সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

সপ্তম বর্ষ

কার্ত্তিক ১৩২৫ হইতে আশ্বিন ১৩২৬।

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুইটাকা।

PUBLISHED FROM.
RESEARCH HOUSE--MYMENSINGH.

# সূচী।

—•*•—

শান্তনুর পুত্র লাভ।

( নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'ভীষ্ম' হইতে গৃহীত )

আশুতোষ প্রেস।

# সৌরভ

সপ্তম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২৫। { প্রথম সংখ্যা।


## ভুক্তি ও মুক্তি।

ট্রাইট্স্কে (Treitschke) বলিয়াছেন, যে জাতি মদ্য ব্যবহার করে না, সভ্য-পদবী তাহার প্রাপ্য নহে। প্রথম যখন কথাটা পড়ি, হঠাৎ প্লীহা যকৃৎ সমেত চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। যে দেশে ধেনো মদ তৈয়ার করা অনেক দিন হইল উঠিয়াগিয়াছে, এবং সোমলতা কেহ আর চিনে না, যে দেশে আঙ্গুর ফল সহজে উৎপন্ন হয় না এবং কবিরাজেরা অরিষ্ট তৈয়ার করিবার সময় দূর দেশান্তর হইতে দ্রাক্ষা ফল মূল্য দিয়া কিনিয়া আনেন, এবং যে দেশে যাহারা গোপনে মদ্য খায় তাহারাও প্রকাশ্যে মাস মাস চাঁদা দিয়া মদ্যপান নিবারিণী সভার সভ্য থাকেন—যে দেশে তান্ত্রিক উপাসনা এখন একেবারে লুপ্ত না হইলেও গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে,—যে দেশের শিক্ষকেরা কত রকমে ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেন যে মদ্যের মত বিষ আর নাই—সে দেশের বেদে যাহাই থাকুক না কেন, তন্ত্র যাহাই বলুক না কেন, সাধারণ লোক সহসা বুঝিতে পারে না, পণ্ডিতের মুখে মদ্যের সম্বন্ধে এ কি কথা! ইংরেজী শিক্ষার প্রথম চোট ফিরিয়াছে,—রাজনারায়ণ বসুর 'সে কাল' আর নাই; সুতরাং মদ্য না হইলে সভ্যতা হয় না, হঠাৎ আমরা এ কথাটা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি নাই। মনে হইয়াছিল, ট্রাইট্স্কে যে শুধু ভুল করিয়াছেন, তা নয়; তিনি ভুলের চেয়ে গুরুতর জিনিস পাপ করিয়াছেন। লেখা পড়া শিখিয়া কেমন করিয়া গণ্ডমূর্খ হইতে পারা যায়, মহামতি ট্রাইট্স্কে তাহা দেখাইয়াছেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়িল বৃদ্ধ মনুর বচন :—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

মানুষের প্রবৃত্তিতে যাহা লয়, তাহা দোষের নয়; করিলে পুণ্য না হইতে পারে, কিন্তু পাপ নাই। মদ্যাদি ব্যবহারে যখন মানুষের প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তখন তাহাতে পাপ থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব-সংসারকে পাপময় মনে করিতে হয়।

নানা রকমে মানুষের সম্মুখে জীবনের যত প্রকার আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটাই মূলীভূত—এক বৈরাগ্য, আর এক ভোগ। বাসনা মাত্রকেই বন্ধন মনে করিয়া, সমস্ত ভোগের বস্তু হইতে সরিয়া থাকিয়া যে সাধনা করা যায়—বৈরাগ্যপন্থীরা সেটাকেই শ্রেয়ঃ পন্থা বলিয়াছেন; প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের প্রভেদ তাঁহারাই দৃঢ়মূল করিয়া দিয়াছেন; এবং এ জীবনটা কিছুই নয়, সুতরাং জীবনের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিকেই তাঁহারা সাধুদের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আর এক আদর্শ ভোগের। চার্ব্বাকের মত কথায় কথায় সকলে গ্রহণ না করিতে পারেন, কিন্তু ভোগকেই যাঁহারা চরম লক্ষ্য মনে করিয়াছেন, চার্ব্বাক তাঁহাদের

মধ্যে প্রধান। মানুষ ভোগ চায়, ঐ দিকেই তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; সুতরাং ঐ প্রবৃত্তির অনুসরণ না করিয়া কোন একটা অজ্ঞাত কিংবা অসম্যক্ জ্ঞাত বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা মূর্খতা ভিন্ন আর কি? সমস্ত জীবজগৎ, সমস্ত চেতন পদার্থ যাহার সন্ধানে ঘুরিতেছে, যাহার আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় বাঁচিয়া আছে, সেই সুখ, সেই ভোগ কিছু নয়, কোন্ সাহসে এ কথা বলিব? সাধারণ একটী উদ্ভিদ্ কণা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশাল বুদ্ধি মানব সন্তান পর্য্যন্ত যাহার সন্ধানে 'পাগলপারা' ছুটিয়াছে, সেই সুখ ছাড়া আর কি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে?

ভোগে বিঘ্ন আছে, সুখে দুঃখ মিশ্রিত থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ভোগ অনভীপ্সিত হইতে পারে না। পথে কণ্টক রহিয়াছে বলিয়া সে পথে যে চলিতে চায় না, তাহার পক্ষে গন্তব্য স্থান কোথায়? চার্ব্বাক বলিতেন, মাছে কাঁটা থাকে বলিয়াই কি মৎস্যাশী তাহার খাদ্য ত্যাগ করে? পশু পক্ষী নষ্ট করিতে পারে, এই ভয়ে কি কৃষক শস্য বপন করে না? কবির ভাষায় বলিব, পঙ্কে পদক্ষেপ না করিলে পঙ্কজ লাভ হয় কি? কণ্টকের ভয়ে কোন্ মূর্খ বসোরার গোলাপ পরিত্যাগ করিতে চাহে? মনীষীরা কণ্টকময়, বিঘ্নময়, দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াই সাধারণ মানুষের অনধিগম্য প্রেয়ঃ বস্তু লাভ করেন। মানুষ যাহাই পাইতে ইচ্ছা করুক না কেন, বাধা তাহাকে অতিক্রম করিতেই হইবে; ভোগের বেলা সেটা বিশেষভাবে সত্য নহে। সুতরাং ভোগের পথে বাধা রহিয়াছে, এই যুক্তিতে মানুষকে ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলা যায় না। বরং সমস্ত চেতন পদার্থের আকাঙ্ক্ষা যে দিকে রহিয়াছে, সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও তাহাকেও চরম লক্ষ্য বলিয়া বরণ করিয়া লওয়া উচিত। ভোগের নিন্দা লঘুচিত্তের পরিচায়ক; শুধু তাই নয়; কঠোর ভাষা যদি এস্থলে অমার্জ্জনীয় না হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, ভোগের নিন্দা কাপুরুষতার লক্ষণ। শাস্ত্র যে শুধু অনুকম্পার স্বরে বলিবেন, "দোষ নাই, করিতে পার, তবে না করিলেই ভাল হয়"—তাহা হইবে না; শাস্ত্রকে স্পষ্টতঃ স্বীকার করিতে হইবে, যে ভোগের সামগ্রীতে অধিকার এবং ভোগের শক্তি যথেষ্ট পুণ্যের পরিচায়ক।*

ভোগ ও বৈরাগ্য, বাসনা ও ত্যাগ—এই দুইটী পরস্পর প্রতিযোগী আদর্শ যদি মানুষের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে কোন্ দিকে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, বলা কঠিন নয়। বৃহস্মনু তাই মীমাংসার ভাষায় বলিলেন, 'দোষ নাই, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্'; কিন্তু সঙ্গে আবার দ্রোণবধের সময় যুধিষ্ঠিরের সত্য কথনের মত চাপা সুরে কহিলেন, 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।' ইহাতে প্রকারান্তরে ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইল—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা হইল না। প্রবৃত্তির অনুসরণ করায় দোষ নাই, তবে নিবৃত্তির ফলই অধিক,—ইহা বলার স্পষ্ট অর্থ এই যে, প্রবৃত্তির চেয়ে নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ। তপস্বীদের তপঃপ্রভাবে বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাইত, কিন্তু মনুর মীমাংসায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির একত্র অবস্থান সুকর হইল না।

প্রবৃত্তির পথ হাজার হইলেও সুগম—সহজেই মানুষ সে পথ ধরিতে পারে। আর নিবৃত্তি-মার্গ যতই নির্ম্মল হউক না কেন, সে পথে পড়িতে হইলে পদে পদে প্রবৃত্তির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে মাথা ঠুকিতে হয়। নিবৃত্তি গম্ভীর স্বরে বলিতে পারে—

'ন জাতু কামঃ কামানুমুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।'

—উপভোগ দ্বারা কামনার কখনও শান্তি হয় না; আগুনে ঘি ঢালিলে যেমন হয়, ভোগ হইতে কামনার তেমনই বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি পদে পদেই যে বাসনাকে মোহন বেশে পথ আগুলিয়া বসিয়া থাকিতে দেখি। বাসনার শতেক দোষ থাকুক, তাহাকে এড়াইয়া যাওয়া যে দুষ্কর। সুতরাং নিবৃত্তি-মার্গ শাস্ত্রের জ্ঞানদৃষ্টিতে যতই মনোরম হউক না কেন, সাধারণ মানুষ রক্ত মাংসের দেহ লইয়া 'বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িতে পারে না। শুধুই কি তাই? যারা 'জয় রাধে'

* 'ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরস্ত্রিয়ঃ। বিভবং চ দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্।'

বলিয়া দ্বারে দ্বারে বৈরাগ্যের ধ্বজা বহন করিয়া বেড়ায় এবং লোকের নিকট বৈরাগী বলিয়া কথিত হয়, যারা সন্ন্যাসের ঘটা করিয়া পরের চুল দিয়া জটা বান্ধে এবং অর্দ্ধ-নিমিলিত নেত্রে চাহিয়া দেখে কোন্ দর্শকের ভক্তির পরিমাণ কয় পয়সায় পরিমিত হইয়াছে,—তাদের, এবং তাদের মত শত সহস্র লোকের লালসার মোহ কি কম?

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই কি জগতে কম হইয়াছে? ছুটিয়া ছুটিয়া হয়রাণ হইয়া শিশু যেমন তাহার অনুধাবনের আর কোন মূল্য দেখিতে পায় না, তেমনই হয়রাণি যখন আসে তখন উপকথার শৃগাল যেমন দ্রাক্ষাফলকে তিক্ত মনে করিয়াছিল প্রবৃত্তিবান্ পুরুষও সেই রকম প্রবৃত্তির প্রতি বীতরাগ হইতে পারে। কিন্তু এ বিরাগ চিরকালের জন্য নয়; ভোগের শক্তি উদ্রিক্ত হইলেই প্রবৃত্তিও আবার জাগিয়া উঠে। এইরূপ একটা হয়রাণির সময়ই বোধ হয়, ইউরোপ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়াছিল, রক্তমাংসময় দেহের উৎপত্তি এবং স্থিতি পাপেতেই হইয়া থাকে;—দেহ এবং আত্মা, জড় এবং চেতন, সংসার এবং স্বর্গ, flesh এবং spirit—এ যুগলের প্রণয় অসম্ভব। ঠিক এইরূপ একটা হয়রাণির সময়ই বোধ হয়, ইউরোপ রোম-গ্রীসের দার্শনিক কূট-তর্ক লইয়া সরল বিশ্বাসী যীশুর মৃত্যুতে সমস্ত সংসারের—প্রবৃত্তি-মূলক বিশ্বসমাজের অনস্তিত্ব প্রতিপাদিত দেখিয়াছিল। প্রবৃত্তির বিলোপ সাধন (crucifixion of the flesh), সংসারের অনস্তিত্ব স্বীকার (denial of the world) প্রভৃতি বড় বড় কথা যে বিধ্বস্ত রোমক সাম্রাজ্যের উড্ডীয়মান ভস্মরাশির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, বিফল বাসনার তীব্র মনোবেদনায় জগৎবাসী তখন আকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

যে কারণেই হউক, প্রবৃত্তিকে অপকৃষ্ট মনে করিয়া, তাহার আভিজাত্যহীনতার জন্য তাহাকে দলিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা জগতে অনেক বার অনেক রকমে হইয়াছে। অনেকবার ঘোষণা করা হইয়াছে, "কিছু চাহিও না, যাহা আছে তাহার প্রতিও একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িও না;-বিশ্বের ভাণ্ডারে অফুরন্ত সামগ্রী রহিয়াছে, তুমি চাহিবে কত? চাহিয়া চাহিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িবে, তথাপি শান্তি, সোয়াস্তি, তৃপ্তি, তোমার ভাগ্যে ঘটিবে না;—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—যত না চাহিয়া পার, ততই ভাল। আর, যাহা আছে তাহাতেও অতিরিক্ত মাত্রায় অনুরক্ত হইও না;—কারণ,—কে জানে—কখন যে সব অন্তর্হিত হইয়া যাইবে—'হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং'। সুতরাং 'সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'—'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' হইয়া কালযাপন কর। এই প্রকার অনেক উপদেশ শ্রবণ করিবার ভাগ্য মানুষের হইয়াছে। কিন্তু ফল দাঁড়াইয়াছে কি? 'সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' ব্যক্তিকে আমরা বেদান্তে, পুরাণে, এখানে সেখানে, 'জীবন্মুক্ত', 'মহাপুরুষ', 'ঋষি', 'রাজর্ষি', ইত্যাদি নানা আখ্যায় অভিহিত করিয়াছি বটে,—কিন্তু এইরূপ একটী মানুষ পাওয়া চিরকালই দুষ্কর রহিয়াছে। প্রবৃত্তির বিনাশ হয় নাই।

রাবণের চিতা কবে নিবিয়া গিয়াছে, কেহ টেরও পায় নাই, যদিও এক সময়ে লোকে ভাবিয়াছিল, এ আগুণ আর নিবিবেনা। কিন্তু মানুষের ভিতরে যে প্রবৃত্তির বহ্নি রহিয়াছে, তাহা যদিও বাড়িতে কমিতে পারে, তথাপি সাগ্নিকের আহিত অগ্নির মত তাহা অনির্ব্বাণ।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষা জীবিতুমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং॥"

বাস্তবিকইত, ইহার চেয়ে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? কাঁধে করিয়া শ্মশান ঘাটে মরা লইয়া যাইতেছি, চোখের সামনে তাহার এক সময়ে সযত্নে রক্ষিত দেহটাকে, ভস্মে মিলাইয়া যাইতে দেখিতেছি, তথাপি নিজের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই মনে জাগে না, ইহা আশ্চর্য্য নয় কি? কিন্তু এইত দুনিয়া, এইত মহামায়ার মায়া। যে দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি, কান্তি প্রভৃতি নানারূপে সংস্থিতা রহিয়াছেন, এবং যাঁহাকে দেবগণও স্তব করিয়াছিলেন,—এ তাঁহারই লীলা, তাঁহারই মায়া।

প্রবৃত্তির জয় চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। তাহা না হইলে দেবরাজ ইন্দ্র এত এত বার অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিতেন না, তাহা না হইলে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ

হইত না, এবং তা না হইলে শকুন্তলার জন্ম হইত না এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পড়িতে পাইতাম না। প্রবৃত্তির যদি জয় না হইত তাহা হইলে গেটের (Goethe) ফষ্ট (Faust) সয়তানের নিকট নিজের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া সুখের এবং শান্তির লালসায় ভূতলে রসাতলে ছুটাছুটি করিত না। আর যারা নিবৃত্তির ধ্বজা উড্ডীন করিয়া হুহুঙ্কার করে, তারাও কি কোনও একটা বস্তুর পিছনে বদ্ধ দৃষ্টি নহে, কোনও একটা কিছু পাইবার আশায় ধাবমান নহে? জিনিসটা এ জগতের না হইতে পারে, কিন্তু সেওত একটা লালসার সামগ্রী এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াও ত প্রবৃত্তিই আমাদের বাঁচিয়া থাকে। গাভীর জন্ম বশিষ্টের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের কলহ খুব ভদ্রোচিত হয় নাই বটে, কিন্তু সে কলহটা বাদ দিলেও বিশ্বামিত্রের তপস্যার মূলে কি কোনও প্রবৃত্তি ছিল না? খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা যে সংসার হইতে দূরে মঠ স্থাপন করিয়া অনাহারে ও অনিদ্রায় কাল কাটাইত, তাহার মূলে কি প্রবৃত্তি ছিল না? এই পৃথিবীর প্রতি অবহেলায় কি তাহাদের ঐ পৃথিবীর সেই ভবিষ্যৎ রাজ্যের প্রতি লালসা দ্বিগুণিত হইত না? তান্ত্রিক যে শ্মশানে বসিয়া নর কপালে 'কারণ' পান করে, তাহার মূলেও কি 'ঐশ্বর্য্য' লাভের—বিভূতি প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে না? যোগীর নির্জ্জন যোগসাধনায় যে যে শক্তি লাভ হয়, শাস্ত্র সে কথা এত ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিয়াছে কেন? জ্যোতিষ্টোম, দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতির ফলে কত দিন স্বর্গবাস হয়, টীকা টিপ্পনীতে মণ্ডিত করিয়া বেদ সে কথা এত বারবার বলিয়াছে কেন? এত সব প্রচেষ্টা শুধু মানুষের প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া দিবার জন্যই নয় কি?

প্রবৃত্তির বিলয় সুতরাং আকাশ কুসুম,—কল্পনার দৃষ্টিতে যতই সুন্দর হউক না কেন, ধরিতে পাওয়া যায় না। তথাপি নিবৃত্তির জন্য চেষ্টাও কম হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সাধনা যেন দুইটী পাশাপাশি স্রোতের মত চলিয়াছে। একদিকে বেদ, ব্রাহ্মণ, স্মৃতি এবং তাহাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা পূর্ব্ব মীমাংসা ভোগকেই বরণীয় মনে করিয়া তাহারই প্রাপ্তি, তাহারই স্থায়িত্বের জন্য কত শত উপায়ের চিন্তায় ব্যাপৃত; আর একদিকে, উপনিষৎ ও বেদান্ত মুক্তির চিন্তায় ব্যস্ত। একদিকে দেখিতে পাই অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা, সোমলতার স্তব এবং ব্রতাদির বিবিধ ফল বর্ণনা—দেখিতে পাই, প্রার্থনা হইতেছে—'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্'—অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে ধন প্রাপ্তির দিকে নিয়া যাও; কিম্বা স্তব হইতেছে, 'স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া'— হে সোম(লতা), তুমি স্বাদিষ্ঠ ও মাদিষ্ঠ ধারায় ক্ষরিত হও; কিম্বা বিচার হইতেছে, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অথবা একাদশীর ফল কি, চন্দ্রগ্রহণের সময় গঙ্গাস্নানে কত কোটি বৎসর স্বর্গে বাস হয়। অপর দিকে দেখিতে পাই, ভোগের নিন্দা এবং মুক্তির প্রশংসা—শুনিতে পাই 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি একদিকে দেখিতে পাই, ভুক্তির প্রশংসা, আর একদিকে দেখি মুক্তির মাহাত্ম্যকীর্ত্তন। ভুক্তি ও মুক্তির এই যে কলহ তাহা ভারতেই যে শুধু দেখা যায়, তা নয়। কিন্তু সব জায়গায়ই মুক্তিবাদীরা ভুক্তির উপর কিছু কঠোর আক্রমণ করিয়া থাকেন। ভুক্তির আর যতই দোষ থাকুক না কেন, পরনিন্দায় তার বিশেষ কোন আনন্দ নাই। তাহার পথ অবশ্যই মুক্তির পথের বিপরীত দিকে, এইটুকু বিরোধ মুক্তির সঙ্গে তাহার আছে। কিন্তু সে নিজের পথই দেখায়, মুক্তিপথের নিন্দা করা তাহার ব্যবসায়ের অন্তর্গত নয়।

মুক্তি কিন্তু এতটা সংযত নয়। ভোগের নিন্দা করা কতকটা তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে। যে পথে স্বভাবতঃই মানুষের গতি, সে পথের নিন্দা না করিলে মানুষকে ফিরাইয়া আনা কঠিন। কিন্তু এত রকমে ভোগের নিন্দা করিয়াও ত মুক্তি জয়ী হইতে পারে নাই। এত এত মুক্তি তর্ক সত্ত্বেও ত মুক্তির জন্য কেহ ঘর সংসার ছাড়িতে আরম্ভ করে নাই। যাহারা সংসার ছাড়িয়া যায়, তাহাদের দ্বারা সংসার চলে না; সুতরাং মুক্তির জন্য কেহ যদি ঘর ছাড়িয়া বন আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত নিজের উপকার করিয়াছেন, কিন্তু সংসার যে টিকিয়া আছে সে ত এ প্রকার লোকের চেষ্টায় নয়। এবং সংসার না থাকিলে মুক্তিবাদীর জন্মই কি হইত? সংসার আছে বলিয়াই ত অন্যান্য ভালমন্দ নানা জিনিসের সঙ্গে

সঙ্গে মুক্তির ঢক্কাবাদককেও মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া মুক্তিকে ভুক্তির দ্বারে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। ভোগ যদি সংসার হইতে লোপ পাইত, তাহা হইলে মুক্তির কথা কহিবার এবং শুনিবার জন্য লোকেরও অভাব হইত—'আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য শ্রোতা' কোথায় যে উধাও হইয়া যাইতেন কবিকল্পনায়ও তাহার সন্ধান পাওয়া যাইত না।

সুতরাং ভোগের আভিজাত্য নাই—সে জাতিকুলহীন নিকৃষ্ট—এ সব বড় বড় কথায় বিদ্বেষ থাকিতে পারে, কিন্তু অর্থ বিশেষ কিছু নাই। ভুক্তি ও মুক্তির মধ্যে কলহটা পাকাইয়া তুলিলে হয় এই, মানুষের জীবনটা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। ভোগকে সে ছাড়িয়া পারে না—সে দিকে তাহার সর্ব্বস্বের টান: কিন্তু মুক্তির এত সব প্রশংসা শুনিয়া সে দিকেও যে তাহার লোভ না হয়, তা নয়; ফলে, কলহটা ভোগ ও বৈরাগ্যের মধ্যে না হইয়া দুইটী বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে গিয়া দাঁড়ায়;—এক দিকে ভোগের স্পৃহা, আর এক দিকে মুক্তির জন্যও স্পৃহাই। এই দুইটীকে একত্র স্থান দিতে না পারিয়া মানুষ দ্বিপত্নীক ভবানন্দ মজুন্দারের মত নিজেকে দুইটা ভাগ করিয়া লইতে বাধ্য হয়। অবসর মত সে মুক্তির কথা শতমুখে কহিতে শিখে, সন্ধ্যায় সকালে হয় ত সে মুক্তিলাভের জন্য একটু আধটু অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে;—কিন্তু বাকী সময় টুকু সে ভোগের নেশায় বিভোর থাকে।

কথিত আছে, মিশরবাসী বড়লোকেরা যখন বড় রকম ভোজে বসিতেন, তখন খেদমতগারেরা একটী ভেষজ রক্ষিত মৃতদেহ সকলের সম্মুখ দিয়া ঘুরাইয়া নিত উদ্দেশ্য ছিল, ভোগের বন্যার মধ্যেও ভবিষ্যতের কথাটা একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া। এটা এক রকম মন্দ বুদ্ধি ছিল না ইহাতে ভোগকে একেবারে লোপ পাইতে বলা হইত না। অথচ সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের কথাটাও লোকে স্মরণ করিবার অবসর পাইত।

কথাটা অনুধাবনের যোগ্য। ভুক্তি ও মুক্তিকে সপত্নীর মত পৃথক্ ঘরে স্থান করিয়া দিলে চলিবে না। তাহারা সখীর মত—অনসূয়া প্রিয়ম্বদার মত—গলায় গলায় চলিতে পারিলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়। মুক্তির কথা ভুক্তিকে সংযত রাখিবে, আর ভোগের স্পর্শে মুক্তি প্রাণময় হইয়া উঠিবে, তবে ত মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ জীবন সম্ভব হইবে। যাঁহারা শুধু বৈরাগ্যের বাহার দেখিতে চান, তাঁরা ফাঁকা কথায় মজিয়া থাকেন; মুক্তি অর্থ ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্তি, ভূমার দিকে গতি; ভোগের সঙ্গে ইহার নিত্য বিরোধ নাই। বরং ভোগে যে ক্ষুদ্রতা সহজেই আসিয়া পড়িতে পারে, মুক্তির ছায়াপাতে তাহা দূরে অপসৃত হয়। ভুক্তি মাত্রেই পাপ নয়—বরং ভুক্তির সজীব স্পর্শ না হইলে মুক্তির কথা প্রাণস্পর্শী হয় না। একটীকে বাদ দিলে আর একটীর অপূর্ণতা ঘটে: এবং মনে রাখা উচিত, 'যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখম্'॥

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

# সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩০শে জুন আমরা এল আলাগা সহরে উপস্থিত হইলাম। নদীর বাম তটে ইহা অবস্থিত। সহরটি অতি ক্ষুদ্র। অধিবাসীর সংখ্যা দুই হাজারের অধিক হইবে না। সহরে চারিজন য়ুরোপীয় বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে বাস করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে একজন ইংরাজ। আমরা এক রাত্রি তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিলাম। সাহেব হাতীর দাঁত, পাখীর পালক, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির চামড়া, মধু প্রভৃতি এখান হইতে য়ুরোপে চালান দেন, এবং য়ুরোপীয় দ্রব্যাদি আমদানি করেন। লণ্ডন সহর ইহার কেন্দ্র। শুনিলাম এই প্রকার কাজে এই দেশে অনেক ইংরাজ নিযুক্ত আছেন, এবং সকলেই বিশেষ লাভবান হইতেছেন। সাহেব বলিলেন, আফ্রিকার এই অংশে এইভাবে ব্যবসা করিবার জন্য এখনও অনেক লোকের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ হইতে একজন মাড়োয়ারী এইখানে কারবার করিতেছেন। তিনি আমাকে ও রবিকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা তিনজনে মিলিয়া এই কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রথমে দুই সহস্র টাকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

সে আজ চার বৎসরের কথা। এক্ষণে উহাঁদের মূল ধনের পরিমাণ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। বড়ই দুঃখ হইল যে, টাকা রোজগারের এমন সহজ উপায় থাকিতেও আমাদের দেশের লোক এদিকে একবারে মন দেন না। মাড়োয়ারির মতন যদি ৫।৭ জন লোক অনধিক এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া এই কাজে হাত দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সামান্য বেতনের চাকরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় না। সামান্য সাহস থাকিলে ও পরিশ্রম কাতর না হইলে যে কেহ এ কাজে হাত দিতে পারেন।

পরদিন আমরা খুব প্রাতঃকালে আলাগা ত্যাগ করিলাম। নদীর দুই ধারের দৃশ্য ঠিক আগেকার মত—গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা বন্য জন্তুও দেখিতে পাইতেছিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় আমরা আহারাদির যোগাড় করিতেছি এমন সময় দেখি একখানা ক্ষুদ্র নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে। নৌকা খানা ঠিক ডোঙ্গার মত বলিয়া আমরা দূর হইতে বুঝিতে পারিলাম, উহার মধ্যে কোনও আরোহী আছে কিনা? ক্রমে ক্রমে যখন উহা নিকটে আসিল তখন ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এক যুবক ও এক যুবতী প্রায় উলঙ্গ ভাবে পাশাপাশি শয়ান। বিলক্ষণ মজবুত ও মোটা রজ্জু দ্বারা দুইজনে নৌকার সহিত আবদ্ধ। আমাদের মাঝিরা উহাদের দেখিয়াই 'চউ কিয়ানো'. 'চউ কিয়ানো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাপারটা এই :—

এ দেশের অনেক স্থানে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিশেষ কঠিন ব্যবস্থা আছে। কোনও বিবাহিতা রমণী যদি স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে, তাহা হইলে স্বামী মহাশয় গ্রামের লোকের সাহায্যে উভয়কে ধৃত করিয়া গ্রাম্য জুজুর নিকট আনয়ন করেন। জুজু একখানা লাঙ্গল বা শাবল আগুনে লাল করিয়া উভয়ের হাত বা পায়ের উপর ছ্যাঁকা দেয়। যদি তাহাতে ফোস্কা না, পড়ে তাহা হইলে উহারা নিরপরাধী সাব্যস্ত হয়। বলা বাহুল্য এ প্রকার ভীষণ পরীক্ষায় কেহই পাশ হয় না।

উহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইলে দুই জনকে একখানা ক্ষুদ্র নৌকা বা ডোঙ্গায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবদ্ধ করিয়া উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ দেশের সামাজিক শাসন এমন কঠিন যে, ঐ হতভাগ্য প্রণয়ীদ্বয়কে ছাড়িয়া দিবার সাহস কাহারও হয় না। এই প্রকার শাস্তি প্রাপ্ত প্রণয়ীদিগের যে কি পরিণাম হয়, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না।

যাহা হউক, আমরা নৌকার মধ্যে ঐ ব্যাপার দেখিয়া মাঝিদিগকে নৌকা ধরিবার জন্য আদেশ করিলাম। উহারা প্রথমে অস্বীকার করিল এবং বলিল যে ঐ কার্য্য করিলে উহাদের প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। শেষে কাপ্তেন সাহেব যখন উহাদিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন তখন তাহারা সম্মত হইল। অবিলম্বে নৌকা ধৃত হইল এবং আমাদের সম্মুখে আনীত হইল। আমি নৌকার মধ্যে যাইয়া উহাদের দুইজনকে মুক্ত করিয়া দিলাম, কিন্তু দুই দিন ক্রমাগত অনাহারে থাকায় উহারা এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহাদের কাহারও উঠিবার শক্তি ছিল না। তখন উহাদিগকে আমাদের নৌকায় আনা হইল। তিন দিনের পর উহারা কিছু আহার করিয়া অনেকটা সবল হইয়া উঠিল।

শুনিলাম' ঐ যুবক ও যুবতীর মধ্যে বহুদিন যাবত ভালবাসা ছিল। কিন্তু গ্রামের বৃদ্ধ সর্দ্দার যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া অর্থ দ্বারা উহার পিতাকে হস্তগত করিয়া উহাকে বিবাহ করে। যুবক যুবতী কিন্তু পূর্ব্ব ভালবাসা ভুলিতে পারিল না; তাহারা প্রায়ই গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিত। অবশেষে যাহা হয় তাহাই হইল। একদিন দুজনে ধরা পড়িল। পরিণাম যাহা হইয়াছিল তাহা বলিয়াছি। কাপ্তেন সাহেব উহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলায় যুবক বলিল যে ঐ দেশে তাহাদের আর স্থান নাই। তাহারা কোনও দূর দেশে চলিয়া না গেলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। অগত্যা সাহেব উহাদিগকে সঙ্গে করিয়া কায়রো পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে স্বীকার পাইলেন।

পরদিবস আমরা এলভুগো নামক এক ক্ষুদ্র সহরের নিকট বেলা প্রায় নয়টার সময় নজর ফেলিলাম।

আহারাদির পর র সাহেব একজন সিপাহী সঙ্গে লইয়া হরিণ শীকার করিতে বাহির হইলেন। অপরিচিত স্থান বলিয়া কাপ্তেন সাহেব তাঁহাকে তীর হইতে অধিক দূর যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি স্বীকার পাইয়া চলিয়া গেলেন। অনুমান ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তিনি ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু একা। তিনি যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—খানিক দূর গমনের পর আমি দূরে একটা হরিণ দেখিতে পাইলাম। সিপাহীকে ঐ স্থানে দাঁড়াইতে বলিয়া আমি খুব সন্তর্পণে উহার দিকে অগ্রসর হইলাম। মিনিট ২।৩ পরে এক ভীষণ চীৎকার শুনিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিতে পাইলাম তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। আমার সঙ্গের সিপাহী উপুর হইয়া পড়িয়া আছে। একটা প্রকাণ্ড সিংহ উহার ঠিক পাশে দণ্ডায়মান। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সিংহটা উহার পৃষ্ঠের কোটটা দাঁতে ধরিয়া উহাকে উঠাইয়া লইল এবং জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। এতক্ষণে যেন আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি তৎক্ষণাৎ উহাদের অনুসরণ করিলাম। কিন্তু প্রায় ২০ মিনিট কাল অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোনও সন্ধান পাইলাম না।

কাপ্তেন সাহেব তৎক্ষণাৎ আমাকে, রবিকে ও আরও চারিজন লোক লইয়া সিপাহীর সন্ধানে চলিলেন। র সাহেবকেও সঙ্গে লওয়া হইল। আমাদের সঙ্গে একজন ঐ দেশীয় শিকারী ছিল। উহার সাহায্য না পাইলে আমরা সেদিন কোনও মতে কৃতকার্য্য হইতাম না। যে স্থানে সিংহটা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল, সেইখান হইতে সে সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। ঐ লোকটার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এক এক স্থানে পায়ের সামান্য মাত্রও চিহ্ন ছিল না। সে সব জায়গায় লোকটা যে কিসের সাহায্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছিল তাহা আমাদের বুদ্ধিতে কুলাইল না।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমরা এক উন্মুক্ত স্থানের নিকটে উপস্থিত হইলাম। এইখানে সহসা সে গতি-রোধ করিল এবং বলিল যে সিংহ নিকটেই কোনও স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা তখন অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইলাম। কয়েক পদ যাইয়াই আমাদের পথ প্রদর্শক একস্থানে দণ্ডায়মান হইল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেতে সম্মুখে দেখাইয়া দিল। যাহা দেখিলাম তাহা অতি অপূর্ব্ব।

সিংহটা সম্মুখের পাও দ্বারা এক স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতেছে, আমাদের সিপাহী উহার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। সে জীবিত না মৃত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ৫।৬ মিনিট পরে যখন গর্ত্তটা বেশ গভীর হইল, তখন পশুরাজ গর্জ্জন আরম্ভ করিল। ওঃ! সে কি ভীষণ ব্যাপার! সমস্ত বন ভূমি যেন কাঁপিতে লাগিল। সত্য কথা বলিতে কি, ভয়ে আমার মুখ শুখাইয়া গেল। বন্য সিংহের গর্জ্জন ইহার আগে অনেকবার শুনিয়াছি। কিন্তু এত নিকট হইতে কখনও শুনি নাই। দেশে শুনিয়াছিলাম, সিংহের গর্জ্জন শুনিলে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইয়া যায়। আজ ইহার সত্যতা বর্ণে ২ বুঝিতে পারিলাম।

কয়েক বার গর্জ্জনের পর সিংহ নিজ শীকারকে মুখে করিয়া উঠাইয়া গর্ত্তের মধ্যে রক্ষা করিল এবং চারিপাশ হইতে মৃত্তিকা লইয়া উহার উপর ফেলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সিপাহীর মুখ ও পায়ের, জুতাদ্বয় ছাড়া আর সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিল। এই সময়ে সাহেবরা উহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সিপাহীকে লাগিবার ভয়ে উহাঁরা সাহস করিলেন না।

ইহার পর সিংহ চারিদিকে কয়েকবার চাহিয়া দেখিল, এবং কয়েক পদ চলিয়া গেল। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিল এবং আরও খানিকটা মাটি সিপাহীর উপর নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় ঐ স্থান ত্যাগ করিল। এবার প্রায় ২০।২৫ গজ চলিয়া গেল, কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিল। এই ভাবে ৬ বার চলিয়া গেল ও ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কোনও বারেই ২০।২৫ গজের অধিক দূর গেল না। ষষ্ঠ বারে সে প্রায় ৪০।৪৫ গজ দূর পর্য্যন্ত প্রস্থান করিল। সাহেবেরা এ পর্য্যন্ত যে কেন গুলি চালান নাই তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এইবার দুই জনে এক সঙ্গে গুলি করিলেন। অতি ভীষণ রবে গর্জ্জন করিয়া সিংহটা একদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

ঠিক ঐ মুহূর্ত্তে প্রোথিত সিপাহী হটাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মাতালের মত টলিতে ২ আমাদের দিকে অগ্রসর হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলে মুহূর্ত্তের জন্য ঘোর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর সকলে তাহার দিকে দৌড়াইয়া গেলাম। সকলের আগে কাপ্তেন সাহেব ছিলেন। সে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, এবং কয়েকবার 'আয় আল্লা, আয় আল্লা' ( লোকটা মুসলমান ) বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। এই সময়ে সিংহটা যদি সাংঘাতিক ভাবে আহত না হইত, তাহা হইলে হয়ত আমার এই গল্প অন্য ভাবে লিখিতে হইত। আমরা সিপাহীকে লইয়া এ প্রকার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সিংহটার প্রতি নজর দিতে একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অজ্ঞান সিপাহীকে যখন নৌকায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তখন আমরা দেখি যে সিংহটা মুমূর্ষু। র সাহেব এক গুলির আঘাতে তাহার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করিয়াদিলেন। অনতিবিলম্বে সিংহের মৃত দেহটা লইয়া আমরা নৌকায় গমন করিলাম। হতভাগ্য সিপাহীকে কিন্তু আমরা বাঁচাইতে পারিলাম না। ঐ দিনই সে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইল এবং দুইদিন পরে সংসারের সমস্ত যন্ত্রণা এড়াইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

---

# ধূমকেতু।

আজন্ম দেখিয়া অভ্যস্ত বলিয়া আমরা নক্ষত্র খচিত বিচিত্র নভোমণ্ডলের দিকে অনেক সময়ে তাকাইয়া দেখারও প্রয়োজন বোধ করি না। যখন উল্কাপাত, গ্রহণ কিম্বা ধূমকেতুর আবির্ভাব হয় তখনই আমরা সতৃষ্ণ নয়নে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকি।

১৯১০ সনের ১৬ই জানুয়ারী জোহন্‌স বার্গে একটী ধূমকেতু দৃষ্ট হইবা মাত্র গ্রেট বৃটেনে উহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং তিন দিন পরে জ্যোতির্ব্বিদগণ কেম্বিজ মানমন্দির হইতে উহা দেখিতে পান। ইহার গতি এত দ্রুতছিল যে তিন দিনের মধ্যেই উহা সূর্য্যের পশ্চিমদিক হইতে প্রায় ৪২ ডিগ্রি পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছিল। তখন সূর্য্যাস্তের পরে উহাকে খালি চক্ষেই পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইত। দিন দিন উহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল এবং ক্রমে চক্রবাল হইতে উর্দ্ধদিকে ইহার বিশাল পুচ্ছ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই ধূমকেতুর মস্তক শুক্র গ্রহ হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং মঙ্গল হইতে উজ্জ্বলতর বোধ হইত। ক্রমে ইহার দুইটী পুচ্ছ দেখা যাইতে লাগিল। বৃহৎ পুচ্ছ উর্দ্ধদিকে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় পুচ্ছটী ক্ষুদ্র এবং প্রথমটী হইতে ২০ ডিগ্রি ব্যবধানে তির্য্যকভাবে লম্বমান। ২৯শে জানুয়ারীতে বৃহৎ পুচ্ছের পরিমাণ ৬ কোটি ২০ লক্ষ মাইল এবং উহা নভোমণ্ডলের ৫০ ডিগ্রি স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছিল। দিবা ভাগে দৃষ্ট হয় এরূপ ধূমকেতুর মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর এই ধূমকেতুটী একটী প্রধান।

১৯১১ সনের ধূমকেতুটীর সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত হেলির ধূমকেতু আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও অনেক বার হেলির ধূমকেতুর সঙ্গে সঙ্গে অপর এক একটী ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছে। ১৯০৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নভোমণ্ডলের অলোক চিত্রে নিহারিকা পুঞ্জবৎ হেলীর ধূমকেতুটী প্রথম দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে উহাকে খালি চক্ষে দেখা যায়।

হেলী (Edmund Halley) লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তিনি সেণ্টহেলেনায় জ্যোতির্ব্বিদের কার্য্য করেন। অতঃপর তিনি অক্সফোর্ড জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন এবং অবশেষে গ্রীন্ উইচ্ মানমন্দিরের ভার প্রাপ্ত হন।

তিনি ১৬৮২ সনে তাঁহার নামে অভিহিত ধূমকেতুটী প্রথম পর্য্যবেক্ষণ করেন হেলীই ইহার পুনঃ পুনঃ আগমনের কথা প্রথম প্রচার করেন। সে জন্যই ইহাকে হেলীর ধূমকেতু বলা হয়। ইহার পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে ধূমকেতু একবার চলিয়া গেলে আর কখন ফিরিয়া আসে না। হেলী আবিষ্কার করেন যে ১৬৮২, ১৬০৭ এবং ১৫৩১ সনের দৃষ্ট ধূমকেতুর কক্ষ প্রায় এক এবং তিনি আরও দেখিতে পান যে ১৪৫৬, ১৩০১, ১১৪৫ এবং ১০৬৬ সনের বৃহৎ ধূমকেতু উদয়ের কথা লিপিবদ্ধ

আছে। এই সকল উপাদানের উপরে নির্ভর করিয়া হেলী তাঁহার ধূমকেতুর পুনরাগমনের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন্ প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর পরে উহার আগমন হইয়া থাকে।

তিনি ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন যে ধূমকেতুটী ১৭৫৯ সালের প্রথম ভাগে পুনরায় দেখা দিবে। কিন্তু ঐ সালের পূর্ব্বেই অঙ্ক শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হওয়ায় ক্লেরট (Clairaut) গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ১৭৫৯ সনের ১৩ই এপ্রিল ধূমকেতুটী সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে। গণনার সময়ে তিনি প্রবল বৃহস্পতির আকর্ষণের বিষয়ও হিসাব করিয়াছিলেন। সে সময় পর্য্যন্ত উরেনস্ ও নেপ্‌চুন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ক্লেরট তথাপি ভবিষ্যৎ-বাণী করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন—যদি ধূমকেতুটী অপর কোন গ্রহের আকর্ষণে পড়ে, তবে উহার আবির্ভাব এক মাস আগ পাছ হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ১৭৫৯ সনের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে ধূমকেতুটী সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া হেলীর ভবিষ্যৎ-বাণীর সত্যতা প্রমাণিত করে। হেলীর আবিষ্কারের পরে দেখা গিয়াছে যে প্রায় ১২।১৪টী ধূমকেতু কতিপয় বৎসর পরে পরে পুনরাগমণ করিয়া থাকে।

হেলীর ধূমকেতু ভিন্ন আরও দুইটী ধূমকেতু ৭০ ৮০ বৎসরে একবার তাহাদের কক্ষ পরিভ্রমণ করে। পুনরাগমণকারী ধূমকেতুর মধ্যে হেলীর ধূমকেতুই সর্ব্বোজ্জ্বল এবং সর্ব্বপ্রধান। এই সকল ধূমকেতুর পরিচয় সম্বন্ধে একটী প্রধান অন্তরায় এই যে কেবল কক্ষ ব্যতীত ইহাদিগকে সেনাক্ত করিবার অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বে যে ধূমকেতু সপুচ্ছ উদিত হইয়াছিল,এবার হয়ত সে লেজহীন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুসংস্কার সকল দেশেই বর্ত্তমান আছে। পূরাকালে ইহাকে অনেকে একটী জীব বলিয়া মনে করিত। বহুদিন পর্য্যন্ত ধূমকেতুর আগমন লোকে অশুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিত। এরিষ্টটল (Aristotle) প্রভৃতির ধারণা ছিল যে পৃথিবী হইতে একটী পদার্থ উর্দ্ধগামী হইয়া উপরস্থ বায়ু সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন যে ধূমকেতুর গতি পথ পেরাবোলা (Parabola) বা ক্ষেপনী ক্ষেত্রের মত কিন্তু হেলী প্রথম আবিষ্কার করেন যে কোন কোন ধূমকেতু ডিম্বাকার (elliptical) ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে। সে সময়ে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে কোন কোন ধূমকেতু পেরাবোলা ক্ষেত্রে এবং কোন কোন ধূমকেতু ইলিপ্‌টিকেল্ ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে, কাজেই উহারা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানিয়া চলিয়া থাকে।

এইরূপে ধূমকেতুদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর গতি পথ পেরাবোলার মত এবং অন্য শ্রেণীর গতিপথ ডিম্বাকৃতি। ইহাদের মধ্যে যাহারা ডিম্বাকার পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে তাহারাই পুনরাগমণ করিয়া থাকে এবং পেরাবোলা পথগামীগণ একবার দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু প্রবলগ্রহের আকর্ষণে কখন কখন ইহাদের গতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অর্থাৎ পেরাবোলা পথগামী ইলিপ্‌টিকেল্ এবং ইলিপ্‌টিকেল্ পথগামী পেরাবোলীক গতি প্রাপ্ত হয়। এ যাবৎ যতদূর নির্দ্ধারিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রায় ২০০ ধূমকেতু পেরাবোলিক পথগামী এবং প্রায় ৫০টী ডিম্বাকৃতি পথে চলিয়া থাকে। কিন্তু প্রায় আরও ২০টীর পথ দেখিতে ইলিপ্‌টিকেল্ মনে হয়, অথচ ইহাদের আবর্ত্তনে বহু বৎসর লাগে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত উহাদের প্রকৃত কক্ষ কিরূপ তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই।

এ যাবৎ প্রায় ৭০০ ধূমকেতুর বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ধূমকেতুর কক্ষের যে অংশটুকু সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গিয়াছে—আমরা মাত্র সেইটুকুই দেখিতে পাই। ইহা ধূমকেতুর কক্ষের এক ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। কাজেই ইহাদের কক্ষ নিরূপণ করা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। প্রকৃত ধূমকেতুটী অত্যুজ্জ্বল না হইয়া নীহারিকা পুঞ্জের মত হইলে উহাদের দূরত্ব স্থির করাও মুস্কিল।

অনেক ধূমকেতুই একবার দর্শন দিয়া তাহার পেরাবোলিক্ কক্ষে অনন্ত আকাশে চিরকালের তরে চলিয়া যায় বলিয়া উহাদিগকে আমাদের সৌর জগতের অন্তর্ভুক্ত বলিতে পারি না। কিন্তু যাহারা ইলিপ্‌টিকেল্ কক্ষে ভ্রমণ করিয়া মাঝে মাঝে সূর্য্যকে বেষ্টন করে তাহাদের এই সৌর জগতের সহিত সম্বন্ধ আছে

বলা যায়। কিন্তু ইহারা বর্ত্তমানে যদিও এই সৌর জগতের অন্তর্ভূত হইয়াছে তথাপি মনে হয় উহারা অনন্ত আকাশ হইতে আসিয়া প্রবল গ্রহাদির আকর্ষণে পড়িয়া তাহাদের দলভুক্ত হইয়াছে। এই যুক্তির সমর্থনে ইহা বলা যাইতে পারে যে ৩ হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে যে সকল ধূমকেতু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে তাহাদের কক্ষ বৃহস্পতির কক্ষের নিকট দিয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় এই প্রবল গ্রহ উহাদিগকে কয়েদ রাখিয়াছে। এইরূপে বৃহস্পতির অধীনে ১৬টী, শনির অধীনে ২টী (উহাদের একটার আবর্ত্তন কাল ১৩ বৎসর), উরেনসের অধীনে ৩টী এবং নেপ্‌চুনের অধীনে ৬টী ধূমকেতু আছে। এই নেপ্‌চুনের অধীন ৬টীর মধ্যে ৩টী ধূমকেতুর আবর্ত্তনের সময় ৭০ হইতে ৮০ বৎসর এবং ইহাদেরই একটী সুবিখ্যাত হেলীর ধূমকেতু।

এরূপ অনুমান করা যায় যে কোন ধূমকেতু সৌর জগতে আসিয়া প্রবেশ করিলে প্রবল গ্রহগণের আকর্ষণে কখন কখন উহাদের গতি দ্রুত ও কখন মন্দ হইয়া থাকে। গতি দ্রুত হইলে যে ধূমকেতুর কক্ষ পেরাবোলিক্ ছিল উহা হাইপার বোলিক্ (Hyperbolic) হইয়া যায় এবং গতি মন্থর হইলে উহা ইলিপ্‌টিকেল্ হইয়া যায়। ইহা এখনও কেবল অনুমান মাত্র প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে বহু বৎসরের দরকার।

৬,৭টী ধূমকেতুর দল আছে যাহাদের সম্বন্ধে একটু চিন্তার প্রয়োজন। উহাদের এক এক দল যখন চলিতে থাকে, তখন একই কক্ষে একটীর পরে আর একটী দ্রুত চলিয়া যায়। ইহাদিগকে দেখিয়া এরূপ অনুমান করা যায় যে ইহাদের এক এক দল সম্ভবতঃ এক একটী ধূমকেতু হইতে উদ্ভূত।

ধূমকেতুকে ৩ অংশে বিভক্ত করা যায়। মস্তক (Head), মস্তকের নিকটস্থ উজ্জ্বল অংশ নিউক্লিয়াস্ (Nucleus) এবং পুচ্ছ। কমা চিহ্নের মত বক্রাকার ক্ষীণ-জ মস্তকটী যখন সূর্য্য মণ্ডলের নিকট আসিতে থাকে তখনই উহা আমরা দেখিতে পাই। অনেক সময়ে এই মস্তকের ব্যাস ৪০ হাজার মাইলের কম হয় না। অথচ ইহাদিগকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে হয়। যে সকল ধূমকেতু খালি চক্ষে দেখা যায় তাহাদের কোন কোনটী আমাদের সূর্য্যমণ্ডল হইতেও বৃহৎ।

ধূমকেতু যখন সূর্য্যের নিকটস্থ হয় তখন উহার মণ্ডল কিঞ্চিত সঙ্কোচিত হয় বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ইহা আমাদের দৃষ্টিভ্রম, কারণ সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে ইহার কিয়দংশ ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়াতে ঐরূপ দেখায় নচেৎ সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে উহা বিস্তৃত না হইয়া সঙ্কুচিত হওয়া সম্ভব নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধূমকেতুর মস্তকের উজ্জ্বল অংশকে নিউক্লিয়াস্ (Nucleus) বলে। ইহা যে সকল সময়েই দেখা যায় তাহা নহে এবং কখন কখন ইহা থাকেও না। ১৮৪৫ সালের ধূমকেতুতে যে নিউক্লিয়াস্ দেখা গিয়াছিল তাহাই সর্ব্ব বৃহৎ বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহার ব্যাস ৮০০০ মাইল। কখন কখন কোন কোন ধূমকেতুর মাত্র ১০০ মাইল ব্যাসের নিউক্লিয়াস্‌ও দেখা যায়। সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিয়া যাওয়ার সময়ে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটীতে দেখা যায়। সে সময়ে কখন কখন ইহা হইতে একরূপ আলো বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এবং কখন কখন ইহা হইতে একরূপ আলোক তরঙ্গ বাহির হইতে থাকে। আবার কোন সময়ে এই নিউক্লিয়াস্ বিদীর্ণ হইয়া একাধিক নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। ১৮৮২ সনের ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস্ বিদীর্ণ হইয়া ৪।৫ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল।

ধূমকেতুর লেজটী একটী আশ্চর্য্য জিনিষ এবং ইহার সম্বন্ধে নানারূপ মতামত বর্ত্তমান। গগন মণ্ডলে ইহার বিশাল পুচ্ছ বস্তুতঃই একটী মনোহর বস্তু। ১৮৮২ সালের ধূমকেতুর পুচ্ছটী ১০ কোটি মাইল লম্বা এবং ১ কোটি মাইল প্রস্থ ছিল। বস্তুটী দেখিতে যদিও বিশাল কিন্তু ইহার ওজন অত্যন্ত কম। ইহার অণু সকল এরূপ সূক্ষ্মরূপে বিস্তৃত যে ঐ পুচ্ছ ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার সময়েও ঐ নক্ষত্রের জ্যোতির বিন্দুমাত্র ব্যাতিক্রম হয় না। এই পুচ্ছের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ এই যে অন্যান্য গ্রহ—এমন কি আমাদের পৃথিবী যখন এই পুচ্ছের ভিতর দিয়া চলিয়া যায় তখন তাহার

সংঘর্ষে আসাতে এই সকল গ্রহগণের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় না। ধূমকেতু দেখিতে যদিও বিশাল কিন্তু ইহা গ্রহগণের নিকটে আসিয়া আকর্ষণের দ্বারা তাহাদের এক চুল পরিবর্ত্তনও কখন ঘটাইতে পারে নাই। গ্রহগণ কিন্তু ইহাদের অনেককে কক্ষ-চ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে।

পৃথিবীর অণু সকল যেরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট তাহার তুলনায় ধূমকেতুর অণু ১ লক্ষ ভাগের এক ভাগের ও কম ঘন বলিতে হইবে।

আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া অভ্যস্ত বলিয়া ইহা কল্পনাও করিতে পারি না যে ধূমকেতুর মত এরূপ হালকা জিনিষ কিরূপে এত দ্রুতগমন করিতে পারে। বায়ুশূন্য অনন্ত আকাশে কেহ বাধা জন্মাইবার থাকে না বলিয়াই এরূপ দ্রুত গমন সম্ভব পর। কারণ আমরা দেখিয়াছি বায়ুশূন্য পাত্রে একখণ্ড প্রস্তর ও একটু তুলা ছাড়িয়া দিলে উভয়ে একই সময়ে ভূতলে পতিত হয়।

রেলগাড়ী কিম্বা ষ্টিমার দ্রুত চলিবার সময়ে উহাদের পরিত্যক্ত ধূম পটল যেরূপ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, উত্তরীয় স্কন্ধে বাতাসের বিরুদ্ধে চলিবার সময়ে উত্তরীয়ের অংশ যেরূপ পশ্চাতে উড়িতে থাকে, ধূমকেতুর পুচ্ছ সেরূপ ভাবে উহাদের মস্তকের পশ্চাতে থাকে না। ধূমকেতুটী যখন সূর্য্যের দিকে আসিতে থাকে তখন উহার পুচ্ছ সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থান করে এবং তখন মনে হয় যেন ধূমকেতুর মস্তকের পশ্চাতেই লেজটী আসিতেছে কিন্তু যখন ধূমকেতুটী সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া যাইতে থাকে, তখনও পুচ্ছটী সূর্য্য হইতে দূরে থাকে বলিয়া মনে হয় যেন পুচ্ছের পশ্চাতে মস্তক রাখিয়া ধূমকেতুটী পলাইতেছে। ফলকথা ইহা অনুমিত হয় যে সূর্য্য ও ধূমকেতুর পুচ্ছে এরূপ সম্বন্ধ যেন উভয়ে উভয়কে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে।

অনেকে অনুমান করেন ধূমকেতুর লেজটী ফাঁপা। সম্ভবতঃ একরূপ নিটোল পরমাণু যাহাদের চতুর্দ্দিকে একটী জ্যোতির্ম্ময় আবরণ আছে, তাহারা নিউক্লিয়াস হইতে বিকীর্ণ হইয়া এই পুচ্ছ নির্ম্মান করিয়া থাকে। একদিকে নিউক্লিয়াস ইহাদিগকে বিকীরণ করে, অপর দিকে সূর্য্যও ইহাদিগকে দূরে অপসারিত করিতে চায় এবং তদুপরি মাধ্যাকর্ষণের আধিপত্য, এই তিন চাপে পড়িয়া এই পুচ্ছের আকার কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া থাকে। এই পুচ্ছ কি উপাদানে গঠিত—আলোক পরীক্ষার যন্ত্রদ্বারা (Spectroscope) অধ্যাপক ব্রেডিচিন্ (Professor Bredichin) তাহার অনেকটা স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন যে পুচ্ছটী যখন সরল তখন উহা হাইড্রোজেনের (Hydrogen) অণুতে গঠিত পুচ্ছ ঝাপরা হইলে উহা হাইড্রোকার্ব্বণ (Hydro-carbon) গ্যাসের দ্বারা এবং অত্যন্ত বক্র হইলে লৌহময় বাষ্প ও তৎসঙ্গে সোডিয়াম্ প্রভৃতি অপর কোন মিশ্রিত ধাতু দ্বারা গঠিত থাকে।

একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে ধূমকেতু স্বপ্রভ কিম্বা সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোতে আলোকিত হয়? যদিও ধূমকেতুতে সূর্য্যের প্রতিফলিত আলো যথেষ্ট পরিমাণ থাকে তথাপি ধূমকেতু নিজেও জ্যোতিষ্মান। ধূমকেতু সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া গেলে অনেকটা ক্ষীণ প্রভ হইয়া পড়ে. ইহাতে মনে হয় সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোতে ইহা অনেকটা আলোকিত হয়। কখন কখন আবার কোন কোন ধূমকেতুকে হঠাৎ ৭।৮ গুণ উজ্জলতর হইতে দেখা যায়, ইহা দ্বারা মনে হয় ইহার ভিতরে এরূপ কিছু আছে যাহাতে ইহা আপনা হইতেই উজ্জল হইয়া উঠিতে পারে।

ধূমকেতুর উপাদান সম্বন্ধে এ যাবৎ বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কিন্তু নূতন আবিষ্কারের দ্বারা ইহা অনেকটা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ধূমকেতু ও উল্কার মধ্যে নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ মনে করেন ধূমকেতু অসংখ্য উজ্জ্বল ক্ষুদ্র নিরেট পদার্থের সমষ্টি মাত্র।

ধূমকেতু ও উল্কার সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য বাইলার (Biela's) ধূমকেতুর বিষয় উল্লেখ করা যায়। ১৮২৬ সালে প্রথমতঃ এই ধূমকেতুটী দেখা যায়। ইহা ৬½ বৎসর অন্তর অন্তর আসিতে থাকে। ১৮৪২ সালে ইহা পুনরায় দেখা দেয়। নভোমণ্ডলে স্থান বিশেষে অবস্থান হেতু ১৮৩৯ সালে ইহাকে দেখা যায় না। ১৮৪৬ সালে ইহা সাধারণ ভাবে দৃষ্ট হয়। ১৯শে ডিসেম্বর ইহা একটী পেয়ারার আকার ধারণ করে কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর উহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার পরে প্রায় ৪মাস যাবৎ

উভয় ধূমকেতুকে ১লক্ষ ৬০ হাজার মাইল ব্যবধান পাশা-পাশি চলিতে দেখা যায়। ইহারা একে অন্যের উপর কোন রূপ আধিপত্য বিস্তার না করিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু বিশেষত্ব এই হয় যে একটী উজ্জ্বল হইলে অপরটী ক্ষীণ প্রভ হইয়া পড়ে এবং কিছু দিন পর্য্যন্ত একটী ক্ষীণ আলোক রেখা উভয়কে সংযুক্ত করিয়া রাখে।

পুনরায় ১৮৫২ সালে উভয় ধূমকেতু আসিয়া দেখা দেয়; তখন তাহাদের ব্যবধান ১৫ লক্ষ মাইল। কিন্তু ঐ সনের পরে আর উহাদিগকে দেখা যায় নাই। ১৮৭২ সালের ২৬শে নবেম্বর আমাদের পৃথিবী উক্ত ধূমকেতুর কক্ষের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে পৃথিবী হইতে প্রচুর উল্কা-পাত দৃষ্ট হয় এবং ইহার পরে ১৮৮৬ সালের নবেম্বর মাসে পৃথিবী পুনরায় ঐ কক্ষের নিকট আসিতে বহুল পরিমাণ উল্কাপাত পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহা নিঃস-ন্দেহে বলা যায় যে এই সকল উল্কার সহিত বিয়েলার ধূমকেতুর কোন রূপ সম্বন্ধ আছে। হয়ত এই উল্কাদল উক্ত ধূমকেতু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৮৮২সালে যে ধূমকেতুটী দেখা গিয়াছিল তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য জনক। দিনের বেলা সূর্য্যের সান্নিধ্য থাকা কালীনও ইহাকে দেখা যাইত। ইহাকে ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে উহাকে পৃথিবী হইতে ৪৭ কোটি মাইল দূরে দৃষ্ট হইত। কাজেই বলা যাইতে পারে জ্যোতির্ব্বিদগণ উহার কক্ষ ভালরূপেই নিরূপণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার কক্ষটী অত্যন্ত লম্বা ডিম্বা-কৃতি. উহার একবার আবর্ত্তনে ৭৭০ বৎসরের প্রয়োজন। ইহার পুচ্ছ লম্বে ১০কোটি মাইল ছিল। একাধিক জ্যোতি-র্ব্বিদ ইহার অগ্রভাগে একটী ক্ষুদ্র ধূমকেতু দেখিয়া ছিলেন। ইহাতে মনে হয় সম্ভবতঃ ইহাও বিয়েলার ধূমকেতুর মত—একটী ধূমকেতু বিভক্ত হইয়া দুইটী হইয়াছিল।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

---

# দাম্ভিকের সাজা।

(১)

চলার পথে সবার সাথে যেতেছিলাম একা,
দূরের পানে দৃষ্টি থাকে হয় না তবু দেখা;
জীবন যেন একলা কেঁদে মরে!
জানিয়ে দিতে আসল ভালো,
জ্বালিয়ে দিতে প্রাণের আলো,
বন্ধু আছেন অন্ধকারে আমার বিজন ঘরে!

(২)

সবার মাঝেই আছেন তিনি সেই কথা যাই ভুলে,
অহঙ্কারে নিইনে সবার চরণ ধূলি তুলে;
সত্যি আমার কেমন ধারা ত্রুটি!
কোথা থেকে দম্‌কা হাওয়া
অমনি এল— যায় না চাওয়া,
হোঁচট্ খেয়ে পথের ধূলায় খেলাম্ লুটোপুটি!

(৩)

এম্‌নি ক'রে সাজা দিয়ে কর আমায় তাজা!
সবার সাথে সমান ক'রে গড় হৃদয় রাজা!
চাইনে আমি ফাঁকির সিংহাসন!
যতই কেন হইনে ফানুস,
আশায় আছি— করবে মানুষ,
শক্ত চাণ্ডা আগুন রাঙা কর আমার মন!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

# কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর।

## সুন্দরের জন্ম।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে লীলার বারমাসী অবলম্বনে কবি কঙ্কের জীবন কাহিনী বিবৃত করিয়াছি; এইবার কবির রচিত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিব।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের প্রথম ভাগে মঙ্গলাচরণ ও বন্দনা গীতি। আমরা কবির জীবন আখ্যায়িকায় সেই সুদীর্ঘ বন্দনা গীতির অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, প্রাচীন অন্যান্য কবিগণের ন্যায় কঙ্ককবিও শিব দুর্গা গণেশ প্রভৃতি দেব দেবীর চরণ বন্দনা করিয়াছেন;

এই সকল দেব দেবীর মধ্যে তিনি সত্য-পীরকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই বন্দনা গীতি বা মঙ্গলাচরণে বিশেষ কোনও নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই। সুতরাং আমরা বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের বন্দনা গীতির পুনরুল্লেখ না করিয়া মূল আখ্যায়িকাটিই আরম্ভ করিব।

উপখ্যান ভাগ। মাল্যবান নামে রাজা পূর্ব্ব দেশে ঘর।

সুন্দর তাঁহার পুত্র রূপে বিদ্যাধর॥
আচম্বিত কথা তার শুন সভাজন।
যেমনে হইল বিদ্যাসুন্দর মিলন॥

পূর্ব্ব দেশের কবি এইরূপে রাজধানীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রাজধানীর নিকটে কোনও সাগর কিম্বা নদীর উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

আগালী পাথালী নামে আছিল হাওর।
দিনেকের পথ জুরি দীর্ঘ কলেবর॥
সেহিখানে মাল্যবান রাজার ভবন।
আগে শোভে শ্বেতী বিল তাতে পদ্মবন॥

সেই শ্বেতী ঝিলের পার্শ্বে গজারির ঠুনী ও উলুছনের ছানিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটচালা চৌচালা ঘরে কবি বিশ্ব শিল্পীকে উপহাস করিয়া অমরা তুল্য মাল্যবানের পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বিশাল পুর-বর্ণনায় কবি কোথাও পাষাণ প্রাসাদ বা ইষ্টকালয়ের বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার বর্ণনা এইরূপ :—

গড়ের ভিতর শোভে পুরী মনোহর।
বড় বড় ঘর খানি দেখিতে সুন্দর॥
আটচালা চৌচালা ঘর পর্ব্বত প্রমাণ।
চালে চালে স্বর্ণ কুম্ভ নেতের নিশান॥
গজারির ঠুনি তায় উলুছনে ছাণী।
কেমন কামলা ঘর বান্ধিল না জানি॥
হীরামন মাণিক্য দিয়া করিল সাজোয়া।
আসমানে ঠেকিছে মাথা জমিনে রহিয়া॥
উত্তম শীতল পাটী তাতে করি বেড়া।
মলোয়া মজুয়া দিয়া পুরীখানি ঘেরা॥

এইরূপে কবি পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ, দুর্য্যোধনের হস্তিনা ও রাবণের কনক লঙ্কার উপমা দিয়াছেন।

রাজা মাল্যবান ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। কুবের তুল্য তাঁহার ধন, রাবণ তুল্য তাহার প্রতাপ, চম্পকপতি রাজা চন্দ্রধর সদৃশ তাহার শত শত বাণিজ্যতরী, জলে স্থলে তাঁহার অক্ষুন্ন প্রভাব, সামন্ত নৃপতিগণ অবনত মস্তকে রাজা মাল্যবানকে কর যোগাইয়া থাকে।

হাতীশালে আছে রাজার বাটি হাজার হস্তী।
লক্ষ অশ্ব ঘরে বান্ধা নক্ষত্রের পতি॥
সাথানেতে চড়ে তার নব লক্ষ গাই।
খাচর মহিষ কত লেখা জোখা নাই॥

রাজা মাল্যবান ইচ্ছা করিলে ক্ষীর সমুদ্র প্রস্তুত করিয়া মানুষকে তাহাতে সাঁতার কাটাইতে পারেন। কবি গাহিয়াছেন—

রাজার ক্ষেমতা আমি সভাতে জানাই।
লোক লস্কর তাঁর লেখা জোখা নাই॥
রাজার অধীনে আছে নব লক্ষ ঢালী।
আশী লক্ষ তীরন্দাজে করিছে কোটালী॥
কোটী কোটী পদাতিক যেন যমকাল
পুরীখানা রক্ষা করে দিবা নিশা কাল।

রাজার সৈন্য বিভাগে আশী লক্ষ তীরন্দাজ সওয়া লক্ষ গোলন্দাজ নব লক্ষ ঢালী আর কোটি কোটি পদাতিক, প্রহরী কোটালেরত সংখ্যাই নাই; সৈন্যগণের নিশ্বাসে ঝড় বহে। গমনে বসুন্ধরা কম্পিত হয়। কটাক্ষে পর্ব্বত টলে। তা ছাড়া তের লক্ষ পাবর, চৌদ্দ লক্ষ ধাঙ্গর সর্ব্বদা রাজ বাড়ীর কামেলার কাজ করে। নব লক্ষ মালীতে রাজার উদ্যান রক্ষা করে ও রাজ পথে ঝাড়ু দেয়—গাছের পাতাটী মাটীতে পড়িলে তৎক্ষণাৎ পুরীর বাহিরে ফেলিয়া আসে।

নগরবাসীগণের সুখের অভাব নাই, প্রজার দুঃখ দারিদ্র্য মোচন জন্য রাজ ভাণ্ডার সাগর জলের ন্যায় সর্ব্বদা উন্মুক্ত। রাজ পথে গমনশীল নগরবাসিগণের মুখ সর্ব্বদা হাস্যময়—প্রফুল্ল। নহবতের সুমধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহারা ভোরের মধু-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠে। প্রভাতে রাজোদ্যানের সুরভিত কুসুম দামে বেণী বিনাইয়া পুরাঙ্গণাগণ নৃত্যগীতে কালাতিপাত করে।

নিশিভোরেও ঘৃতের প্রদীপ জলিতে থাকে। প্রভাতে স্রক চন্দনে বাঞ্ছিতাকে সাজাইয়া নাগরীকগণ হাস্য প্রফুল্ল মনে রজনীর অপেক্ষা করে, সুবিমল শ্বেত পট্টাম্বরা পুরনারীগণ গন্ধ তৈলে কেশ রচনা করিয়া চাঁদ সরোবরে স্নান করিতে যায়। তাহাদের রূপে উষা আরক্ত বদনে মেঘের কোলে অঙ্গ ঢাকা দেয়। দেহের সুগন্ধে বসন্ত পালায়, ললিত সঙ্গীতে অপ্সরা মূক হইয়া যায়। সেদেশে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ নাই, আবশ্যক দ্রব্যের অভাব নাই, ধনে রত্নে, ফলে ফুলে সেদেশ অতুলনীয়। দধি দুগ্ধের কোনও মূল্য নাই, রাজার দোহনিয়া গো-রক্ষকগণ নাগরিকগণকে বিনা মূল্যে দধি দুগ্ধ বিলাইয়া দেয়। রাজার আদেশ। এই-রূপে রাজা পুরবাসীগণের নিমিত্ত নবলক্ষ ধেনুতে ক্ষীর সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজ ছত্রতলে পুরবাসিগণ যতই সুখ স্বচ্ছন্দে কালা-তিপাত করুক—রাজার অন্তরে ছিল না বিন্দু মাত্র সুখ। চন্দ্রহীন আকাশের মত, দীপ শূন্য গৃহের মত, রাজপুরী ছিল অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। কারণ—রাজা মাল্যবান ছিলেন অপুত্রক। মেঘাবৃত্ত চাঁদের ন্যায় রাজার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া পুরবাসীগণও এই একমাত্র দুঃখে কাল কাটাইতেছিল। রাজার মনে যত দুঃখ ছিল, পুরবাসী গণের মনে তদপেক্ষা কম দুঃখ ছিলনা।

তারপর বংশ রক্ষাহেতু রাজ ভাবিয়া চিন্তিয়া
একে একে করিলেন সাতখানি বিয়া।

কিন্তু তাহাতেও রাজা মাল্যবানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না! তারপর যাগ যজ্ঞ পূজা হোমের পালা পড়িল।

পুত্রের লাগিয়া রাজার বড়ই ভাবনা।
মুনি ঋষি ডাকি করে যজ্ঞ আরম্ভনা॥
ত্রেতা যুগে এহিরূপে রাজা দশরথ।
পুত্র হেতু যজ্ঞ করি পূর্ণ মনোরথ॥

নাগা পর্ব্বতে সিদ্ধনাথ নামে এক মহাতপাঃ মুনি বাস করেন, তাঁহার চারি হাজার শিষ্য। তিনি মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞানলে আহুতি দিলে বারো বৎসরের অনা-বৃষ্টির দেশ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়; তাঁহার কটাক্ষে নিষ্ফল তরুতে ফল ধরে। রাজা সেই মহাতপাঃ ঋষিকে আনিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, যজ্ঞের ফল নিষ্ফল হইল।

উদয় গিরিতে গোরক্ষনাথ নামে দুর্ব্বাসা তুল্য এক মহা তেজস্বী তপোধন বাস করেন। তিনি মৃত্যুকাল খণ্ডাইতে পারেন, তাঁহার উগ্র তপস্যায় দেবগণ ভীত-চিত্ত, তাঁহার মন্ত্রপুতঃ জল সেচনে শুষ্ক তরু মুকুলিত হয়। তাঁহার সঞ্জীবনী মন্ত্রে কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট মৃত-দেহে প্রাণ সঞ্চার হয়। তিনি রোষনেত্রে চাহিলে অভিসপ্ত ব্যক্তি দাবাগ্নি দহনে পতিত তৃণের ন্যায় ভস্ম হইয়া যায়। আর করুণা দৃষ্টিতে তাকাইলে ধন জন প্রার্থী অকিঞ্চনের মনোরথ সিদ্ধ হয়। রাজা তাঁহাকে আনিয়া মহা সমারোহে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিাইলেন। যজ্ঞের ফল পণ্ড হইল। এইরূপে—

মুনি ঋষি ছিল যত পর্ব্বত কাননে।
ডাকিয়া আনিলা রাজা আপন ভবনে॥
যাগ যজ্ঞ পূজা হোম হইল নিস্ফল।
আটকুড় রাজার ভাগ্যে না ফলিল ফল॥

এইরূপে বিধি মতে যাগযজ্ঞ পূজাহোম করিয়া রাজা বিফল মনোরথ হইলেন। নিস্ফল তরুরমত তাঁহার জীবন একরূপ বিড়ম্বনা ময় হইয়া উঠিল। লোকে আট কুড়ে রাজার মুখ দেখেনা; জগতে ইহার চাইতেও আর কি দুঃখ আছে!

কিন্তু হায় এজগতে ধনজন সকলই অদৃষ্ট সাপেক্ষ। রাজা মাল্যবানের ধন রত্নের অভাব ছিল না—তারপর

সাত রাণী ঘরে রাজার সকলি যুবতী।
একপুত্র নাহি রাজার বংশে দিতে বাতি॥
ধনে রত্নে কি করিবে লোকে লস্করে।
তারা কি আনিয়া দিবে চান্দের পসরে॥

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃপুরুষগণের পিণ্ড লোপ হইবে এই আশঙ্কায় রাজা মাল্যবান আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। একদিন এক রজক আসিয়া মনের দুঃখে রাজার পদতলে পড়িয়া বলিল—"মহারাজ আপনার রাজ্যে আর আমার বাস করা হইল না।" রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রজক বলিল "আমি আটকুর, সেজন্য রাজ্যের লোকে আমার মুখ দেখেনা; শুভকার্য্য সময়ে

আমাকে উপস্থিত থাকিতে দেয়না, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।" রাজা মর্ম্মাহত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রজকের কথাগুলি শুনিলেন, আর ভাবিলেন আমি রাজা, আর এই নিঃস্ব রজক আমার প্রজা। উভয়েরই কর্ম্মফল এক কিন্তু এই ব্যক্তি দরিদ্র বলিয়া ইহার ভাগে এত লাঞ্ছনা. আমি রাজ্যেশ্বর তাই প্রজাগণ ভয়ে আমাকে কিছু বলিতে সাহস পায় না। প্রত্যক্ষে না হউক কিন্তু পরোক্ষভাবে আমার প্রতি ও এই দরিদ্র রজকের প্রতি প্রজাগণের একই ধারণা। রাজা মধুর বচনে রজককে সান্ত্বনা করিয়া শয়ন মন্দিরে সোনার কবাটে খিল দিয়া শয়ন করিলেন। থাক্ পড়িয়া দূরে এই অসার নিষ্ফল সংসার। জীবনের প্রতি, রাজ্যের প্রতি, রাজার মনে এক প্রবল ধিক্কার জন্মিল।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর রাজার মনে এক নূতন বাসনা জাগিয়া উঠিল। বন ভ্রমণে যাইয়া কিছুকাল অন্য মনে দিন কাটাইব, দেখি একটু শান্তি পাই কিনা। পাত্রমিত্র সকলেই জানিল—রাজা মৃগয়ায় যাইবেন; কিন্তু কবে যাইবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই—কথাটা রাজ পাটেশ্বরীর কাণেও উঠিল—একদিন—

কবেতক যাওয়া হবে কবেতক আসা।
রাজাকে সুধায় রাণী খেলাইতে পাশা॥

রাণী পাশা খেলাইতে বসিয়া রাজার নিকট বনভ্রমণের কথা তুলিলেন। রাজা বলিলেন "শীঘ্রই যাইব।" এই রূপে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন সহসা নগরে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। অশ্বারোহী, পদাতিক, তীরন্দাজগণের অস্ত্রের ঝণৎকারে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। কোষ মুক্ত তরবারে ও ফলকে রবির কিরণ পড়িয়া নগরবাসিগণের নয়ন ধাঁধিয়া যাইতে লাগিল আর হস্তীর পদধূলিতে আকাশে অকালে যেন জলদের সৃষ্টি করিল।

রাজা মাল্যবান মৃগয়া যাত্রা প্রাক্কালে সাত রাণীর নিকট হইতে বিদায় লইতে গেলেন। ছয় রাণীর মধ্যে কেহ সাপের মাসি. কেহ সোনার হরিণ, কেহ বা হিরণ বৃক্ষের ফল, এইরূপ যাঁর যা মনে ধরে—চাহিলেন। রাজা ছয় রাণীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পাটেশ্বরীর কাছে বিদায় লইতে গেলেন।" রাজা বলিলেন মৃগয়ায় যাইতেছি তোমার জন্য কি আনিব বলিয়া দাও। পাটেশ্বরী বলিলেন, "তুমি অক্ষত শরীর লইয়া আবার রাজ্যে ফিরিয়া আইস এই—ইহার চাইতে আর আমার কি প্রার্থনা আছে।" তবু রাজা তাহাকে একটা কিছু চাহিতে বার বার বলিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন—আমার জন্য একট তোতা পাখী ধরিয়া আনিও আমি তাকে পালন করিব। রাজা মাথার উষ্ণিসটী একটু হেলাইলেন। তিনি বুঝিলেন রাণী তোতাপাখী পোষণ করিতে চায় কিন্তু তোতায় মা ডাকিলে রাণীর মনের দুঃখ শান্তি হইবে কি?

রাজা তোরণ দ্বার পার হইয়া উচ্চৈশ্রবা তুল্য এক তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাহার পৃষ্ঠে শাণিত শর পূর্ণ তূণ, স্কন্ধে শরাশন একহস্তে এক দীর্ঘ বর্শা শোভিতেছিল—ইন্দ্র যেন বৃত্র—সংহারে যাইতেছেন। নক্ষত্রবেগে অশ্ব ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে রাজা মাল্যবান পুরী ছাড়িয়া প্রান্তরে পড়িলেন। ঘূর্ণি বায়ু যেমন করিয়া তৃণপত্র উড়াইয়া, তরুলতা কাঁপাইয়া, নদীর জল দুলাইয়া ছুটিয়া যায়, তেমনি রাজার সেই অগণিত সৈন্য সামন্ত ঝড়ের মত বেগে মাল্যবানের পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

একদিন দুপুর বেলা রাজা মৃগয়া-ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এক দারাক বৃক্ষমূলে বসিলেন। তখন সহসা তাহার মনে উঠিল রাণী তোতা পাখীর কথা বলিয়াছিলেন, কি সর্ব্বনাশ, আজ সাতদিন যায়—রাণীর কথাটা একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এই বলিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃষ্টি তাঁহার দারাক বৃক্ষের উপরে পড়িল—

পাতার আঁড়ালে রাজা দেখিলা চাহিয়া।
হীরামন তোতাপাখী আছে লুকাইয়া॥"

উচ্চ বৃক্ষ শাখায় অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে এক তোতা পাখী বসিয়া ঘুমাইতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সোনার পালকে ঢাকা। রাজা তোতা পাখীকে ধরিবার জন্য শরাশনে অস্ত্র জুড়িলেন। মৃদু টঙ্কার শুনিবামাত্র তোতা চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং সুপ্তোত্থিত তোতা তখনি বৃক্ষশাখা ছাড়িয়া উড়িয়া চলিল।

বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে শাখা হইতে শাখান্তরে, বন হইতে বনান্তরে তোতা উড়িতে লাগিল, অশ্বারোহণে

রাজাও পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। বিদ্যুৎ চকিতের ন্যায় তোতা এই আকাশে উড়ে, এই মেঘের অঙ্গে মিশায়, এই বৃক্ষপত্রে লুকায়, মুহূর্ত্তে আবার কোথায় স্বপ্নের মত অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু অদৃশ্য হইয়া অধিকক্ষণ থাকেনা. আবার দেখা দেয়। উল্কা যেমন আকাশ জুড়িয়া ছুটা ছুটি করিতে লাগিল। রাজার অশ্ব ক্লান্ত হইল। মাল্যবান ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে পড়িল তিনি কোথায়, তাহার লোক জনই বা কোথায়? বন ছাড়িয়া কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কি মায়াপুরী, একি স্বপ্নে গড়া মায়া তোতা?

ত্রেতাযুগে এইরূপে মায়ার হরণে।
ছলনা করিল রাম ঠাকুর লক্ষণে॥

তোতা আবার অন্তর্হিত হইল। রাজা ক্লান্তদেহে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। অকস্মাৎ আবার সেই তোতা—এবার একেবারে মাথার উপরে। এবার রাজা পদব্রজে তোতার পশ্চাৎ চলিলেন। খানিক দূর যাইয়াই এক শাণিত শরচাপ বসাইলেন। ইচ্ছা এইবার তোতাকে প্রাণে মারিবেন। নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষশাখায় তোতা বসিয়াছিল, রাজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন। আর তথায় তোতা নাই; যেন অকস্মাৎ একটী উল্কাপাত জ্বলিয়া নিবিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। রাজা নিরাশ চিত্তে, ক্লান্তপদে অশ্বের সন্ধানে চলিলেন। পথিমধ্যে—সেই তোতা, সোনার পাখা মেলিয়া—রাজার পানে পেছন ফিরিয়া—এবার মাটিতে বসিয়া আছে। রাজা আবার শরসন্ধান করিলেন। আবার তোতা উড়িয়া গেল। অকস্মাৎ রাজা একি দেখিলেন—

পূর্ণিমার চান্দ যেন পড়িয়া ধূলায়।
পন্থে পরি শিশু এক ছাড়াইয়া যায়॥
কাতরে কান্দিছে বাছা ধূলায় পড়িয়া।
আগু হইয়া লইলা রাজা কোলেতে তুলিয়া॥

একি! এই বিজন বনভূমিতে এই সদ্যজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার মাতা পিতা কোথায় গেল?

পূর্ণিমার চান্দ তুল্য অঙ্গের লাবণী।
হেন শিশু ফেলি যায় কেমন জননী॥
না জানি কে কাঠারিণী গর্ভবতী ছিল।
কার্য্য হেতু আসি বনে পুত্রে প্রসবিল॥

না, তাওত নয়

রাজটিকা আছে দেখি ছেলের কপালে!
তেমন তেমন নহ দেখি এ ছাওয়ালে॥

এ রক্ষীশূন্য জনহীন স্থানে এই সদ্যজাত শিশু বাঁচিল কিরূপে—এদিক ওদিক চাহিয়া রাজা দেখিলেন—

মক্ষিকার চাক এক উচ্চ বৃক্ষ ডালে।
বাঁচাইল মধুদিয়া এই যে ছাওয়ালে॥
আর পাছে রৌদ্র লাগে ছাওয়ালের মুখে।
সোনার পাখায় তোতা শিশু অঙ্গ ঢাকে॥

এই তোতা কি মায়া তোতা—আর এই সন্তান কি দেব মায়া?

যে হউক সে হউক মোর যা থাকে কপালে।
পুত্র সম তারে যদি লইয়াছি কোলে॥

উত্তরিয় দ্বারা রাজা সেই শিশুকে বাঁধিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

লোকজন সকল পূর্ব্বেই রাজধানীতে আসিয়াছে, সাত রাণী উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথপানে চাহিয়া চাহিয়া সারাটা দিন কাটাইয়াছেন। দীর্ঘ রজনী দুঃস্বপ্নে প্রভাত হয়—আকুল চিন্তা তরঙ্গ একটীর পর আর একটী উঠিয়া পড়িয়া যেন সাত রাণীকে লইয়া দুকুলে আছারি পিছারি খাইতে লাগিল।

সাতদিন পর রাজা রাজধানীতে আসিয়া প্রথমেই পাটেশ্বরীর শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করতঃ উত্তরিয় প্রান্ত হইতে ছেলে লইয়া রাণীর কোলে দিলেন। রাণী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—একি সর্ব্বনাশ!

কার অঞ্চলের ধন আনিলে ছিনায়ে।
কার এ নয়নমণি আনিলে হরিয়ে॥
কি কব দুঃখের কথা কহিতে না জোয়ায়।
হরিলে কাহার শিশু কাঁদাইয়া যায়॥
আছিল যাহার কোলে এমত বাছনি।
কেমনে ধৈরয তার ধরিবে জননী॥
কাহার ঘুমের বেলা কোল শূন্য করি।
চন্দ্র সম সুতে তার করিয়াছ চুরি॥
এখান মরিবে সে যে গলে কাতি দিয়া।
হায়! রাজা কি করিলে ছাওয়ালে হরিয়া॥

রাজা রাণীকে সান্ত্বনা করিয়া বন ভ্রমণের আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। এবং শেষে বলিলেন, এক পীরের আশীর্ব্বাদে এই রত্নলাভ হইয়াছে। আমি লোকজন ও অশ্ব প্রভৃতি হারা হইয়া যখন দিক ভ্রান্ত পথিকের মত তোতার পাছে ঘুরিতেছিলাম, এই পীরই তখন দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছে এবং এই শিশু রত্ন লাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছে। পীর বলিয়াছে, সত্য পীরের পূজা দিলে ইহা হইতেই আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে।

তখন রাণী বলিলেন—

"যে হউক সে হউক তুমি মোর কথা ধর।
দণ্ডরা বাজাও তুমি যুড়িয়া নগর॥
সাত দিন ঢোল দাও সহরে বাজারে।
ঘোষণা করিয়া দাও প্রতি ঘরে ঘরে॥
যে মায়ে হারাইল তাঁর অন্ধের নয়ন।
পুত্রসহ দিবে তারে বহুমূল্য ধন॥
জন্মিয়া দেখি নাই কভু সন্তানের মুখ।
পুত্রের জননী হওয়া জানি না কি দুঃখ॥
কিন্তু যে হারাইল এই নয়নের মণি।
বাছার লাগিয়া সে হইব পাগলিনী॥
বিলম্ব না কর রাজা রাখ মম কথা।
মায় সে বুঝিতে পারে সন্তানের ব্যথা॥
ত্রেতাযুগে দশরথ রামে দিয়া বনে।
পরাণ ত্যজিল রাজা পুত্রের কারণে॥

রাণীর কথায় রাজার আদেশে সাতদিন ধরিয়া নগরে দণ্ডরা বাজিল কিন্তু সেই অনাথ শিশুর জনক জননী বলিয়া কেহ পরিচয় দিতে আসিল না। পথের ধুলায় প্রাপ্ত মলিন রত্নখণ্ডের ন্যায় সেই শিশু সন্তানকে রাজা ও রাণী দেবতার দান ভাবিয়া অঞ্চল পাতিয়া লইলেন।

পাইয়া দুর্ল্লভ পুত্রে রাজা মাল্যবান।
দ্বিজগণে করে রাজা ধন রত্ন দান॥
ভাণ্ডার খুলিয়া রাজা দীন দুঃখীগণে।
অন্ন বস্ত্র দেয় রাজা পুত্রের কারণে॥
আনন্দেতে পুরীখান তোলপার করে।
দিন দিন বাড়ে শিশু মায়ের মন্দিরে॥
দেখিয়া সুন্দর পুত্র রূপে বিদ্যাধর।
বাপ মায় রাখে তার নামটী সুন্দর॥

রাজা দেবতাদিগকে পূজা দিলেন। রাজার পূজায় দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন। ধন রত্ন পাইয়া দ্বিজগণ রাজাকে অমর হইতে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। গরীব দুঃখী অন্ন বস্ত্র পাইয়া রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করিতে লাগিলেন। এই আনন্দ উৎসবের বিপুল আবর্ত্তে পড়িয়া রাজার সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিটী ভাঙ্গিয়া গেল—রাজা মাল্যবান মস্ত একটা ভুল করিলেন। আমোদ উৎসবের কিছুই বাকী রহিল না। বাকী রহিল কেবল সেই পীর ফকিরের নিকট প্রতিজ্ঞাত—সত্য পীরের পূজা। সুতরাং সত্যপীর রাজার উপর কোপান্বিত হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

## ঋণ।

সাগরের বারিকণা রবি করে ধার,
সে আগে বোঝেনি ও যে এত বোঝা ভার!
দিনে দিনে পলে পলে ধীরে জমিয়া সে,
ভীষণ মেঘের রূপে তাহারেই গ্রাসে!
উগারে সে অবশেষে অশনি অনল,
কাঁপে সে ঋণের ডাকে সারা ধরাতল!
দয়া করি দেবরাজ ধারা বরষণে,
উদ্ধার করেন ঋণে বিপন্ন তপনে!

রবির নিকটে শশী আলো করি ঋণ,
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু কলঙ্কে মলিন!
তবে যে মরিয়া বাঁচে, ঘটে উপচয়,
সুধার আকর বলি সুধায় সে নয়!
শরণ দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি,
তাই আছে মৃত্যু সাথে করে' টানাটানি!
দেবতা এমনি যদি ঋণে ম্রিয়মাণ,
মানুষ কেমনে তবে ঋণে পায় ত্রাণ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

---

# বিদ্রোহ দমন।

(১)

দেবীপুরের রায় চৌধুরী মহাশয়দের প্রতাপে, বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাইত, এককালে এইপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত ছিল। রায় চৌধুরী বংশের বর্ত্তমান জমিদার হরমোহন বাবু, পূর্ব্বপুরুষগণের সেই খ্যাতি অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন লোকে বলিত যে তাঁহার জমিদারীতে তিনিই একাধারে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন।

তাঁহার মফস্বলের নায়েবগণ, নিজ নিজ, শাসনাধীন স্থানে একাধারে মুন্সেফ ও ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। নায়েবের বিচারের বিরুদ্ধে সদর বিচার সেরেস্তায় ম্যানেজারের নিকট আপীল হইতে পারিত। ম্যানেজারের বিচারে কোন পক্ষের আপত্তির কারণ হইলে, খোদ কর্ত্তার নিকট আপীল করিবার পথ উন্মুক্ত ছিল। ইহাই ছিল হাইকোর্ট বা প্রিভিকাউন্সিল। যে হতভাগ্য এই শেষোক্ত বিচারালয়ের বিচারে হারিয়া যাইত, তাহার আর দাঁড়াইবার পথ ছিলনা, কারণ সে জানিত যে গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে সুবিচারের প্রত্যাশী হইয়া দাঁড়াইলে জমিদার সরকারের আইনে সে বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমিদারের প্রতিপত্তি রক্ষা করার জন্য, জমিদারের পক্ষ হইতে অর্থ এবং লোকবল দ্বারা তাহার প্রতিপক্ষকে সাহায্য করা হইবে।

হয়তো ছয়মাস পূর্ব্বের কোন এক তারিখে লিখিত পাঁচ ছয়জন সাক্ষীর নাম সম্বলিত একখানা দুইশত অথবা পাঁচশত টাকার তমঃশুকের দাবীতে তাহার নামে আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে। সে যদি লেখাপড়া না জানে তাহা হইলে তো কথাই নাই, লেখাপড়া জানিলেও সে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইবে যে দলিলে লিখিত হস্তাক্ষরে ও তাহার হস্তাক্ষরে কোনই প্রভেদ নাই।

হয়তো বা কোন দিন, বিচারালয় হইতে প্রত্যাগমন কালে, পথ পার্শ্বে হঠাৎ দুই চারিজন অপরিচিত, পথবাহী, তাহার সহিত গায়ে পড়িয়া বিবাদ করিয়া তাহাকে এমন ভাবে প্রহার করিবে যে তাহাকে প্রায় পোনর দিনের জন্য [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কিম্বা হঠাৎ একদিন হয়ত সে শুনিতে পারিবে যে তাহার যুবতী স্ত্রী, কন্যা অথবা পুত্রবধুর নামে একটা মিথ্যা কলঙ্ক লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছে এবং গ্রামের মাতব্বর তাহাকে একঘরে করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

এত সব ব্যাপারেও যাহার চৈতন্য হইবে না, হয়তো একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগরিত হইয়া সে দেখিতে পাইবে যে—তাহার বাস গৃহখানি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে।

জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করার এই সকল পরিণাম প্রজারা প্রায় সকলেই জানিত, সুতরাং খুব কম লোকেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইত। সুতরাং হরমোহন বাবু অপ্রতিহত প্রভাবে জমিদারী শাসন করিতেন। এই বিচার বিভাগে তাঁহার আয়ও সামান্য হইত না।

নালিসের সঙ্গে সঙ্গে বাদীকে দরখাস্তের নজর একটাকা দিতে হইত। অবস্থা ভেদে পাচ টাকা হইতে দুইশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইত। অভিযোগ প্রমাণিত হইলে আসামীর এবং প্রমাণিত না হইলে ফরিয়াদীর জরিমানা হইত। প্রজারা গোপনে বলাবলি করিত, "জমিদারের বিচার করাতের মত—আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।"

এই বিচারের নামে যে কত প্রকার অত্যাচার হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্থানীয় থানায় যখন যে দারোগা আসিতেন জমিদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত রজত মুদ্রার মধুর নিক্কণ, তাঁহার কর্ণকে এমনই বধির করিয়া রাখিত যে অত্যাচারিত প্রজাদের কাতর রোদন তাঁহার কর্ণে মোটেই প্রবেশ করিত না। সুতরাং অপ্রতিহত প্রতাপ হরমোহন বাবুর যথেচ্ছাচারে বাধা প্রদান করিতে কেহই ছিল না।

(২)

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। এই প্রকার প্রবল ক্ষমতাশালী জমিদার আজ কয় বৎসর হইল কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জমিদারীর মধ্যে হুসেনপুর কাচারীর অধীন গ্রাম সমূহের সমুদয় প্রজা, বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জমিদারের প্রাপ্য ন্যায্য খাজানা ভিন্ন, আরও নানা প্রকারে হরমোহন বাবু প্রজাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন। মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের মাথট, পুত্রের বিবাহের মাথট, বাড়ীর বিগ্রহের নূতন মন্দির প্রস্তুত করিবার মাথট ইত্যাদি টাকা আদায়ের নূতন নূতন এক একটা ফিকির জমিদার মহাশয়ের মাথায় খেলিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিত। এতদ্ব্যতীত দুর্গাবৃত্তি, কালীবৃত্তি, স্কুলবৃত্তি ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত হইয়া প্রজার খাজানার প্রতি টাকায়, এক আনা, দুই পয়সা, একপয়সা, এই প্রকার হিসাবে প্রতিবৎসর বহু টাকা আদায় হইত। নিন্দুকেরা বলিত যে, যে কার্য্যের নাম করিয়া যে টাকা আদায় হইত, তাহার একচতুর্থাংশের দ্বারা সেই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অবশিষ্ট টাকা জমিদার বাবুর সিন্ধুকে উঠিত। যাহাই হউক পূর্ব্বোক্ত প্রকার কোন একটী মাথট আদায়ের সময়, হুসেনপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রজাগণ মাথট দিতে আপত্তি করে। সে বৎসর অজন্মা হওয়ায় কৃষকদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হইয়াছিল; তাহারা নায়েব মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করে—যেন এ বৎসর তাহাদিগকে এই মাথটের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাহাদিগের নিকট যখনই যে মাথঠ চাওয়া হইয়াছে তখনই তাহারা বিনা আপত্তিতে মাথট দিয়াছে—কিন্তু এবার তাহাদের অবস্থা খারাপ, জমিদার মহাশয় যেন এবার তাহাদিগকে মাপ করেন।

এই মাথট আদায় ব্যাপারটীতে নায়েব মহাশয়দের বেশ লাভ হইত। প্রথমতঃ আদায়ী টাকার উপর শতকরা সাড়ে বার টাকা কমিশন, নায়েব মহাশয়গণ পাইবেন--ইহাই জমিদারদের আদেশছিল। দ্বিতীয় কাহারও নিকট হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা আদায় করিয়া তিন টাকা জমা, কাহারও নিকট হইতে দশ টাকা আদায় করিয়া সাত টাকা জমা, এই প্রকার ভাবেও নায়েব মহাশয়দের হাতবাক্স বেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। এই প্রকার লাভের ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটায়, নায়েব মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘ একখানা "এত্তেলা" দ্বারা সদরে জানাইলেন যে "হুসেনপুরের এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহী হওয়ার উপক্রম করিয়াছে, মাথট দিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহাকে তো নানাপ্রকার অপমান সূচক কথা বলিয়াছেই, শ্রীযুক্ত কর্ত্তা মহারাজকে লক্ষ্য করিয়াও নানাপ্রকার গ্লানি জনক উক্তি করিয়াছে। ইহার সত্বর প্রতিবিধান না হইলে পরিণাম অত্যন্ত ভীষণ হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এই সংবাদ হরমোহন বাবুর নিকট পঁহুছামাত্র আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। চিরদিন পদদলিত, চিরদিন তাহার ইচ্ছায় চালিত প্রজাদের তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন স্বতন্ত্র একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে একথা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং প্রজাদের এই প্রকার সমবেত বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার নিকট অত্যন্ত স্পর্দ্ধার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইল। নায়েবের অতি রঞ্জিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এবং সেই রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুসন্ধান না করিয়া তিনি অত্যন্ত কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন।

তাহার সেই আদেশ অনুসারে ম্যানেজারের দস্তখতযুক্ত নিম্ন লিখিত পত্র নায়েবের নিকট প্রেরিত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় নাগ নায়েব হুসেনপুর কাচারী

সুচরিতেষু—

মৌজে হুসেনপুর প্রভৃতি স্থানের প্রজাগণ মধ্যে মারীভয় উপস্থিত হওয়ার সংবাদ, আপনার এত্তেলায় অবগত হইয়া শ্রীযুতের কর্ণ গোচর করায় আদেশ হইল যে—যে প্রকারেই হউক মারীভয় অধিক বিস্তৃত হওয়ার পূর্ব্বেই নিবারণ করিতে হইবে। তজ্জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এ বিষয়ে হুজুরের আম হুকুম জানিবেন। যাহাদের পীড়া অত্যন্ত কঠিন এবং যাহাদের নিকট হইতে সাধারণে ব্যারাম সংক্রামিত হওয়ার বেশী আশঙ্কা, প্রথমতঃ তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন; তাহা হইলে রোগের বিস্তার বন্ধ হওয়ার সম্ভব। দশ শিশি ঔষধ পাঠান গেল, আবশ্যক হইলে এবং লিখিলে আরও পাঠান যাইবে। ইতি—

| দেবীপুর<br>সন ১৩১৮, ৫ই ফাল্গুন। | অনুমতি অনুসারে<br>শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধর<br>ম্যানেজার সদর কাচারী। |
|---|---|

দাঙ্গা হাঙ্গামা করার পত্রাদি এই প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষাতেই লিখিত হইত। সোজা বাঙ্গালায় এই পত্রের অর্থ এই যে, এই বিদ্রোহের ভাব অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হইবে, তজ্জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা, ঘর জ্বালানি, মারপিট যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিতে নায়েব পশ্চাদপদ হইবেন না। যাহারা এই বিদ্রোহীদলের নেতা, এবং যাহাদের উপদেশে সাধারণ প্রজা চলিত হওয়া সম্ভব প্রথমতঃ তাহাদিগকেই শাসন করিতে হইবে। তাহা হইলে বিদ্রোহের বিস্তার হইতে পারিবে না। নায়েবের সাহায্যের জন্য দশজন লাঠিয়াল প্রেরিত হইল। আবশ্যক হইলে আরও পাঠান যাইবে।

'একে মা মনসা তাতে আবার ধুনার গন্ধ।' এই আদেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হুসেনপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে সামরিক আইন জারী হইল। প্রেরিত লাঠিয়ালদের অত্যাচারে, গ্রামের ঝি বউদের বাহির হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। নায়েব মহাশয় যাহাদের যাহাদের দলের চাই বলিয়া মনে করিলেন তাহারা নানা-প্রকারে অপমানিত হইতে লাগিল। কাহাকে কাহাকে ধরিয়া আনিয়া প্রকাশ্য কাচারীতে জুতাপেটা করা হইল; কাহারও কাহারও জমির পাকা ফসল গরুদ্বারা খাওয়াইয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। নায়েব মহাশয় অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রচার করিতে লাগিলেন যে যাহারা মাথট না দিবে তাহাদের স্ত্রী, পুত্র বধু, কন্যা প্রভৃতিকে প্রকাশ্য কাচারীতে বাধিয়া আনা হইবে। পৈশাচিক তাণ্ডবে সমুদয় গ্রাম কম্পিত হইতে লাগিল।

( ৩ )

প্রজাদিগের মধ্যে সদাশিব মণ্ডলের—অবস্থাপন্ন ও মাতব্বর বলিয়া-খ্যাতি ছিল। অল্পদিন হইল সে পঞ্চাশের কোঠা ছাড়াইয়াছে। আশপাশে দশ গ্রামের সকলেই তাহাকে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বৃদ্ধ বয়সকালে একজন বিখ্যাত জোয়ান ও লাঠিয়ালছিল। চতুর্দ্দিকের পাঁচ সাত খানি গ্রামের কৃষক যুবকগণ তাহার নিকট কুস্তী ও লাঠি-খেলা শিখিত। পুত্র পৌত্রাদি লইয়া তাহার প্রকাণ্ড সংসার। পুত্র চারিটীর মধ্যে একজন কাজকর্ম্ম দেখিত আর একটি ফরিদপুর দেওয়ানী আদালতে পিয়নের কাজ করিত এবং সর্ব্ব কনিষ্ট দুই ভাই, ফরিদপুরে তাহাদের দাদার বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িত। তাহারই বাড়ীতে প্রত্যহ রাত্রিতে প্রজাদের বৈঠক হইতে লাগিল। অযথা অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাগণ যখন আসিয়া তাহার নিকট নায়েবের অত্যাচার কাহিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রকাশ করিত তখন ক্রোধ ও ঘৃণায় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত—বাহিরে কেহই তাহা টের পাইত না। সে সকলকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিত।

একদিন তাহার ধৈর্য্যের বাঁধন ছুটিয়া গেল। তাহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান হানিফ খাঁকে যখন যমদূতের মতন পাঁচজন লাঠিয়াল আসিয়া কাছারীতে ধরিয়া লইয়া গেল এবং হানিফের স্ত্রী তাহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া আসিয়া সদাশিবের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, সদাশিব আর থাকিতে পারিল না। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত বহু বিপদের সহায় লাঠিগাছটী হাতে করিয়া কাচারীতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

কাচারীতে তখন এক বিভৎস অভিনয় হইতেছিল। হানিফ খাঁ এবং আরও কয়েকটী দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের নিকট এক একটী লাঠিয়াল দাঁড়াইয়াছে। নায়েব মহাশয় তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন "শালাদের পঁচিশ ঘা করে জুতো লাগাও।"

সদাশিব কাচারী গৃহে প্রবেশ করিয়াই নায়েব মহাশয়কে ছোট গোছের একটা নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এরা কি করেছে নায়েব মশাই যে এদের উপর এই জুলুম করছ?"

জুলুম কথাটা শুনিয়াই নায়েব মহাশয়ের গরম মেজাজ অধিকতর গরম হইলেও সদাশিবের মুখের ভাব দেখিয়া তিনি যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন, বলিলেন—"মনিবের হুকুম অমান্য করে এরা মাথট দেয়নি তাই এদের সাজা হচ্ছে।" সদাশিব উত্তর করিল "আমিওত মাথট দিইনি, আমাকে আগে সাজা দাও, তারপর এদের সাজা দিও। মশা মেরে হাত কালা কচ্ছ কেন নায়েব মশাই?"

সদাশিবের ক্ষমতা প্রতিপত্তির সকল কথাই—নায়েব মহাশয় জানিতেন। এই জন্যই তিনি প্রথমে তাহাকে ঘাটান নাই। "চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা" নীতির

অনুসরণ যে বাঙ্গালী চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব ইহা বহুদর্শী নায়েব মহাশয় জানিতেন। সদাশিবও সেই নীতির অনুসরণ করিবে এবং যদি তাহার নিজের উপর কোন অত্যাচার না হয়, তাহা হইলে অন্যের উপর অত্যাচারের সে কোন প্রতিবাদ করিবে না, নায়েব মহাশয়ের ইহাই বিশ্বাস ছিল এবং অন্যের বিপদে সদাশিব কোন সাহায্য না করিলে শেষে যখন সদাশিবের উপর তিনি খড়্গ উত্তোলন করিবেন তখন অন্য কেহ আর সদাশিবের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না এইপ্রকার ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া নায়েব মহাশয় প্রজাশাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় দরিদ্র উৎপীড়িত, ভিন্ন জাতীয় কয়েকটী প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া সদাশিবকে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ হইল। তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন "বটে এত বড় আস্পর্দ্ধা! কে আছিস্? হারামজাদাকে বেঁধে ঘা কতক লাগিয়ে দে তো?"

যমদূতের মতন কাচারীর প্যাদা, যাহারা ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে—নায়েব মহাশয় সবিস্ময়ে দেখিলেন—তাহারা কেহই অগ্রসর হইতেছে না, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। সদাশিব একটু মৃদু হাস্য করিল, তারপর ধীরে ধীরে যাইয়া হানিফ খাঁ প্রভৃতির বাঁধন খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া কাচারী হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া যাওয়ার সময় নায়েব মহাশয়কে বলিল—"নায়েব মশায়, এই মনিবের ভিটায় সাতপুরুষ কেটে গেল, কিন্তু গুষ্টির কাউকে এত বড় কথা কোন দিন কোন নায়েব বলতে পারে নি—আর তুমি বিনা দোষে প্রজার উপর যে জুলুম সুরু করছ, তাও কেউ কোন দিন করেনি। সাবধান হয়ে থেকো—উপরওয়ালা একজন আছেন, এত জুলুম ধর্ম্মে সইবে না।

বিস্ময়ে ক্রোধে লজ্জায় নায়েব মহাশয় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তারপর প্যাদা ও লাঠিয়ালগণের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—কেন তাহারা আদেশ পালন করিল না। তাহরা সকলেই উত্তর করিল যে, নায়েব মহাশয়ের সকল প্রকার আদেশই তাহারা পালন করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পাঁচ গাঁয়ের মাতব্বর, তাদের অনেকেরই ওস্তাদ গরীবের মা বাপ, মণ্ডলের বেটাকে অপমান করিতে তাহারা কেহই পারিবে না। তাহারা চাকুরী ইস্তাফা দিতে রাজী আছে।"

বিষদন্তহীন সর্পের ন্যায় নায়েব মহাশয় আপনা আপনি রাগে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সেই দিনই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহ অনল জ্বলিয়া উঠিল। সেই দিনই রাত্রিতে মণ্ডলের বাড়ীতে চতুপার্শ্বস্থ গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান মাতব্বর প্রজাগণ একত্র হইয়া এক "বৈঠক" করিল। সেই বৈঠকে স্থির হইল যে নায়েবের ডাকে কোন প্রজা কাচারীতে যাইবে না। বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইতে আসিলে একে অন্যকে সাহায্য করিবে। মাথট পরের কথা, খাজানা পর্য্যন্ত বিনা নালিশে আপোষে দিবে না। সেই সভায় ইহাও স্থির হইল যে মনিবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন প্রজারা চাঁদা করিয়া সেই অর্থ সংগ্রহ করিবে। যাহার যত টাকা খাজানা সে প্রতি টাকায় দুই আনা হিসাবে চাঁদা দিবে, এতদ্ব্যতীত প্রজাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা অতিরিক্ত চাঁদাও প্রদান করিবে। সদাশিব মণ্ডল এবং আরও দুইটী মাতব্বর প্রজার নিকট এই টাকা গচ্ছিত থাকিবে এবং তাহারাই দেখিয়া শুনিয়া সব কার্য্য করিবে।

হুসেনপুর কাছারীর অধীন পাঁচ ছয়খানি গ্রামে হরমোহন বাবুর বার্ষিক ষাইট হাজার টাকা আদায় হইত। প্রজারা এই ভাবে একযোগে খাজানা বন্ধ করায় তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি জেদ্ পরিত্যাগ করিলেন না। সদাশিব মণ্ডলের এবং অন্যান্য নেতাগণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা মোকদ্দমা ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! ভগবানের অমোঘ বিধানে সঙ্ঘশক্তির সম্মুখে অত্যাচারীর শক্তি, ক্রমশঃ পরাভব হইতে লাগিল। হরমোহন বাবু অকর্ম্মণ্য বলিয়া বহু নায়েব পরিবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু কেহই হুসেনপুরের বিদ্রোহ দমন করিতে পারিল না।

( ৪ )

পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সেবার অর্দ্ধোদয় যোগ। বাঙ্গালার প্রতি পল্লী হইতে অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ভাগীরথীর পূত জলে অবগাহন করিয়া, প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে বলিয়া ছুটিয়াছে। সেবার বাঙ্গালীর জীবনে একটা নূতন হাওয়া আসিয়া লাগিয়াছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ স্বেচ্ছা সেবক ব্রত অবলম্বন করিয়া, কলিকাতা নৈহাটী প্রভৃতি স্থানে যাত্রীগণের সুখ ও সুবিধার জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিতেছিল।

সেই সময় নৈহাটীতে যাত্রীগণের নিকট ভাড়া দেওয়ার জন্য স্থানীয় কোন কোন লোক বড় বড় চালা উঠাইয়া দিয়াছিলেন, ইহার একটি চালার একটি কক্ষে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ভীষণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। পার্শ্বে একটি সুন্দরকান্তি অল্পবয়স্ক যুবক বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে ও তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতেছে। যুবককে দেখিলেই সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও অবস্থাপন্ন লোকের সন্তান বলিয়া বোধ হয়। যুবকের বক্ষে স্বেচ্ছা সেবকের নিদর্শন শোভিত। কিছু দূরে আর একটি বিছানায় একটি বৃদ্ধ শায়িত। তাহাকেও এই ভীষণ ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছিল। এই যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রমে, যত্নে ও চেষ্টায় সে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত, সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষা যুবক নির্ব্বিকার চিত্তে করিয়াছে। সে একটু ভাল হইতেই তাহার স্ত্রী এই ভীষণ রোগে আক্রান্তা হইয়াছে; তাহার সর্ব্বপ্রকার সেবা ও শুশ্রূষাও এই যুবকই করিতেছে।

বৃদ্ধ বিছানায় শুইয়া শুইয়া যুবকের এই সকল কাজ দেখিতেছিল, এবং মনে মনে কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ ধীরে ধীরে ডাকিল "বাবু।"

যুবক তাহার নিকটে আসিলেন এবং কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলছ?"

বৃদ্ধ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "আপনি আমাদের আর জন্মের কে ছিলেন বাবু?"

যুবক একটু হাসিয়া মাথানত করিলেন। বৃদ্ধ আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল—"এই সর্ব্বনেশে ব্যামো, আপনার জন কাছে ঘেসতে চায়না—আর দিন নেই, রাত নেই, প্রাণের ভয় নেই, ঘেন্না পর্য্যন্ত নেই, এমনকরে পরের জন্য পরে কে কোথায় খেটে থাকে? বাবু আপনি মানুষ না দেবতা?"

যুবকের চোক্ মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—ছি! ওকথা বল্‌তে নেই। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। তুমি সেরেছ বটে কিন্তু এখনো খুব দুর্ব্বল রয়েছ। বেশী কথা বল্‌লে অসুখ বাড়বে।" বৃদ্ধ বলিল "বেশী কথা আর বল্‌ব না, দুটো একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করব। আপনার বাড়ী কোথায় বাবু?"

যুবক উত্তর করিলেন—"ফরিদপুর জেলায়---দেবীপুর।"

বৃদ্ধ বলিল—"কোন দেবীপুর? রায় চৌধুরী বাবুদের দেবীপুর?"

যুবক বলিলেন—হাঁ, তুমি কি দেবীপুর চেন?"

বৃদ্ধ বলিল—"নাম শুনেছি বটে। আপনার নাম কি বাবু?"

যুবক উত্তর করিল—"করুণানিধান রায় চৌধুরী।"

বৃদ্ধ একেবারে সেকেলে বৃদ্ধ, তাহার প্রশ্নের আর শেষ হয় না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়ো মানুষের বেয়াদপি মাপ করবেন, আপনার বাবু কর্ত্তার নাম?"

যুবক উত্তর করিলেন—"শ্রীযুক্ত হরমোহন রায় চৌধুরী।" এই কথা বলিয়াই যুবক পাল্টা প্রশ্ন করিলেন "অত কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন বলতো?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল—"যাঁর দয়ায় প্রাণ পেয়েছি, তাঁর পরিচয়টা নিতে কি ইচ্ছা হয় না বাবু?"

যুবক আর কোন কথা কহিলেন না। এই সময় ডাক্তার আসিলেন; রোগিণীকে পরীক্ষা করিলেন এবং যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন "All right, the patient is no longer in danger" (বাস্‌ রোগিণীর আর বিপদের আশঙ্কা নাই) যুবকের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

( ৫ )

এই ঘটনার পর প্রায় ছয়মাস চলিয়া গিয়াছে, দেবীপুরে আজ বড়ই ধুম। হরমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাবাবু আজ বিবাহ করিয়া নব বধু লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন।

দেবীপুর হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী রেল ষ্টেশন হইতে দেবীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের উভয়পার্শ্বে সারি সারি কলাগাছ নিশান প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। শতাধিক ঢুলী ও ইংরেজী বাদ্যকর, মাথায় ঝাকড়া চুল বুকের উপর কাপড় বাঁধা মোটা লাঠি হাতে শতাধিক লাঠীয়াল, এবং তাহার মধ্যে মধ্যে পায়ে নাগরাই জুতা, পটী দ্বারা পদদ্বয় আবৃত, মাথায় পাগড়ী, গালে দাড়ী, বন্দুকধারী ভোজপুরী দারোয়ান, রায় চৌধুরী বংশের বনেদিত্বের পরিচায়ক রূপার আসা, সোটা, বল্লাম, ছাতি প্রভৃতি বহনকারী বরকান্দাজ, মশাল, নিশান, এছিটাইলিনের ঝাড় বাহক বহু ভৃত্য ইত্যাদি সমন্বিত প্রকাণ্ড শোভা যাত্রা, বড় বধুকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লওয়ার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে। বাড়ীতে কয়েকদিন হইল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" চলিতেছে। আত্মীয় কুটুম্ব, প্রতিবেশী প্রজা, গ্রামের আপামর সাধারণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

বাহিরের জাঁক জমক দেখিলে রায় চৌধুরী বাড়ীর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া কেহই বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু হরমোহন বাবু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। বিপদ কখনো একা আসে না। হুসেনপুরের প্রজা বিদ্রোহের পর হইতে, বিপদের পর বিপদ আসিয়া হরমোহন বাবুকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। হরমোহন বাবুর প্রকাণ্ড পাটের কারবার ছিল। পাটের গুদামে হঠাৎ আগুন লাগিয়া প্রায় পঁচিশ হাজার মন পাট পুড়িয়া তাঁহার লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এক হুসেনপুর কাচারীর অধীন প্রজাগণ বিদ্রোহী হওয়ায় সম্পত্তির অর্দ্ধেক আয় কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই আয় হ্রাসের অনুপাতে তিনি ব্যয়ের হ্রাস করিতে পারেন নাই। সাত পুরুষের বনেদি চাল একেবারেই ধা করিয়া পরিবর্ত্তন করা যে কত কঠিন তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের অনুমান করা সম্ভব নাই।

ইহার পর আর একটি গুরুতর বিপদে হরমোহন বাবু এখন পতিত। এই সকল গুরুতর ক্ষতিতে, অর্থাভাব হওয়ায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, তাহার প্রতিদ্বন্দী জমিদার কমলাপুরের শশীকান্ত বসু মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি মূল্যবান তালুক রেহানাবদ্ধ রাখিয়া উচ্চ সুদে—পোনর হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। সুবিধা পাইয়া সেই টাকার জন্য শশীবাবু নালিশ করায় সুদ আসলে খরচায় প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ডিগ্রি হইয়াছে। সাত দিন পরে নীলামের তারিখ ইহার মধ্যে টাকা দাখিল করিতে না পারিলে আবদ্ধ তালুক খানা নীলাম হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে হরমোহন বাবুর মান ইজ্জত প্রতিপত্তি সব অতল জলে নিমজ্জিত হইবে। যাহার ইঙ্গিতে কত পঁচিশ হাজার টাকা জলের মতন ব্যয় হইয়া গিয়াছে, সেই হরমোহন বাবু আজ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। কর্জ্জ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কোথাও পান নাই। হুসেনপুরের প্রজাগণের নিকট হইতে মাথট আদায়ের জেদ তিনি অনেকদিন হইল ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপোষে ন্যায্য খাজানা পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট এ কথা তাহার নায়েব অনেকবার ঘোষণা করিয়াছে কিন্তু প্রতিশোধ কামনায় জ্ঞানশূন্য, সদাশিব মণ্ডল চালিত প্রজাগণ নালিশ ভিন্ন খাজানা দিবে না স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে।

এই অবস্থায় হরমোহন বাবু পুত্রের বিবাহ দিতেছেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দ-উৎসব। তিনিও সেই উৎসবে যোগ দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রাণ দুশ্চিন্তায় জর জর হইয়াছে। সাতদিন মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহার মান ইজ্জৎ সবই যাইবে। সিংহ দরজায় দাঁড়াইয়া তিনি ম্যানেজারের সহিত এই বিষয়েরই আলাপ করিতেছিলেন। ম্যানেজারের মুখেরদিকে চাহিয়া হরমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডিক্রীর টাকার কোন যোগাড় কত্তে পাল্লে?' ম্যানেজার মাথা নাড়িলেন, বলিলেন যে—দুই তিন স্থানে খুব বড় বড় মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে তিনি নিজে গিয়াছিলেন।—কোথাও টাকা পাইলেন না। হরমোহন বাবু বিশুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন—"তাহা হইলে কি হইবে?"

ম্যানেজার মাথা হেট করিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—"এক হুসেনপুর কাচারীতে দু'লাখ টাকার উপর খাজানা বাকী, আর পঁচিশ হাজার টাকার জন্য আমরা লোকের কাছে খোসামোদ কচ্ছি। এ দুঃখের কথা কাকে বলব?"

হরমোহন বাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—বলিলেন—"হুসেনপুরের নাম আমার সামনে কর্‌য়ো না। হুসেনপুরই আমার সর্ব্বনাশ করেছে।"

এমন সময়ে অদূরে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল, বরবধূ আসিতেছে। কথা বন্ধ করিয়া উভয়ে অগ্রসর হইলেন।

শোভা যাত্রা আসিয়া পৌছিল। বরবধূ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তথায় স্ত্রী আচার ও আশীর্ব্বাদাদি হওয়ায় পর বর ও বধূ আসিয়া বাহিরে সজ্জিত চন্দ্রাতপতলে উপবেশন

করিলেন। তখন গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব কর্ম্মচারী প্রভৃতি নববধূর মুখ দেখিতে অগ্রসর হইলেন। ইহাই রায় চৌধুরী বাড়ীর চিরপ্রচলিত প্রথা। নববধূর সম্মুখ স্থিত একটি প্রকাণ্ড রৌপ্যথালে ঝন্ ঝন্ শব্দে মুখদর্শনী রৌপ্যমুদ্রা পড়িতে লাগিল, একজন কর্ম্মচারী তথা হইতে ডাকিয়া দাতাগণের নাম বলিতে লাগিলেন, এবং অপর একজন কর্ম্মচারী কিছু দূরে বসিয়া একটি খাতায় নামে নামে টাকা জমা করিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ গ্রামস্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ, তার পর ম্যানেজার প্রভৃতি সদরের কর্ম্মচারিগণ, তারপর মফঃস্বলের কর্ম্মচারিগণ—সকলেই মুখদর্শনী মুদ্রা প্রদান করিলেন। তারপর মাতব্বর প্রজাদের পালা আসিল।

বিবাহ অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে যে গ্রাম হইতে যত টাকা মাথট আদায় হইত। সেই গ্রামের মাতব্বর সেই টাকাটা এইপ্রকার ভাবে স্বহস্তে প্রদান করিবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে নারিকেল, কাপড় কলসী প্রভৃতি সম্মানস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে—ইহাই চিরদিনের প্রচলিত প্রথা।

"রায়পুর গ্রামের মাতব্বর গোপাল প্রামাণিক দুইশত টাকা"—কর্ম্মচারী চীৎকার করিয়া বলিলেন অপর কর্ম্মচারী তাহা লিখিয়া লইলেন "মীরপুরগ্রামের মাতব্বর মহম্মদ বকাউল্লা পাচশত টাকা" তাহাও লিখিত হইল।

হরমোহন বাবু একদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার এসব দিকে দৃষ্টি এবং মনোযোগ ছিল না। হঠাৎ তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল কর্ম্মচারী উচ্চৈস্বরে বলিতেছে "হুসেন-পুরের মাতব্বর সদাশিব মণ্ডল"—বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হরমোহন বাবু নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলেন দেখিলেন শুভ্রকেশ, সুন্দর কান্তি একটি বৃদ্ধ একটী বৃহৎ তোড়া রূপার থালার উপর রাখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে প্রণাম করিতেছে। কর্ম্মচারী তোড়াটি খুলিলেন, হরমোহন বাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন তোড়াটি নোটে ও স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ।

কর্ম্মচারী ক্ষিপ্রহস্তে মোহরগুলি থাক থাক করিয়া রূপার থালার উপর সাজাইয়া রাখিলেন এবং নোট গণনা করিয়া আবার চীৎকার করিয়া বলিলেন "হুসেনপুরের মাতব্বর সদাশিব—মণ্ডল ত্রিশ হাজার টাকা।"

হুসেন পুরের বিদ্রোহীর নেতা সদাশিবের নাম করুণা নিধান অনেকবার শুনিয়াছে, আজ সবিস্ময়ে চাহিয়া সে দেখিতে পাইল যে, অর্দ্ধোদয় যোগের সময় যে বৃদ্ধকে শুশ্রূষা করিয়া সে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল—সেই বৃদ্ধই সদাশিব মণ্ডল।

হরমোহন বাবু বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার প্রবল প্রতাপ, অমানুষিক অত্যাচার ও অজস্র অর্থব্যয় যে বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয় নাই তাঁহার পুত্রের নিঃস্বার্থ সেবা-ব্রত আজ সেই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল।

## দরশন।

মরমের কথাগুলি মুক হ'য়ে মরিল,
নিঠুর বিধাতা মোরে কেন বৃথা গড়িল,
হাসিল না মোর প্রাণে নিরমল চাঁদিমা,
আঁধার হৃদয়ে র'ল চিরকাল কালিমা,
নদী মোর বয় শুধু, কুলু কুলু গায় না,
সুদূর সুনীলাকাশে পাখী মোর ধায় না,
দখিন দুরন্ত হাওয়া দিনরাত সকালে,
প্রাণ করে আন্‌চান্—এই ছিল কপালে;
সরমে ঘোম্‌টা পরা বধু-মুখ আদরে,
হেরিব আশায় ভিজি শ্রাবণের বাদরে,
এইরূপে কত দিন কত মাস কত যুগ,
ভুগিয়াছি মরমের করমের কত ভোগ,
বধূরে দুয়ারে দেখি দেহ মন শিহরে,
ভিখারী চমকি হেরি কাণাকড়ি শিয়রে,
লুকাল আঁধারগুলো চুপি চুপি গোপনে,
মধুর সমীর বহে গেয়ে গাঁথা গগনে।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

---

## গ্রন্থ সমালোচনা।

সেকাল একাল—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, কবীন্দ্র, বি, এ, বিরচিত, মূল্য চারি আনা মাত্র।

কোন প্রকার কবিত্ব ফলাইবার বৃথা প্রয়াস না করিয়া গ্রন্থকার সরল সোজা 'পয়ারে' সেকালের শান্তিময় জীবন চিত্রের পার্শ্বে একালের ঝকমারীপূর্ণ জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়া পাঠককে তাহা ভাবিবার ও তুলনা করিবার অবসর দিয়াছেন। চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে—শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

# সৌরভ

সপ্তম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ সন। | ২য় সংখ্যা।

## হরিষেণের প্রশস্তি।

পুরাকালে ভারতবর্ষ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একতা শূন্য অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে কেবল দুইবার মাত্র ভারতবর্ষ একতা-বদ্ধ হইয়াছিল— প্রথম, মহারাজ অশোকের সময়, দ্বিতীয় মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের সময়।

মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত ৩৩০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্পপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। অনেকের মতে পুষ্পপুর এবং পাটলীপুত্র অভিন্ন। সমুদ্র গুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষের বিজেতা ছিলেন। এই কীর্ত্তি তাঁহাকে কীর্ত্তি-মন্দিরে স্থান দান করিয়াছে। তাঁহার আর এক কীর্ত্তি অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন। যে সময় বৌদ্ধপ্রভাব নিবন্ধন সনাতন ক্রিয়া কলাপ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, সেই কালে তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি আরও নানা কারণে লোকের বরেণ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিজে কবিতা রচনায় পারদর্শী, সঙ্গীত পটু এবং সংস্কৃত সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সাধন জন্য মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতেন।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ বরেণ্য নরপতির রাজ-বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সমুদ্র গুপ্তের রাজ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। গুপ্ত বংশের অনুগ্রহ-পুষ্ট একজন রাজকবি সংস্কৃত গদ্য পদ্যে তাঁহার কীর্ত্তি গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রশস্তিতে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সম্রাটের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এজন্য ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ সাতিশয় মূল্যবান। সংস্কৃত পণ্ডিতের নিকটও ইহার মূল্য কম নয়। "সন্ধি বিগ্রহিক, কুমারামত্য মহাদণ্ড নায়ক" প্রভৃতি উপাধি বিভূষিত কবি হরিষেণ মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে প্রশস্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রয়াগস্থিত অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ হইয়া এক দিকে তাঁহার ইষ্ট-নরপতির মহিমা বিঘোষিত করিতেছে, অন্য দিকে রচনার অভিনবত্ব, এবং পারিপাট্য, তাঁহার নিজের নামও স্মরণীয় করিয়াছে।

আমারা হরিষেণের প্রশস্তির বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি।

"যাহার মুখ মন প্রাজ্ঞদের সঙ্গ করিতে অভ্যস্ত ছিল, যিনি শাস্ত্র তত্ত্বার্থের সমর্থক ছিলেন, যিনি গুণীজনের সম্মিলিত প্রজ্ঞা দ্বারা সৎকাব্যশ্রীর বিরোধ নাশ করিয়া (এখনও) বিদ্বন্মণ্ডলীতে কবিতাকীর্ত্তি এবং সরল অর্থের যশ উপভোগ করিতেছেন।

যাহাকে পিতা (তুমিই) উপযুক্ত বলিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে গভীর ভাবের নিদর্শন স্বরূপ আলিঙ্গন এবং স্নেহ ব্যাকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণ ও গুণমুগ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিখিল ধরা (পালন করিতে) আজ্ঞা প্রদান করেন; যাহাকে সমজাতগণ [রাজপদে মনোনীত হইতে অসমর্থ হইয়া ঈর্ষাকুল ভাবে] ম্লান বদনে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং (যাহার নির্ব্বাচনে) সভাসদগণ [কোন অনুপযুক্ত পুত্রের উপর ভার ন্যস্ত হইবার আশঙ্কা দূর হওয়াতে] দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। *

* This verse seems to indicate that Chandra Gupta I specially selected Samudra Gupta from among several brothers to conquer the land and succeed him on the throne. (Dr. Fleet.)

যাহার অদ্ভুত অনেক কর্ম্ম দর্শন করিয়া কতলোক সাতিশয় হর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্নেহ সহকারে আস্বাদন করিতে [অভ্যস্ত ছিল] এবং যাহার বীর্য্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া অন্য কতলোক বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক আশ্রয় প্রার্থনা করিত।

যাহার একমাত্র উদ্বেল ভুজবীর্য্য বলে অচ্যুত এবং নাগসেন উন্মূলিত হইয়াছিলেন, যাহার আদেশে সৈন্য কর্ত্তৃক কোট বংশজাত (অধিপতি) বন্দী হইয়াছিলেন এবং যিনি পুষ্প নামক (নগরে) আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

যিনি বিবিধ শত সমরে অবতীর্ণ হইতে দক্ষ ছিলেন, যাহার স্বীয় প্রখর ভুজবলই একমাত্র বন্ধু ছিল, যিনি প্রখর ভুজ বীর্য্যের জন্য প্রখ্যাতছিলেন, যাহার অতি মনোহর দেহ পরশু, শর, শঙ্কু, শক্তি, প্রাস, অসি, তোমর, আরাচ, ভিন্দিপাল এবং বৈতষ্টিক আদি প্রহরণের শত আঘাত চিহ্ন দ্বারা শোভান্বিত হইয়াছিল।

যাহার মহাভাগ্যের সহিত কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কেরলের মন্ত্ররাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্র (১) পর্ব্বতস্থিত কোত্তুরের স্বামীদত্ত, (২) এরণ্ডপল্লের দমন, কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ, অভমুক্তের নীলরাজ, ভেঙ্গীর হস্তীবর্ম্মণ, (৩) পলক্কের উগ্রসেন, (৪) দেবরাষ্ট্রের কুবের, (৫) কুশলপুরের ধনঞ্জয় এবং দক্ষিণাপথের অন্যান্য সমস্ত রাজাকে প্রথমতঃ বন্দীকরণ এবং তারপর অনুগ্রহ মুক্তিদান জনিত প্রতাপ মিশ্রিত হইয়াছিল।

যাহার মহৎ প্রভা উদ্বৃত্ত ছিল, যাহার সে মহৎ প্রভা রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মণ, গণপতি নাগ, নাগ সেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্মণ এবং আর্য্যাবর্ত্তের আর অনেক রাজাকে বলপূর্ব্বক সমূলে বিনষ্ট করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি আটবিক (জঙ্গল) প্রদেশের সমস্ত অধিপতিকে পরিচারক হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

যাহার প্রচণ্ড শাসন প্রত্যন্ত সমতট, ডাবক, কামরূপ, নেপালাদি রাজ্যের অধিপতিগণ এবং মালব, অর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন, সনক, কানিক, কাক, খর, পরিক প্রভৃতি জাতি সকল কর্ত্তৃক সর্ব্ব বিধ) কর প্রদান, আদেশ পালন, এবং বশ্যতা জ্ঞাপন জন্য আগমন দ্বারা সম্যকরূপে পরিতুষ্ট হইয়াছিল।

যাহার নিখিল ভুবনব্যাপী শান্ত যশ অনেক ভ্রষ্ট এবং রাজ্যোৎসন্ন রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা অর্জ্জিত হইয়াছিল; যাহার প্রখর ভুজবীর্য্য কর্ত্তৃক [সমগ্র] ধরণীর একত্র বন্ধন দৈবপুত্র, সাহি, সাহানুসাহি, শক এবং মুরুন্দ ও সিংহলবাসী এবং সর্ব্বদ্বীপবাসীদের আত্ম নিবেদন, কন্যা দান, গরুড় অঙ্ক (প্রদান), স্ববিষয় ভুক্তি পরিত্যাগ এবং শাসন যাচনআদি সেবাদ্বারা সাধিত হইয়াছিল; যিনি পৃথিবীতে অপ্রতিরথ ছিলেন; যিনি শত সুচরিত্র অলঙ্কৃত অনেক গুণের আধিক্য বশতঃ অন্য নরপতিগণের কীর্ত্তি চরণতলে প্রমৃষ্ট করিয়াছিলেন; যিনি অচিন্ত্য বলিয়া সতের উদয় এবং অসতের প্রলয়ের হেতু ছিলেন; যিনি অনুকম্পা পূর্ণ বলিয়া মৃদু-হৃদয় ছিলেন; যাহার মৃদু হৃদয় কেবল ভক্তি ও অবনতি গ্রাহ্য করিত; যিনি শত সহস্র গো-দান করিয়াছিলেন।

যাহার মন দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দীন, অনাথ এবং আতুরজনের উদ্ধার ও দীক্ষাআদির জন্য উপগত থাকিত; যিনি লোক অনুগ্রহের বিগ্রহ ছিলেন; যিনি (দেবতা) ধনদ, বরুণ এবং ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন; যাহার অমাত্য বর্গ তাঁহার নিজের ভুজ বল বিজিত অনেক নরপতির সম্পত্তি প্রত্যার্পণ জন্য নিত্য ব্যাপৃত থাকিতেন।

যিনি ত্রিদশপতি গুরু বৃহস্পতি, তুম্বরু এবং নারদ ও অন্যান্যকে বিদগ্ধমতি, সংগীতবিদ্যা এবং ললিত কলা দ্বারা লজ্জা দিতেন; যিনি বিদ্বজ্জনের উপজীবিকা উপযোগী অনেক কবিতা রচনা করিয়া কবি-রাজ উপাধী প্রতিষ্ঠীত করিয়াছিলেন; যাহার অনেক উদার ও অদ্ভুত চরিত্র সুচিরকাল স্তুত হইবার যোগ্য।

যিনি লৌকিক ক্রিয়া বিধানে মাত্র মনুষ্য, (নতুবা) পৃথিবীবাসী দেবতা ছিলেন; যিনি মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রপৌত্র, মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ গুপ্তের পৌত্র, মহারাজা-

(১) পিষ্টপুরের অন্যনাম পিঠাপুরম, গোদাবরীজেলার পিঠপুর, প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ছিল। (২) কোত্তুর রাজ্য কোলাইর হ্রদের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। (৩) কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যে ভেঙ্গী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৪) প্রাচীন পলক রাজ্য সম্ভবতঃ নেলোর জেলায় অবস্থিত ছিল। (৫) দেবরাষ্ট্র—মহারাষ্ট্র।

ধিরাজ শ্রীচন্দ্র গুপ্তের পুত্র; লিচ্ছবি দৌহিত্র এবং মহাদেবী কুমারী দেবী গর্ভজাত ছিলেন।

যাহার যশ, প্রদান, ভুজবিক্রম, প্রসন্ন, শান্ত বাক্য পাঠের বিকাশ বশতঃ উচ্চ হইতে উচ্চে উত্থিত হইয়া অনেক মার্গে পরিভ্রমণ করিয়া মুক্তি লাভান্তে দ্রুতগতি প্রবহমান পশুপতির জটা বদ্ধ পাণ্ডু গঙ্গাজলের ন্যায় ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছে।

সেই মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্র গুপ্তের নিখিল অবনীতল ব্যাপ্ত সর্ব্ব পৃথিবী বিজয় জনিত এবং তাঁহার ত্রিদশপতির ভবন গমন লব্ধ ললিত সুখ প্রাপ্ত কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য এই উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীর বাহুর ন্যায় উত্থিত হইয়াছে।

যিনি খাত্তত পাকিক, মহাদণ্ড নায়ক ধ্রুব ভূতির পুত্র সন্ধি বিগ্রহিক এবং কুমারামাত্য মহাদণ্ড নায়ক হরিষেণ এবং যিনি ভট্টারকের পদ দাস; যাহার মন তাঁহার সমীপে সর্ব্বদা গমন সুলভ অনুগ্রহ বশতঃ উন্মীলিত হয় [ তাঁহার বিরচিত ] এই কাব্যদ্বারা সর্ব্ব ভূতের হিত ও সুখ হউক।

এবং পরম ভট্টরকের পদের অনুধ্যানকারী মহাদণ্ড নায়ক তিল ভট্টক কর্ত্তৃক এই বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে।"

আমরা হরিষেণের প্রশস্তির বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম। কেবল যে যে অংশ অসম্পূর্ণ তাহার অনুবাদ প্রদান করিতে পারি নাই।

হরিষেণের প্রশস্তির উপসংহারে লিখিত হইয়াছে যে পরম ভট্টারকের পদ অনুধ্যানকারী মহাদণ্ড নায়ক তিল ভট্ট কর্ত্তৃক তৎ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরম ভট্টারক ছিলেন। ভারতবর্ষের মুখোজ্জলকারী সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত পরলোকগত হইলে তদীয় পুত্র পরম ভট্টারক চন্দ্রগুপ্ত শাসন কার্য্যে ব্রতী হন এবং পিতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে হরিষেণের প্রশস্তি প্রচারিত করেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

# "নামে রুচি।"

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন,
ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাহি সনাতন।"
( চৈতন্য চরিতামৃত। )

( ১ )

শ্রীবাসের অন্তঃপুরে,
মৃত্যুর মহা করাল ছায়া নেমে আসে ধীরে ধীরে।
অগ্রদূত আজ এসেছে মৃত্যুর,
শীর্ণ গণ্ড তাই বদন পাণ্ডুর;
পুত্র মুখখানি,
শ্রীবাস ঘরণী,
দেখে চেয়ে বারে বারে।
আছে প্রতিক্ষায়
কখন কি হয়,
কখন বা যায় ছেড়ে।

( ২ )

বাহির আঙ্গিনায়,
কীর্ত্তনের রোল, করতাল খোল, মধুরে মিলেছে তায়,
গৌর নাচিছে মোহিয়া চিত্ত,
আনন্দে শ্রীবাস করিছে নৃত্য,
শিহরে পুলকে,
আঁখি অপলকে,
গোরা মুখ পানে চায়।
দেহ মন তার,
নহে আপনার,
বিকায়েছে সব পায়।

( ৩ )

অঞ্চলে চক্ষু ঢাকি,
এমন সময়, দাসী এসে কয়—শ্রীবাসে আড়ালে ডাকি,
"আনন্দে হেথায় করিছ নৃত্য,
দেখ এসে তব অমূল্য বিত্ত,
আজিকে তোমারে
যায় বুঝি ছেড়ে,
চিরতরে দিয়ে ফাঁকি।

তোমার মতন
পাষাণ এমন,
আর কেহ আছে নাকি ?"

( ৪ )

কীর্ত্তন আনন্দ ছাড়ি,
অন্তঃপুরে যেয়ে, পুত্র মুখ চেয়ে, বুঝিল নাহিক দেরী ;
মৃত্যু-জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণ,—
উপস্থিত সেই মুহূর্ত্ত ভীষণ।
সময় হয়েছে,
বাজিয়া উঠেছে,
মৃত্যুর আহ্বান ভেরী,
কহিল তখন
করিয়া যতন,
তনয়ে বক্ষে ধরি,—

( ৫ )

"আনন্দ ধামের পথে,
হে যাত্রী নবীন ! আজি কি সুদিন, যত্নকরি লহ সাথে,
পথের সম্বল এ মধুর নাম,
হরে কৃষ্ণ-হরে কৃষ্ণ-হরে রাম,
গৌর গুণধাম
এনেছে যে নাম,
পতিত উদ্ধারিতে।"
বালক শুনিল
অমনি চাহিল,
হাসিল আচম্বিতে ॥

( ৬ )

পিতার সহিত ধীরে,
উচ্চারিতে নাম, কণ্ঠ মুক্ত প্রাণ, জননী আছাড়ী পড়ে।
শ্রীবাস কহিছে "কান্নার সময়,
বহু পড়ে আছে, এখন তো নয়,—
ভক্তসনে গোরা
নামে মাতোয়ারা,
আজিকে আমার ঘরে।
নাম ভঙ্গ হবে,
গোরা ব্যথা পাবে,
এখন কাঁদিলে পরে।"

( ৭ )

পতির আদেশ সতী,
না পারে ঠেলিতে, না পারে রাখিতে, হৃদয়ে বেদনা অতি।
অস্ফুট কণ্ঠে গুমরি গুমরি
কাঁদে অভাগিনী পুত্র কোলে করি।
শ্রীবাস সেথায়
আর নাহি রয়,
ছুটে চলে দ্রুতগতি,
উচ্চকণ্ঠে নাম,
করে অবিরাম,
উচ্চকণ্ঠে গাহে গীতি।

( ৮ )

বাজিছে মৃদঙ্গ জোরে,
নাচিছে শ্রীবাস, হৃদয়ে উল্লাস, প্রেমাশ্রু নয়নে ঝোরে।
সহসা হইল কীর্ত্তন ভঙ্গ,
শ্রীবাসে ডাকিয়া কহেন গৌরাঙ্গ,
"মধুর নামেতে
না পারি লভিতে,
আনন্দ কিসের তরে ?
মনে যেন লয়,
বিপদ নিশ্চয়,
ঘটেছে তোমার ঘরে।"

( ৯ )

শুদ্ধ করতাল খোল,
অন্তঃপুর হতে, অস্ফুট নিনাদে, আসে ক্রন্দনের রোল।
শ্রীবাস হাসিয়া করযোড়ে কয়,
বিপদ বারন আমার আলয়,
কোথায় বিপদ ?
অতুল সম্পদ—
আনন্দ ময়ের কোল
তনয় লভেছে ;
নাহি বুঝে মিছে
পত্নী করে গণ্ডগোল ॥"

( ১০ )

বিস্ময়ে নির্ব্বাক সবে ;
বাহু পসারিয়া, বুকেতে চাপিয়া, কহেন গৌরাঙ্গ তবে ;

"মৃত পুত্র ঘরে রাখিয়া এমন,
নাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মাদ নর্ত্তন,
এ হেন বিশ্বাস,
প্রেমের বিকাশ,
কে কোথা দেখেছ কবে?
শক্তিনামের
ভক্তি বৈষ্ণবের
আজিকে শিখালে জীবে॥"

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল।

---

# সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১১ই জুলাই আমরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ খর্তুম্ সহরে উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে বহর—এল-এজ্‌রেফ (নীল-নাইল) নীল নদীর সহিত আসিয়া মিশিত হইতেছে; খর্তুম্ সেইখানে অবস্থিত। এই দুই নদীর সঙ্গম স্থানে স্থাপিত বলিয়া বাণিজ্য জগতে এই সহরের স্থান অতি উচ্চে। আবিসিনিয়া, নিউবিয়া, মিশর, সুদন প্রভৃতি দেশ হইতে বড় বড় নৌকা নানা প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া এই স্থান হইয়া যাতায়াত করিতেছে। একখানি ষ্টিমার কায়রো (মিশর বা ইজিপ্টের রাজধানী) হইতে খর্তুম্ এবং খর্তুম্ হইতে কায়রো প্রত্যহ যাতায়াত করে। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ।

এই সহর গর্ডন সাহেবের নামের সহিত চির সংযুক্ত হইয়া আছে। আমরা এই স্থানে তাঁহার কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

মেহদি ডন্‌গোলা জেলার এক দরিদ্র জেলের ছেলে। ১৮৮১ সালের প্রথমে মিশরের শাসন কার্য্যে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে সময়ে ইংরাজ বাহাদুর মিশরের শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইংরাজ বণিকদিগের রক্ষার জন্য কেবল সামান্য একদল ইংরাজ সৈন্য কায়রোতে অবস্থিতি করিত। মেহদি বাল্যকাল হইতেই মিশরাধিপতি খেদিবের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। যৌবনে ঐ ভাব সম্যক স্ফূর্ত্তি পাইল। প্রথম প্রথম সে দেশের দরিদ্র লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা একদিন সে জন সমাজে নিজেকে "মেহদি" (ঈশ্বর প্রেরিত) বলিয়া প্রচার করিল। খেদিবের কুশাসনের দোষে দেশের লোক অনেকদিন হইতে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এখন মেহদীর অগ্নিময় বক্তৃতার ফলে তাহারা সকলে দলে দলে তাহার পতাকার নীচে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। খেদিব অবিলম্বে হিক্‌স্ পাসার অধীনে প্রায় ৩০০০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মেহদির সৈন্যের নিকট উহারা প্রচণ্ড—বায়ুর নিকট তৃণগুচ্ছের ন্যায় উড়িয়া গেল।

এই সময়ে কর্ণেল গর্ডন সামান্য কয়েক শত সৈন্য লইয়া খর্তুমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সহরটী বিদ্রোহীদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে সহরের অধিকাংশ অধিবাসিই মেহদির পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন তিনি বাধ্য হইয়া দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই মুষ্টিমেয় লোক লইয়া তিনি কয়েক মাস পর্য্যন্ত মেহদির সহস্র সহস্র সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রবীন ও জীর্ণ দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ প্রকার অমানুষিক বীরত্ব কাহিনী ইতিহাসে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ক্লাইব একবার আরকটে অবরুদ্ধ হইয়া ৫১ দিন পর্য্যন্ত কয়েক শত সিপাহী লইয়া সহস্র সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা বলা সহজ নয়। তবে ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, ইহাদের এই অত্যদ্ভুত বীরত্ব কাহিনী ইহাদিগকে চিরদিন অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

গর্ডনকে সাহায্য পাঠাইবার জন্য খেদিব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খর্তুমের চারিদিক মেহদির হস্তগত হইয়াছিল বলিয়া কোনও মতে সমর্থ হইলেন না। মানুষ যাহা করিতে পারে গর্ডন তাহার অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সহস্র সহস্র লোকের বিরুদ্ধে কয়েকশত লোক কতদিন আর আত্মরক্ষা করিতে পারে? একদিন মেহদির সৈন্যেরা খর্তুমের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। গর্ডন হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে লইয়া উন্মুক্ত তরবারী হস্তে ঐ জন সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যুদ্ধ

করিতে করিতে দুর্লভ বীরলোকে গমন করিলেন। এই দুর্ঘটনার ঠিক দুই দিন পরে ইংরাজ বাহিনী খর্তুম উপস্থিত হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও উহারা ইহার পূর্ব্বে আসিতে পারে নাই। ইহার পর মেহদী খর্তুম সহরকে সমভূমি করিয়া তিন মাইল দূরে নীল নদীর বামদিকে এক নূতন সহর সংস্থাপিত করিল। ইহা এখন ওমদর্মন্ ( Omdurman ) নামে প্রসিদ্ধ।

খর্তুম সহরে বহুতর য়ুরোপীয় ও ভারতবাসী বাস করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে প্রায় বার আনা বাণিজ্য ব্যবসায়ী, অবশিষ্ট সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত। এই সহর বৃটিশ সুদনের রাজধানী। এই জন্য এখানে বড় বড় অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী বাস করেন। ভারতবর্ষের ন্যায় এখানেও ইংরাজরা সহরের বাহিরে বড় বড় বাংলা প্রস্তুত করাইয়া বাস করেন। ভারতবাসীরা সকলেই সহরের মধ্যে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবের লোকই অধিকাংশ। আমি যখন গিয়াছিলাম, বাঙ্গালা দেশের লোক এক জনও দেখিতে পাই নাই। মাড়োয়ারি ও মান্দ্রাজের চিটিরা এখানে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেছেন। সাহেবদের মহলে দুইজন পার্সী খুব বড় দোকান খুলিয়াছেন।

এত বড় সহর—কিন্তু গাড়ীর প্রচলন খুব কম। যাতায়াতের জন্য সহরের সর্ব্বত্র ভাড়াটে গাধা ও উঠ পাওয়া যায়। গাধার ব্যবহার অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হইল। সুদন ও মিশরের সর্ব্বত্রই গাধা ও উটের প্রচলন। ভারতীয় সওদাগরেরা গরুর গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন বটে, কিন্তু এদেশের লোক উহার বড় পক্ষপাতী নয়। এখানকার লোকেরা বড় কফি প্রিয় বলিয়া মনে হইল। সহরের যেখানে সেখানে কফির দোকান। এই দোকানগুলি এক একটী আড্ডা। দুই চারিজন ইয়ার লইয়া একটু প্রাণ খুলিয়া আলাপ পরিচয় করিতে হইলে সেখানকার নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর লোকেরা কফির দোকানে আশ্রয় লয়। বাড়ীতে বসিয়া লোকের সহিত মেলা মেশা কেবল উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মনে রাখিবেন সুদন ও মিশর মুসলমান প্রধান সহর। এই সকল দেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। ভারতের ন্যায় এখানেও মুসলমানদের অবস্থা খুব শোচনীয়; লেখা পড়ার চর্চ্চা আদৌ নাই। সরকারি হিসাব অনুসারে এখানে ১০০০০ এর মধ্যে ২০৬জন পড়িতে জানে। এই সব স্থান মিশরের খেদিবের অধীন। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি শুনিলাম অত্যন্ত উদাসীন। ইংরাজ বাহাদুর বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বড় একটা কিছু করিতে পারিতেছেন না; তবে শীঘ্রই যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতে প্রথম যখন ইংরাজ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়, তখন ইংরাজি শিক্ষাকে অনেকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিত। এদেশে এখন ঠিক ঐ অবস্থা। অভিভাবকেরা ছেলেদিগকে ইংরাজি শিক্ষা দিতে চায় না।

খর্তুমের গর্ডন কলেজ দেখিবার জিনিষ। চারিদিকে সুদৃশ্য বাগান মধ্য স্থানে কলেজ ও দক্ষিণে দিকে খেলিবার প্রকাণ্ড ময়দান, উহার একদিকে প্রিন্সিপালের বাড়ী; প্রিন্সিপাল ও অধিকাংশ অধ্যাপক ইংরাজ। ছাত্র সংখ্যা কিন্তু মোটে ২৯ জন। এফ এ ও বি এ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক প্রায়ই আমাদের মত; শুনিলাম পাশ করা বড় সোজা।

খর্তুমে আমরা দুই দিনের অধিক থাকিতে পারি নাই। তৃতিয় দিবস প্রাতঃকালে আমরা আবার রওনা হইলাম। খর্তুমে আমরা একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ইংরেজের বাসায় অবস্থান করিয়াছিলাম। তিনি একদিন সন্ধ্যা বেলা আমাদিগকে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। অনেকে হয়ত ইহা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু সাহেব স্বচক্ষে উহা দেখিয়াছিলেন। এবং মেম সাহেবও এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমি উহার মধ্যে সন্দেহের কোনও কারণ দেখি নাই বলিয়া নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

"সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা! আমার প্রথম সন্তান চার্লির বয়স তখন প্রায় এক বৎসর। ইহার তিন মাস আগে আমরা এদেশে আসিয়াছিলাম, সেই জন্য এখানকার ভাষা বুঝিতে পারিতাম না। কয়েকটা দরকারি কথা শিখিয়াছিলাম মাত্র। আমার স্ত্রী আবার তাও জানিতেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখি চার্লির সর্ব্বাঙ্গ একখানা নূতন শালে ঢাকা। স্ত্রী বলিলেন যে ঐ দিন অপরাহ্নে একজন দেশীয় বৃদ্ধ ফেরিওয়ালার নিকট

হইতে তিনি উহা খরিদ করিয়াছেন। পুরাতন শাল ও ১০, টাকা নগদমূল্য দিয়া উহা পাইয়াছেন। এই সব শুনিতেছি, এমন সময় বাড়ীর এক দাসী ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সে খর্ত্তুমেরই লোক। সে আসিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া কি বলিল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া যাহা বুঝিলাম তাহার মর্ম্ম এই :—ফেরিওয়ালা এ দেশের একজন প্রসিদ্ধ যাদুকর। ছোট ২ অনেক ছেলে মেয়ে উহার হস্তে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। উহার শাল চার্লির জন্য খরিদকরা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

"আমরা তখন বিলাত হইতে নূতন আসিয়াছি। এই সব খেয়াল প্রাচীন কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। আজ ও তাহাই করিলাম। কিন্তু ঐ দিন ক্লাবে গিয়া খর্ত্তুমের কয়েকজন ইংরাজ অধিবাসীর নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে উহা আর কুসংস্কার বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু রাত্রে যখন বাড়ী পঁহুছিলাম, তখন ও বিষয়ে মেম সাহেবকে কিছু বলা আর আবশ্যক মনে হইল না।

ইহার তিন দিন পরে অপরাহ্নে মেম সাহেব ও আমি অশ্বারোহণে ভ্রমণে বাহির হইলাম। প্রায় ৩ মাইল যাইবার পর আমরা নীল নদীর ধারে ঘোড়া হইতে নামিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কথায় কথায় মেম সাহেব বলিলেন যে ঐ দিন মধ্যাহ্নে ফিরিওয়ালা পুনরায় আসিয়াছিল। সে পুরাতন শাল ফেরত দিয়া উহার বদলে নগদ অর্থ প্রার্থনা করে। তিনি সম্মত না হওয়াতে সে নিজের নূতন শাল ফেরত লইয়া গিয়াছে। কি জন্য ঠিক বলিতে পারি না, চার্লির অমঙ্গল আশঙ্কা সহসা আমার মনে উদয় হইল। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে পুরাতন শাল খানা কোথায়? শুনিলাম, বেড়াইতে বাহির হইবার সময় তিনি উহাদ্বারা খোকার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া আসিয়াছেন। আমি নিমেষের মধ্যে ঘোড়ায় চড়িয়া বসিলাম, এবং স্ত্রীকে আমার পশ্চাতে আসিতে বলিয়া বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়াদিলাম। ঐ পথ আমি কি ভাবে যে অতিক্রম করিয়াছিলাম তাহা আমার মনে নাই। অন্য কোনও ঘোড়া, গাড়ী, বা মানুষের সহিত আমার যে ধাক্কা কেন লাগে নাই তাহা আমি এখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক আমি বোধ হয়—১০ মিনিটের মধ্যে বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। স্ত্রীও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। গাড়ী বারান্দায় ঘোড়া দুইটি ছাড়িয়া দিয়া আমরা নক্ষত্র বেগে চার্লির শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলাম। চার্লি বেশ শান্তভাবে ঘুমাইতেছে দেখিয়া আমাদের মন হইতে পাহাড়ের বোঝা নামিয়া গেল। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ চার্লিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে আমি কখনও বিশ্বাস করিতাম না। ঐ পুরাতন শালখানা খোকার সর্ব্বাঙ্গে জড়ান ছিল। স্ত্রী যখন খোকাকে তুলিয়া লইয়াছিলেন—,তখন শালখানা অবশ্য বিছানায় পড়িয়াছিল। ইহার—দুই এক মুহূর্ত্ত পরে শালখানা—খোকার—শয্যা—হইতে এক লম্ফে মাটির উপর পড়িল। সেখান হইতে উহা দ্রুতবেগে সমস্ত ঘরটা অতিক্রম করিয়া বাহিরে গমন করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা ঘরের মধ্যে চলিতে ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি যেন মন্ত্র মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়াছিলাম। যখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন যেন আমার চৈতন্য হইল। আমি দুই লম্ফে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে উপস্থিত হইলাম। তখন ও শাল খানা দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আমি দ্রুতবেগে যাইয়া উহা দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু কি যে এক অদৃশ্য অমানুষিক শক্তি উহার উপর আপন ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল বলিতে পারি না, আমি কোনও মতে উহা ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমি ঐ খানে নির্ব্বোধের মত—দাঁড়াইয়া রহিলাম, শাল খানা ছুটিতে লাগিল। দুই চারি—সেকেণ্ড পরে আমি—আবার ছুটিলাম ও এবার উহার উপর যাইয়া দণ্ডায়মান হইলাম। কিন্তু উহার গতিরোধ করা আমার—সামর্থ্যে কুলাইল না। কে যেন আমায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া উহা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আমি আর চেষ্টা করিলাম না।"

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

---

# নীলার চীক্।

( ১ )

বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না করিয়া দেশের সমুদয় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃ-কুলকে অবলীলাক্রমে বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে, সমাজের নিকট তার অবশ্যই একটা শক্ত জবাবদিহি আছে। বিবাহ ও মনুষ্যের চাষ সম্বন্ধে যুদ্ধ আরম্ভ অবধি যে সমুদয় নূতন ধরণের দর্শন শাস্ত্র জার্ম্মানীতে রচিত হইয়াছে, সেগুলি জীর্ণ করিতে গিয়া আমার মাথা খারাপ হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে কোনো ডাক্তারি ব্যবস্থা লই নাই বটে, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে কতকগুলি অদ্ভুত গোছের কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ফটোগ্রাফের ক্যামেরার ভিতরে ছবি যেমন উল্টা হইয়া পড়ে, আমার মনের ভিতরে নারীমূর্ত্তির চেহারাটাও সভ্যসমাজের আদর্শের ঠিক উল্টা হইয়াই পড়িয়াছিল। স্ত্রী পুরুষের মিলনের ভিতরে যে একটু ক্ষণিকের আঙুর-চোয়ানো নেশা আছে, সেটুক ফুরাইয়া যাইতে না যাইতে মানুষের জন্য চিরজীবন ব্যাপী যে গভীর ক্লান্তিকর অবসাদ আসে, আমি ভাবি—মানুষ তারজন্য সৃষ্টির আদিযুগ হইতে এমন পাগল হইয়া ঘুরিতেছে কেন? দাম্পত্য বন্ধনের পীড়নে স্ত্রীপুরুষের মুখে যে অপরিস্ফুট বেদনার চিহ্ন দেখিতে পাই, তা দেখিয়া আমার কেবলি মনে হয়,—স্ত্রীপুরুষ আবার কবে বিবাহ করিয়া এ জীবনে সুখী হইয়াছে!

বাবার পীড়াপীড়িতে আমাকে সোণার বাংলার অর্দ্ধেক আইবড় মেয়েদের দেখিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। কিন্তু নিজের সঙ্গে একত্র জুড়িয়া সংসার চক্র টানিবার মত একটী মেয়েও আমার চোখে ধরিল না। বাস্তবিক বিবাহ সম্বন্ধে অত বড় 'প্রেজুডিস্' লইয়া নিজের জন্য কনে দেখিয়া বেড়ানোর মত অত বড় লাঞ্ছনা আর নাই। আমার দশা দেখিয়া বাবা দুঃখের সহিত বলিতেন, সুনীল যে মেয়েকে পছন্দ করিবে সে দেবকন্যা পৃথিবীতে আসিবার জন্য এখনো রুষ্ট দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হয় নাই। বাবার দুঃখ দেখিয়া আমার কিন্তু হাসি পাইত। আমি মনে মনে বাবাকে এই বলিয়া জবাব দিতাম—যে দেবকন্যা যদি আমাকেই উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে মর্ত্তলোকে অবতীর্ণা হন, তখন হয়তঃ আমার আর বিবাহ করিবার বয়সই থাকিবে না।

( ২ )

ইন্দুশেখর তাঁর অন্তঃপুরটাকে বাহিরের সবুজ সূর্য্যালোকিত পৃথিবী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তাঁর মেয়ে তারার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তারাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে লাভ করিবার জন্য যে তরুণ উপাসক সম্প্রদায় প্রকাশ্যে ও নির্জ্জনে তার তপস্যা করিয়া মরিত, আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে কতক গুলা রঙ্গীন কাপড়ের ভাঁজ, চোখে মুখে এক আধটু হাসির বিদ্যুৎ, আর সুগন্ধি সাবানের ফেণা ও দুচার ফোঁটা লেবেণ্ডারের ছিটার সাময়িক বিকার ভিন্ন, তারার অসামান্য সৌন্দর্য্যটা কোথায়? আমি তাহাদিগকে কি বুঝাইয়াছি আর তারাই বা কি বুঝিয়া নিয়াছে, তা এক ভগবান মীনকেতুই বলিতে পারেন! তারার সম্বন্ধে আমার নিজের মত এই যে যেজন্য তার প্রার্থীর দল তারাকে ভয় করিয়া চলিত আমি সেইটাকেই যা কিছু তারিপ করিতাম। তার নিজের মনের উপর এতটা শক্তি ছিল যে সে আমার মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াও কখন নিজের মনে অসুখ বোধ করে নাই। তারার এতটা দীপ্তি আমার মোহ জন্মাইবার পক্ষে অনুকূল নয় বুঝিয়া এক্ষেত্রেও বাবা সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন!

তারাকে জব্দ করিতে না পারিয়া আমার জেদ আরও বাড়িয়া উঠিল। তারার প্রার্থীর দল যখনই তাকে লইয়া সান্ধ্য সমিতি জমাইয়া তুলিত, আমি তখনই জলন্ত উল্কার মত তাদের মাঝখানে গিয়া পড়িতাম। আমি তারার অহঙ্কার বেষ্টিত হৃদয় দুর্গটী এমন হিংস্র ভাবেই আক্রমণ করিতাম এবং তার সৌন্দর্য্যের ত্রুটীগুলি তার প্রার্থীদের চোখে আঙ্গুল দিয়া এমন স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়া দিতাম যে, সে সময় আমার ব্যবহারটা অত্যন্ত নির্লজ্জের মত হইয়া দাঁড়াইত! এক এক দিন মনে করিয়াছি আজ তারাকে এমন করিয়াই জব্দ করিয়াছি যে আমার মনোরাজ্যের অপার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এই বুঝি তার সমুদয় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিয়া তারা আমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল! কিন্তু জয়শ্রী তারাকে কখনও পরিত্যাগ

করে নাই। আমি যতই পরাজিত হইয়াছি, তারা ততই আমার অত্যাচারের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে শত্রু ভাবেই হোক, আর মিত্র ভাবেই হোক্, আমরা যে ক'টী তারার নিকট যাতায়াত করিতাম, তাদের কেউ তার সুরক্ষিত হৃদয় দুর্গের একখানা ইষ্টকও স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। প্রার্থীদের বন্দনাগীতি ও আমার জলন্ত মন্তব্যগুলি তার হৃদয়ের বাহিরেই পড়িয়া একসঙ্গে গড়াগড়ি যাইত।

একদিনের ঘটনা এখানে আমাকে একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। সেদিন সন্ধ্যার পর বিবাহ ও নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে তারার ঘরে আমি তর্কের লাল ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। তারা আমাকে যতই সকাল সকাল বিদায় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, আমি ততই তার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া আরো আট হইয়া বসিলাম। তর্কের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পূর্ণ ঝড় এমনই বহিতে লাগিল, যে অবশেষে তারা ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন হাই তুলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে শুক্লা ষষ্ঠীর অনুজ্জ্বল হলুদবর্ণ চাঁদ অস্তশিখরে একখানা নীল মেঘের আচল ধরিয়া কোনো মতে ঢুলিতে লাগিল। রাত্রির সুনীল পৃথিবী মৃদু জ্যোৎস্নার ঘোরে একখানা অস্পষ্ট স্বপ্নের মত জ্বলিতে লাগিল। বাড়ীর সমুখের বকুল গাছটীর নীচে অন্ধকারে থাকিয়া থাকিয়া দুচারটী জোনাকি জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে ছিল। কালো মখমলের মত অবয়বহীন তটপ্রান্ত ধরিয়া ভাগিরথীর উর্ম্মিল জলধারায় বিশ্বজননীর মাতৃস্নেহ ঈষদুজ্জ্বল স্তন্যধারার মত কোন স্বপ্নলোকে ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথাও নিবিড় তিমির পুঞ্জের অবকাশে একটী গৃহ-দীপ পথহারা নক্ষত্রটীর মত ঝিক মিক করিতেছে। কোথাও অন্ধকারপূর্ণ অদৃশ্য ভবনের মুক্তদ্বারে দীপালোকিত প্রকোষ্ঠের রক্তপাণ্ডুর ছায়াটী কোন অস্পষ্ট সুদূর স্বপ্নালোকের প্রবেশ পথের মত রহস্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি কাঁচের চিমনির ভিতরের কেরোসিনের উগ্র দীপশিখাটী তীব্রতর করিয়া দিয়া বুলবুলের মত কেবল অনর্গল বকিয়াই যাইতে ছিলাম; এমন সময় আরেকটী মহিলা আমাদের তর্কের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।

তিনি তারাকে আস্তে আস্তে একটু ঠেলা দিয়া বলিলেন, "দিদি ঘরের ব্যারোমেটারের পারা যেরূপ পড়ে গিয়েচে তাতে আজ রাত্রে যে তোমাদের বক্তৃতার ঝড়টা থাম্‌বে, তাতো মনে হচ্চে না।" তারা যেন সহসা ঘুম হইতে উঠিয়া গভীর ক্লান্তির সহিত উত্তর করিল—"ঝড় কি বল বিভা, এযে ঘোরতর সাইক্লোন! তাই একটু বেশী কা' হয়ে পড়েচি।"

পূর্ণ উদ্যমের মাঝখানে আমার বক্তৃতার ঝড়টা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি ততক্ষণ যুক্তিতর্ক সব ভুলিয়া বসিয়াছি। নিজের সঙ্কোচটা কোন মতে সামলাইয়া বিভাকে লক্ষ্য করিয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"একে তো চিনতে পারচি নে।" তারা তার আফিমের ফুলের মত রঙ্গিন ঠোঁট দুখানির উপর একটু হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়া বলিল—"আমার মাসতুতো বোন বিভা; তর্কযুদ্ধে অনেক উকিল বিভার কাছে মামলা ফেলে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছেন। নিতান্ত বিপদে পড়েই আজ আমার সেনাপতিকে স্মরণ করতে হয়েচে!"

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম:—"আমাদের কুরুক্ষেত্রে ওকে তো আর কখনো দেখতে পাইনি!"

বিভা একখানা চেয়ারে বসিয়া একখানা খবরের কাগজ হাতে লইয়া বলিল:—"আরমি রিজার্ভের সব খবর শত্রু পক্ষের না জানাই উচিত।"

পোষাকের ভাঁজগুলি বাদ দিলে, তারা সৌন্দর্য্যের হিসাবে বিভার কাছে দাঁড়াইতেই পারে না। আমার মনে হইল তারার নূতন সেনাপতির দিগ্বিজয়ে ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু এবার শক্ত লোকের হাতে তাঁর রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া বাঁধা পড়িয়াছে। যেহেতু আমার বিশ্বাস ছিল, আমার নিজের মতের উপর আমার যথেষ্ট আধিপত্য আছে! আমি ক্ষমাশীল বীরের মত একটু হাসিয়া বলিলাম:—"এবার তাহলে আমি রণে ভঙ্গ দিচ্ছি!"

তারা হাসিয়া বলিল:—"ক্ষতিপূরণের একটা পাকা বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তো আমরা এ যুদ্ধ থামাতে পারিনে—" আমি একটু লাল হইয়া বলিলাম:—

"আপনাদের Peace terms দিন তাহলে!"

তারা বলিল:—"এনাটমি পড়তে মানুষের হাড় নাড়াচাড়া করে, বিভার ভালবাসায় পড়ে বিয়ে করবার সখ ঘুচে গেছে। বর ধরবার ওকালতনামা আমায় দিয়ে উনি চোখ বুজে স্বয়ম্বরা হবেন!"

আমি সম্মুখে বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়াও একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম :—"প্রথাটা স্বদেশী বটে, কিন্তু এমন স্থলে ঘটকালিগুত সব সময় নিরাপদ নয়!"

তারা খুব এক পশলা হাসিয়া বলিল—"ঘটকালিত আর এক তরফা ডিগ্রি নয় সুনীল বাবু! বরের শুধু পক্ষই আছে, চক্ষু নেই, তাতো বলবার যো নেই!"

আমার মনে হইল তারার সৌন্দর্য্যের ত্রুটীগুলির উপর আমি এতদিন যে বিষ-বাণগুলি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছি, তারা তার একটী আজ আমাকে ধন্যবাদের সহিত প্রত্যার্পণ করিল। তবু আমি পরাভবের লজ্জা কোনো মতে চাপাদিয়া একটু রহস্য করিয়াই বলিলাম :—"এ সমুদয় ব্যাপার যে দেবতার কারসাজি, তিনি ইংরেজ মতে অন্ধ, আমাদের বাঙ্গলা দেশের হালে চশমা নিয়েচেন!"

তারা হাসিয়া বলিল :—"আমাকে ঘটকালির বিপদ থেকে বাঁচাবার আপনার যেমন সতর্কতা দেখা যাচ্ছে, তাতে আপনিই বিভাকে এ যাত্রা উদ্ধার করুন না। বিভাও বাঁচে, আমিও বাঁচি, আপনিও ক্ষতিপুরণের দায় হতে বেঁচে যান!" আমি বিপদ ঘনীভূত দেখিয়া দুঃসাহসিকের মত উত্তর করিলাম :—"রাজি! কিন্তু উনি যদি গান্ধারীর মত আমাকে চোখ বেঁধেই বরণ করেন, তবে আমিও যে বাকী জীবনটা চোখের আবরণ খুলতে পারবো না।"

আমার মত পাকা ও স্পষ্টবাদী স্ত্রী বিদ্বেষীর সঙ্গে বিবাহের ঘটকালি চলে না! বিশেষতঃ তারার ঘটকালি-টার আমি যেরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র-চিকিৎসা করিয়া দিলাম তাতে বুদ্ধিমতী তারার আমাকে বুঝিতে দেরী হয় নাই। সেদিনকার বাক্ যুদ্ধের ভিতর আমার ভাবিবার মত অনেক বিষয় ছিল। যখন মনে হইল, বিভার ওকালত নামা উপলক্ষ্য মাত্র, তারা নিজের জন্যই আমার নিকট উমেদারী করিতেছে, তখন আমার মনে হইল তারার ঘটকালিতে ধরা না দিয়া আমি যে আশ্চর্য্য কীর্ত্তি লাভ করিয়াছি, তা সাধারণ মানব বুদ্ধির অগম্য। মনে করিলাম এইবার তারা সত্যি সত্যি আমার নিকট জব্দ হইয়াছে। তার পরক্ষণেই মনে হইল আমি যে টানিয়া বুনিয়া তিল হইতে তাল পাকাইয়া শূন্যের উপর দিক-বিজয় সৃষ্টি করিয়াছি তা যদি [illegible] তবেত শেষকালে আমার জিৎ বজায় থাকিল না। মনের ভিতর অনেক আলোচনা গবেষণা করিয়া শেষকালে স্থির করিলাম আমিই জিতিয়াছি কি তারাই জিতিয়াছে তাহার কিছু মাত্র স্থিরতা নাই, তবে এটা নিশ্চিত সত্য যে আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই!

(৩)

এম, এ পরীক্ষা খুব নিকটে বলিয়া এই ঘটনার পর প্রায় মাস দুই আমার সঙ্গে তারার দেখা হয় নাই! পরীক্ষাটা একেবারে শেষ করিয়া আবার তারার মজলিসে ধূমকেতুর মত একটা উজ্জ্বল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া সন্ধ্যা বেলায় দেখা দিলাম। দু' চার টা বাজে কথার পর তারা একখানা চিঠি পড়িতে পড়িতে বলিল :—

"আজকার নূতন সংবাদটা তো শুনেচেন সুনীল বাবু!" পরীক্ষার পরদিন হইতেই আমি চা খোরের মত আবার খবরের কাগজ ধরিয়াছিলাম। তাই তারার প্রশ্নটা মাটীতে পড়িতে না পড়িতে উত্তর করিলাম :—

"শুনেচি কাইসার পরাজয় স্বীকার করে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেছে!"

তারা আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল :—"তার চাইতেও চমৎকার খবর—এবার পূজার ছুটীতে বিভা যাচ্ছে নীলগিরি, আর হিমাংশু যাচ্ছে ওয়াল্টেয়ার।"

আমি কিন্তু বিভা-হিমাংশু উপাখ্যানের কিছুই জানিতাম না, তাই নিম্রান্ত ব্যাকুবের মত উত্তর করিলাম—"ভ্রমণকারীদের পক্ষে সমুদ্র ও পর্ব্বত দুটোই দর্শন প্রশস্ত!"

তারা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল :—"ক্ষমা করবেন সুনীল বাবু আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, হিমাংশুর সঙ্গে বিভার আজ দু মাস হলো বিয়ে হয়েছে। হিমাংশু জব্বলপুরে ওকালতি কর্‌চে।"

তারার নূতন সংবাদের ভিতর আমার নিজের লাভ লোকসান কিছুমাত্র ছিলনা বলিয়া আমি কিছুমাত্র কৌতূহল অনুভব করিলাম না দেখিয়া তারা বলিল :—

"দেখচেন সুনীল বাবু হদ্দ দুমাস বিয়ে হয়েচে এরি মধ্যে এদের দুজনার আর এক জায়গায় পূজার ছুটীর আনন্দ চলচে না!"

আমি পুরা দস্তুর দার্শনিকের মত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, সেটা ত ভাল পশারের লক্ষণ। তারা ত

৫০৲ টাকার কেরাণী নয় যে মাকড়সার জালে না মরা পর্য্যন্ত দুজনে এক জায়গায় ঝুলে থাকবে!"

তারা একটু চিন্তার সহিত বলিল:—"না সুনীল বাবু, দুমাস যেতে না যেতেই ওরা স্বামী স্ত্রীতে মনে করতে আরম্ভ করেছে যে দুজনেই দুজনকে ঠকিয়েচে!"

আমি বুক ঠুকিয়ে বলিলাম:—"দেখুন এই ভয়েই আমি এ পর্য্যন্ত স্ত্রী জাতির বশ্যতা স্বীকার করিনি; কিন্তু এত বড় একটা ভুল করে বসবার আগে আপনার তো বিভাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল।"

তারা অত্যন্ত তেজের সহিত বলিল:—"ঠেকে শিখতে হবে বলে মানুষের স্বাধীনতা আগে থেকে খর্ব্ব করা আমি ভাল বলে মনে করি না।"

আমি তারার স্বাধীনতা প্রিয় ভালবাসার উপর বেশ একটু শ্লেষ করিয়াই বলিলাম:—"দুদিক থেকে স্বাধীনতার বন্যা যদি উল্টা দিকে বয়ে যায় তবে যে বিবাহের সাগর সঙ্গম একেবারে বালুচর হয়ে দাঁড়াবে!"

তারা খুব জোরের সহিত উত্তর করিল:—"সেটা ত স্বাধীনতার দোষ নয়, সেটা উভয় পক্ষেই স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখার ফল!"

আমি উৎসাহের সহিত উত্তর করিলাম—"লজিক ধরে যদি চলেন, তবে শেষ কালে বলতে হবে দোষ কারো নয়, দোষ তাদের ভাগ্য নক্ষত্রটির।"

তারা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু অন্য মনস্ক ভাবে বলিল:—"সে কথা এক হিসাবে ঠিকই বটে! তাদের ভাগ্য নক্ষত্রটী আমি বিবাহের আগেই দেখতে পেয়েছিলাম!"

আমি এবার তারাকে একটু অভিযোগ দিয়াই বলিলাম:—তাই যদি দেখতে পেয়েছিলেন তবে সে অশুভ নক্ষত্রটীকে তো বিভাকে আপনার স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

আমার অভিযোগের শরটা বোধ হয় তারার মর্ম্ম ভেদ করিয়া বিদ্ধ হইয়াছিল। মন হইতে গায়ের জোরে সেটা উঠাইয়া ফেলিয়া খুব তেজের সহিত তারা উত্তর করিল:—"না উচিত ছিল না, কোন মতেই উচিত ছিল না! মানুষের চিত্তকে পরের সতর্কতায় কে কবে বাঁচাতে পেরেচে! আজ যদি বিভা মরতেও বসে, তবে তার ভিতর দিয়ে ওর যে শিক্ষা হবে, সেই শিক্ষাই জন্ম জন্মান্তরের শিক্ষা!"

তারার উচ্ছ্বসিত কথাগুলি আমার জীবনের সমুদয় অন্ধকার ভরিয়া একসঙ্গে শত শত তারার মত জ্বলিতে লাগিল! জানিনা কেন আমার মনে হইল আমিই যেন তারাকে মারিতে বসিয়াছি, তারা মৃত্যুর শর-শয্যায় ছটফট করিয়া মরিতেছে, কিন্তু হত্যাকারীর নিকট পরাভব স্বীকার যে মৃত্যুর অধিক লজ্জাকর! বনের বাঘিনীরা যেরূপ মরিবার সময়ও হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ বল্লমের গোড়াটা কামড়াইয়া ধরিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াও চিত্তের স্বাধীনতা রক্ষা করে, আমার মনে হইল, তারাও যেন সেই বাঘিনী জাতীয়া স্ত্রীলোক। তারার সে সুন্দর মৃত্যু দেখিবার মধ্যে আমার জন্য শিকারীর আনন্দের উত্তেজনা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তারাকে বাঁচাইবার ক্ষমতা আমারতো ছিল না! তারা ও আমার হৃদয় এমনই বিভিন্ন তাড়িতে পূর্ণ ছিল যে আমাদের দুজনার প্রতিঘাতে এ পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যুতই জ্বলিয়া উঠিয়াছে; মিলনের ভিতরে কোনও দিন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার চোখ জুড়ানো আলো ফুটে নাই!

আমাদের এই বিভিন্নমুখী হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সময়ের স্রোত নিঃশব্দে অনেক দূর বহিয়া গিয়াছে। তারা নিষ্ফলা বনলতার মত পত্র পুষ্পের অনাবশ্যক প্রাচুর্য্যের ভিতরে ততদিনে অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এর মধ্যে তারার ব্যর্থ নারী জন্মটার চারিদিকে এমন একটা সামাজিক সঙ্কটজাল জড়াইয়া উঠিল, যার কোনো প্রতিকার করিতে না পারিয়া তারার নিরুপায় পিতা একদিন চিরকালের মত চক্ষু মুদিয়া বাঁচিলেন। ব্যাপারখানা সংক্ষেপত এই:—তারার পিতা তাকে সমাজের বাহিরে থাকিয়াই মানুষ করিয়া ছিলেন। তারা যখন কলেজে পড়িয়া বেশী বয়সে পরদার বাহিরে আসিয়া অবিবাহিত অবস্থায় সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন খাঁটি হিন্দু সমাজের বরেরা অর্থাৎ তাদের পিতৃকুল তারার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। অন্তঃপুরের পরদার আবরণ ছিন্ন করিয়া যে মেয়ে একেবারে সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁকে আবার কোন বায়ুহীন অন্দর বাড়ীতে

বন্দী করা যাইবে! এমন মেয়েকে ঘরে আনিয়া কোন নিষ্ঠাবান সামাজিক নিজের ঘরের আব্রু লোপ করিবেন? আর যে সমুদয় নব্যতন্ত্রের হিন্দুসন্তানগণ বিদেশী সভ্যতার সারটুকু ফেলিয়া চাকচিক্যটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সে সমাজের বরের দল তারার মনের শক্তির আস্বাদ পাইয়া ভেড়ার দলের মত পালাইতে আরম্ভ করিল। যখন এই নিষ্ঠুর সংবাদ আমার কাণে পঁহুছিল, তখন সংসারে একা নিরুপায় অভিমানিনী তারার কথা ভাবিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। মনে হইল আমি যদি মানুষ হইয়া থাকি, তবে আমি তাকে বিবাহ করিয়া তারার দুঃখ দূর করিতে পারি। কিন্তু যাকে ভালবাসি না, তাকে দয়া করিয়া বিবাহ করা যে আমারও তারার দুজনার পক্ষেই একটা জীবনব্যাপী দুঃখের অভিনয় হইয়া দাঁড়াইবে! অনেক ভাবিয়া, শেষকালে তারার বিপদের সময় আমি তার কোনো কাজেই লাগিলাম না!

মনুষ্য জীবনের ত্রিশ বছরে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা নগদ তহবিলে মজুত হইয়াছিল, তা এক-দিনের ঘটনায় সব কেমন ওলট পালট হইয়া গেল। সে কথাটা আমার এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। সংসার যেখানে আমার ক্ষুদ্র জীবনটীকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছিল, সেখানে একদিন হঠাৎ প্রয়োজনা-ধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। সে সময় আমি এম, এ, পাশ করিয়া যে কলেজে পড়িতাম সেই কলেজেই অধ্যাপক হইয়া নবোদিত জ্যোতিষ্কের মত পুনঃ প্রবেশ করিলাম। কিন্তু অধ্যাপক হইলে কি হইবে, আমার মনটা তখনো ছিল অনেকটা তাদেরি মত, যারা বেঞ্চে বসিয়া আমার নিকট হইতে মাহিয়ানা দিয়া অধ্যাপনা আদায় করিয়া নিত! জীবন যাত্রার পথে বীজগণিতের অঙ্কের মত যে কোন একটা বিশেষ সংজ্ঞা ধরিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, সে রহস্যটা আমার তখন আদবেই জানা ছিল না! আমি নিজের মতামতকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতাম, সেই ছিল আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল মন্ত্র। আমার জন্ম নক্ষত্রের বরেই হউক, আর অভিসম্পাতেই হউক, সে যায়গায় আমি অপরের হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে পারিতাম না। এমন সময় আমাদের কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে শিক্ষা সম্বন্ধে গুটিকয়েক প্রিন্সিপাল লইয়া আমার জন্মের মত মতভেদ হইয়া গেল। অধ্যক্ষ বলিলেন, মতের অমিল থাকিলেও তুমি আমার মতাবলম্বী হইয়া চলিতে বাধ্য, যেহেতু তুমি আমার সম্পূর্ণ অধীন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি কোনো অপর শ্রেষ্ঠতর দেবতারও ভারবাহী পশুর মত চক্ষু বুজিয়া চলিতে সম্পূর্ণ অশক্ত, যেহেতু আমার নিজের মতামত সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

এই মতামতের সংঘর্ষে যে অগ্ন্যুৎপাত হইল, তার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে অধ্যক্ষের বড় লেপাফায় কলেজ কাউনসিলের টাইপ করা 'রিজলিউসন' আসিয়া হাজির। কলেজ কাউনসিল আমাকে অধ্যাপকের কার্য্য হইতে সৌজন্যের সহিত নিষ্কৃতি দিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। এমন দুঃসংবাদ পাইয়াও কলেজ কাউনসিলের সৌজন্য দেখিয়া আমার হাসি পাইল। এ জগতে মানুষের স্বেচ্ছাচার কৃত্রিমতার এত ছদ্মবেশও ধরিতে জানে?

সে যা হোক মতামতের উপর নির্ভর করিয়া কলেজ কাউনসিলের টাইপকরা রিজলিউসন হাতে লইয়া অভিমান করিয়া বসিয়া থাকা আমার মত অবস্থার লোকের কিছুতেই পোষায় না। কারণ আমার ঘরে বসিবার, পড়িবার, আলো জ্বালাইবার আসবাব যথেষ্ট মজুত থাকিলেও সে দিন উনুন জ্বালাইবার মত সঙ্গতি আমার ছিল না। ক্যাশবাক্সে শীর্ণোদর টাকার থলেটী শূন্যহৃদয়ে আগে থাকিতেই মাস্কাবারের অপেক্ষা করিতেছিল। দেশে যারা ভিক্ষা করে তাদের অবশ্যই আত্মসম্মান নাই। তাই আমাদের ভিতরে যারা চসমা চোখে দিয়া কামিজ পড়িয়া বেড়াই, তারা ভিক্ষা না করিয়া ধার করিয়া থাকি। বাস্তবিক ভিক্ষার তুলনায় ধার করার আভিজাত্যটা যে কোথায়, তাতো আমি আজো ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ যে দুচারটী বেসরকারী কলেজের বন্ধ ফটকে চাকরীর চেষ্টায় মাথা ঠুকিলাম, সে সব পীঠস্থান হইতে রক্তাক্ত মস্তকেই ফিরিয়া আসিতে হইল। যে দুচার যায়গায় সময় সময় ধার করিতাম, তাঁরা আমার চাকরিটী গিয়াছে শুনিয়া আমার ষ্টাম্পের খত নামঞ্জুর করিলেন। আর যে সব স্থানে মজুত টাকার রূপার পাহাড়ের উপর

সেগুলা পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে আমার নিকট সুদের মুনাফার তেমন সম্ভাবনা না দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তারা আমাকে স্পষ্ট জবাব দিলেন। কিন্তু যেখানে গিন্টিকরা লেপাফায় কেবল শিষ্টাচার ছিল, আর তদতিরিক্ত একখানা এক টাকার নোটও ছিল না, সেখানেও পৃথক ফল ফলিল না। মানুষের সত্যির দুঃখকে যারা শুধু হৃদয়হীন শিষ্টাচারের মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতে আসে, ভগবান মানুষকে সে অপমান হইতে যেন রক্ষা করেন!

জানিনা কেন, সেদিন জগতের সবদিকে ধাক্কা খাইয়া আমার তারার কথা মনে হইল। মনে হইল আমি তারাকে ঠকাইয়াছি বটে কিন্তু সে-ত আমাকে ঠকায় নাই! তারার কাছে কি আমি অর্থের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম? তা নয়, তারা আমার চাইতেও নিঃস্ব। সে আমাকে কি করিয়া টাকা দিয়া সাহায্য করিবে। মানুষের মত যখন দুর্ব্বল হয়, তখনি তার ভালবাসার প্রয়োজনটী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠে। পৃথিবী আজ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তারার স্নেহ-দ্বারত এখনো আমার সম্মুখে খোলা আছে! কিন্তু তারার দুঃখের দিনে তার দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি কি করিয়াছি! আজ বিপদে পড়িয়া যার স্নেহটুকুই জগতের একমাত্র আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে, এতদিন আমি তার স্নেহকে কি চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি? আর কি তারার কাছে মুখ দেখাইবার পথ আছে? তারার নিকট যাইব, কি যাইব না, এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে আমি সত্যি সত্যি কখন যে তার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তা নিজেই ভাল করিয়া জানি নাই। আজ তারার ঘরে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম বটে, কিন্তু দুঃখিত হই নাই।

বেলা তখন আন্দাজ বারোটা। ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে দেখা করার পক্ষে অসময় বটে; কিন্তু মানুষের দুঃখের ত সময় অসময় নাই। তারার ঘরে প্রবেশ করিয়া, দেখি সে রান্না ঘরে উনুনের পাশে বসিয়া রান্না চড়াইতেছে। তারার তখনকার ক্লান্ত আপেলটীর মত গাঢ় আরক্ত মুখ খানার পানে চাহিয়া আমার নিজের জীবন সংগ্রামের কঠোরতা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। বাস্তবিক আমি তারার কাঁটা ও উলসুতা হাতে করিয়া কাজ করার কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু এফ,এ, পাশ করিয়া যে তাকে নিজের জন্য ভাত সিদ্ধ করিতে হইবে, এ কথা তো আমি স্বপনেও ভাবি নাই। তারাকে দেখিয়া আমি চোরের মত পালাইতেছিলাম, এমন সময় তারা বলিয়া উঠিলঃ—"সুনীল বাবু নাকি, এসেই ফিরে যাচ্চেন যে!" এ প্রশ্নের জবাব কি দিব তা ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম:—চোখে যা দেখছি, তা দেখতে পারবো না বলেই পালাচ্চি।" তারা ঝরা পাতার মতন পাণ্ডুর মুখে উত্তর করিল:—"এ আপনার বুঝবার ভুল সুনীল বাবু, নিজের কাজ খুব হীন হলেও, তা নিজে করার ভিতরে যথেষ্ট আত্মসম্মান আছে!"

আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—"দৈন্যকে এমন করে সম্মানিত করার মধ্যে আপনি যে মনের শক্তির পরিচয় দিয়েচেন, তার প্রসংশায় আমার সারা মন ভরে উঠেচে। কিন্তু আপনার উপর দৈন্যের পীড়ন যে আর চোখে দেখতে পারা যাচ্চে না। তাই আপনি যার সঙ্গে যুদ্ধ করচেন, আমি তাকে দেখেই যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পালাতে চাচ্চি!"

তারা একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—"এ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কারো পালিয়ে নিস্তার নেই সুনীল বাবু! তা যাক কিন্তু আপনাকে আজ এমন কাহিল দেখাচ্চে কেন, কোনো অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

আমি এতক্ষণ অনেক চেষ্টা করিয়াই আমার নিজের দশা তারার কাছে চাপিয়া চলিতেছিলাম। কিন্তু এবার বুঝিলাম স্নেহশীলা স্ত্রীলোকের হৃদয়ের ভিতরে আর একটী ত্রিনয়ন আছে, যার অন্তদৃষ্টি হইতে মানুষের গভীর মর্ম্ম বেদনা চিরকাল গোপন করা অসম্ভব! সুতরাং আমি তারার নিকট আর কিছুই গোপন না করিয়া আমার হৃদয়ের বেদনার স্থানটী তাকে খুলিয়া দেখাইতে আর একটুও ইতস্ততঃ করিলাম না। তারা আমার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিল, তারপর বলিল:—"সুনীল বাবু, আপুনি ওঘরে একটু বসুন, আমি আসছি!"

আমি একটু হতাশ ভাবে বলিলাম:—"আজ আমায় মাপ করুন, আমি অন্য সময় আসবো!"

তারা স্নেহ মধুর চক্ষে আমার পানে তাকাইয়া বলিল:—"আপনি দয়া করে একটু বসুন, আপনার

সঙ্গে একটা জরুরী কাজ আছে।" আমি তারার স্নেহ-করুণ চক্ষের মিনতি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

একটু পরেই তারা একখানা বড় লেপাফা হাতে করিয়া আমি যে কামরায় বসিয়াছিলাম, সেই কামরায় উপস্থিত হইল। সে আসিয়া কোনোরূপ বাজে কথা না বলিয়া খাম হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তা দিতে আসিল। আমি তাকাইয়া দেখি পাঁচশত টাকার একখানা চেক্!

আমি সহসা বাণবিদ্ধ পাখীর মত চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"একি, চেক্ দিয়ে কি হবে!"

তারা রাজরাণীর মত হাসিয়া হুকুম করিল—"মহাজনি ব্যবসা খুলেছি, আপনি এই টাকা ধার নিন্!"

আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম:—"যদি না খেয়ে মরেও যাই, তবু আপনার কাছে এ সময় ধার নিতে পারবো না!"

তারা আমার পানে তাকাইয়া বলিল:—মাপ করুন সুনীল বাবু, চেকে আপনার নাম এনডোর্স করে ফেলেচি, এখন যদি চেক খানা না নেন, তো আমার টাকাটা মাঠে মারা যায়!"

আমাকে তারার চেক লইতে হইল! কিন্তু সে দিন বুঝিলাম, যে তারাকে আমি এতদিন আমার যোগ্য মনে করি নাই, আমার চাইতে সে তারা কত বেশী সুন্দর।

আমি বলিলাম "একটা কাগজ কলম দিন, একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে ফেলি!"

তারা একটু হাসিয়া বলিল:—মানুষের মুখের ভিতর দিয়াই ভগবান কথা কন! আমি এক টুকরা কাগজ রেখে কি করবো! যখন পারেন, আপনি আমার টাকাটা শোধ করে দেবেন, তা হলেইত হলো!"

আমি বলিলাম:—"আপনার ধারের বোঝা যেরূপ বেড়ে উঠছে, সে আর শোধ করে উঠতে পারব, এমনত বোধ হচ্চে না! কিন্তু টাকা আপনি কোথায় পেলেন, ইন্দুবাবু তো আপনার জন্তে কিছুই রেখে যেতে পারেন নি!"

তারা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল:—"তিনি আমার জন্তে যে আশীর্ব্বাদ রেখে গেছেন, সেই আমার এক জন্মের পক্ষে যথেষ্ট! এ টাকাটা তাঁরি লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকা। বাবু যে ইন্সিওর করে ছিলেন, তা আমি জানতুম না!"

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম:—"সব টাকা যদি আমি নিয়ে যাই, তা হলে আপনার কি উপায় হবে!"

তারা একটু ম্লান হাসিয়া বলিল:—আমার দরকার মত রেখেই আপনার জন্য চেক্ লিখেচি। আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না!"

আমি চেক লইয়া ঘরে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম, পৃথিবী যে এত দিনেও পাপের আগুণে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নাই, তার কারণ—এমন দুর্দ্দিনেও তারার মত স্ত্রীলোকদের নিঃস্বার্থ হৃদয়ের পুণ্য প্রভায় আমাদের এ পাপময় পৃথিবী আলোকিত হইয়া আছে!

তারার টাকা মূলধন করিয়া দোকান করিলাম। আর চাকরী করিতে প্রবৃত্তি হইল না। মাস দুয়েক যাইতে না যাইতেই তারার মূলধন আমার মুনাফা হইয়া দাঁড়াইল। আমি প্রফুল্ল চিত্তে টাকা কটী লইয়া তারার বন্ধ দরজায় ঘা দিলাম। আজ তারার গৃহদ্বার আমার নিকট রুদ্ধ। কেহ দরজা খুলিয়া দিয়া আজ আমাকে তারার ঘরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল না। পাশের বাড়ীতে খবর লইয়া জানিলাম, তারা এখানকার বাস উঠাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সে খবর কেউ জানে না!

( ৫ )

এই ঘটনার পর পুরা একটী বছর কাটিয়া গিয়াছে। তারার ঋণের বোঝা দিন দিন আমার নিকট ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তারার কোন সন্ধান পাইলাম না!

সে দিন কলিকাতা হইতে সমুদ্র দেখিবার জন্য মেল ট্রেণে বেম্বাই যাইতেছিলাম। শেষ রাত্রে আপাদমস্তক একখানা রেলওয়ে রাগ দিয়া মুড়িয়া ঘুমাইতেছিলাম, এমন সময় মনে হইল, কয়েকটী যাত্রী কতকগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া আমার গাড়ীতে উঠিলেন। রেল গাড়ীতে যাত্রী উঠিলে, তাদের অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করা বাংলার সহযাত্রীদের প্রথা নহে, তাই লগেজ তোলার শব্দ, ও ছেলে মেয়েদের কলরবে আমার শেষ রাত্রির ঘুম টুকুর যে ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল, সে জন্য একটু বিরক্ত হইয়াই চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলাম।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে শুনিলাম একটী মেয়ে

বলিতেছে :—"নীলগিরিতে তোমায় আবার কবে ফিরে পাব মা ?"

একটী যুবতী স্নেহ মধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন :—

"তা তো বলতে পারবো না মা. যুদ্ধে যারা মরবে, তাদের সেবা করতে যাচ্ছি ! সেবার বড় স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নেই। সেবা করতে করতে যদি মরেও যাই, তাতেই দুঃখ কি মা !"

বাস্তবিক এ যুদ্ধে পৃথিবীতে নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কম্বলটী গায় জড়াইয়া বসিলাম। মনে হইল বাংলার এ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। উঠিয়া দেখি, কামরার বৈদ্যুতিক আলোর উপর নীল পরদা টানা। অস্ফুট নীলাভ আলোকে দেখিলাম কামরায় একটী মহিলা, খোলা জানালায় বাহিরের নক্ষত্র পূর্ণ অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছেন। আর কয়েকটী ছোট বড় মেয়ে—কেউ কোলে, কেউ পীঠে, কেউ পাশে বসিয়া তাঁর গলা জড়াইয়া বসিয়া আছে। অল্প আলোকে মুখ কারো স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইতেছে না, কিন্তু মহিলাটীর চারিদিকে যেন একটা আসন্ন মাতৃবিচ্ছেদের মৌন বেদনা শিশুগুলির হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্ষিপ্ত লগেজ গুলার ভিতর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। আমার মনে হইল আজ শেষ রাত্রির স্বপ্নে বাংলার নূতন মাকে দেখিলাম। মনে মনে সে সেবারূপিণী তরুণ মাতৃমূর্ত্তিতে ভারতের নব বিকাশ দেখিতে পাইয়া আমি তাঁকে মনে মনে ভক্তি ভরে প্রণাম করিলাম। বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মহিলাটীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"সহ যাত্রীর বাচালতা মাপ করবেন, আপনি কি আহত সৈন্যদের সেবার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছেন।"

মহিলাটী বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন :—"হাঁ মহাশয়।"

আমি কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?"

মহিলাটী কলের মত উত্তর করিলেন :—"করাচি ফিরে মেসোপোটামিয়ায়।'

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম : —"যুদ্ধ যে মানুষের পাশবিকতার উলঙ্গ লীলা ভূমি—শত্রুর হাতে নারীর মান সম্ভ্রম যদি বজায় না থাকে !"

মহিলাটী উত্তর করিলেন :—এ মাটীর দেহের মান অপমান তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ ; নারীর ধর্ম্ম নারীর মান তার মনে। সেখানে তার কোনো অপমানের ভয় নেই।"

আমার ইচ্ছা হইল, আলোর নীচের নীল পর্দ্দাটা সরাইয়া দিয়া বিদ্যুতের দীপ্ত ছটায় বাংলার মেয়েকে দেখিয়া নব্য বাংলার নূতন ভবিষ্যতটা একবার ভাল করিয়া দেখি। তবুত স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম ; তাই খুব কষ্টে মনের রোখ চাপিয়া গেলাম। আমি বলিলাম

"মেয়ে কটীকে কোথায় নিয়ে যাবেন ?"

মহিলা উত্তর করিলেন :—জব্বলপুরে নেবে, ওদের মাসীমার কাছে রেখে যাব।"

আমি অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—"এ মেয়ে কটী কি আপনার ?"

মহিলা মৃদুস্বরে বলিলেন :—"আমার, আমার বই কি।"

আমি একটু কাশিয়া বলিলাম :—"আপনার স্বামী তাহলে—

মহিলাটী একটু হাসিয়া বলিলেন :—"আমি অবিবাহিতা !"

আমি অবাক হইয়া বলিয়া উঠিলাম :—"সেকি মেয়েটী যে এখনি আপনাকে মা বলে ডেকে উঠলে।"

মহিলাটী আবার বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন :—"অমন চারশো মেয়ে আমায় মা বলে ডাকে, আমি তাদের সকলেরি মা—"

নীল পরদার ব্যবচ্ছেদটা আমার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু এ যাত্রা ভগবান আমাকে অনুগ্রহ করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রদোষের শুভ্র আলো দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, ধূম্র বর্ণের শৈলমালা ও সবুজ গাছপালা সব উজ্জ্বল করিয়া দিয়া আমার অপরিচিতার মুখের উপর হইতে নীল পরদার রহস্য সরাইয়া দিতেই দেখিতে পাইলাম, অপরিচিতা আর কেহ নয়, তারা।

আমি নব বিস্ময়ে তারার মুখপানে তাকাইয়া বলিলাম "একি আপনি !"

তারার মুখের উপর ঊষার তরুণ আলো ঝক ঝক করিতেছিল। সেও আমাকে দেখিয়া একটু প্রফুল্ল হইয়াই বলিয়া উঠিল :—সুনীল বাবু যে। বিদেশের পথে আপনার

সঙ্গে যে আবার এমন ভাবে দেখা হবে, তাতো স্বপ্নেও ভাবিনি!"

আমার বিচিত্র সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ হৃদয় তখন তারার দিকেই তরঙ্গে তরঙ্গে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম:—"আমি যে এক বছর ধরে আপনাকেই দেশে বিদেশে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

তারা কোন কথা কহিল না। গাড়ীর খোলা জানালা দিয়া সে যেন অরুণীত আকাশ পটে শুকতারার ম্লান শোভাই দেখিতেছিল।

আমি অনুতপ্ত চিত্তে বলিয়া উঠিলাম:—"তারা বিবাহ সম্বন্ধে আমার সমুদয় মতামত উল্টে গেছে।"

তারা প্রফুল্লতার ভান করিয়া বলিল:—"আশ্চর্য্য শুভ সংবাদ কিন্তু আর দেরী করবেন না সুনীল বাবু,— প্রজাপতি প্রসন্ন থাকতে থাকতে কাজটা সেরে ফেলুন।"

তারার নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলাম:— "সেই জন্যইতো আমার এত দেশ ভ্রমণের তাড়া—"

তারা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল:—"মন যখন ঘুরেচে, তখন দেশ ভ্রমণের ফল অবিশ্যি ফলবে।"

আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলাম:—"আপনি আমায় বলুন,—ঐ শুকতারা কি আমার হৃদয় আকাশেই আজ চির কালের মত ডুবল? আমার কি তবে আর কোন আশাই নেই?"

তারা আমার পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া অত্যন্ত মধুর স্বরে বলিল:—"সুনীল বাবু, এবার আমার যে তীর্থ থেকে ডাক এসেছে, সে খানে আমার আত্ম বিসর্জ্জনের স্থান আমার ঘরের আনন্দের চেয়েও বড় বলে বোধ হচ্চে।"

আমি কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় বোম্বাই মেল জব্বলপুর ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাড়াতাড়ি কুলি ডাকিয়া তারার জিনিষ পত্রগুলি নামাইয়া দিতে লাগিলাম। ট্রেণ ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা যখন বাজিয়া উঠিল, তখন আমি মৃতের মত পাণ্ডুর মুখে হিমশীতল হস্তে তারার শেষ ঋণ শোধ করিবার জন্য কোটের লম্বা পকেটে নোটের তাড়া খুজিতেছিলাম। ট্রেণ যখন চলিবার আগে হুইসল দিল, তখন আমি তারাকে বলিলাম:—"একটু দয়া করে দাঁড়ান, আপনার সেই চেকের টাকাটা—"

তারা একটু হাসিয়া বলিল:—"সে টাকা দিয়ে আপনার ভাবি স্ত্রীকে এক ছড়া নীলার চীক্ কিনে দিলে একেবারেই আমার ঋণ শোধ হয়ে যাবে।"

আমি তখন চোখে রুমাল দিয়া আমার হৃদয়ের গভীর নিরাশার বেদনাটা তারার কাছে গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।

ট্রেণ তখন চলিতেছে। তারা তখন পুষ্প পুঞ্জিত বনলতার মত অবনত হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল:—"মনে করে নীলার চীকে দু চারটী সোনার তারা বসিয়ে দিতে ভুলবেন না। ওতেই আমার স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেলাম—"

যতক্ষণ দেখা গেল, আমি ট্রেণ হইতে গলা বাড়াইয়া তারার পানে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল তার পদ্ম-পলাশ চোখের এক প্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু গোলাপের পাঁপড়ির উপর সঞ্চিত এক ফোটা জমাট নীহার বিন্দুর মত ছল ছল করিতেছে। যখন তারা অদৃশ্য হইয়া গেল তখন প্রভাতের রৌদ্র করোজ্জল শ্যামল দিকপ্রান্ত বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখি তারার এক বিন্দু অশ্রু প্রভাতের স্বর্ণালোকে যেন সমুদয় বিশ্বের উপর ছল ছল করিতেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

---

# স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস।

তিন বৎসর পূর্ব্বে সৌরভে যখন "কেন বাঁচালে আমায়" ছাপাই, তখনই ভাবিয়াছিলাম, দুঃখ-দৈন্য, নৈরাশ্য-নিপীড়নে কবিবর গোবিন্দ দাসের "দিন ফুরাইয়া" আসিতেছে। তার পর বহুবারের বিশেষতঃ এই সে দিনের দেখায় আশা হইয়াছিল, আমরা এত শীঘ্র তাঁহাকে হারাইব না। কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ বুঝিলেন।

গত ১৩ই আশ্বিন সোমবার শেষরাত্রে, জন্মভূমি ভাওয়ালে নয়, নূতন নিবাস বিক্রমপুরে নয়, ঢাকায়—প্রবাসে, পরগৃহে, বিনা-চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায় তিনি ভবের সকল যন্ত্রণা এড়াইয়া সর্ব্ব সন্তাপহারীর "রাঙ্গাপায়" আশ্রয়, লইয়াছেন। সৌরভে তাঁহার শেষ কবিতা "ঋণ"। ঋণের পাপ

তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। পাপ আমাদের। তিনি নির্ম্মল চিত্তে পুণ্যলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

তিনি দেশের দুর্ব্বল প্রাণে শক্তি জাগাইয়াছেন; জাতীয় বলবীর্য্যের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন; মুক্ত প্রাণে, মুক্ত হস্তে, তাঁহার অফুরন্ত ভাবের সম্পদ বিলাইয়াছেন। আমরা তাঁহার জন্য কি করিয়াছি? অন্ত মুহূর্ত্তে, অন্তিম তৃষায় তাঁহাকে আমরা একটু জলও দিতে পারি নাই। এখন "কবিবর" বলিয়া কাঁদিবার আমাদের কি অধিকার আছে? অনুতাপের অশ্রুজল আমাদের সম্বল। লজ্জায় অধোবদন আমাদের কলঙ্কের আচ্ছাদন।

ময়মনসিংহে তাঁহার কবি জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি ময়মনসিংহকে ভালবাসিতেন, ময়মনসিংহ তাঁহাকে ভালবাসিত। দেবেন্দ্র কিশোরের দেবনিবাসে তাঁহার আসন ছিল। ময়মনসিংহ সাহিত্যসমিতিতে, মুক্তাগাছায়, সেরপুরে হরচন্দ্র-সভায় তাঁহার সম্মান ছিল। কেশবচন্দ্রের সাহিত্য-মজলিসে তাঁহার আদর ছিল।

"সারস্বত সমিতির" কবি-মঞ্চ তাঁহার জন্য মুক্ত ছিল; ময়মনসিংহে তিনি "সারস্বত কবি" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সৌরভ তাঁহাকে আজন্ম শ্রদ্ধার সহিত অর্ঘ্য উপহার দিয়া আসিয়াছে। শেষ দেখায় তিনি বলিয়াছিলেন, ময়মনসিংহের আদর্শ-লোক চরিত্রের একখানি চিত্র আঁকিয়া যাইবেন। তিনি সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ময়মনসিংহের দুর্ভাগ্য।

হৃদয় বড় ব্যথিত ভারাক্রান্ত। তাঁহার কাব্য এবং কবিজীবনের আলোচনার এ সময় নহে। তাঁহার স্মৃতির জন্য আমরা কি করিতে পারি—পূর্ব্ববর্ত্তী পরলোকবাসী কবিগণের অদৃষ্ট ভাবিয়া সে চিন্তা বৃথা। তিনিই তাঁহার স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। "প্রেম ও ফুল" তাঁহার অনাবিল ভালবাসার ছবি দেখাইবে। "কুঙ্কুম, "কস্তূরী," "চন্দন" ও "ফুলরেণু" তাঁহার সৌরভ বহন করিবে। বাঙ্গালি যতদিন, বাঙ্গালা ভাষা যতদিন, চিরদিন "বৈজয়ন্তীতে" তাহার কবি প্রতিভার বিজয়-নিশান উড়িতে থাকিবে।

১৭ই আশ্বিন।

---

# কবি-প্রয়াণে

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
ভাতের অভাব ঘুচ্‌লো এবার, ঘুচ্‌লো হাহাকার!
সারা জীবন কেঁদে গেছে দু-মুঠ ভাতের দায়!
হাত পাতেনি কারুর কাছে দারুণ যাতনায়!
মাসের ভিতর বেশীর ভাগই থাক্‌তো চিঁড়া খেয়ে;
জীবন-ভরা জীবন-জ্বালা দেখ্‌লো না কেউ চেয়ে!
জগৎকিশোর বুঝ্‌তো দরদ—গরীব দুখীর পিতা;
তার দয়াতেই জাত্ রেখেছে কবির পরিণীতা!
সন্তানেরা পাচ্ছে খেতে, যায়নি যমাগার;
বাঁচুক্ কিম্বা মরুক্ তারা, আস্‌বে না সে আর!

( ২ )

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
তোম্‌রা এখন শোকের সভা করো চমৎকার!
চিতায় এখন মঠ দাওগে, কেঁদে ভিজাও মাটি;
বক্তৃতাতে তুব্‌ড়ি ছুটাও, টেবিলে দাও চাঁটি।
বুকের নীচে তাকিয়া রেখে তর্ক করো সবে,
গোবিন্দ দাস মস্ত কবি, নাম রেখেছে ভবে।
তোদের এসব কথা শুনে উর্দ্ধে দেবপুরে,
ক্ষুৎপীড়িত কবির আত্মা মর্‌ছে মাথা খুঁড়ে!
এখন হাজার গলা ফাটা, চেঁচা বারম্বার;
কবি তোদের দেখ্‌বে না মুখ, আস্‌বে না সে আর!

( ৩ )

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
যায় না বলা সে সব কথা সকল ঘটনার!
যারা বেশী গর্ব্ব করে দাস কবিকে নিয়ে,
তারাই আগে মাথা কুটুক্ ঘরের কোণে গিয়ে।
কি করেছিস্ তোরা তাঁহার যখন ছিল বেঁচে?
এক মুঠো ভাত দিস্‌নি খেতে একটা দিনও যেচে!
মনের কষ্টে ঢাকায় কবি ফির্‌তো পথে পথে;
ক্ষুধায় চক্ষু কোটরগত, চল্‌তো কোনো মতে!
দোনের মত পেটটি ছিল, হাড় কখানি সার;
জীবন দিয়ে মান রেখেছে, আস্‌বে না সে আর!

( ৪ )

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
পূর্ব্ববঙ্গ ক'রে গেছে গভীর অন্ধকার!
বিনা পথ্য চিকিৎসাতে কয়টা দিনের জ্বরে,
দেশের মস্ত অবহেলায় মনের ক্ষোভে মরে!
এদেশে কি পাঠক আছে? এইগুলা সব চাষা!
বুক-ফাটা সে ভীষণ কাঁদন কাঁদবে কবির ভাষা!
গরীব কাঙ্গাল কবি ব'লে কেউ চাহেনি হেসে;
আপন ক'রে নেয়নি তারে গভীর ভালবেসে!
পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির অন্ন পাওয়া ভার?
ভুঁড়ি ভোজন চলুক্ তোদের, আস্‌বে না সে আর!

( ৫ )

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
একটি খাঁটি কবি গেল কাঙ্গাল পল্লী মা'র!
শুভ্র ছিল হৃদয় তাহার কুন্দ ফুলের মত;
একটু স্নেহে ফেল্‌তো কেঁদে, লাগ্‌তো থতমত!
ক্ষুধার চোটে নিত্য তাহার বইতো বুকে বান!
সহ্য নাহি কর্‌তো তবু আত্মার অপমান!
মনুষ্যত্বের কর্‌তো পূজা, শক্ত বুকের ছাতি;
কলুষ-হৃদয় লাখ্‌পতিদের মাথায় মার্‌তো লাথি!
নেহাৎ গরীব কবি কিন্তু বীর্য্যের অবতার;
একটা নিখুত মানুষ গেল, আসবে না সে আর!

( ৬ )

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
পা'র হয়ে সে গেছে চ'লে দুখের পারাবার!
দেশের এসব ধনী মানী মিছাই থাকে ঢাকা!
বৃথা এসব বি-এ এম-এ, কেবল চেনে টাকা!
দেশের কবি চিড়া খেয়ে কাঁদ্‌তো নারিন্দায়!
পয়সা হ'লে তবেই চাট্টি হোটেলে ভাত পায়!
নীল কণ্ঠের মত কেবল গরল পিয়ে নেছে!
সকল জ্বালার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেছে!
কাঙ্গাল কবি আর চাহে না তোদের সুবিচার;
কুকুর শেয়াল কাঁদুক্ এখন, আস্‌বে না সে আর!

( ৭ )

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
বিনা দোষে দেশান্তরী কর্‌লো জমিদার!
সে কেঁদেছে সারা জীবন মনের মহা দুখে;
রক্ত দিয়ে লিখে গেছে মাতৃ ভাষার বুকে!
নির্য্যাতনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে কর্‌লে কষাঘাত,
ধর্ম্ম শাস্ত্র বলে না তার কর্‌তে মুণ্ড পাত!
"ভাওয়াল তার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল তাহার প্রাণ";
সেই ভাওয়ালে জীবনের তার হয়নি অবসান!
কেউ করে না এমন তর ভীষণ অত্যাচার;
পাপীর বক্ষ পিষে দিতে আস্‌বে না সে আর।

( ৮ )

গোবিন্দ দাস গেছে চলে, আস্‌বে না সে আর!
একটি মানুষ পাই না খুঁজে দুঃখ বলিবার!
থাক্‌লে মানুষ কবির মৃত্যু হয় না অনাহারে;
দুই মুঠো ভাত সবাই দিত শাস্ত্র অনুসারে!
এদের চেয়ে হাজং গারো হাজার গুণে ভালো;
তাদের হৃদয় এদের মত নয় তো মসী কালো!
বাহার ক'রে কাপড় প'রে বেড়াস্ বাবু সেজে;
হাজার চেষ্টা কর্‌লে মানুষ হয় না ঘসে মেজে!
'দাম্‌ড়ি' 'চাম্‌ড়ি' খুব চিনেছে, হায় কি ব্যবহার!
গরীব কবির হাড় জুড়ালো, আস্‌বে না সে আর!

( ৯ )

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর!
মনুষ্যত্ব নাই এদেশে, গেছে ছারেখার!
চতুষ্পদের গোষ্ঠি জ্ঞাতি ঘুর্‌ছে দ্বিপদগুলা;
বাঁধা বুলি ঢের শিখেছে, মুখে ধোনে তুলা!
এদের কি আর হৃদয় আছে? পাষাণ কবে গলে?
কথায় যদি ভিজতো চিড়া, কাজ ছিল না জলে।
যখন তখন আহার বিহার চল্‌ছে রাত্রি দিবা;
মুখ আছে তাই বেঁচে গেছিস্, নয়তো খেতো শিবা।
কলম-পেষা জাত্ ব্যবসা, সবাই চাটুকার;
মিট্‌লো কবির পেটের ক্ষুধা, আস্‌বে না সে আর!

( ১০ )

গোবিন্দ দাস গেছে চ'লে আস্‌বে না সে আর!
জীবন গেলে ভুলবো না আর এদের অবিচার!
এদের খ্যাতির মূল্য নহে একটি কাণা কড়ি;
ক্ষুধায় ম'লো দেশের কবি, নাই কি গলার দড়ি?
এরাই আবার মিটিং করে, লক্ষ্মীছাড়ার জাত্‌!
বক্তৃতাতে স্বর্গে তোলে, দিন্‌কে করে রাত!
চরণ-চাটা অপদার্থ এদের মত নাই;
হা ভগবান্‌, মানুষ পাঠাও—মানুষ কোথা পাই!
এদেশ বাসীর জীবনে ধিক্‌, ধিক্‌ সে কোটিবার!
গোবিন্দ দাস বেঁচে গেছে, আস্‌বে না সে আর!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

## বঙ্গের কিঙ্কর।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা অতীত যুগের রাজন্যবৃন্দের, গ্রন্থকারগণের এবং ধর্ম্ম প্রচারক মণ্ডলীর ও কবিদিগের ইতিহাস উদ্ধার করণে বদ্ধ পরিকর। নানা নিদর্শন দেখাইয়া কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দেশে কাহার পর কে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন তাহা নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা একশেষ যত্ন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝিবার জন্য এবং তাহাতে যতপ্রকার আপত্তি হইতে পারে তাহার উদ্ভাবনে এবং তাহার সমাধানে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন, সুতরাং অভিলাষ স্বত্বেও তাঁহারা সেই সেই গ্রন্থের গ্রন্থকারদিগের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও অবসর পাইতেন না। ইতিহাস থাকিলেও পণ্ডিত সমাজের এবিষয়ে লক্ষ্য না থাকায় সংস্কৃত ভাষায় যাঁহারা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থকারের ইতিহাস প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। *

এই ময়মনসিংহ জেলায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিয়া "তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক স্মৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, তাপস প্রবর ৺ রমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত—যাঁহার তপস্যা স্থান "ধীতপুরের পঞ্চবটী" বলিয়া খ্যাত ও ময়মনসিংহে নব্যন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার প্রবর্ত্তক বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ, † স্মার্ত্ত চূড়ামণি বিখ্যাত পণ্ডিত তারাকান্ত ন্যায়রত্ন, তন্ত্রাচার্য্য রাঘবানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কত কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ধারাবাহিক কোন ইতিহাস না থাকায় এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি সম্পূর্ণ হস্তগত না হওয়ায় তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে।

প্রবন্ধোক্ত স্বর্গীয় কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য এক সময়ে "বঙ্গের কিঙ্কর" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জেলা ময়মনসিংহে সুসঙ্গ পরগণান্তঃপাতি দুর্গাপুর থানার অধীন বাকলজোড়া গ্রামে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

বংশাবলী দৃষ্টে ইহার আবির্ভাব বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বলিয়া অনুমিত হয়।

ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বিমুগ্ধ নবদ্বীপস্থ বিবুধ মণ্ডলী নবদ্বীপের শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার নাম সন্নিবেশিত করিয়া "নদীয়ার শঙ্কর বঙ্গের কিঙ্কর" এই গৌরবাত্মক খ্যাতি প্রদানে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিঙ্করের বংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে ও বিদ্যাবত্তায় তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ, ৺ গয়াধাম নিবাসী গয়ালী ৺ ছেদী পাঠক প্রভৃতি এবং এ জেলারও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কুলীন ব্রাহ্মণ এই বংশের শিষ্য।

কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেশে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালে নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল, কিন্তু তথায় যাওয়া তৎকালে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। সেজন্য এদেশ হইতে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই নবদ্বীপ গিয়া অধ্যয়ন করিত। ঐ সময় ধীতপুর নিবাসী স্বর্গীয় রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ মহাশয় নবদ্বীপ গিয়া কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া এদেশে নব্য ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার সূচনা করেন, এই দৃষ্টান্তে উক্ত কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও নবদ্বীপ যাওয়ার স্পৃহা বলবতী হইল; তিনি বিশেষভাবে অভিভাবকগণ নিকট

* মৎসঙ্কলিত "বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী" নামক গ্রন্থে এজেলারও বহু প্রাচীন অধ্যাপকের জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। অচিরেই "রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ" হইতে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

† "ময়মনসিংহে ন্যায়চর্চ্চা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" ১৩১৯ ২য় সংখ্যা।)

হইতে সম্মতি গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন, এবং তথায় পৌছিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান পূর্ব্বক সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করণান্তর তথাকার সভায় বিচারে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তিনি সংস্কৃত কবিতা দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন

নবদ্বীপ হইতে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় তিনি কোন পল্লীতে এক মৌলবীর নিকট গিয়া পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই পারস্য ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশে আগমন করেন।

দেশে আসিয়া তিনি অধ্যাপনা এবং গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন। ইনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় মিশ্রিত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং ঐরূপ কবিতায় কয়েকখানা গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থ তাঁহার বংশধর স্বর্গীয় প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ছিল, তাঁহার নিকট হইতে উক্ত বাকলজোড়া গ্রাম নিবাসী তাঁহাদের জ্ঞাতি ৺ জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিয়া তাঁহাদের দালানে রাখিয়াছিলেন। ১৩০৪ সালের প্রবল ভূকম্পে ঐ দালানটী ভূমিসাৎ হয় ও ঐ দালানের চাপায় উক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং গ্রন্থগুলিও ইষ্টক স্তূপের মধ্যে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। ধীতপুর সিমুলজানি নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক সময় বাকলজোড়া গ্রামে অবস্থান করিতেন, তিনি বলিয়াছেন ঐ সকল গ্রন্থ তিনি নিজে দেখিয়াছেন; তাহা সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় মিশ্রিত সুললিত শ্লোকে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ গ্রন্থগুলি বিনষ্ট হওয়ায় ময়মনসিংহের একটী গৌরব নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার রচিত বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থও একখানা ছিল। ঐ গ্রন্থ মধ্যে সতরঞ্চ খেলার ঘরের ন্যায় কোঠা কাটা একখানা কাগজ ছিল, তাহা ঐ পদ্যের উপর ধরিলে, কতক অক্ষর আবৃত হইয়া বাকী অক্ষরগুলিতে এক একটি শ্লোক গঠিত হইত। ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থাবলী না থাকায় তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শনের উপায় নাই। পরম্পর অবগত হইলাম ঐ সকল ইষ্টক স্তূপের মধ্য হইতে কতক কর্ত্তক পুস্তক খণ্ডিত অবস্থায় স্থানীয় লোক এবং উক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আত্মীয়গণ মধ্যে কেহ কেহ নিয়াছেন।

উক্ত কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবদ্বীপ হইতে গৃহে আগমন কালে কোন বড়লোকের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য গিয়াছিলেন এবং উক্ত বড়লোকের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট সে বিষয় প্রস্তাব করিলে তিনি অতি মিষ্ট ভাষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করায়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন :— *

কাকোচ্ছিষ্ট লবেন পিক
ত্বংযাহি মা গর্ব্বিতাং
কিঞ্চিত্ত্বৎ ধ্বনি মাধুরী বিরহিণী
পাদস্পর্শ মহোত বান্‌ কুরুতে
ক্ষৌণ্যামহং জ্ঞানকৃৎ।
আঁকে য়্যাফত কমীন গা
জরুগরাঁ মখরুর বাহরকছে।

হে কোকিল! তুমি কাকের উচ্ছিষ্ট কণাদ্বারা প্রতিপালিত, তুমি গর্ব্ব করিওনা। তোমার স্বরের মধুরতায় বিরহিণীগণের সন্তাপ বর্দ্ধন করে মাত্র। অহঙ্কারী ব্যক্তি পৃথিবীতে তোমার ন্যায় পাদস্পর্শ করিয়া থাকে। যে স্বর্ণকারগণের আশ্রয় পাইয়াছে, সে সকল লোকের প্রতি অহঙ্কার প্রদর্শন করে। *

নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং লোকনাথ শিরোমণি এই দুইজনে বিচার হইয়াছিল, তখন সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মধ্যস্থ হইতে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ লোকনাথঃ
স্বয়ং হরিঃ।
দ্বয়োর্ব্বিবাদয়োর্ম্মধ্যে কিঙ্করঃ
কিং করিষ্যতি॥

* কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত উপরের লিখিত শ্লোকটী ঐ বংশীয় বাকলজোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বর্ত্তমানে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নানা ভাষায় অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, মহাশয় পারস্য ভাষায় রচিত অংশের সংশোধন ও বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শঙ্কর ( শঙ্কর তর্কবাগীশ ) সাক্ষাৎ শিবতুল্য, ও লোকনাথ ( লোকনাথ শিরোমণি ) স্বয়ং বিষ্ণুতুল্য এই দুই জনের বিবাদে কিঙ্কর কি মধ্যস্থতা করিবে ?

সভাস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার এই রূপক বর্ণনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সময়ে ও তৎ পূর্ব্বকালে অসাধারণ পাণ্ডিত্য যাঁহারা লাভ করিতেন তাঁহারা প্রায়ই উপাধি গ্রহণ করিতেন না। যেমন "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" নামক স্মৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, "তন্ত্রসার" প্রণেতা তন্ত্রাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য, "প্রাণতোষিনী" নামক তন্ত্র গ্রন্থ প্রণেতা রামতোষণ ভট্টাচার্য্য এবং বিখ্যাত নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। বোধ হয় এই রীতি অনুসরণ করিয়াই কিঙ্কর ভট্টাচার্য্যও কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি পাণ্ডিত্যে বঙ্গের কিঙ্কর নামেই বিখ্যাত ছিলেন।

কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বর্ত্তমান বংশধর বাকলজোড়া নিবাসী সু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়তীর্থ মহাশয় সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের সভা পণ্ডিত পদে নিযুক্ত আছেন। আশাকরি ন্যায়তীর্থ মহাশয় তাঁহাদের বংশের গৌরব স্বর্গীয় কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একখানা বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর যদি কিছু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হন, তাহার বিশেষ পরিচয় প্র দান করিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

# নীলের কথা।

নীলের সঙ্গে বঙ্গের যে দুর্দ্দিনের ইতিহাস জড়িত আছে, তাহাতে নীলকে দেশ ছাড়া করিতে সকলেই যে চেষ্টিত হইবেন—ইহা ভাবা অস্বাভাবিক নয়। নীলকে দেশের লোকে সে দিনে চেষ্টা করিয়াও ছাড়াইতে পারে নাই—কিন্তু জার্ম্মাণীর ইন্দ্রজাল কৃত্রিম নীলরূপে কৃষিজাত নীলের স্থান অধিকার করিয়া নীলের চাষকে একরূপ উঠাইয়া দিয়াছে।

বহু প্রাচীন কালেও নীলের প্রচলন ছিল। খৃঃ পূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীর কোন কোন মিসরীয় "মামীর" গাত্রাবরণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহা নীল রঞ্জিত। জার্ম্মাণীর কৃত্রিম নীল বহু ব্যাপক হওয়ার পূর্ব্বে ভারতের ও যাভার নীলই পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। ব্রাজিল এবং ফিলিপাইন্সেও কিছু নীল উৎপন্ন হইত; কিন্তু তাহার পরিমাণ অত্যল্প।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর কৃত্রিম নীল বাহির হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসর ভারতবর্ষ ৫½ কোটী টাকার ও যাভা ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের নীল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিয়াছিল। এতদুপরি ভারতবর্ষের নিজ প্রয়োজনেও বহু নীল ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৯১৩ সালে— বর্ত্তমান যুদ্ধ বাঁধিবার পূর্ব্ব বৎসর ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ২১ লক্ষ টাকার নীল রপ্তানি হইয়াছে। এই সনে জার্ম্মাণী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ৬½ কোটী টাকা মূল্যের নীল রপ্তানি করিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় রঙ্গ হিসাবে নীলের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী। এ্যানিলীন ও এ্যানিজালিন ( কৃত্রিম মঞ্জিষ্ঠা ) ঘটিত রঙ্গও বহুব্যাপক। অথচ এই দুই পদার্থোৎপন্ন রঙ্গের সমষ্টির মূল্যাপেক্ষা অধিক মূল্যের নীল রঙ্গ প্রতিবৎসর বিক্রীত হয়। রঙ্গের ব্যবসায় জার্ম্মাণীর একটী খুব বড় ব্যবসায়; আর যে ভারতবর্ষ একদিন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নীল যোগাইত, তাহার নীলের চাষ ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে।

জার্ম্মাণী নীল সুলভে দেয়। কৃষিজাত পণ্য, তাহাও ব্যয় সাধ্য কৃত্রিম পণ্যের প্রতিযোগিতায় হারিয়া গেল!

জর্ম্মাণী যখন যুদ্ধের গণ্ডীতে বাঁধা; সেই সময় মধ্যে আমাদের নীলের চাষের উন্নতি করিতে পারিলে, যুদ্ধাবসানে, এ প্রতিযোগিতায় হয়ত এ কৃষি টিকিয়া থাকিতে পারে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ হয়ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না যে নীল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু জৈব রসায়নের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নীলও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এংলার ও এমারলিঙ্গ রাসায়নিক সংযোগাত্মক নীল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। ইহার পরেও ত্রিশ বৎসর গত হইলে নীলের ব্যবসায় আরম্ভ হইল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেয়ার বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরে রাসায়নিক নীলের আণবিক গঠন প্রণালী বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। এবং তাঁহার নির্দেশ মত তৎকালে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত আরম্ভ হয়।

তিন ৩ লক্ষ টাকায় বেডিস্ কোম্পানীকে তাহার পেটেণ্ট বিক্রয় করিলেন। কিন্তু তাহার প্রণালী অনুসরণ করিয়া বহু পরিমাণ কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া লাভবান্ হওয়া কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হইল না। সুতরাং কোম্পানী কিছু ক্ষতিগ্রস্তই হইল। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে কে, হিউম্যান নেপ্থ্যালিন্ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরম্পরায় নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। বেডিস্ কোঃ এই পেটেণ্টও কিনিলেন। নীল প্রস্তুত জন্য কল কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় পড়িল তাহাদের ৭ লক্ষ টাকা। ১৯১১ অব্দে সুইজারলণ্ডেও কৃত্রিম নীলের কারখানা স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জার্ম্মাণ পরিচালিত একটী কৃত্রিম নীলের কারখানা ইংলণ্ডে স্থাপিত হয়। ইহার সমগ্র উপকরণ জার্ম্মাণী হইতেই আসিতে লাগিল। যুদ্ধ বাঁধিলে উপকরণাভাবে কারখানার কাজ বন্ধ হইল। কারখানা বাজেয়াপ্ত ও অন্যত্র বিক্রীত হইলে দেখা গেল, ইহার জার্ম্মাণ ম্যানেজার নীল প্রস্তুত প্রণালীর সমুদয় পুস্তক ও কাগজাদি পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। রাসায়নিক অনুসন্ধান সমিতির যত্ন ও চেষ্টায় শীঘ্রই নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইল এবং ১৯১৬ অব্দে কৃত্রিম নীল বিলাতের বাজারে পুনরায় দেখা দিল।

এইরূপ কারখানাদি স্থাপন বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু তৎস্থলে নীলের চাষের উন্নতি বিধান করিয়া এ সমস্যার কতকটা সমাধান করিতে পারা যায়। এ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র ১½ লক্ষ একর জমিতে নীলের আবাদ হইত। বর্ত্তমান সনে প্রায় ৯ লক্ষ একর জমিতে নীলের চাষ হইতেছে। বিহারি, মান্দ্রাজ ও পাঞ্জাবেই নীলের অধিক পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। দেখা যায় বিহারেই বেশী নীল উৎপন্ন হয়। এবং বিহারেই গবর্ণমেণ্টের যত্নে ২১টী কৃষিজাত নীল উৎপন্নের কারখানা স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখিয়া নীলের চাষকে প্রতিযোগীতায় দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা না হইলে যুদ্ধ শেষে আবার জর্ম্মাণীর নীল আসিয়া ভারতীয় নীলকে শঙ্কিত করিয়া তুলিবে।

১। চারার উৎকর্ষ সাধন। যাহার চারাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নীল উৎপন্ন হয়—যাহাতে ঐ চারার সর্ব্বত্র প্রচলন হয়, সে চেষ্টা করিতে হইবে।

২। পাতায় কোন্ সময়ে নীল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্মে তন্নিরূপণ ও যাহাতে তাহা হ্রাস পাওয়ার পূর্ব্বেই পত্র কর্ত্তিত হয় অথবা যে কারণে নীল হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তাঁহার প্রতিকার করিতে হইবে।

৩। কৃষিজাত নীলে নীলভিন্ন অন্য পদার্থও থাকে। নীলের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া, ঐ সকল পদার্থকে রঙ্গে পরিণত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। নীলপাতা কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া কারখানায় নেওয়া, নীল ভিজান, থিতান, জমান, শুকান পর্য্যন্ত সকল কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয় ও এসব কার্য্যে যাহাতে নীলের অনর্থক অপচয় না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যাহাতে নীলের চাষ প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে, সে চেষ্টাকে সুপরিণত করিবার জন্য দক্ষ ব্যক্তিগণের অগ্রসর হওয়া উচিত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ গুহ।

---

# ভারতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন।

আজকাল এক বিজ্ঞাপনের যুগ! কোন সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে সেই দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন সমূহে তত্রত্য শিল্প বাণিজ্যাদির অধোগতি নিদারুণ রূপে সূচিত হয়।

ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রগুলি দেখিলে বাস্তবিকই হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়। তাহাতে অপরাপর দেশের সংবাদপত্র সমূহের ন্যায় বিজ্ঞাপ্য বিষয়ের বাহুল্যজনিত বহিরাবয়বের বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় না; উহা কয়েকটী নিতান্ত উপেক্ষণীয় উদ্ভট বিজ্ঞাপনের সাহায্যে একাধারে স্বীয় আকার ও গুণগত লঘুতাই জগৎ সমক্ষে প্রকটিত করিয়া থাকে। ইংরাজ পরিচালিত এতদ্দেশীয় পত্রিকা ও খাস বিলাতি সংবাদ পত্রগুলিতে বিজ্ঞাপনের কি বাহার! বিচিত্র

ও বিভিন্ন বিষয়ের বহু বিজ্ঞাপনের সজ্জায় তাহাদের অর্দ্ধাংশেরও অধিক সুমণ্ডিত; সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সুবৃহৎ কল, কব্জা ও যন্ত্রাদি এমন কি দিয়াশলাই, সাবান পর্য্যন্তও তাহাতে বাদ যায় নাই। ইন্সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক, জাহাজের খবর ও তাহাতে আছে।

বোম্বাই সহরের কতিপয় উল্লেখ যোগ্য পত্রিকা ব্যতীত ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলির বিজ্ঞাপনের পরিচ্ছদ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে, মান্দ্রাজের হিন্দু পত্রিকা কোন গতিকে আপনার আবরু বাঁচাইয়া চলিয়াছে। ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলিতে যে দুই একটা বিজ্ঞাপন থাকে তাহার অধিকাংশই উৎকট ব্যধির প্রতিষেধক আজগুবি তাবিজ কবচ ও মন্ত্রৌষধির। তাহা অমার্জ্জিত চিত্তবৃত্তিগ্রস্ত স্বল্প বুদ্ধিজনগণের অজ্ঞতার পরীক্ষা ও তাহাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিকল্পে সহায়ক হইতে পারে তদ্ব্যতীত তৎ সমুদয়ের মূল্য অনধিক। প্রত্যুত ঔষধের আজগুবি বিজ্ঞাপনগুলি পরোক্ষভাবে সমস্ত দেশময় বায়বীর ব্যাধির বিস্তৃতপথ বিশেষরূপে পরিস্কৃত করিয়া দিতেছে। কম্বলের রোয়া বাছিয়া ঝাড়িয়া লইলে যেমন গোটা কম্বল পাওয়া দুরাশামাত্র, তদ্রূপ বিজ্ঞাপনের বাচালতার লহরের ভিতরে মাথা ঢুকাইলে মস্তিস্ক সুস্থ রাখিয়া পরিত্রাণ পাইয়া আসিবার কল্পনাও সুদূর পরাহত। সুক্ষাতিসুক্ষ ব্যাধির বীজাণু—বীজাণুত কোন ছার পরমাণু এমনকি যদি অতিপরিমাণুও খুজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে আর বৈদ্য ডাকিতে হইবে না, সুক্ষ নাড়ির মৎস্যকুর্ম্মাজগর গতির হিসাব নিকাশ করিতে হইবে না, রঞ্জনরশ্মি ফলাইয়া হাড় গণিয়া ব্যাকুল হইতেও হইবে না। যে কোন একটি ঔষধের বিজ্ঞাপনই বাষ্পীয় প্রতিচ্ছবির সাহায্যে ব্যাধির বীজ একটী একটী করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া দিবে। কাহারো নিকট হইতে ব্যাধির ফাঁক পাইয়া পলাইবার আর উপায় নাই।

কিছুদিন হইল, ইণ্ডিয়ান সোসিয়াল রিফর্ম্মার লিখিয়া ছিলেন, আমরা মদের বিজ্ঞাপন ছাপি না। আমরা বলি, সর্ব্বনাশকর- ঐন্দ্রজালিক-মাহাত্ম্য- পরিকল্পিত ছাই ভস্মের বিজ্ঞাপন না ছাপিয়া মদ, তামাকের বিজ্ঞাপন ছাপিলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞাপনের অভাবে ভারতীয় পত্রিকাগুলিকে অনেক সময় পৃষ্ঠা যুড়িয়া বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপনের হার ও মূল্যের হার ছাপাইতে হয়। ভাবিয়া দেখুন ভারতীয় পত্রিকা সম্পাদক বর্গের উপায় কি? একে ত তাঁহারা না না কারণে নিগৃহীত তাহাতে উপযুক্ত গ্রাহকের আনুকূল্যের অভাবে উপেক্ষিত, বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া যে দুই চার পয়সা পাইবে সে আশাতেও তাহারা বঞ্চিত, সুতরাং "যথালাভ" অর্থনীতির এই উদার সূত্রকে সম্বল করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতে হয়।

ভারতীয় সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়। কোন বৈদেশিক যদি তাহার প্রকৃতিকে খেয়ালের বশে একান্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন সমূহ পাঠ করে, তবে সে নিশ্চই মনে করিবে ইহারা নিতান্ত কুসংস্কারান্ধ, কদর্য্য ব্যাধিভারে মুহ্যমান ধ্বংসাভিমুখী উদ্যমহীন জাতি।

অপরাপর দেশের সংবাদপত্রগুলি তদ্দেশীয় শিল্প বাণিজ্যাদির বিজ্ঞাপনে পূর্ণ থাকে কিন্তু এতদ্দেশীয় পত্রিকা সমূহে তৎসম্বন্ধে বৈদেশীক বর্গের বিচক্ষণ কার্য্য দক্ষতা ও এতদ্দেশীয়গণের নিদারুণ নিরপেক্ষ—উপেক্ষাশীলতাই প্রকটিত হয়। ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে কারবার সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনাদি এক প্রকার থাকে না, তেলে যেন তামাম ভারত তিতিয়া গিয়াছে, তাহার ফলেই এ জাতির স্বাভাবিক তৈলমর্দ্দন স্পৃহা!

ভারতীয় সওদাগরগণের কি বিজ্ঞাপন ছাপিবার জন্য যুগোচিত আগ্রহ নাই? আর থাকিলেই বা কি হইবে? কারবারের মত কারবারগুলিত সকলই বৈদেশিকের হস্তে তাঁহারা দেশীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বিমুখ। তাঁহাদের খরিদ্দারেরা বেশীর ভাগই এতদ্দেশীয় লোক, তাহাদের খাইয়া তাহাদের পরিয়াই তাঁহারা কোঠার উপর কোঠা তুলিতেছেন সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতিও তাঁহাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে। বিশেষতঃ ভারতীয় কাগজের সহায্যেই ভারতীয় জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ সাধ্য।

এ বিষয়ে ভারতীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদকবর্গেরও কিঞ্চিত অপরাধ আছে। তাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কীয় আলোচনা বড় একটা করিতে চাহেন না, তাঁহাদের দেশের জন সাধারণকে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ে উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়া দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসাবে বিজ্ঞাপনের মারফতে তাঁহারা পরিশ্রমের পুরস্কার পাইবেন।

বর্ত্তমানে ভারতীয় পত্রিকার মধ্যে একমাত্র--বোম্বে ক্রনিকেলেরই সাজ গোজ একটু ভাল। বোম্বায়ের গুজরাটী কাগজগুলি এবং মান্দ্রাজের হিন্দু পত্রিকা মন্দের ভাল। কলিকাতার হিন্দু পেট্রিয়টের চেহারা মন্দ নহে। ইংলিশম্যানও ষ্টেটস্ ম্যানের সহিত বেঙ্গলী ও অমৃত বাজারের তুলনা করুন!

বাঙ্গালী ও দৈনিক বসুমতীর কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। পাইওনীয়ার এবং সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটের তুলনায় লিডার ট্রিবিউন ও পাঞ্জাবীর কেমন শোচনীয় অপরূপ! মাসিক পত্রিকাগুলির অবস্থা এমন হইয়াছে যে তাহাদের জরাজীর্ণ ফেকাসে রঙ্গের মধ্য দিয়া বুকের হাড় কয়েক খানা গণিয়া বাহির করা যায়, সেগুলির নিদারুণ কাহিনী নাই বলিলাম।

অতঃপর ইহাও দ্রষ্টব্য যে বঙ্গদেশে তিনটী উৎপন্ন দ্রব্যের বিপুলায়তনের কারবার চলিতেছে কিন্তু বঙ্গীয় সংবাদপত্র গুলির বরাতে তাহার কুদ কুড়াও উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে না। কলিকাতার ক্যাপিটালে ব্যাঙ্ক, কোম্পানী এবং অপরাপর শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে প্রায় ২০০শত বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তন্মধ্যে ৬টার অধিক এতদ্দেশীয় নহে। দেখিয়া অবাক হইতে হয় এই ৬টার মধ্যেও আবার তিনটি ঔষধ ও জ্যোতিষের। অপর একটি কাগজ ধরুণ, ইণ্ডিয়ান য্যাণ্ড ওয়েষ্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ার—কলিকাতার একখানা বিখ্যাত পত্রিকা সে খানি ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত বহুল বিষয়ের বিচিত্র বিজ্ঞাপন রাজিতে সুপল্লবিত; তাহার ৩৫০ টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে ৬টি খাটি এতদ্দেশীয় কারবারের। মাইশোর ইকনমিক জর্ণ্যাল একখানি সুপরিচালিত পত্রিকা কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতেও মহীশুর ব্যাঙ্কের কিংবা মহীশূরের পশম, রেশম এবং চন্দন কাষ্ঠের ব্যবসা সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় না। এতদেশীয় সংবাদপত্রেই যখন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বিজ্ঞাপ্তি এতাদৃশ, তখন ভারতের বহির্ভাগে ভারতীয় শিল্প কলার কিরূপ প্রচার তাহার কল্পনা খুব দুরূহ নহে। অথচ ভূমণ্ডলের এমন কোন দেশ বা জাতি নাই যে ভারতের পয়সায় বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না পোষণ করিয়া থাকে। *

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

## গ্রন্থ সমালোচনা।

কল্পকথা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত ও ঢাকা ইউনিভার্সিটী লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য আট আনা এই গ্রন্থে সাতটী ক্ষুদ্র গল্প আছে; গল্পগুলি পড়িয়া আমাদের ভালই লাগিল। ইহা উনিভার্সিটী লাইব্রেরীর "আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার" প্রথম গ্রন্থ।

সতী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ও "পোঃ কাইটাইল (ময়মনসিংহ) বীণাপাণি লাইব্রেরী" হইতে প্রকাশিত। মূল্য লিখিত হয় নাই। ইহা একখানি নাতি দীর্ঘ উপন্যাস গ্রন্থ। কাঁচা হাতের লেখা। গল্প জমিয়া উঠিতে পারে নাই। পাঠকগণ গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের শ্লোকটী স্মরণ রাখিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই গ্রন্থকারের প্রতি সুবিচার করা হইবে।

রীতিকা—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য আট আনা। কলিকাতা "মাধুরী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। একখানি ৮০ পৃষ্ঠার কবিতা পুস্তক। পুস্তকের নাম করণে 'নূতন কিছু কর' বাতিক আছে। কবিতাগুলিতে অনুকরণের আভাস থাকিলেও প্রায় সবগুলি কবিতাই বেশ ভাল লাগিল।

---

* The Common Weal—1st. November.

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২৫। | তৃতীয় সংখ্যা।

## সভ্যতার স্তর ভেদ।

বর্ত্তমান কালে ঐতিহাসিকগণ মনুষ্য সভ্যতার তিনটী স্তর দেখিতে পান। এই তিন স্তরের প্রথমকে তাঁহারা প্রস্তর যুগ, দ্বিতীয়কে পিত্তলযুগ এবং তৃতীয়কে লৌহযুগ নাম প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য যে সকল দ্রব্য প্রধানতঃ অস্ত্র শস্ত্র গঠনে ব্যবহার করিত এই স্তর—ভেদের মূল তাহাদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য মণীষীগণ আর এক ভাবে মানব সভ্যতার স্তর ভেদ প্রকাশ করেন। মনুষ্যের জীবনোপায়ের বিভিন্নতা এই প্রভেদের মূল বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই মত অনুসারে মনুষ্য সভ্যতার তিনটী প্রধান যুগ ক্রমশঃ দেখা দিয়াছে—যথা, মৃগয়া যুগ, পশুপালন যুগ ও কৃষি যুগ। মানব সভ্যতার স্তর ভেদ আর এক প্রকারেও দেখান যাইতে পারে। আমরা জানি এক কাল ছিল যখন মনুষ্যগণ অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিত না। এই অনগ্নি যুগে মনুষ্য অরণ্যে বাস করিত এবং মৃগয়া লব্ধ মাংস পচাইয়া ভক্ষণ করিত। প্রস্তর দ্বারা নানা প্রকার অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগকে অরণ্যের রাজা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। একালে যে ধর্ম্ম ভাব মানব মনে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা শুধু ভীতি প্রণোদিত। তাহারা কতক গুলি ভীষণ ও ক্রূর কাল্পনিক জীবে বিশ্বাস করিত; মানুষের অনিষ্ট করাই ইহাদের ধর্ম্ম। ইহাদিগকে নানা উপহার দিয়া তুষ্ট না করিলে মনুষ্য নানা রোগে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এই প্রকার ধর্ম্ম বর্ত্তমান। সম্ভবতঃ বহু শত সহস্র শতাব্দী মনুষ্য এই অনগ্নি যুগে কাল যাপন করে। পরে কোন এক মনুষ্য সম্প্রদায়ে একটী প্রতিভাবান মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া দুইটী কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করেন। ইহাতেই অগ্নি যুগের উৎপত্তি। এই প্রক্রিয়াটী ভারতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য মূল ও তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৩।২৯

অস্তি। ইদং। অধি মন্থনম্। অস্তি। প্রজননং। কৃতম্। এতাং। বিশ্‌পত্নীং। আভর। অগ্নিং। মন্থাম। পূর্ব্বথা। ১

এই উপরিস্থ মন্থন (দণ্ড) রহিয়াছে; (ইহা প্রকৃষ্টরূপে জন্মা ইতে রহিয়াছে। এই বিশ্‌পত্নীতে (অর্থাৎ নিম্ন অরণিতে) প্রবেশ করাও; পূর্ব্বকালের মত অগ্নিকে আমরা মন্থন করি। ১

অরণ্যোঃ। নিহিতঃ। জাতবেদাঃ। গর্ভঃ ইব। সুধিতঃ। গর্ভিণীষু। দিবে দিবে। ঈড্যঃ। জাগৃবৎভিঃ হবিষ্মৎভিঃ। মনুষ্যেভিঃ। অগ্নিঃ॥ ২

যেমন গর্ভ গর্ভিণী দিগের মধ্যে সুখে নিহিত থাকে, জাতবেদা (অগ্নি) সেইরূপ দুই অরণি মধ্যে নিহিত আছেন। জাগরণ শীল, হবিপ্রসাদ কারী মনুষ্য দিগের দ্বারা (ইনি) প্রতিদিন স্তুত হন। ২

উত্তানায়াং। অব। ভর। চিকিত্বান্। সদ্য। প্রবীতা। বৃষণং। জজান। অরুষস্তূপঃ। রুশৎ অস্য। পাজঃ। ইড়ায়াঃ। পুত্রঃ। বয়ুনে। অজনিষ্ট॥ ৩

হে জ্ঞানবান্! ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিত (অরণিতে) অধোমুখে (মন্থন দণ্ড) স্থাপন কর। এখনি প্রবীতা (অর্থাৎ অধ্বর্য্যু) বৃষকে (অর্থাৎ-অগ্নিকে) জন্মাইয়াছেন। ইহার অরুণ বর্ণ তেজ-সংঘ উজ্জ্বল হইল। ইড়ার পুত্র অরণির যোনি স্থানে উৎপন্ন হইল। ৩

ইড়ায়াঃ। ত্বা। পদে। বয়ম্‌নাভা। পৃথিব্যা। অধি। জাতবেদঃ। নিঃ ধীমহি। অগ্নে। হব্যায়। বোঢ়বে। ৪

হেজাতবেদা! পৃথিবীর নাভির উপর ইড়ার পদে (অর্থাৎ অগ্নি বেদীতে) আমরা তোমাকে হবিবহণ করিতে স্থাপন করি। ৪

যদি। মন্থন্তি। বাহুভিঃ। বি। রোচতে। অশ্ব। ন। বাজী। অরুষঃ। বনেষু। আ। চিত্রঃ। ন। যামন্। অশ্বিনোঃ। অনিবৃতঃ পরি। বৃণক্তি। অশ্মনঃ। তৃণা। দহন্। ৬

বাহু সকলের দ্বারা যখন (ইহাকে) মন্থন করে, দ্রুতগামী অশ্ব সদৃশ, রক্তবর্ণ অগ্নি কাষ্ঠে আবির্ভূত হন অশ্বিদ্বয়ের বিচিত্র, অনিবৃত্ত গতির মত (গমনে) প্রস্তর হইতে তৃণ দহন করিয়া (উহা) ত্যাগ করেন। ৬

তনূনপাৎ। উচ্যতে। গর্ভঃ। আসুরঃ। নরাশংসঃ ভবতি যৎ। বিজায়তে। মাতরিশ্বা। যৎ। অমিমীৎ। মাতরি। বাতস্য। সর্গঃ। অভবৎ। সরীমনি॥ ১১

আসুর গর্ভকে তনূনপাৎ বলে। জন্মাইলে নরাশংস বলে। মাতাতে যখন আলা নির্ম্মাণ করে তখন মাতরিশ্বা বলে। শীঘ্র গমনে বায়ুর প্রবাহ হইয়া থাকে। ১১

এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে একটী কাষ্ঠ খণ্ডের উপরিভাগে একটী গর্ত্ত করা হয়; এই গর্ত্তকে 'যোনি' নাম দেওয়া হইত। ঐ গর্ত্তে একটী কাষ্ঠ দণ্ড রক্ষা করিয়া উহাকে হস্ত দ্বারা দ্রুত ঘুরাইতে হয়। এই কাষ্ঠদ্বয়কে আরণি বলে। ইহাদের ঘর্ষণে এত তাপ উৎপন্ন হয় যে নিম্নস্থ অরণির গর্ত্ত জ্বলিয়া উঠে। উহাতে তখন তৃণাদি জ্বালাইয়া ইড়া নামক অগ্নি বেদিতে লইয়া যায়। এই রূপে উৎপন্ন অগ্নির তিন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনটী নাম দেওয়া হইয়া ছিল; যথা তনূনপাৎ, নরাশংস ও মাতরিশ্বা। অরণি ঘর্ষণের পূর্ব্বে অগ্নি অরণির গর্ভরূপে তাহাতে নিহিত থাকে। এই অবস্থায় অগ্নির নাম তনূনপাৎ। যখন ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নির অবির্ভাব হয় তখন উহাকে নরাশংস বলে। কারণ তখন নর বা ঋত্বিক দিগের তিনি স্তবনীয় হন। এই অগ্নি ইড়া নামক অগ্নি বেদিতে তৃণ কাষ্ঠ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া আলা উৎপাদন করিলে মাতরিশ্বা নামে অভিহিত হন। মাতরিশ্বা অর্থে মাতৃক্রোড়ে নিশ্বাস গ্রহণ কারী। সেকালে অগ্নিকে ইড়ার পুত্র বলা হইত। অতএব অগ্নি ইড়ামাতার ক্রোড়ে আসিয়া যেন নিশ্বাস লইতেছেন, এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া ইনি মাতরিশ্বা নামে অভিহিত হইয়া ছিলেন। দেখা যায়, ঋষিগণ বায়ুকে ও মাতরিশ্বা বলিতেন। ইহার কারণ দ্যাবা পৃথিবীকে (অর্থাৎ অন্তরিক্ষ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থানকে) মাতৃলোক বলা হইত। বায়ু এই দ্যাবা পৃথিবী মাতার ক্রোড়ে শ্বাস গ্রহণ করেন; এই জন্য ইনিও মাতরিশ্বা নামের অধিকারী। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং বায়ুর অভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ মনে করিতেন মাতরিশ্বা বায়ু সূর্য্যমণ্ডলস্থ বৈশ্বানর অগ্নিকে আনিয়া প্রাচীন অথর্ব্বা, ভৃগু প্রভৃতি ঋষি দিগকে প্রদান করিয়া ছিলেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের যুগে কোন ২ ঋষি বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি অনুমান করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন আর্য্য সম্প্রদায়ে আরণি দ্বয় নানা প্রকার বৃক্ষের কাষ্ঠ সম্ভূত ছিল বলিয়া অনুমান করি। শতপথ ব্রাহ্মণে পুরূরবা উর্ব্বশীর উপাখ্যানে দেখাযায় গন্ধর্ব্বগণ অশ্বত্থ বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা অরণি প্রস্তুত করিতেন। (১) কেহ কেহ শমী বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারাও অরণি করিতেন। (২) শতপথ ব্রাহ্মণের যুগে অরণি দণ্ডকে পুরূরবা এবং নিম্ন অরণিকে উর্ব্বশী নাম দেওয়া হইত। উৎপন্ন অগ্নিকে আয়ু নাম দেওয়া হইয়াছিল দেখা যায়। (৩)

---

(১) Make thyself rather an upper *arani* of Asvattha wood and a lower *arani* of Asvattha wood ; the fire which shall result there from will be that fire.

XI–5–1–16
vol V. p. 74

(২) পুত্রঃ। যৎ। পূর্ব্বঃ। পিত্রোঃ। জনিষ্ট শম্যাং। গোঃ। জগার। যৎ। হ। পৃচ্ছান্। ১০।৩১।১০ ঋগ্বেদ, যখন পুরাতন পুত্র (অগ্নি) পিতৃলোকদ্বয়ে জন্মেন; গাভী শমীতে (অগ্নিকে) উদ্গীরণ করেন যখন (ঋত্বিক্‌গণ) অন্বেষণ করেন।

Make thyself rather an upper *arani* of Asvattha wood, and a lower *arani* of sami wood ; the fire which shall result there from will be that very fire.

XI–5–1–15
vol V. p. 74

(৩) There on he lays the churning stick (with the top to the north), with, 'Thou art Urvasi !' He then touches the ghee-pan with the upper churning stick, with 'Thou art Ayu', he puts it down (on the lower *arani*) with, 'Thou art Pururavas. For Urvasi was a nymph, and Pururavas was her husband and the (child) which sprang from that union was Ayu.

Satapatha Brahman III–4–1–22.
Vol 2. p. 91

গ্রীকগণ মনে করিতেন প্রমিথিয়ুস দেবলোক হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া মনুষ্যকে প্রদান করেন। ইহা যে অরণি জাত অগ্নি তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রমিথিয়ুস শব্দ 'প্রমথ' ও ইয়ুস্ শব্দ দ্বয় যোগে উৎপন্ন। ইয়ুস (বা অগ্নি) প্রমথিত হইয়া উৎপন্ন, এই অর্থই প্রমিথিয়ুস শব্দ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি।

মানব যে সকল কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অরণি ঘর্ষণ প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান করি। দুইটী প্রস্তর খণ্ড বা একটী প্রস্তর খণ্ড ও একটী ধাতু খণ্ডের আঘাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিয়া শোলা বা তাহার মত পদার্থ জ্বালাইবার প্রক্রিয়া সম্ভবতঃ ইহার পরে অবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমান করি শোলার পরিবর্ত্তে পদ্মের মৃণাল প্রথম ব্যবহৃত হইত। এইজন্য পুরাণে ব্রহ্মার (অর্থাৎ অগ্নির) নাম পদ্মযোনি। ঋগ্বেদের এক স্থলে বসিষ্ঠ ঋষির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে মিত্রবরুণের পুত্র বলা হয়। মিত্রবরুণের তেজ বিদ্যুৎ রূপে উর্ব্বশীতে পতিত হইলে দেবগণ তাহাকে পুষ্করে (অর্থাৎ পদ্মে) রক্ষা করেন। এখানে বিদ্যুৎ রূপী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পদ্মে (অর্থৎ পদ্মের মৃণালে) পতিত হইয়া অগ্নি জ্বালাইবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১

অগ্নি যুগে সভ্যতার সমূহ বিস্তার হইয়াছে। ইহার প্রভাব মানব জীবনের নানা দিকে পরিলক্ষিত হয়। অগ্নির সাহায্যে গহন বন ধ্বংস করিয়া গ্রাম নগর নির্ম্মাণে মানব আপন শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। নানা প্রকার ধাতু দ্রব্য আবিষ্কার ইহার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। অগ্নি মানবকে আম মাংস ভোজন হইতে বিরত করিয়াছে। পাক প্রণালীর উন্নতি সাধন দ্বারা সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। ঋগ্বেদের যুগে পাক কার্য্য ধর্ম্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষদেব অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া মানবের মনে দেবভাবের উদ্রেক হইয়াছে। অগ্নি পূজক মানবগণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি, মানবের শত্রুসংহারকারী শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু রূপে দেবগণের কল্পনা করিয়া উচ্চতর ধর্ম্মের অবতারণা করিয়া ছিলেন। এইরূপে পৃথিবীতে ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। অগ্নি পূজার উন্নতি হইলে মানব অগ্নিকে চন্দ্রে, সূর্য্যে, তারকায়, বিদ্যুতে, স্থাবরে, অস্থাবরে,-- সমগ্র বিশ্বে দর্শন করিয়াছেন। ইহাতে মানব সমাজে একেশ্বর বাদের মূল প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ, রস স্বরূপ, এক ও অদ্বিতীয় এই সকল উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান অগ্নি যুগেই মানব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে বাষ্পীয় পোত, শকট ও কল প্রভৃতির আবিষ্কার অগ্নির বিশিষ্ট দান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান অনেক অংশে অগ্নির নিকট ঋণী। অগ্নি যুগে মানব সভ্যতা যে উচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছে তাহাতে ও মানব সন্তুষ্ট নহে। অনগ্নি ও অগ্নি যুগের অবসানে পৃথিবীতে আর এক নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাকে আমরা বিদ্যুৎযুগ সংজ্ঞা প্রদান করিব। যে দিন মানব 'এম্বার' নামক পদার্থ, ঘর্ষণ দ্বারা লঘু দ্রব্য আকর্ষণের ক্ষমতা উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিল সেই দিন বিদ্যুৎ যুগের উৎপত্তি। এই অসাধারণ শক্তির কার্য্যকারিত্ব বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ দ্রুত গতিতে আবিষ্কার করিতেছেন তাহাতে মনে হয় অচিরে পৃথিবীতেই মানব অচিন্তনীয় সুখ লাভ করিবে। এযুগে এক নবতর ও উন্নততর ধর্ম্মের আবির্ভাব হইবে বলিয়া ও মানব আশা নেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

(১) বিদ্যুতঃ। জ্যোতিঃ। পরি। সংজিহানম্
মিত্রা বরুণা। যৎ। অপশ্যতাম্। ত্বা।
তৎ। তে। জন্ম। উত। একং। বসিষ্ঠ
অগস্ত্যঃ। যৎ। ত্বা। বিশঃ। আজভার॥ ৭। ৩৩। ১০

মিত্রবরুণ বিদ্যুতের জ্যোতি পরিত্যাগ করিয়া যখন তোমাকে (অর্থাৎ উর্ব্বশীকে) দেখিয়াছিলেন, হে বসিষ্ঠ। তখন তোমার এক জন্ম এবং যখন অগস্ত্য বিশ তোমাকে আহরণ করেন।

উত। অসি। মৈত্রা বরুণঃ। বসিষ্ঠ
উর্বশ্যাঃ। ব্রহ্মন্। মনসঃ। অধি। জাতঃ।
দ্রপ্সং। স্কন্নং। ব্রহ্মণা। দৈব্যেন
বিশ্বে। দেবাঃ। পুষ্করে। ত্বা। অদদন্ত। ৭। ৩৩। ১১

হে বসিষ্ঠ। তুমি মিত্রবরুণের পুত্র হও; হে ব্রহ্মন্। (তুমি) উর্ব্বশীর মন হইতে উৎপন্ন। দেব লোকের ব্রহ্ম দ্বারা চ্যুত বিন্দু (দ্রপ্স) তোমাকে বিশ্ব-দেবগণ পদ্মে ধারণ করিয়াছিলেন।

# কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর।

২

## সুন্দরের মৃগয়া গমন।

তার পর একুশ বৎসরের কথা। সুন্দর তখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত।

যশোমতি-মায়ের যে সুন্দর গোপাল।
রাজ্য মধ্যে সেই মত নবীন ভূপাল॥
কৃত্তিকার কোলে যথা কার্ত্তিক কুমার।
মায়ের দুর্লভ পুত্র মাণিকের হার॥
না পাইয়া পাইয়াছে নিধি অঞ্চলের ধন।
খঞ্জর লউরী যথা অন্ধের নয়ন॥
সুন্দরের রূপগুণে রাজ্য খানি ঘোরে।
প্রাণ দিয়ে প্রজাগণে ভালবাসে তারে॥
সর্ব্ব শাস্ত্র শিখি হইল পড়ুয়া পণ্ডিত।
কাব্য অলঙ্কার আদি শাস্ত্রেতে রসিক॥

যুবরাজ সুন্দর সমগ্র রাজ্যের প্রিয় দর্শন। রাজ্যের আবাল, বৃদ্ধ বনিতা তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে। স্কন্দ তুল্য তাঁহার অসামান্য রূপ। তিনি রাম তুল্য সত্য-সন্ধ ও প্রজা রক্ষক। সমগ্র রাজ্যবাসী প্রজা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তিনি শত্রুর কৃতান্ত, শরণাগতের রক্ষক, অনুগতের পালক। সঙ্গীত কাব্য অলঙ্কারাদি রসে রসিক, প্রিয়ংবদ অথচ রহস্য রসে বাগ্মায়।

চন্দ্র কিরণ যেমন কেবল মাত্র আকাশে সীমা বদ্ধ থাকে না, সেইরূপ যুবরাজের অসামান্য রূপগুণে কেবল রাজা ও রাণী নহেন পরন্তু তাঁহার যশ ও রূপের প্রভায় সমগ্র রাজ্য আলোকিত। তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইলে রাজ পথের শত শত গবাক্ষ হইতে চকিত দৃষ্টি তাঁহার সৌম্যোজ্জ্বল রথের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। রাজ্যবাসী আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সর্ব্বদা কুল দেবতার মন্দিরে যুবরাজের মঙ্গল কামনা করে।

এই রূপে দিন যায়। একদা প্রভাতে;—

"তখন বসন্ত কাল পিক কুহু গায়।
মধু লোভে ভ্রমরারা ফুলে ফুলে ধায়॥
কুঞ্জেতে কোকিলা গায় ডালে ফুটে ফুল।
মধুলোভে ফুলে ফুলে উড়ে অলিকুল॥
মল্লিকা মালতী ফুটে মালঞ্চ ভরিয়া।
যুবতীর পতি আসে প্রবাস ছাড়িয়া॥
মলয় বাতাসে কার চিত্ত উচাটন।
ধরায় আইল রতি সহিত মদন॥
দেখে শুনে কুমার না কি কাম করিল।
মৃগয়ায় যাবে বলি মনে স্থির কৈল॥
* * * * *
মৃগয়া করিতে রায় ভাবিয়া অন্তরে।
ধীরে ধীরে যান তবে মায়ের মন্দিরে॥
মাতা ভাবে ক্ষুধা পাইয়া পুত্র বুঝি আইল।
শীঘ্র আনি ক্ষীর ননী হস্তে তুলি দিল॥

যুবরাজ মায়ের কাছে তখন মনোবাসনা প্রকাশ করিলেন। তখন—

ছল ছল চক্ষু রাণী করিয়া শ্রবণ।
মৃগয়া যাইতে পুত্রে করিলা বারণ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক আছে কাননের মাঝে।
অল্পত বয়স পুত্র মৃগয়া না সাজে॥
ঘরের বাহির হইতে না দেই কখন।
কি মতে সহিবে পুত্র রবির কিরণ॥

যুবরাজ কিন্তু মৃগয়া যাইবেনই। রাণীর সকল আব্দার ভাসিয়া গেল। অবশেষে পুত্রের করুণ প্রার্থণা রাণী রাজাকেও শুনাইলেন।

তার পর একদিন বসন্তের শেষে চৈতালী বায়ুতে তুলা যখন অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত পানে উড়াইয়া নিতে ছিল, সেই দিন শুভক্ষণে যুবরাজ শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া—

তারকে মারিতে যেন চলিলা কুমার।
আগে পাছে চলে লোক করি মার মার॥

অতি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য পুর রক্ষার্থে রাখিয়া রাজা মান্যবান রাজপুত্র সহ রাজ্যের যত লোক লস্কর তীরন্দাজ গুলন্দাজ সবাইকে যাইতে আদেশ দিলেন। ছয় লক্ষ পদাতিক তিন লক্ষ অশ্বারোহী যুবরাজের সহচর রূপে চলিল। পথ পরিস্কারক তেরলক্ষ গাবর কুঠার হস্তে আগে আগে চলিল। আর চলিল হস্তী, অশ্ব, যান, বাহন, ঠাট কটকাদি সাগর তরঙ্গের মত—অগণিত—অসংখ্য।

রাণী সেই দিন ছয় সতীন আর যত সঙ্গিনী গণকে লইয়া মহাসমারোহে মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দিলেন। রাজপুত্রের মঙ্গলার্থে দেবমন্দিরে যাইয়া দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিলেন। তাহার করুণ অনুনয় অগণিত দেবতার প্রত্যেকের পদ প্রান্তে পৌঁছিল; বাকী রহিলেন কিন্তু কেবল সেই সত্যপীর।

যুবরাজ বনে পৌঁছিবা মাত্র—

ছল করি সত্যপীর কোপান্বিত হইয়া।
কাননেতে জীব জন্তু রাখে লুকাইয়া॥

বন ঘুরিয়া যুবরাজ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কি আশ্চর্য্য! সমস্ত বন ভূমি যেন সাড়াহীন। না পাইলাম একটী ব্যাঘ্র, না দেখিলাম একটী হরিণ। জীব জন্তু শূন্য একি কোন মায়া কানন? এই ভাবিয়া যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতে ছিলেন অকস্মাৎ বন ভূমি আলোকিত করিয়া—

সম্মুখেতে যুবরাজ দেখিলা চাহিয়া।
সোনার হরিণ এক যায় পলাইয়া॥
চলিছে সোনার মৃগ কানন উজলি।
যেমন মেঘের অঙ্গে সোনার বিজলী॥
পলাইতে চায় মৃগ পলাইতে না পারে।
লম্ফ দিয়া উঠে রায় ঘোটক উপরে॥
পক্ষী হেন বন মধ্যে মৃগ দিল উড়া।
হরিণ ধরিতে রায় ছুটাইল ঘোড়া॥

বন মধ্যে মৃগয়ার্থে আসিয়া রাজা, মাল্যবানের দশা যেরূপ হইয়াছিল সুন্দরের দশাও সেইরূপ হইল। বলা বাহুল্য ইহা সত্যপীরের সৃজিত মায়ার ফাঁদ। দেব মায়ায় জড়িত সুন্দর অত্যল্প কাল মধ্যেই সহচরগণকে হারাইয়া এক মহা বনে আসিয়া পড়িলেন। এদিকে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় চকিতে সেই মায়া মৃগ অন্তর্হিত হইয়া গেল। সঙ্গীহীন যুবরাজ বনমধ্যে রক্ষা শূন্য অবস্থায় পথ শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

বন মধ্যে মায়া মৃগ শূন্যে দিল উড়া।
এক মাত্র সঙ্গী তার পক্ষীরাজ ঘোড়া॥
কোথা গেল মায়া মৃগ লোক লস্কর।
একেলা পড়িয়া রায় হইলা কাপর॥

তখন ক্লান্তি অপনোদন মানসে সুন্দর তাহার একমাত্র সঙ্গী অশ্বটীকে এক বৃক্ষ শাখায় বন্ধন করিয়া তরুতলে উপবেসন করিলেন এবং তৃণ শয্যায় পড়িয়া অল্প কাল মধ্যেই সত্যপীরের মায়ার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন—

"বনবাসী সাত চোর চুরি করিবারে।
বন ছাড়ি চলিয়াছে রাজার নগরে॥
পথেতে পাইয়া অশ্ব ভাবে মনে মন।
ইহারে বেচিলে পাই বহু রত্ন ধন॥
এ অশ্ব সামান্য নহে রাজার দুলাল।
এহারে লইয়া যাব যা থাকে কপাল॥
ধীরে ধীরে সাত চোর খুলিল বন্ধন।
ঘোড়া লইয়া এড়াইল গহণ কানন॥
নিদ্রা ত্যজি দেখে রায় চৌদিকেতে চাই।
শিয়রে আছিল বান্ধা পক্ষিরাজ নাই॥
একমাত্র সঙ্গী ছিল তাও হারাইয়া।
বন মধ্যে ফিরে রায় ঘোড়ারে খুজিয়া॥

যুবরাজ উন্মত্তের মত বনে বনে অশ্বের অন্বেষণে ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা—হাতে লাঠী মাথায় পাকা চুলের ঝপটা—এক পীর-ফকিরের সঙ্গে দেখা হইল। যুবরাজ ফকিরের নিকট সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। ফকির তখন ——

"চারিকোণা ঘর আঁকি মাটীর উপরে।
খড়ি পাতি ফকির যে লাগে গুণিবারে॥
এক দুই ঘোড়া নিছে চোরে তে হরিয়া।
তিন চার চলি গেছে কানন ছাড়িয়া॥
চার পাঁচ চাম্পানামে আছয়ে নগর।
ইন্দ্র সেন নামে তথা বৈসে নরবর॥
ছয় সাত নরবর লক্ষ টাকা দিয়া।
সদাগর হৈতে ঘোড়া রাখিছে কিনিয়া॥
আট নয় শূন্য যদি না পড়িল শেষে।
পাইবেক ঘোড়া গোটা কহিনু বিশেষে॥

এই রূপে ফকির যুবরাজ কে ঘোড়ার সন্ধান বলিয়া দিল। তারপর যাইবার সময় ইহাও বলিল—

'বহু দূরদেশ বাছা যাইও সাবধানে।
ছিন্নি মানিও কিছু পীরের চরণে॥
আর এক কথা বলি রাখিও স্মরণ।
বিপদে সম্পদে মোরে করিও স্মরণ॥

যুবরাজ মনে মনে পীরের চরণে সিন্নি মানসিক করিয়া অশ্বের অনুসন্ধানে চাম্পা নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

## সুন্দরের চম্পক নগরে গমন ও বিদ্যা দর্শন।

এক মাসে যুবরাজ অমরাবতী তুল্য চাম্পা নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

'সে রাজ্যের কথা কভু না যায় বর্ণন।
সাবধান কহি শুন যত সভাজন॥
চন্দ্রের সমান পুরী ঝল মল করে।
এক লক্ষ কামেলাতে সদা কাম করে॥
মণি মাণিক্যেতে জোড়া ঝলসে নয়ন।
রাজার ঐশ্বর্য্য কথা বলিতে অক্ষম॥
দুয়ারে রূপার খিল সোনার কপাট।
বড় বড় দীঘী যত শানে বান্ধা ঘাট॥
তীরে শোভে ফুল বন ইন্দ্রের নন্দন।
মধু লোভে ফুলে ফুলে ভ্রমরা গুঞ্জন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হইল দুপ্রহর বেলা।
অশোকের তলে রায় শুইলা একলা॥

অনাহারে অর্দ্ধাহারে পূর্ণ এক মাস চলিয়াগিয়াছে। অনবরত ভ্রমণে ক্লান্ত দেহ যুবরাজ অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

"হেন কালে সঙ্গে লয়ে যত সহচরী।
আইল জলের ঘাটে রাজার কুমারী॥
গোপী গণ সঙ্গে রাই যমুনাকি তীরে।
স্নান হেতু আইসে কন্যা চাম্পা সরোবরে॥
মন্দাকিনী জলে যথা নামিল অপ্সরা।
চান্দের সহিত ভূয়ে খইসা পড়ে তারা॥
রাজা পায়ে বাজে রুণু নুপুর সোনার।
বুকের উপরে শোভে হীরা মন হার॥
আলুই কাহার চুল কার বান্ধাবেণী।
কেহ হাসে কেহ গায় যতেক রঙ্গিনী॥
গন্ধ তৈলে কেহ করে কেশর সাজন।
বেড়িয়া কমল মুখ ভৃঙ্গের গুঞ্জন॥
কাখের কলসী সবে রাখিয়া ভূতলে।
আকুলা ভ্রমরী প্রায় ফেরে ফুলে ফুলে॥

আজ নক্ষত্র সহ চন্দ্রমণ্ডল যেন চাম্পাতীরে খসিয়া পড়িয়াছে, সেই সকল রূপেশ্বরীগণের রূপের প্রভায় চাম্পাতীর আলোকিত। তাহাদের দেহের সুগন্ধে চাম্পা তীরস্থ বায়ু সুরভিত। তাহাদের প্রতি পদ সঞ্চালনে কানন পথ যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। নূপুর নিক্কন—গুন গুন সঙ্গীতে কোকিল পাপিয়া মূক হইয়া পড়িতেছে।

স্নানার্থিনী কুমারীগণ ক্ষণকালের জন্য উন্মনস্কা ভাবে উদ্যান ভ্রমণ করিতেছিলেন।—কেহ বা রহস্যচ্ছলে একটী মালতী ফুল তুলিয়া কোন সহচরীর খোপায় গুজিয়া দিতেছিল, কেহ বা একটী গন্ধরাজ ফুল ছিনাইয়া লইয়া কোন প্রিয় সহচরীর গায়ে ছুড়িয়া ফুলের অঙ্গে ফুলের আঘাত করিতেছিল। কেহ বা একটী ফুটন্ত মল্লিকার সঙ্গে রাজ কুমারীর রূপের তুলনা দিয়া হাসিয়া লুটিয়া পড়িতে ছিল। কেহবা কুসুম স্তবক শোভিত অশোক বৃক্ষের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহের সম্বন্ধ পাতিতে ছিল, কেহ বা পুষ্প মধু পান নিরত ভ্রমর সকলকে উড়াইয়া, কেহ বা কোকিলের কুহুধ্বনির অনুকরণ করিয়া মনের সাধ মিটাইতেছিল।

অকস্মাৎ গন্তব্য পথে বাধাপ্রাপ্ত রাজহংসী যেমন করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায় সহচরীগণ সঙ্গে রাজকন্যা তেমন ভাবে দাঁড়াইলেন; পাল ভরা তরীর বহর সহসা চড়ায় ঠেকিয়া যেন বদ্ধ হইয়া গেল।

দেখিলা রূপসীগণ অশোকের তলে।
শশী যেন খসি পড়ি লুটে ভূমি তলে॥
জল ছাড়ি ভূতলে ফুটয়ে অরবিন্দ।
তরু বর তলে যেন ঘুমাইছে চান্দ॥
সুন্দর কুমার এক ভূমিতে পড়িয়া।
ত্রেতায় শ্রীরাম যথা সীতা হারাইয়া॥

বিদেশী অপরিচিত যুবককে দেখিয়া——

'রাজ কন্যা গেলা এক গাছের আরালে।
তারারেণ্ রাখিয়া চাঁদ যেন অস্তাচলে॥
মন না যাইতে চায় না পালটে আঁখি।
এহিতনা ভিন্ন দেশী কুমারেরে দেখি॥
দেখিয়া সুন্দরে কন্যা ভাবে মনে মন।
কবিকঙ্ক কহে হৃদে বিন্ধিল মদন॥
* * * * * *
রাজার কুমার দেখে জাগিয়া স্বপন।
সম্মুখে তাহার এক অপ্সরা কানন॥
চারিদিকে নৃত্য করে অপ্সরা সকলে।
কেহ গায় গীত কেহ নাচে তালে তালে॥
জাগিয়া উঠিলা রায় নৃত্য গীত শুনি।
মনেতে বাজিয়া উঠে নুপুরের ধ্বনী॥

সুপ্তোত্থিত রাজ কুমার দেখিলেন সত্যই যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই সুর নর প্রমোদিতা দিব্যাঙ্গনাগণ। কেহ বালিকা, কেহ কিশোরী, কেহ কেহ ষোড়শী—সকলেই রূপসী রূপ আর অঙ্গে ধরে না। লাবণ্যরাশি অঙ্গ হইতে ঝড়িয়া পড়িতেছে। কোনও কিশোরীর অঙ্গে যেন প্রায়াগত যৌবন শ্রী উষার হাসির মত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কেহ ফুটন্ত, কেহবা ফুটিবে—এই আজি, কিম্বা কালি। বিকশিত উদ্যান মধ্যে বাল সূর্য্যের তরুণ রশ্মিমালা প্রকাশিত হইলে আধ ফুটন্ত মল্লিকা মালতী লজ্জশীলা অভিসারিকার ন্যায় যেমন পাতার আড়ালে থাকিয়া থাকিয়া সেই কিরণ সুধা পান করিতে থাকে, সেইরূপ এই সকল লজ্জাশীলা উদ্যান চারিণীগণও কেহ অশোক বৃক্ষের কাণ্ডে হেলিয়া, কেহ বা পুষ্প সমেতে একটী মাধবী লতাকে ললাটে রক্ষা করিয়া কেহবা আপন সোনালি আচল খানি চক্ষের উপর ধরিয়া কেহবা লতাকুঞ্জ হইতে পুষ্প তুলিবার ভান করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই ভিন্ন দেশী যুবকের পানে চাহিয়া দেখিতে ছিল। তখন—

চন্দ্রকলা নামে সখি আগু হইয়া কয়।
কোন রাজ্যে বাস তোমার কহ মহাশয়॥
কিবা নামটী মাতা পিতার কি নাম তোমার।
স্বরূপে হইবে কোন রাজার কুমার॥
কি কারণে রাজ্য ত্যজি হেথায় আইলা।
কোন দোষে বিধি তোমা এমন করিলা॥
এ পথে আসিতে আছে সকলের মানা।
যতেক রাজ্যের লোকের আছে সব জানা॥
রাজ কন্যা বিহার করেন এ কাননে।
কি হেতু আইলা তুমি এহি গুপ্ত স্থানে॥
ভিন্ন দেশী বলি দোষ না লব তোমার।
পরিচয় কথা কহ সুন্দর কুমার॥
চন্দ্রকলা মুখে শুনি এতেক বচন।
ধীরে ধীরে রাজপুত কহিলা তখন॥
অজানা অচেনা পথ নাহি জানি শুনি।
পন্থ মোরে বলে দাও ওগো সুবদনী॥
পরিচয় কহি মোর শুন মন দিয়া।
উদ্যানের ভৃত্য আমি জাতিতে মালীয়া॥
মাল্যবান মালী পিতা পূর্ব্ব দেশে ঘর।
বাপ মায় নাম মোর রাখিছে সুন্দর॥
চাকুরীর উদ্দেশে আমি আসি এহি দেশে।
পরিচয় কথা মোর কহিনু বিশেষে॥
মৃদু মৃদু হাসি তবে চন্দ্রকলা কয়।
গোবরে ফুটয়ে পদ্ম ভুমে চন্দ্রোদয়॥
সির্জ্জন করিয়া বিধি রূপে বনমালী।
জাতিতে করিলা তারে বাগানের মালি॥
কি কার্য্য করিবা তুমি বিদেশী কুমার।
মালীর অছয়ে কাজ রাজার কন্যার॥
দরমাহা কত চাও থাকিবা কি রূপে।
বলিলে মনের কথা জানাইব ভূপে॥
রাজপুত বলে আমি বেতন নাহি চাই।
বিনা মূল্যে কাজ করি পুষ্প মধু খাই॥
নরের অসাধ্য কাজ করি সুবদনী।
শুষ্ক তরু জিয়ে যদি আমি ঢালি পানি॥
আর এক গুণ মোর শুনলো সুন্দরী।
নিষ্ফল লতার ফুল ফুটাইতে পারি॥

মন্ত্র পড়ি আমি জল ঝাড়া দেই শেষে।
মনভৃঙ্গ উড়ে আসে থাকে যেই দেশে ॥
আরও এক গুণ মোর শুনলো রূপসী।
আমার হাতের মালা নাহি হয় বাসি ॥
মন্ত্র পড়ি মালা আমি দেই যার গলে।
জীবনে যৌবন তার কভু নাহি টলে ॥
কহিনু যতেক গুণ কিছু নহে আন।
পরীক্ষা করিয়া লও সত্য মিথ্যা জান ॥
চন্দ্রকলা কয় সব আছে মোর জানা।
যে চাঁদে থাকয়ে সুধা দেখে যায় চিনা ॥
আগুনে পুড়াইরে কেবা পরীক্ষে চন্দন।
দেখিয়াই চিনিয়াছি রসিক রতন ॥
রূপে রস বাক্যে রস মনে রস যার।
কবিকঙ্কে কহে রায় রসের আধার ॥
চন্দ্রকলা কহে তবে রসিক রতন।
একটী মালীর কাজ তোমার মতন ॥
রাজ কন্যার উদ্যানেতে আছে লক্ষ মালী।
সবার উপরে তুমি করিবে ঠাকুরালী ॥
রজনী বঞ্চিবে সুখে পোহাইলে রাতি।
তুলিয়া ভোরের ফুল মালা দিবে গাঁথি ॥
মালা যদি বাসি হয় যৌবন বা টলে।
কোটালে ডাকিয়া কিন্তু দিবে তোমা শালে ॥
রায় বলে পরে হবে যা থাকে কপাল।
মনেতে বিন্ধিয়া গেছে নয়নের শাল ॥
মনে মনে হাসি তবে চন্দ্রকলা কয়।
সন্ধ্যা হইয়া গেল প্রায় শুন মহাশয় ॥
আজি রাত্রি থাক গিয়া মালানী বাসরে।
মাসী মাসী বলি তুমি ডাকি উঠ ঘরে ॥
হের ওই দেখা যায় মালিনীর বাড়ী।
চারি দিকে ফুলবন মালঞ্চেতে বেড়ি ॥
লতায় পাতায় ফুল ফুলের আঙ্গিনা।
মধু লোভে ভৃঙ্গ তথা করে আনাগুনা ॥
চন্দ্রার কুঞ্জেতে যথা রহেন পীত বাস।
মালিনীর কুঞ্জে মধু রহে বার মাস ॥
আজি নিশা বঞ্চ গিয়া মালিনীর ঘরে।
প্রয়োজন হলে পরে ডাকিব তোমারে ॥
তখন উঠিয়া সুন্দর রায় ধীরে ধীরে যায়।
কুব্জার মন্দিরে যথা চলে শ্যাম রায় ॥
উলটী পালটী চায় রাজ কন্যা পানে।
চারি চক্ষু এক হইল পরাণে পরাণে ॥
নিশিথে রাখিয়া চাঁদ গেলা অস্তাচলে।
চন্দ্রাবলী কুঞ্জে শ্যাম যায় নিশাকালে ॥
কবি কঙ্ক কহে আজি সুন্দরেরে হেরি।
সিনান ভুলিয়া গেল যতেক সুন্দরী ॥
রাজ কন্যা হইলা নিজ মন্দিরে উদয়।
মনে মনে হইল পরাণ বিনিময় ॥
নয়নে নয়নে হইল আদান প্রদান।
অন্তরে বাজিল বিষ মদনের বান ॥
কায়া মাত্র লইয়া কন্যা পশিলা মন্দিরে।
ছায়া রূপে মন গেল মালানীর ঘরে ॥

( ক্রমশঃ )

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

---

# অপ্রকাশিত কবিতা।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯৯ সন। দিবা ১০ টা।
হস্তী আরোহণে—পিয়ারপুরের সড়ক—মৈষমারীর নিকট।

বল বল বল সখা শুনিযে এ কি,
তোমাতে আমাতে আছে প্রভেদ নাকি?
অনন্ত তোমার রাজ্য, অনন্ত তোমার কার্য্য,
কেবলি তোমারে দেখি যে দিকে ফিরাই আঁখি!
তুমি ছাড়া আমি নই, আমি ছাড়া তুমি কই?
তোমারি আমারি কার্য্য অবিভিন্ন মাখামাখি।
দিয়েছ ভুগিতে সুখ, কেন হইব বিমুখ?
করিব প্রাণে যা চাহে পাপ বা কি পুণ্য বা কি?
ধূলিতে মিশিব ধূলি, প'ড়ে র'বে কথা গুলি
তোমারে করিব সুখী আপনি হইলে সুখী।

৺গোবিন্দচন্দ্র দাস।

---

# সূর্য্যের উপগ্রহণ।

শিক্ষিত মহোদয়গণের অনেকেই অবশ্য অবগত আছেন যে মহাগ্রহ সূর্য্য সৌর জগতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত থাকিয়া মহাকর্ষণের বলে অন্যান্য গ্রহগণকে বৃত্তাকারে অথবা আরও সূক্ষ্মরূপে বলিতে গেলে বৃত্তাভাষ চক্রে আপনার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন। আমরা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চৌদ্দলক্ষগুণ বড় এবং পৃথিবী ৯২,৭৩০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কিন্তু কিরূপে এই দূরত্ব নির্ণিত হইল তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ মাত্রেই দেখিতে অতি মনোহর; কিন্তু বুধ ও শুক্র কর্ত্তৃক সূর্য্যের উপগ্রহণ দেখিতে আরও মনোহর। তাহা এরূপ মনোহর হইবার একটী কারণ এই যে সাধারণ গ্রহণের ন্যায় এইসকল উপগ্রহণ সচরাচর সঙ্ঘটিত হয় না। পৃথিবী ও শুক্রের গতির সমবায়ে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে এই উপগ্রহণগুলি পুনঃ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শুক্র কর্ত্তৃক সূর্য্যের উপগ্রহণ নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে সঙ্ঘটিত হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ ৮ বৎসর পরে, তৎপর ১২২ বৎসর পরে, পুনরায় ৮ বৎসর, তৎপর ১০৫ বৎসর, ইহার পর পুনরায় ৮ বৎসর, তৎপর ১২২ বৎসর, তার পর আবার ৮ বৎসর ইত্যাদি ক্রমানুসারে হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা যথাক্রমে ৮, ১২২, ৮, ১০৫, ৮, ১২২, ৮, ইত্যাদি বৎসর পর পর এই উপগ্রহণ হইয়া থাকে। আরও সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ৮ বৎসর পরে পরে একবার ১১৩ ১/২সহিত ৮ যোগ ও আর এক ৮ বৎসর পরে ১১৩১/২ হইতে ৮ বিয়োগ করিলে যে সময় পাওয়া যায় তত বৎসর অন্তর শুক্র কর্ত্তৃক সূর্য্যের উপগ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপগ্রহণের সময় শুক্রকে একটী কালদাগের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যায়।

এই উপগ্রহণ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বৈদেশীক জ্যোতির্ব্বিদেরা যে কত পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে থাকেন তাহা ভাবিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিয়া জগতের কল্যান সাধনার্থে এই জ্যোতির্ব্বিদমণ্ডলী কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন তাহাও আমাদের ভাবিবার বিষয়। যাহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহার অতি সামান্য অংশও ইঁহাদের দ্বারায় সম্পাদিত হইলে ইঁহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন। ২০০৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে এবং ২০১২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে যে দুইটী উপগ্রহণ হইবে বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের আয়োজন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার রাজন্যবর্গ এবং অন্যান্য স্বাধীন জাতি স্ব স্ব রাজকীয় ব্যয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জ্যোতির্ব্বিদের অভিযান প্রেরণ করিয়া এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়া থাকেন।

যে যে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের সাহায্যে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায় তন্মধ্যে শুক্র কর্ত্তৃক সূর্য্যের উপগ্রহণ একটী।

এই উপগ্রহণ সম্বন্ধে আর একটী আশ্চর্য্যজনক জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে ইহা হয় জুন না হয় ডিসেম্বর মাসে হইয়া থাকে।

সম্প্রতি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখ এই প্রকারের দুইটী উপগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। এই উভয় উপগ্রহণের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইউরোপ ও আমেরিকায় জ্যোতির্ব্বিদ মহলে হুলু স্থূলু পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহারা বিরাট ব্যাপার জুড়িয়া দিয়াছিলেন। পৃথিবীর যে যে স্থান হইতে এই উপগ্রহণ দৃষ্ট হইবার কথা ছিল, জ্যোতির্ব্বিদেরা পূর্ব্বেই তাহা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ফরাসী দেশ হইতে চীন, জাপান, কোচীন চীন, নিউক্যালিডোনিয়া, সেন্টপল দ্বীপ ও কেম্পবেল দ্বীপে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। আমাদের ইংলণ্ডেশ্বরী ও ভারতবর্ষ, মিশর, পারস্য, সিরিয়া, চীন, জাপান, উত্তমাশা অন্তরীপ ও অষ্ট্রেলিয়াতে পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসী জ্যোতির্ব্বিদেরা ও সাইবেরিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অংশে, চীন, নিউজিলণ্ড, চেথাম দ্বীপপুঞ্জ ও কারগুলেন দ্বীপপুঞ্জে এবং টাসমেনিয়াতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ইটালী কেবল মাত্র বাঙ্গলা দেশেই একদল পর্য্যবেক্ষক প্রেরণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণীর জ্যোতির্ব্বিদেরা পারস্য, মিশর, নিউজিলণ্ড ও অকলাণ্ড, কারগুলেন ও মারিসস্ দ্বীপপুঞ্জে অভিযান করিয়াছিলেন। রুশিয়া তাহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে ও সাইবেরিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অংশে পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দুইটী দিনে নিশ্চল এসিয়াবাসী ব্যতীত সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকার জ্যোতির্ব্বিদগণ অর্দ্ধগোলক ব্যাপিয়া নির্নিমেষ লোচনে দিবা ভাগেই রতিদেবীর (Venus)— কমলবদন নিরীক্ষণ করিবা রজন্য লালায়িত ছিলেন।

যে সকল স্থান হইতে এই উপগ্রহণ দুইটী দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর একটী মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ঐ স্থানগুলি তাঁহারা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। গ্রহণের সময় পৃথিবীর যে অর্দ্ধাংশে রাত্রি ছিল তাহাও ঐ মানচিত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ এই অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাদের সকলেই অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবিরাম বৃষ্টির জন্য কোন কোন দলের সূর্য্যমণ্ডল নিরীক্ষণ করাই অসাধ্য হইয়াছিল। আবার কোন কোন দল নানাপ্রকার পরিমাপ গ্রহণ করিয়া ও সূর্য্যমণ্ডলের বিভিন্ন ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়া আনন্দের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এই দুইটী উপগ্রহণের পূর্ব্বে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে এই প্রকারের আর একটী উপগ্রহণ হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ লিজেন্টিল (Le Gentile) ঐ উপগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী জাতিদ্বয় এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদি চলিতেছিল। সুতরাং উপগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি কিছুতেই উপকূলে অবতরণ করিতে সক্ষম হইলেন না। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন তারিখে আর একটী উপগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। দুরদৃষ্টক্রমে পূর্ব্বে একটী সুবিধা চলিয়া গিয়াছে। এ সুযোগটীও যদি চলিয়া যায় তবে তিনি ইহজীবনে আর এই প্রকারের উপগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া লিজেন্টিল বীরের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এই উপগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুতরাং আরও ৮ বৎসর তিনি পণ্ডিচেরীতে রহিয়া গেলেন। জুনমাসে পণ্ডিচেরীর জল বায়ুর অবস্থা বেশ ভালই থাকে। সুতরাং তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে এইবার নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। প্যারিস হইতে যাত্রা করিবার কালে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং একখানা জাহাজও তাহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি যথোপযুক্ত অর্থ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং পণ্ডিচেরীতে একটী মানমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাতে ভাল ভাল যন্ত্রাদির সংস্থাপন করিয়া ইহা সুসজ্জিত করিলেন। এই আট বৎসরে তিনি মাদ্রাজের ভাষা শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন।

ক্রমে ১৭৬৯ সাল আসিয়া দেখা দিল। মে মাস চলিয়া গেল। জুন মাসের প্রথমদিনে সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তৎপর উপগ্রহণের দিন। প্রাতঃকালে সূর্য্য দেখা গেল। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? দৈব প্রতিকূল! ক্রমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সূর্য্যমণ্ডল মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল। একটীবারের জন্যও ইহার জলদাবরণ সে দিন উন্মোচিত হইল না। মেঘের অন্তরালে থাকিয়াই শুক্রদেবী (Venus) সূর্য্যদেবের বক্ষ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেলেন। পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্ণর ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোক যাহারা মান মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের সকলকেই ভগ্ন হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরেই আকাশ পুনরায় পরিষ্কৃত হইল। মার্ত্তণ্ডদেব পুনরায় আপনার প্রচণ্ড কিরণ বিস্তার করিয়া সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। ইহার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের উপগ্রহণ। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া এতদিন অপেক্ষা করা মানুষের সাধ্যায়ত্ব নহে লিজেন্টিল ইহা বুঝিতেন। সুতরাং ঐ হতভাগ্য জ্যোতির্ব্বিদের ভগ্ন হৃদয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ব্যাতিত আর উপায় কি? *

বিভিন্নদেশীয় গভর্ণমেণ্ট কোন বিদ্যার উন্নতি কল্পে কিরূপ সাহায্য করেন, কত যত্ন ও চেষ্টা করেন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা কত সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী ইত্যাদি বিষয়ের আভাষ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যাইবে।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ত্রিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শুক্রকর্ত্তৃক সূর্য্যের যে যে উপগ্রহণ হইয়াছে ও ভবিষ্যতে হইবে পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল।

* এখানে লিজেন্টিলের দুরদৃষ্টের শেষ হয় নাই। যাওয়ার কালে দুইবারই পথিমধ্যে তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল। প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তিনি "দশচক্রে ভূত সাজিয়াছেন"। তখনকার দিনে টেলিগ্রাফের তার ছিল না। তখনও বাষ্পীয়পোত উদ্ভাবিত হয় নাই। এখনকার দিনের মত জাহাজের যাতায়াতও এত বেশী হইত না। দীর্ঘকাল তাহার কোন খোঁজ খবর না পাইয়া সকলেই মনে করিলেন যে তিনি আর ইহলোকে নাই; হয়ত অতল বারিধিবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার পদে অন্য লোক নিযুক্ত করা হইল। ইহাতেই তাহার দুর্দ্দশার শেষ হইল না। ফরাসীদেশের আইনমতে—যেহেতু তিনি মরিয়াছেন, একবার এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে—সুতরাং তিনি তাঁহার সম্পত্তি হইতেও বঞ্চিত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে লিজেন্টিলের প্রেতাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। অবশেষে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মর্ম্মান্তিক মানসিক যন্ত্রণা ও দুর্ভাগ্যের অবসান হইল। বর্ত্তমানে ফরাসীদেশে লিজেন্টিলের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

# শুক্র কর্ত্তৃক সূর্য্যের উপগ্রহণের তালিকা।

ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ ফ্লেমারিয়ন কর্ত্তৃক ( Camille Flammarion ) গণিত।

( সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত )

| | গ্রহণের তারিখ। | স্থিতি কাল। | | কালকাতা প্রান্তে ৬টা ১৬মিনিটের পর যত ঘণ্টা অতীত হইলে গ্রহণের অর্দ্ধ সময় গতহইবে। | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ঘণ্টা | মিনিট | ঘণ্টা | মিনিট | সেকেণ্ড |
| | ১৬৩১…৬ই ডিসেম্বর | ৩ | ১০ | ১৭ | ২৮ | ৪৯ |
| | ১৬৩৯…৪ঠা ডিসেম্বর | ৬ | ৩৪ | ৬ | ৯ | ১০ |
| | ১৭৬১…৫ই জুন | ৬ | ১৬ | ১৭ | ৪৪ | ৩৪ |
| ২৩৫ বৎসর | ১৭৬৯…৩রা জুন | ৪ | ০ | ১০ | ৭ | ৫৪ |
| | ১৮৭৪…৮ই ডিসেম্বর | ৪ | ১১ | ১৬ | ১৬ | ৩ |
| ২৩৫ বৎসর | ১৮৮২…৬ই ডিসেম্বর | ৫ | ৫৭ | ৪ | ২৫ | ৪৪ |
| | ২০০৪…৭ই জুন | ৫ | ৩০ | ২১ | ০ | ৪৪ |
| ২৩৫ বৎসর | ২০১২…৫ই জুন | ৬ | ৪২ | ১৩ | ২৭ | ০ |
| | ২১১৭…১০ই ডিসেম্বর | ৪ | ৪৬ | ১৫ | ৬ | ৩৭ |
| ২৩৫ বৎসর | ২১২৫…৮ই ডিসেম্বর | ৫ | ৩৭ | ৩ | ১৮ | ৪০ |
| | ২২৪৭… ১১ই জুন | ৪ | ১৬ | ০ | ৫০ | ২৩ |
| ২৩৫ বৎসর | ২২৫৫…৮ই জুন | ৭ | ১২ | ১৬ | ৫৩ | ৫৬ |
| | ২৩৬০…১২ই ডিসেম্বর | ৫ | ২৫ | ১৩ | ৫৯ | ৯ |
| ২৩৫ বৎসর | ২৩৬৮…১০ই ডিসেম্বর | ৪ | ৫৯ | ২ | ১০ | ২ |
| | ২৪৯০…১২ই জুন | ২ | ৪ | ৩ | ৫৪ | ৩৫ |
| ২৩৫ বৎসর | ২৪৯৮…৯ই জুন | ৭ | ৩৩ | ২০ | ২১ | ২ |
| | ২৬০৩…১৫ই ডিসেম্বর | ৫ | ৫৩ | ১২ | ৫৪ | ১৬ |
| ২৩৫ বৎসর | ২৬১১…১৩ই ডিসেম্বর | ৪ | ৩০ | ১ | ১১ | ১২ |
| | ২৭৩৩…১৫ই জুন | অল্পক্ষণ স্থায়ী | | ৭ | ২৩ | ৫৬ |
| ২৩৫ বৎসর | ২৭৪১…১২ই জুন | ৭ | ৪৬ | ২৩ | ৪৩ | ৫৯ |
| | ২৮৪৬…১৬ই ডিসেম্বর | ৬ | ১৪ | ১১ | ৫৩ | ১৫ |
| ২৩৫ বৎসর | ২৮৫৪…১৪ই ডিসেম্বর | ৩ | ৪৮ | ০ | ১৩ | ২৯ |
| | ২৯৭৬…১৭ই জুন | অত্যল্পক্ষণ স্থায়ী | | ১৯ | ২৩ | ৩০ |
| | ২৯৮৪…১৪ই জুন | ৭ | ৫২ | ৩ | ২ | ২২ |

এই তালিকাটী পরীক্ষা করিয়া সুদূর ভবিষ্যতেও যে এই উপগ্রহণগুলি জুন ও ডিসেম্বর মাসেই সঙ্ঘটিত হইবে, এরূপ মনে হয় না। কেননা ঐ তারিখগুলি উত্তরোত্তর পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# নারী সমস্যা।

নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার সর্ব্বত্র কলঙ্ক কালিমায় পরিপূর্ণ। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে এমাজন নামে এক শ্রেণীর রমণী ছিল, যাদের কাছে পুরুষ শারীরিক বলে পরাস্ত মানিত এবং যাদের শাসন তারা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিত, কিন্তু কিম্বদন্তী ছাড়া ইতিহাস তাদের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পায় নাই। সর্ব্বত্রই, কি মানব সমাজে কি নিম্নের প্রাণী জগতে, পুরুষের তুলনায় স্ত্রী দুর্ব্বলদেহ। শুধু এই পাশবিক বলের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষ রমণীকে পূর্ব্বাপর স্বীয় ক্রীড়ার সামগ্রী স্বরূপ মনে করিয়াছে। মানব সমাজ এবিষয়ে অনেকাংশেই নিকৃষ্টতর প্রাণী সমাজের অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে।

সমাজের প্রথম অবস্থায়, গো এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু পক্ষীর ন্যায়, রমণী পুরুষের ধনবিশেষ বিবেচিত হইত প্রায় সমস্ত অসভ্য সমাজে এখনও রমণী তদ্রূপই বিবেচিত হইতেছে; পুরুষ তার জীবন মরণের বিধাতা, একে অন্যকে দান করিতেছে, ক্রয় বিক্রয় করিতেছে এবং অম্লান বদনে তার প্রাণ সংহার করিতেছে।

কেবল যে ভোগ সামগ্রী অথবা বংশ রক্ষার জন্য রমণী পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত, এমত নয়। সংসারের কার্য্য পরিচালনের জন্যও,—যথা আহার্য্য প্রস্তুত, গৃহ পালিত পশু পক্ষীর তত্ত্বাবধান ইত্যাদিতে রমণীর সাহচর্য্য বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। এইজন্য পুরুষ যতটী পারিত রমণীকে স্ত্রী স্বরূপ গ্রহণ করিত। এখনও এই বহু দার প্রথা অনেক সমাজে প্রচলিত কিন্তু যতই জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে, পবিত্র প্রেমের ভাব, দাম্পত্য জীবনের মোহন ছবি, মানব জীবনে ফুটিয়া উঠিতেছে ও তার প্রতি প্রাণ আকৃষ্ট হইতেছে, ততই এ কুপ্রথা অপসারিত হইতেছে।

ধর্ম্ম অনেক সময়ই প্রাচীন আচার ব্যবহারকে সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করিয়া তোলে এবং সমাজে নূতন ভাব দিয়া যায় কিন্তু যে ধর্ম্ম যে সমাজ হতে উদ্ভূত, তার কুরীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করা, তার পক্ষে সুকঠিন। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে রোমেরা নামক এক প্রকার মৎস্য সমুদ্রগামী জাহাজের গতি অকস্মাৎ বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। ধর্ম্ম অনেক সময়ই মানবের উন্নতির পথে এই প্রকার প্রতি বন্ধক স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া আছে। মহম্মদ যখন আরব দেশে আবির্ভূত হন, তখন তথায় বহুদার প্রথা অপ্রতিহতভাবে প্রচলিত ছিল এবং রমণী যে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এ-মত বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইত। তাই কোরাণের উপদেশ মত, রমণী পুরুষের তুলনায় অপকৃষ্ট, এভাব ও একাধিক দার গ্রহণের প্রথা, মুসলমান সমাজে পূর্ব্বাপর বিধিবদ্ধ হইয়া আছে। তবে তাঁহার মতে চারিটীর অধিক স্ত্রী গ্রহণের নিয়ম নাই। যে অসংযত বহুবিবাহ প্রথা সে সমাজে প্রচলিত ছিল, তার তুলনায় ঈদৃশ প্রতিরোধ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। তথাপি বলিতে হইবে, বহুদার প্রথার দাবী স্বীকার করিয়া, মুসলমান সমাজ উন্নতির হিসাবে অন্যান্য সমাজ হইতে নীচে পড়িয়া আছে।

কিন্তু, এক বিষয়ে ইসলামের রীতিনীতি রমণী সম্বন্ধে উদার ও তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে পুত্র বা অন্য আত্মীয়ের মুখের দিকে, গ্রাসাচ্ছদনের জন্য চাহিয়া থাকিতে হয় না। পিতা, স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্রের ধনে অংশানুরূপে তার স্বত্ব জন্মিয়া থাকে এবং যাকে ইচ্ছা দান বা বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। মোটের উপর, সে ও যে মানুষ, তার ও যে পৃথক অধিকার এবং সমাজে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তা বুঝিবার যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে। ইসলামের ন্যায়, সাম্যের ভাব কোনও ধর্ম্মই গ্রহণ করে নাই। তাদের প্রত্যেক অঙ্গের প্রাত্যহিক আচার ব্যবহারে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণই এভাব প্রকটিত হইতেছে। রমণী সম্বন্ধে মহম্মদ যদিও প্রচলিত বহুদার প্রথাকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া যান নাই, তথাপি তাকে কতক সংযত করিয়া ও রমণীকে অন্যান্য অধিকার প্রদান করিয়া, তার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন। মুসলমানগণ, তাঁর অন্তর্দ্ধানের পর, সে পথ প্রসার করিবার আর চেষ্টা করেন নাই, কোরাণের অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই। তাই সময়ের সাথে চলিতে না পারিয়া, মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আচার পদ্ধতির নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়া, তাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর বন্দী স্বরূপে

সমাজ বাস করিতেছে ও ক্রমে ক্রমে অন্যান্য উন্নতিশীল জাতীর সঙ্গে জীবন যুদ্ধে হটিয়া গিয়াছে।

এই গেল, মুসলমান সমাজের কথা। চীন দেশে রমণীর অবস্থা আরও শোচনীয়, সেখানে রমণী সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন। কোনও চীনবাসীর বংশে যদি কেবল কন্যাই জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তাকে সন্তানশূন্য বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ন্যায়, কন্যারূপে পিতা মাতার, স্ত্রীস্বরূপে স্বামীর এবং বিধবারূপে পুত্রের অধীন হইয়া চীন রমণীকে চলিতে হয়। বিবাহ ব্যাপারে কন্যার কোনও মতামত গৃহীত হয় না। চীন রমণী উত্তরাধিকারী সূত্রে কোনও সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না এবং প্রত্যেকেরই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। জাপানেও রমণীদের অবস্থা অনেকটা চীন দেশের মত ছিল কিন্তু সে দেশের উপর দিয়া নাকি পশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণপ্রদ প্রবল হাওয়া বহিয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যেই রমণীর অবস্থার অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে, বিবাহে তাদের মত গৃহীত হইতেছে এবং যেমন দেখা যায়, জাপান ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণেই রীতিনীতির সংস্কার করিবে।

এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীস দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়। সেখানেও রমণী সর্ব্ববিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচিত হইত। সকল অবস্থাতেই, রমণী স্বামীর এবং তদভাবে পুত্রের শাসন মানিয়া চলিত। পারিবারিক কাজ কর্ম্মেই তাহাকে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে হইত। স্ত্রী গৃহে আবদ্ধ অবস্থায় থাকিত এবং স্বামী, ও তার আজ্ঞানুসারে শুধু বন্ধুবান্ধদের সাথে বাক্য বিনিময় করিতে পারিত। কিন্তু স্বামীর ব্যবহার ও আচরণের বিরুদ্ধে তার বলিবার কোন ক্ষমতাই ছিলনা। স্বামী অন্য রমণীর সঙ্গে যদৃচ্ছা মিলিত হইতে পারিত এবং তজ্জন্য তাকে সমাজে কোনও প্রকারে নিন্দাভাজন হইতে হইত না। স্পার্টাতে লাইকারগাস (Lycurgus) ও পরবর্ত্তীকালে এথেন্সে সলন (Solon) যে নিয়মাদি প্রচলন করিয়া যান, তাহা স্বদেশহিতৈষণারূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশের যাতে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সৈনিক বৃত্তি গ্রহণের ন্যায় বিবাহে আবদ্ধ হওয়া সকলের পক্ষেই বাধ্যকর ছিল। যুবকগণ যাতে বিবাহে আকৃষ্ট হয়, এইজন্য তাহাদিগকে উলঙ্গিনী যুবতী রমণীগণের ব্যায়াম চর্চ্চায় সাহায্য করার জন্য উদ্বোধিত করা হইত। বৃদ্ধ স্বামীর পক্ষে সন্তানোৎপাদনের জন্য যুবতী ভার্য্যাকে সুশ্রী যুবকের হস্তে সময় বিশেষে দান করা মহা গৌরবের বিষয় ছিল। বিবাহ ব্যাপারে রমণীর কোনও প্রকার স্বাধীনতাই ছিলনা। পিতা, তাহার অভাবে ভ্রাতা এবং তদভাবে পিতামহ তাহার বিবাহ দিত। গোধন বা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায়, মৃত্যুকালে লোকে স্ত্রী ও কন্যাকে দান করিয়া যাইত। এভাবে ডেমসথেনিস (Demosthenes) তার সম্পত্তি ও স্ত্রী এবং কন্যাদ্বয়কে ভ্রাতুষ্পুত্র এফোবাস (Aphobus) এবং ডেমফনটেসকে (Demophoutes) দান করিয়া গিয়াছিলেন; প্যাসিয়ন (Pasion) মৃত্যুকালে তাহার স্ত্রী (Phormion) ফর্মিয়ন্‌কে দান করিয়া যান। ক্রমে রমণীদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হয়; অবশেষে এমনও সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন রমণীগণকে ও স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা ও অর্থসংরক্ষণে অধিকার দান করা হয়। প্রাচীন গ্রীসে রমণীদের দুরবস্থার পরিসীমা ছিলনা কিন্তু লাইকারগাস ও সলন যে উদ্দেশ্যে প্রাণোদিত হইয়া বিবাহ বিধি সমূহ সঙ্কলন করিয়া গিয়েছিলেন, তা যে সুসংসাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। গ্রীসের সাধারণ তন্ত্রান্তর্গত দেশ সমূহ এত লোকে পরিপূর্ণ ছিল যে স্থান সঙ্কুলন হইয়া উঠিত না। এটিকায় এক এক বর্গ মাইলে চারিহাজার একশত ছয়ষট্টী জন লোক বাস করিত অর্থাৎ লোকসংখ্যা বর্ত্তমান ফরাসী দেশের অনুপাতে তিনগুণ বেশী ছিল।

রোমান সভ্যতার ইতিহাসও এ বিষয়ে কদাকার। সে দেশে দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, অনেক সময় তারও পূর্ব্বে, বালিকাদের বিবাহ সম্পন্ন হইত। যদি বিংশ বৎসরের পরেও কোনও রমণী অবিবাহিত দৃষ্ট হইত তাহা হইলে সম্রাট আগষ্টাসের প্রচলিত আইন অনুসারে তাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। তথাপি বলিতে হইবে, গ্রীসে রমণী চালচলনে যে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই, রোমে তারা তার কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোমীয় রমণী প্রকাশ্য রাজপথে বিচরণ করিত, পুরুষের সঙ্গে নাট্যশালায়

গমন করিত এবং সাধারণের ভোজ ব্যাপারে যোগদান করিত। কিন্তু তাহাদিগকে গৃহের অনেক কাজই করিতে হইত। সম্রাট আগষ্টাসের কন্যাও দৌহিত্রীগণকে নিজ হস্তে সূতা ও পরিধান বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইত এবং তিনি তার স্ত্রী ও ভগ্নীর হস্তে রচিত পরিচ্ছদ ব্যতীত অন্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না।

রোমেও জনবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিবাহবিধি সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কন্যা বাল্যে সম্পূর্ণ পিতার অধীনে থাকিত। ইচ্ছা করিলে সে যার তার কাছে তাকে বিক্রয় করিতে পারিত। যদি জামাতা তিন বৎসরের অধিক কাল নিরুদ্দেশ থাকিত তাহা হইলে পিতা কন্যাকে অন্যত্র বিবাহ দিতে পারিত। কালে পিতার এ সকল ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া স্বামীতে পর্য্যাপ্ত হয়। তখন হইতে স্ত্রীর বিবাহের যৌতুকে সে সম্পূর্ণরূপে স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা করিলে গ্রীস দেশের ন্যায় স্ত্রীকে সে যার তার কাছে সময় সময় দান করিতে পারিত। এমন ভাবে হর্টেনসিয়াস (Hortensius) সুপ্রসিদ্ধ কেটোর Cato নিকট তার বিবাহিতা পুত্রবতী কন্যা পোর্সিয়াকে সুসন্তান উৎপাদনের জন্য কিয়ৎকালের জন্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া কেটোর স্ত্রী মার্সিয়াকে সে উদ্দেশে গ্রহ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মার্সিয়ার মতামত জানা কেহ প্রয়োজনীয় মনে করে নাই। হর্টেনসিয়াসের মৃত্যুর পর সে তাহা হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত ধন রত্ন লইয়া পূর্ব্ব স্বামীর ঘরে ফিরিয়া গিয়াছিল। হায়! সভ্যতাভিমানী মনুষ্য সমাজ!

কালে রোমীয় সমাজে রমণীর দাসীবৃত্তি অনেকটা ঘুচাইয়া আসে। পণপ্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে ক্রমে বিবাহ বন্ধন ছেদন বিধিও (Divorce) প্রবর্ত্তিত হয়। তখন হইতে লোকে অনেকটা স্বেচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে মিলিত হইত এবং ঘটনাধীনে সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিত। কি রোমে কি গ্রীসে বিবাহ কোনও অবস্থায় ধর্ম্মবিধি বলিয়া বিবেচিত হইত না। মুসলমান সমাজেও অনেকটা তদ্রূপ।

প্রথম দৃষ্টিতে কৌমারপ্রথাসবলিত খৃষ্টধর্ম্ম রমণীর অধিকার সম্প্রসারণে বহুদোপকার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কার্য্যত এই ধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে, ইয়ুরোপে রোমীয় সভ্যতার শেষভাগে রমণীগণের অধিকারের যে প্রসার পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সঙ্কুচিত হইয়াছে। এ ধর্ম্মমতে, এ সংসারের সুখদুঃখের কোনও মূল্যই নাই, স্ত্রী পুরুষের কোনও প্রকার সম্মিলনই মহাপাপ বিশেষ এবং রমণী অপবিত্র জীব, প্রেত সদৃশ। সম্রাট কনষ্টেণ্টাইনের সময় রমণী পরপুরুষে আসক্ত হইলে তার প্রাণদণ্ডের ব্যাবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। মোটের উপর খৃষ্টধর্ম্মের ফলে, রমণী পুরুষের সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হইয়া উঠিয়াছে। সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বক্ষণ নয়ন স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ রাখিলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তার দৃষ্টান্ত খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব!

ভারতবর্ষে বিবাহবিধি ধর্ম্মের একাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। পূর্ব্বপুরুষকে পিণ্ড দান করিবার জন্য পুত্রের প্রয়োজন এবং তাহাকে লাভের জন্য ভার্য্যার প্রয়োজন। মনুর বিধিমতে রমণী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার কোনও অবস্থাতেই তার ক্ষমতা নাই। স্বামী কি সন্তান, পিতা কি ভ্রাতা, কাহারও কোনও সম্পত্তিতে নিব্যূঢ়সত্বে অধিকারিণী হইবার তার অধিকার নাই। একমাত্র স্ত্রীধনস্বরূপে অল্প যৎসামান্য অর্থ লাভ করার তার ক্ষমতা রহিয়াছে। স্বামী মনোনয়নেও কোন অধিকার নাই। পিতা বা তদভাবে অন্য আত্মীয় তাকে যাহার হাতে সমর্পণ করিবে, তাকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে সে বাধ্য। দশম বৎসরের পূর্ব্বেই তার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া প্রশস্ত ব্যবস্থা। এদিকে স্বামী যতটী ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, এবং অন্য রমণীর সহিত বিনা বাধায় মিলিত হইতে পারে। স্বামীকে যদৃচ্ছা বিবাহ করিবার ক্ষমতা দান করিয়া, বিধবাকে বিবাহ বন্ধনে পুন আবদ্ধ হইতে না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে রমণীর শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না করিয়া এবং আজীবন তাহাকে গৃহাবদ্ধ রাখিবার বিধি প্রচলিত করিয়া সমাজ এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। জগতে এরূপ কুত্রাপি চিরবৈধব্য প্রথা বর্ত্তমান নাই। রমণীর উপর পুরুষের এমন প্রভুত্ব এবং অত্যাচারও কোথায় নাই।

এরূপ পাশবিক বলের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। সমাজ সমূহ রাজকীয়-বিধির নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতেছে। সর্ব্বত্রই

জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রমণীরও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সমস্ত সভ্য সমাজেই রমণী যে পৃথক জীব, পুরুষ ব্যতীত ও যে তার পৃথক সত্ত্বা আছে এ সত্য গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণ ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় রমণী পুরুষের ন্যায় স্বাধীন; সে সম্পত্তি লাভ করিবার ও দান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড রক্ষণশীল দেশ, সেখানেও রমণী পার্লিমেণ্টে ভোট দেওয়ার। ও তাহার সভ্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে সে দিন বেশী দূর নয়, যে দিন রমণী ও পুরুষ একত্র হইয়া এক যোগে রাজ্যশাসন যন্ত্র পরিচালন করিবে। সে সব দেশে জীবিত জাতি সমূহের বাস, যাদের বিজয় গৌরবের কাহিনীতে আজ জগৎ মুখরিত। সে সকল দেশে পুরুষের ন্যায় রমণীও সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। পুরুষের ভাবে পুরুষ, রমণীর ভাবে রমণীকে মানুষ হইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে; দেখা যাইতেছে রমণী পুরু অপেক্ষা জ্ঞানে বা বিদ্যায় কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নয়। যাদের ভিতর হইতে জর্জ্জ ইলিয়াট, ম্যাডাম কুরি, অ্যানি বেসণ্টের ন্যায় বিদুষীর আবির্ভাব তারা পুরুষ অপেক্ষা কিসে নিকৃষ্ট?

ইয়ুরোপে এক্ষণে বিবাহ বন্ধন ছেদন Divorce প্রথ অপ্রতিহত ভাবে প্রসারিত হইতেছে। আমাদের চক্ষে অর্থাৎ যারা রমণীরও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া একটা কিছু আছে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, এ প্রথা নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যারা ন্যায়ের কজ্জল চক্ষে পরিয়া দৃষ্টি করিবে তাদের কাছে ইহার ভিতর দোষণীয় এমন কিছু আছে মনে হইবে না। পুরুষ ও রমণী উভয়ে স্বেচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে মিলিত হইবে এবং যেখানে একের অন্যের সহিত বাস অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে এবং উভয়েরই সে ব্যাপারে সমান ক্ষমতা থাকিবে ইহাতে দোষের কি রহিয়াছে? এ সব সময় স্বামীকে অন্য স্ত্রী গ্রহণে কেহ আপত্তি করিবে না কিন্তু স্ত্রী যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাকে সমাজ দেশান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিবে, এই ব্যবস্থা কোন্ ন্যায় ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত? যাই হোক, যতই শিক্ষা- বিস্তৃতির সঙ্গে জ্ঞানালোকে রমণীর হৃদয় প্রদীপ্ত হইবে, তার হৃদয় নিহিত মনুষ্যত্বের এবং নিজ শক্তি ও অস্তিত্বে সে বিশ্বাসবতী হইবে ততই সে তার পৃথক অধিকার দাবী করিবে এবং ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হোক এই বিবাহ বন্ধন ছেদন প্রথা Divorce বা এবম্বিধ কোনও প্রথা সমাজে প্রচলিত হইবেই।

এই যে ইয়ুরোপে ভয়াবহ যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাতে সমাজে শাসনে রমণীর সাহচর্য্য পুরুষের পক্ষে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হইতেছে। পুরুষ সকল যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া গিয়াছে এবং রমণী তাদের স্থান অধিকার করিয়া শাসন যন্ত্র পরিচালনে সাহায্য করিতেছে। বস্তুত সে সকল দেশের রমণীও যদি পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষিত ও স্বাবলম্বন ভাবাপন্ন না হইত তাহা হইলে এ যুদ্ধ পরিচালন অসম্ভব হইত। যখন সে সব দেশের রমণীদিগের দিক্ হইতে নিজ দেশের দিকে মুখ ফিরাই, তখন দেখিতে পাই এক নিবিড় তিমিরে সমস্ত দেশ ঢাকা, এক অনবচ্ছিন্ন মূর্খতার ভিতর আমাদের রমণী সমাজ নিমজ্জিত। রমণী মূর্ত্তিতে কি শক্তি সমূহেরই না আমরা অপচয় করিতেছি!

মানব সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দৃষ্ট হইবে যে সময় বিশেষে এক একটা প্রশ্ন সমাধানের জন্য বিষম গুরুভাবে ইহার নিকট উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান জাতি, যুক্তি ও বিচার দ্বারা, ইহার যথাযথ সমাধান করিবার চেষ্টা করে এবং তার কল্যাণে নূতন ভাব সঞ্জীবনীতে পুষ্ট হইয়া উন্নতির পথে, জীবনের পথে, অগ্রসর হয়। যারা দৃষ্টির প্রসারতার অভাব বশত তেমন ভাবাপন্ন নয়, যুক্তি অপেক্ষা পাশবিক বলকেই নীতি শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট নিয়ম মনে করে এবং শুধু তার সাহায্যেই সমাজ শাসনে অভিলাষী, তারা এ সকল সমস্যা সমূহকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়, নেহাৎ ঠেকা পক্ষে পাশ কাটিয়া সময় কর্ত্তন করিয়া যায় কিন্তু তাদেরও সন্ধ্যায়, দিবসের কাজের হিসাব দিতে হয় এবং হিসাব দিতে যাইয়া সময় বিশেষে জগতের পৃষ্ঠা হইতেই চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইতে হয়।

সত্যের একটি ধর্ম্ম, যে তাহা মুক্ত আলোতে আসিয়া আপনা হইতেই প্রকটিত হইতে চায়, চিরকালের জন্য তাহাকে চাপিয়া রাখা যায় না। যতই কেন পুরুষ চেষ্টা না করুক রমণী একদিন তার ন্যায্য অধিকার পাইবেই।

তাহার জীবন সমস্যা সাধনে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবে। পুরুষের অত্যাচারে তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। কি বিবাহ, কি সম্পত্তি অর্জ্জন কি শিক্ষা কি আচার ব্যবহার, সামাজিক সকল ব্যাপারে তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার পুরুষের আয়ত কোনও অধিকার নাই।

ইতিমধ্যেই নারী সমস্যা ইয়ুরোপ ও আমেরিকার একটী বিষম সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। সেখানে ইহাদের সমাধানের চেষ্টাও হইতেছে এবং হইবেও। আমাদের দেশে অবশ্য তেমন উৎকটভাবে ইহা দেখা দেয় নাই, তার কারণ আমাদের রমণীগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত কিন্তু এ সমস্যা যত শীঘ্র পূর্ণ হয়, ততই মঙ্গল। তাহা না হইলে অতীতে যেমন, এখনও যেমন, ভবিষ্যতে তেমন, রমণীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পুরুষও রসাতলে গিয়াছে, যাইতেছে এবং যাইবে।

নীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

——:•:——

## জীবন জ্বালায়।

রজনী গো সজনি আমার,
এ জীবনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাহি আর!
নিয়তি গড়িতে নারে,
কেবলি ভাঙিতে পারে,
ভেঙে শুধু করে চুরমার!
ভাঙে হৃদি ভাঙে বুক,
বুঝিয়া বোঝেনা দুখ,
প্রাণ নিয়ে খেলে অনিবার!
তাই আজি মর্ম্ম-দুখে সই,
আঁখি-জলে মর্ম্ম-কথা কই,
কান পেতে শোন একবার—
মানব-জীবনে বিন্দু শ্রদ্ধা নাহি আর!

নিশায় নির্জ্জনে দীর্ঘ দীঘিকার তীরে,
ধীরে ধীরে বহে আজি উদাস পবন;
কে যেন কহিছে দুঃখে ভাসি' আঁখি-নীরে—
প্রেম মিছা রূপ মিছা মিছা এ জীবন!
মিছা এই হাসি খেলা,
মিছা প্রিয়-অবহেলা,
মিছা যত প্রণয়ে রোদন!
ভালবাসা মিথ্যা কথা,
মিথ্যা প্রেম আকুলতা,
জগতের যাহা কিছু অলীক স্বপন!
জীবনই মরণ ওরে মরণই জীবন!

এ সংসার আগা গোড়া ভুল,
এ ভুলের কোথা সমতুল!
আমরা জীবন দিয়ে করি সংশোধন!
দিবা নাই রাত্রি নাই,
খেটে মরি সর্ব্বদাই,
সে শুধু করিতে এক সমস্যা পূরণ!
লক্ষ লক্ষ যুগ চলি যায়,
সে সমস্যা মহা সমস্যায়;
বৃথা কারে করি অন্বেষণ!
যেথায় যেমন ছিল আজিও তেমন!

কাজ নাই শোকাচ্ছন্ন জীবনে আমার!
কাজ নাই মিছা মমতায়!
যে আমি যেমন আছি মেদিনী মাঝার,
সেই আমি থাকিব কি, হায়!
স্রোতের প্রসূন সম,
জীবন যৌবন মম,
ভাসিয়া যেতেছে বৃথা এই মনে হয়!
ভগবন্, এই নিবেদন :—
হানা হানি কাড়া কাড়ি করি,
আর যেন বৃথা নাহি মরি,
ছড়ায়ে বিলায়ে যেন দেই সমুদয়!
তাতে কি হবেনা দেব, যাতনা বিলয়!

দিব রূপ দিব প্রাণ,
ডুবাইব যশ-মান,

স্বার্থ দিব পুরুষার্থের পায় ;
তারেও পাব না কিগো আমার আমার !
কে আপন কেবা পর ভাবিব না আর,
বিশ্বে সবে আমার আপন ;
ভুলিয়া ছিলাম বলে ঝরে আঁখি ধার,
তাই আজি এত জ্বালাতন !
আর তো কাঁদিতে আমি,
পারিনা দিবস যামি,
কবে লো জীবন লক্ষ্মী জাগিবি আমার !
তোর বাণী মর্ম্মে মানি' ভুলিব সংসার !
চাহি প্রাণে সুখ শান্তি ভবে,
দলিব গো শোক দুঃখ তবে,
রাগ যাবে অনুরাগে মিশি !

আমারে জগৎ মাঝে,
লাগাব দশের কাজে,
গান গেয়ে যাব দশ দিশি !
মুছাইব মেদিনীর
দুখিনীর আঁখি নীর,
ক্ষুধিতেরে অন্ন দিব দান !
পতিতেরে উদ্ধারিতে সঁপিব পরাণ !
তাতে যদি মৃত্যু দুর্নিবার,
দেখা দেয় সম্মুখে আমার,
নাহি বিন্দু ভয় ;
যাহা সত্য যাহা শুভ্র ভবে,
কে শুনেছে মরেছে তা কবে !
কোথা অপচয় !

যেথায় মরণ আসে সেথায় জীবন,
মরণ মরণ নহে, জীবনেরি পিতা ;
পুরাতনে প্রাণ পায় সজীব নূতন,
আঁধারেরি বুক চিরি' ওঠে যে সবিতা !
ওঠ্ তবে জেগে ওঠ্ জীবনে আমার,
রে উজ্জ্বল পবিত্র মহান্ !
রে আনন্দ, দিবে যায় সব হাহাকার,
এ জীবনে হ-রে মূর্ত্তিমান !

নিখিলের যত রস নিঃশেষে চুষিয়া নিয়া
তুই চির সঞ্জীবিত হোস্ !
সত্য শিব মঙ্গলেতে আত্ম সমর্পিত !
এই শোকে একবার বল্ এসে বজ্ররবে—
তুই ভীরু কাপুরুষ নোস্ !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

## স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস।

বঙ্গ সাহিত্যে একটী কলকণ্ঠ কোকিলের ধ্বনি নীরব হইয়াছে। স্বভাব কবি গোবিন্দদাস এজগত হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভাওয়ালের বন্য কুসুম নিভৃতে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়া পড়িল। দাস কবি হৃদয়ের রক্ত ধারায় বঙ্গ সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গ সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর সহজে পূর্ণ হইবে না।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণায় জয়দেবপুরে ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে গোবিন্দচন্দ্র পিতৃহীন হইয়াছিলেন। সে সময় সংসারে তাঁহার অতি বৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহী এবং মাতা বর্ত্তমান। কবির কনিষ্ঠ সহোদর ৺জগচ্চন্দ্র দাস তখন সূতিকাগারে। পিতৃবিয়োগের পর এই পরিবার নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। সেই সময় তদনীন্তন ভাওয়াল-রাজ পুণ্যশ্লোক কালীনারায়ণ রায় কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়া এই দরিদ্র পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাজা কালীনারায়ণ কৃপা না করিলে আজ বঙ্গ সাহিত্যে এই কবি বিহঙ্গটীর কাকলী শুনিতে পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ।

গোবিন্দচন্দ্র একটা স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা অতি সামান্য। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে এক বৎসর তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি বাল্যকালে লেখা পড়ায় মনোযোগ না দিয়া খেলা ধূলায় রত থাকিতে এবং মাঠে মাঠে গরু চরাইতে ভাল বাসিতেন—একথা আমরা তাঁহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি। [illegible]

পরিশোভিত এবং নানা তরুলতা সমন্বিত ভাওয়াল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। প্রকৃতির এই রম্য নিকেতনে কবির বাল্য জীবন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

জয়দেবপুরের রাজভবনেই গোবিন্দচন্দ্রের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে কৈশোর কাল হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত সেই কৈশোর কবিতাবলী এখন আর পাওয়া যায়না।

১২৮৪ সনে তিনি ভাওয়ালের রাজকুমার ৺রাজেন্দ্র নারায়ণের পার্শ্বচর কর্ম্মচারীরূপে সর্ব্ব প্রথম কর্ম্ম জীবনে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই হইতেই তাঁহার দুর্ভাগ্য সূচীত হইল। কর্ম্ম-জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় কবি প্রতিভার সঙ্গে মন্দ ভাগ্যের আজীবন সংঘর্ষণ নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

এই সময় ভাওয়াল ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়া বিধ্বস্ত হইতেছিল। তখন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতীব শোচনীয়। সেই দুঃসময়ে রাজা নিজে কোন রাজ কার্য্য পরিদর্শন করিতেন না। এজন্য দাস মহাশয় সর্ব্বদা রাজাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। ক্রমে এই লইয়া ভাওয়াল রাজ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়—প্রজাপক্ষ ও রাজাপক্ষ বলিয়া দুইটী দলের উদ্ভব হয়। তেজস্বী গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক তেজোস্বিতার সহিত প্রজা মণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইলেন। ফলে ভগ্ন হৃদয়ে তাঁহাকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল।

অতঃপর ১২৮৬ সন হইতে ১৩০৭ সন পর্য্যন্ত তিনি নানা স্থানে নানা প্রকার চাকুরী করেন।

গোবিন্দচন্দ্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সের সময় জয়দেবপুরেই প্রথম বার বিবাহ করেন। কবির বাসস্থানের অনতিদূরেই তাঁহার শ্বশুরালয় অবস্থিত ছিল। প্রথম পত্নী সারদা সুন্দরীর গর্ভে তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের কেহই আজ আর এ জগতে নাই।

১২৯২ সনে তাঁহার প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরী পরলোক গমন করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় তিনি ময়মনসিংহ "চারুবার্ত্তা" প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে অমূল্য রত্নরাজি।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের ভূম্যধিকারী ৺হরচন্দ্র চৌধুরী একজন বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে নিজের ষ্টেটে একটী চাকুরী দিয়াছিলেন।

১২৯৬ সনে তাঁহার প্রথম গীতিকবিতা "প্রেম ও ফুল" প্রকাশিত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "কুস্কুমের" রচনার কাল ১২৯৮ সন। সে সময় তিনি সেরপুর চাকুরী করিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি এই দুইখানি কাব্য রচনা করেন। দুইখানিই প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা অবলম্বনে রচিত! সেরপুর কর্ম্মস্থলী হইতে মাঝে মাঝে তিনি জন্মভূমি জয়দেবপুর দেখিতে আসিতেন। "কুস্কুম" রচনার পর তিনি একবার জয়দেবপুর আসিয়া রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে একখানা পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। রাজা তাহা পাঠে অতিশয় প্রীত হইয়া কবিকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

অলক্ষ্যে বসিয়া অদৃষ্ট-দেবতা হাসিতেছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্রের তখন নিতান্তই গ্রহ-বৈগুণ্য। দেখিতে দেখিতে "বড়র পীরিতি বালীর বাঁধের" মত কবির প্রতি রাজার সেই কৃপাকণাটুকু মিলাইয়া গিয়া সেখানে রোষাগ্নির সৃষ্টি হইল।

তখন কলিকাতা হইতে "নবযুগ" নামে একখানা কাগজ প্রকাশিত হইত। সেই কাগজে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সম্বন্ধে অতি তীব্র ভাষায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যে কোন কারণেই হউক, রাজার মনে বিশ্বাস জন্মে যে, দাস-কবিই উক্ত প্রবন্ধের রচয়িতা। সেই সন্দেহের বশীভূত হইয়া ১২৯৮ সনের ফাল্গুন মাসে একদিন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ গোবিন্দ দাসকে মুহূর্ত্ত মধ্যে জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কঠোর আদেশ প্রচার করেন। অনন্যোপায় হইয়া কবি তখন তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ভাওয়াল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এইরূপে বিধি-বিড়ম্বনায় বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ কবি বিনা বিচারে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। গোবিন্দচন্দ্র "নবযুগের" প্রবন্ধ না লিখিয়াও তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিল।

নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি কলিকাতা আগমন করেন এবং প্রত্যেক বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকগণের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন, তখন কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

তারপর মনের দুঃখে নির্ব্বাসিত কবি ১২৯২ সনে তদানীন্তন "প্রকৃতি" নামক একখানা কাগজে "মগের মুলুক" নামকরণে একটী অতি তীব্র ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করেন। ভাওয়ালের অধঃপতনের কাহিনী অগ্নিময়ী ভাষায় কবি "মগের মুলুকে" বর্ণনা করিয়াছিলেন।

প্রথমা পত্নী বিয়োগের প্রায় সাত বৎসর পর গোবিন্দচন্দ্র বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রামে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই পত্নীর নাম প্রেমদাসুন্দরী! তাঁহার গর্ভে কবির যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তন্মধ্যে অধুনা তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

"মগের মুলুক" রচিত হওয়ার সময় তিনি সেরপুরের কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ছিলেন। অবশেষে মুক্তাগাছার স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের ষ্টেটে একটী নায়েবী পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ময়মনসিংহ তাঁহার প্রিয় স্থান ছিল। কর্ম্মজীবনের অধিক সময় তিনি ময়মনসিংহে যাপন করেন। তথায় তাঁহার বহু বন্ধু অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছেন।

ময়মনসিংহে তিনি "সারস্বত কবি" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্তের ষ্টেটে তিনি প্রায় ৫ বৎসর চাকুরী করিয়াছিলেন। তৎপরে অসুস্থ হইয়া কর্ম্মত্যাগ করেন।

চাকুরী ছাড়িয়া তাঁহার জীবন উপায়ের অন্য কোন পন্থা ছিল না। অগত্যা দাস কবি মুক্তাগাছার দানবীর জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর শরণাগত হইয়াছিলেন। তিনি তদবধি কবিকে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ২০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

কবির জন্ম এবং মৃত্যুর সঙ্গে দুইজন মহাপুরুষের নাম বজড়িত রহিয়াছে। জন্মের পর রাজা কালীনারায়ণ তাঁহাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছিলেন, আর অকালমৃত্যুর হাত হইতে রাজা জগৎকিশোর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই দুইজন দেব-হৃদয় রাজর্ষির নিকট বঙ্গসাহিত্য চিরদিন ঋণী রহিবে। রাজা জগৎকিশোরের সাহায্য না পাইলে কবির জীবন ধারণের কোনই উপায় ছিল না। রাজা জগৎকিশোরের এই অপার করুণার কথা উল্লেখ করিতে কবির নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইত।

গোবিন্দচন্দ্র একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তিনি আজীবন দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াও বঙ্গবাসীর সেবায় কখনও ত্রুটী করেন নাই। আপনার শত দুঃখক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তিনি দেশবাসীর কর্ণে আশার বাঁশরী বাজাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই সুমধুর কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়াছে।

তাঁহার দেশাত্মবোধ কিরূপ প্রবল ছিল "নব্যভারতে" তাঁহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র নিজের জয়ঢাক নিজে বাজাইয়া যান নাই। আত্ম প্রকাশ করিতে তিনি নিতান্তই কুণ্ঠিত ছিলেন। নীরবে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া নীরবে তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

একদা তিনি রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা" পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। "বীণায়" প্রকাশিত তাঁহার কয়েকটী অতুলনীয় কবিতা পরবর্ত্তিকালে তাঁহার কোন কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নাই। আমাদিগকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে বিস্মৃতিই তাহার কারণ। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত-ভাবে "নব্যভারতে" কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই "সৌরভে" ও গোবিন্দচন্দ্রের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রেম ও ফুল এবং কুঙ্কুম ব্যতীত কস্তুরী, চন্দন, ফুলরেণু, এবং বৈজয়ন্তী নামে তাহার আরও কয়েক খানা কাব্যগ্রন্থ আছে।

মৃত্যুর দুইবৎসর পূর্ব্বে তিনি গীতার পদ্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি তাহা অমুদ্রিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যে আজকাল অনেক দুর্ব্বোধ কবিতার সৃষ্টি হইতেছে। গোবিন্দদাস এই শ্রেণীর কবিতার কবি নহেন। তাঁহার কবিতা, ভাবে পরিপূর্ণ, জীবনযুক্ত সহজ সরলভাষায় রচিত হইয়াছে। গভীর রজনীর দূরাগত বীণাধ্বনিবৎ গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা কর্ণে মধুবর্ষ

করে। তাঁহার গীত-কবিতা মনের অনুভূতিকে অত প্রবলবেগে জাগাইয়া দেয়।

তিনি বিগত ৩০এ সেপ্টেম্বর সোমবার শেষরাত্রে ঢাকা-নগরীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা শোকে জর্জ্জরিত হইয়াছি। আজ গভীর দুঃখে অবসন্ন হৃদয়ে জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# শত্রু ও মিত্র।

এসেরিয়া প্রাচীন কালে একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এপ্রাদ্ধন্ ইহার একজন প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন। শৌর্য্যস্ফীত এবং আধিপত্য বিস্তারের দুর্জ্জয় লালসায় উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি একদা রাজা লাইলীর অধিকৃত দেশ আক্রমন করিলেন। লাইলী যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। কিন্তু বিজেতা রাজ্য অধিকার করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার আদেশে নগর সকল অগ্নিদ্বারা ধ্বংস করা হইল, পরাজিত ও ধৃত সৈনিক সকলের শিরশ্ছেদন হইল, বহু-সংখ্যক অসহায় ব্যক্তি বিনা দোষে প্রাণ হারাইল। যে সকল সেনাপতি স্বদেশের জন্য রণক্ষেত্রে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বন্দী হইয়া ছিল তাহাদের মধ্যে কতক শূলে প্রাণ হারাইল। আর বাকী যাহারা ছিল তাহাদের জীবদ্দশায় শরীরের চর্ম্ম ছাড়াইয়া লওয়া হইল, হতভাগ্যগণ নিদারুণ যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করিয়া জীবন লীলার অবসান করিল। রাজা লাইলী ও বন্দী হইয়াছিলেন।

(২)

একদিন রাত্রে এপ্রাদ্ধন্ শয্যায় শয়ন করিয়াছেন এমন সময় লাইলীর কথা তাঁহার স্মরণ হইল। লাইলীর তো প্রাণ নাশ করা হয় নাই। সে তো আজও জীবিত আছে। তখন এপ্রাদ্ধন্ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কিরূপে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া লাইলীকে বধ করা যায়। এমন সময় তাহার বিছানার নিকটে একটা, খস্ খস্ শব্দ তাঁহার কানে গেল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে বড়ই বিস্ময় হইল। একজন শ্বেত শ্মশ্রু বৃদ্ধ দরবেশ তাঁহার মাথার কাছে দণ্ডায়মান। এপ্রাদ্ধন তাহাকে দেখিবা মাত্র সেই সৌম্য মূর্ত্তি ধীর ও গম্ভীর ভাষায় কহিল—লাইলীকে বধ করিতে চান?

রাজা—হাঁ! তবে কি উপায়ে তাকে মারিব তা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

বৃদ্ধ—বলেন কি? আপনিই যে লাইলী? আপনাকেই আপনি বধ করিবেন?

রাজা—তা' হ'বে কেন? আমি যে এপ্রাদ্ধন। আমিত লাইলী নই।

বৃদ্ধ—আপনি কেবল মনে ভাবিতেছেন আপনি লাইলী নন। বাস্তবিক আপনি আর লাইলী একই ব্যক্তি। আপনিই লাইলী, আর লাইলীই আপনি।

রাজা এই অপরিচিত বৃদ্ধের প্রহেলিকাময় কথাগুলির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন—আপনি যে কি বলিতেছেন তাঁহার কোন অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এই দেখুন আমি এই কোমল বিছানায় শুইয়া আছি। আমার চারি দিকে অগণিত দাস দাসী। আমি আজ বন্ধুগণের সহিত নানা আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইয়াছি। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ভোজ দিয়াছি। কালও এখানে একটা ভোজ হইবে, সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ করিব; কিন্তু লাইলীত পাখীর মত পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। তার আহার নাই, নিদ্রা নাই। কাল আমি তাহাকে শূলে চড়াইব। তখন সে যন্ত্রণায় কত আর্ত্তনাদ করিবে? বাঁচিবার জন্য কত চেষ্টা করিবে। শেষটায় জিভ বাহির করিয়া শূলে মরিয়া থাকিবে। আমার পোষা কুকুরগুলি তার শরীরের মাংস টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে কহিল—আপনি কিছুতেই তার জীবন নাশ করিতে পারিবেন না।

রাজা—জীবন নাশ করিতে পারিব না? বলেন কি? আমি চৌদ্দ হাজার সৈন্যের প্রাণ বধ করিয়াছি। তাহাদের শরীরগুলি একত্র হইয়া পাহাড়ের মত উঁচু হইয়াছিল! আমি জীবিত আছি, তারা ত কেউ বাঁচিয়া নাই। এতে কি প্রমাণ হইল না—আমি জীবন নাশ করিতে পারি।

বৃদ্ধ—আপনি কি করিয়া জানেন তারা বাঁচিয়া নাই?

রাজা—আমি তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা ভয়ানক যন্ত্রণা পাইয়াছে কিন্তু আমার কিছুই হয় নাই। আমি যেমন সুখে ছিলাম তেমনি আছি।

বৃদ্ধ—আপনি নিজকেই যন্ত্রণা দিয়াছেন! নিজকেই বধ করিয়াছেন! তাদের কিছুই হয় নাই!

রাজা—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বৃদ্ধ—আপনি কি বুঝিতে চান?

রাজা—হাঁ! চাই বই কি?

তবে এখানে আসুন। এই দেখুন একটা জলের চৌবাচ্চা আপনার গায়ের জামা খুলিয়া এটার ভিতর প্রবেশ করুন।

রাজা একে একে তাহার গায়ের জামা সকল খুলিলেন। দরবেশ ইত্যবসরে একটা গাড়ু জলধারা পূর্ণ করিয়া আনিলেন। তিনি রাজাকে কহিলেন; আমি আপনার মাথায় এই গাড়ুর জল ঢালিবা মাত্র আপনি চৌবাচ্চার জলের মধ্যে ডুব দিবেন।'

দরবেশের কথা মত রাজা তাহাই করিলেন।

(৩)

রাজা জলে নিমজ্জিত হইবা মাত্র অনুভব করিতে লাগিলেন তিনি যেন এব্রাহ্মন নহেন, অন্য একজন। তখন নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন—তিনি একখানি বহুমূল্যবান সুকোমল শয্যায় একজন পরমাসুন্দরী রমণীর পাশে শায়িত আছেন। তিনি এই রমণীকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই চিনিলেন ইনি তাঁহারই পত্নী।

রমণী সুমধুরকণ্ঠে কহিলেন—লাইলী, প্রিয়তম, তুমি কাল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া ছিলে তাই অনেক্ষণ ঘুমাইয়াছ। আমি এই জন্য তোমাকে তুলি নাই। দরবার ঘরে রাজপুরুষগ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এখন সাজসজ্জা করিয়া সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর গিয়ে। ”

এব্রাহ্মনের মনে একটুও সন্দেহ হইলনা যে তিনি লাইলী নন। তিনি রাজকীয় পোষাক পরিধান করিয়া দরবার গৃহে গমন করিলেন। সামান্তবর্গ ও রাজকর্ম্মচারিগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সকলে রাজাদেশে আসন পরিগ্রহ করিলে একজন প্রাচীন সামন্ত রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“মহারাজ, দুষ্ট এব্রাহ্মনের অপমান আর সহ্য হয় না। আমরা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতির জন্য সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি। ” রাজা যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতি দিলেন না। তিনি এব্রাহ্মনকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য একজন বহুদর্শী দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। দূত নির্ব্বাচিত হইলে এব্রাহ্মনের সহিত কি বিষয় কিভাবে আলাপ করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন। অতঃপর দরবার শেষ করিয়া তিনি শিকারে গমন করিলেন। সেদিন রাজা দুইটী বন্য গর্দ্দভ বধ করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রজনীতে রাজ-প্রাসাদে বিরাট ভোজ ও নৃত্য গীতের ব্যবস্থা হইল। এইরূপ আমোদ প্রমোদে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

(৪)

একমাস পর দূত এব্রাহ্মনের রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এব্রাহ্মনের আদেশে তাঁহার লোকেরা দূতের নাক ও কান কাটিয়া দিয়াছে। কেবল তাহাই নহে এব্রাহ্মন দূতকে বলিয়াছেন, দেশে গিয়া লাইলীকে বল—যদি অচিরে আমার নিকট উপঢৌকন স্বরূপে বহু মণিমুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্য প্রেরিত না হয় তবে তাহারও এই দশা করিব। ”

দূত এইরূপে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে লাইলী ( পূর্ব্বের এব্রাহ্মন ) তৎক্ষণাৎ দরবার ডাকিলেন। সকলের পরামর্শ হইল এব্রাহ্মনের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। লাইলী স্বয়ং বিশাল সৈন্য বাহিনী সহ যুদ্ধে গমন করিলেন। সাতদিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এব্রাহ্মনের সৈন্যের বল অত্যধিক হেতু তাহার পরাজয় অনিবার্য্য হইল। লাইলী আহত হইয়া বন্দী হইলেন। এব্রাহ্মন তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন।

লাইলী ঘৃণা লজ্জা ও অপমানে মৃতপ্রায় হইলেন। অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়াত দূরের কথা। এখন তিনি শত্রুর হস্তে বন্দী। লাইলী মনে মনে সংকল্প করিলেন, শত্রুর নিকট কখনও দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিবেন না। সকল দুঃখ, সকল অপমান নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিবেন। লাইলী পিঞ্জরে বসিয়া বিনিদ্র নয়নে সুদীর্ঘ দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিশ দিন গত হইল। তিনি পিঞ্জরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহার আত্মীয় স্বজন সেনাপতি ও পরিবারবর্গ সকলেই একে একে অতি নৃশংস ভাবে ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতেছে। তিনি তাহাতে দুঃখ ক্ষোভ কিম্বা অন্য কোন প্রকার চিত্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। এক দিন দেখিলেন কয়েক জন খোঁজা তাহার প্রিয়তমা পত্নীকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি বুঝিলেন তাহার জীবন-সঙ্গিনী এব্রাহ্মনের দাসী হইতে যাইতেছেন। এই মর্ম্মান্তিক করুণ দৃশ্যও তিনি নীরবে সহ্য করিলেন। একদিন এক জন প্রহরী তাহার দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া কহিল :— লাইলী, আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই ক্লেশ হয়। একদিন আপনি রাজা ছিলেন, আর আজ আপনার কি দশা হইয়াছে! এই ব্যাক্তির সমবে-

দয়া পূর্ণ সহৃদয় বাক্যে তাঁহার অতীত স্মৃতি জাগরিত হইল, প্রাণের বল তিরোহিত হইল, মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি অরুন্তুদ মর্ম্মবেদনায় পিঞ্জরের লৌহ শলাকা ধরিয়া আত্মহত্যা করিবার মানসে বারংবার স্বীয় মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে পরিশ্রান্ত দেহে পিঞ্জরের মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

এমন সময় দুইজন ঘাতুক পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আসিয়া তাঁহার দুই বাহু রজ্জুদ্বারা দৃঢ় ভাবে বদ্ধ করিল এবং তাঁহাকে বধ্য মঞ্চে লইয়া গেল। লাইলী ভীতিবিহ্বল চিত্তে দেখিলেন সম্মুখে একটী রক্তরঞ্জিত তীক্ষ্ণধার শূল। মুহূর্ত্ত আগে ঐ শূল হইতে তাঁহার একজন বন্ধুর মৃতদেহ অপসারিত করা হইয়াছে। লাইলী বুঝিলেন—এই শূলেই তাঁহার জীবনান্ত হইবে। ঘাতুকগণ তখন ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার বেশভূষা খুলিয়া ফেলিল এবং শূলে চড়াইবার জন্য তাঁহার ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্ত ও পদদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিল। লাইলী মনে মনে ভাবিলেন "এই বার মৃত্যু! জীবনের শেষ!"

লাইলীর ধৈর্য্য, সংযম ও মনের বল কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! তিনি ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আর্ত্তনাদে কেহ কর্ণপাত করিল না।

সহসা লাইলীর মনে হইল তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন। তিনি জাগিবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টায় তাঁহার যেন চৈতন্য হইল। তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল তিনি লাইলীও নন এব্রাহ্মনও নন। তিনি একটী পশু। তখন তাঁহার বড়ই বিস্ময় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "পশু হইলাম কি করিয়া? এ কথা ত এত দিন জানিতাম না।" তিনি যে একটী জানোয়ার ইহা এতদিন জানিতে পারেন নাই ইহাই তাঁহার বিস্ময়ের প্রধান কারণ হইল।

এব্রাহ্মন দেখিলেন তিনি শস্য শ্যামল উপত্যকায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন। তাহার চারিদিকে বহু সংখ্যক জীব-জন্তু, ইতস্ততঃ মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে। একটী সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট গর্দ্দভ শাবক লাফাইতে লাফাইতে এব্রাহ্মনের নিকটে আসিল। এব্রাহ্মন দেখিলেন তিনি যেন একটী গর্দ্দভী। শাবকটী পরমোল্লাসে তাঁহার স্তন্য পান করিতেছে। এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে তাঁহার দুঃখও হইল না বিস্ময়ও হইল না। বরং তাঁহার প্রাণে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি গর্দ্দভ শাবকের দেহে এবং তাঁহার নিজের ভিতর একই আত্মার যুগপৎ স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলেন।

সহসা শিকারী-নিক্ষিপ্ত একটী তীক্ষ্ণধার তীর আসিয়া গর্দ্দভীর গায় বিদ্ধ হইল এবং চর্ম্মভেদ করিয়া মাংসে প্রবেশ করিল। গর্দ্দভী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া স্বীয় বাঁট শাবকের মুখ হইতে টানিয়া লইল। এমন সময় আর একটী তীর আসিয়া শাবকের গায় বিদ্ধ হইল। শাবকটী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। জননী তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন একটী ভীষণ আকৃতি মানুষ আসিয়া নির্ম্মম হৃদয়ে বৎসটীর গলা ছেদন করিল!

এব্রাহ্মন হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতে ছিলেন। তিনি উচ্চঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "না না, এ কিছুতেই হইতে পারে না। এ স্বপ্ন।"

সেই সময় জাগ্রত হইবার জন্য তিনি আবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক জল হইতে উত্তোলিত হইবা মাত্র তাহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি বুঝিলেন তিনি লাইলী ও নন, গর্দ্দভী ও নন—তিনি এব্রাহ্মন!

(৫)

এব্রাহ্মন চৌবাচ্ছা হইতে উঠিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ দরবেশ গাড়ু হস্তে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় জল ঢালিতেছে। তিনি বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"উঃ কি ভয়ানক যন্ত্রণাই ভুগিয়াছি। এতদিন আমাকে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে।"

কত দিন! বলেন কি? আপনি যে জলে ডুবিয়া তখনই ভাসিয়া উঠিয়াছেন। এই দেখুন আমার এক গাড়ু জল এখনও নিঃশেষ হয় নাই।

এব্রাহ্মনের মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। তিনি ভয়-বিচলিত চিত্তে একদৃষ্টিতে দরবেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দরবেশ গম্ভীর ভাবে কহিলেন :— আপনি কি এখন বুঝিতে পারিলেন যে লাইলী ও আপনি এক, আর যত সৈন্তগণকে বধ করিয়াছেন তাহারা ও আপনি এক ? সৈন্য দের কথা কেবল কেন, যত প্রাণী শিকারে বধ করিয়াছেন ওরা ও আপনাতে কোন প্রভেদ নাই। আপনি মনে করিতেন সকল জীবের প্রাণ স্বতন্ত্র, তা নয়। বিশ্বব্যাপিয়া এক মহাপ্রাণ বিরাজ করিতেছে। আপনার জীবন সেই মহাপ্রাণের অংশ মাত্র। জীব সমুদ্রের আপনি সামান্য জলকণা। আপনার জীবন আপনি উন্নত করিতে পারেন, অবনতও করিতে পারেন। দেহরূপ গণ্ডিদ্বারা অন্যের আত্মা হইতে আপনার আত্মা পৃথক হইয়াছে। এই দেহের সংকীর্ণ গণ্ডি ভাঙ্গিয়া নিজ আত্মাকে বিশ্বের আত্মার সহিত মিলিত করাকে জীবনের চরম উন্নতিসাধন বলে। সকল জীবকে ভালবাসা দিলে সমান জ্ঞান করিলে, আত্মপর বিবেচনা থাকে না। যখন আপনি মনে করেন, আপনার জীবন স্বতন্ত্র এবং অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজের সুখ শান্তি বৃদ্ধি করিতে চান তখনই আপনি নিজের জীবনের অনিষ্টসাধন করেন। অন্যের জীবন নাশ করিবার কারো ক্ষমতা নাই। যে সকল প্রাণীকে আপনি বধ করিয়াছেন মনে করেন ওরা কেহই মরে নাই। আপনি যদি নিজের জীবন দীর্ঘ ও অন্যের জীবন খাট করিতে চান, তবে তা কিছুতেই পারিবেন না। জীবন কখনও দেশ কিম্বা কালে আবদ্ধ নহে। ক্ষণস্থায়ী জীবন আর সহস্রবর্ষ ব্যাপী জীবন, একও অভিন্ন। এক জীবনেরই অস্তিত্ব আছে, আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জীবন ছাড়া আর সব মিথ্যা, কল্পনা।

কথা শেষ হইবামাত্র দরবেশ কোথায় শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। এস্রাদ্দন গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন।

পরদিবস প্রাতে রাজা এস্রাদ্দন লাইলী এবং যে সকল বন্দী জীবিত আছে তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আর ঘোষণা করিলেন—তাঁহার রাজ্যে অতঃপর আর কাহার কখনও ফাঁসী হইতে পারিবে না।

তিন দিন না যাইতেই এস্রাদ্দন আপন পুত্রকে ডাকিয়া তাহাকে সম্রাজ্যতার প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি দেশে দেশে বিচরণ করিয়া স্বীয় জ্ঞানলব্ধ সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন—"মানুষ নিজেই নিজের শত্রু ; যে পরের অনিষ্টসাধন করে বাস্তবিক সে নিজেরই ক্ষতি করিয়া থাকে।" *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

# ননদ-ভাজ সংবাদ।

## ( পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে গ্রাম্যভাষা )

ননদ। বলি হ্যাঁগো বউ, তোকে আমি সেঁই ঝটপহরে ( অথবা "ঝুঝকি রাত" অল্পরাত থাকতে ) কখন উঠাই দিঁয়েছি ; তু সেঁই থেকে কি করলি, বল্ দিখি ? এই তো দেখছি বুঝি ভাত চাপলো, তাই কোন্ একটো বেশাতি (তরকারী) আমলো, তাওতো নেই! তবে কি করছিলি, বলি ? আঃ, তবে কিস্কে (কেন) তোখে মু আন্ধারি বিয়ানে উঠালো, বল্ দিখি। ও মাই গো, চুল্লিটোও জলে নাই কো! ক্যাবল বসে রইছে। চুল্লিটে খেঁচরাই দে হুদকে (জ্বলে) উঠুক। তা নয় ; ছি, ছি, ছি, ঢিপে (ঘোটা) গত্র নিয়ে বসেই রইছে। আর ওনন্ টো কান্‌ছে! কাঠও তো নেই, বাগালে (চাকর) কুথা ? বেশম বেলা (১০টা) হলো, ইয়ার চিট্টা (জ্ঞান) নাইকো।

বউ। তবে শুনবি কি করছিলেম ? চিড়ে খেখে গুড় দৈ দিয়ে ফলার করছেলম! শিজে থেকে উঠে ছড়া দেলোম, মাড়ুলি দেলোম ; দিয়ে, টুকচে (একটু) ঘোঁড়ে পাতে আন্ধার আছে, তোর সেই মুড়া টৌপ্টা ( ছিন্ন মলিন বস্ত্র খণ্ড ) পরে ঘাটকে (ঘাটে) গেলম। গিঁয়ে দেখি, না! পঁছী (পশ্চিম) পাড়ে গয়াকোণে (উত্তর পশ্চিম কোণ) একটু হ্যাকড়া (!) একটো কাল্লো বরুণকে খাঁই করলেক। এ মা আমার দিকে নিকুষে চোকাই থাবা গেড়্যা বসে টুকচেন বাদে (একটু পরে) নেজ ফারকাঁই বণে সেঁমেল্যো। আমি কুলিতে (গ্রাম্য ছোট রাস্তা) কাছাড় (আছাড়) খেয়ে—

ননদ। (বাধা দিয়া) তোখে একটো নেকড়ায় কি করবেক। তু খেঁসাস (ভয় পাওয়া) নাই, নেকড়া টৌই খেসাস তোখে দেখেই খেঁসাই বন ঢুকেছে।

* টল্‌ষ্টয় হইতে অনূদিত।

বউ। মনেক (যা হোক) তার পর শোন্, জল নিয়ে অদা (আদ্র-ভিজা) কাপড়ে ঘরকে এলোম। তাঁতিদের গুঁজে (ছোট) খামিদ (কর্ত্তা) তাদের পিড়ে (বারান্দা) থেকে বলছিলো, বউ ভয় নেই, ভয় নেই। ঘরকে এসে জ্বলাপীর দিন (বর্ষার সময়), কি করি, বাগালেকে ঝিঝড়ির (শুকনো সরু ডাল) তরে বল্লোম। বল্লেক বাখুলে (প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ী) খঁুড়ি নাই, যা আছে সি সব গোল (মোটা), শোঁসা গাছে ডালা দিবেক। বলি, একটো রোলা চেলাই দে। বল্লেক, ওট্টো আভাসন তাড়া, ওট্টো ইস্, ওট্টো বেঁওয়া তাড়া, উকুন তাড়া, ওট্টো শিকেল গড়ি হবেক। ই বলে কাট দিলেক নাই। আমি মাথা মিটায়ে রাঁধবো? যেমনি তোদের ঘরের ভাঁক্ (অবস্থা) সি রকমই হবেক। খাক্ সবাই ঝিঁরু (অসিদ্ধ) চেলের পিণ্ডি!

ননদ। কি বল্লি ভাই খাউকি, বাপ খাউক্কি! ফাঁড়ে কোদালে পথ আলাকরে যা। চার কাহারে যা, ঘাট আলাকরে যা, আমরা তোখে পিণ্ডি রাধবের লেগে এন্যাছি, যা, তোর ভাই বাপকে পিণ্ডি দে গা, যা।

বউ। আমি তোখে কি বলবো! আমার যে এথেনে ভান হাত বা হাত দুটাই সমান, নৈলে তুখেও বোলতম তুই মর্, যা দুর্গার খাপ্পরে যা. তোর ভাতার মরুক, কড়ুই রাঁড়ি হয়ে বাপ্পার ঘরে থাক্।

ননদ। থাম্. থাম্, দাদা খাদ থেকে আসছে, তোর বিত্তেব ( প্রতাপ ) ভাঙ্গব সিঁয়ে ( এসে )।

বউ। ওঃ তোর দাদা ভারি তো মরদ, তাই তাখে ভয়। ভয়ে একটো পিঁপুড়ির গাড় খুঁজি। থুবড়ি জুমড়ি কাল্টী! তোর আবার তেয়ের মান কি লো? সি তো আমার পা ঘসা ঝামা।

ননদ। কি বল্লি। আমড়া দিয়ে ইচ্‌লে মাছের ( ছোট চিংড়ি) টক আর কাঁচা কুলাইয়ের ঝোল সুঁপর্যা (লঙ্কা) দিয়ে পাঁচ পো চেলের ভাতে গাবড়া পোরাবে; আমার বাপের ভাত খেঁয়ে, আমার বাপের ঘরে বসে মু-জোর ( মুখের জোর ) দেখ। পর দুয়োরি, যে ভাত কাঁড়িটী খায় তাখে বিড়েল ডিঙিতে নারবেক (নারিবে=পারিবে না অর্থাৎ ভাতের স্তুপ এত উচ্চ যে বিড়াল লম্ফ দিয়ে পার হইতে অসমর্থ)। তাখেও ব্যাতে ( মুখে ) কথা দেখ। "যা দেখায়নি বাপের বাপে, তা দেখালে কাঠের কাপে (পুতুল)" দেখে। দূর। ছিক।

বউ। ভাই ভাতারি, তুই থাকতে পরকে ভাত খেতে এথেনে এস্যাছে কেনে? জাল মাছ ( ইচ্‌লে বা ছোট চিংড়ি ) আবার মাছ! শাগ আবার তরকারি। খাড়ু হাতে আবার ইস্তিরী! বলি আর জ্বালাসনে। তোদের ডেলে ডুবে কুলাই খুঁজে পাই না। (ডালে সবই জল, কলাই নাই ইত্যর্থ)। কি ভদ্দর ঘর গো, ইয়ার আবার বড়াং দেখ। কি ভজকট! (মুস্কিল)

নেপথ্যে গিন্নি। বলি এত গোল কেনে, বউ আটকুড়ি বুঝি গুণ্ডগোল করছিলো। কৈ আটকুঁড়ির বেটী?

( বধূর সত্রাসে প্রস্থান )

নেপথ্যে দাদা। কিরে বিন্দি ( ভগিনীর নাম ) বউয়ের পেছনে আবার লাগতে গেলি কেনে?

ননদ। (স্বগত) পা-ঘসা ঝামা, বউ তোমার বুয়াসিন ( ভাদ্রবধূ )! ( সক্রম নির্গম )।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

## গ্রন্থ সমালোচনা।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—শ্রীহরিচরণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ৶০ আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বায়ু ও তাহার ক্রিয়া, জল ও তাহার কার্য্য এবং উপাদান, খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, স্নান, পরিশ্রম, নিদ্রা, রক্ত, মাংসের যুস মদকদ্রব্য প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে একজন চিকিৎসক—তাঁহার উপদেশগুলি যে মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ভাষাও সুন্দর এবং সহজ বোধ্য। কেবল বালক বালিকা কেন আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলের পক্ষেই এই মারিভয়ের দিনে এইরূপ একখানা গ্রন্থ সর্ব্বদা পাঠ করা ও গ্রন্থের লিখিত উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলা উচিত।

সাগরিকা—শ্রীললিতকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। ৬৭ সিমলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। সাগর দর্শন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার তাহার মনে নিত্য যে নবীন ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাই কবিতাকারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলির ভাব গভীর, ছন্দও সুন্দর—অবাধ।

মুকুল—শ্রীযাদবচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা কবিতা পুস্তক। লেখক যাহা ভাবের মুখে লিখিয়াছেন তাহাই ছাপাইয়াছেন। নবীন গ্রন্থকার কোন প্রবীনের পরামর্শে চলিলে তাঁহাকে বৃথা এই অর্থ ব্যয় করিতে হইত না।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

# সৌরভ

সপ্তম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৫। | চতুর্থ সংখ্যা।

## উপন্যাস।

গল্প বলিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি দেখা যায়, যেমন গদ্যের অতি পূর্ব্বে সকল সাহিত্যেই কাব্যের বিকাশ, তেমন কাব্য ও নাটকের অভ্যুদয়ের অনেক পরে উপন্যাসের আবির্ভাব হইয়াছে। কেন সাহিত্যের এ ধারা? ঋগ্বেদের কত শত বৎসর পরে মৃচ্ছকটিকের জন্ম, তাহারও আবার কত যুগ পরে কাদম্বরী রচিত। কবি অন্য-হস্ত-ধৃত যন্ত্রবিশেষ; প্রাণের নিগূঢ় তাড়নায় তাহার মুখ হইতে যে ছন্দোবদ্ধ বাক্য বিনির্গত হইয়াছিল, দেশবাসিগণ অজানিত কোনও ভাগ্যবিধাতার আদিষ্ট বাণী জ্ঞানে সাদরে তাহা মুখে মুখে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কালক্রমে বর্ণমালা রচিত ও লিপি প্রচারিত হইবার পর হইতে ভূর্জ্জপত্রে, তালপত্রে, কাষ্ঠখণ্ডে কিম্বা তাম্রফলকে তাহা শ্রদ্ধাসহকারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই ভাবেই ঋগ্বেদের আবির্ভাব, সর্ব্বত্র সকল প্রাচীন বাণীরই আবির্ভাব।

নাটক—পদ্য ও গদ্যের সমষ্টি। কাব্যের পরই তাহার সৃষ্টি। প্রকৃত গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি তখনই সম্ভবপর, যখন ভাষা ব্যাকরণের অনুশাসন মানিয়া চলিয়াছে এবং জনসাধারণের মুখে অহরহ উচ্চারিত কথাবার্ত্তার ভিতরও জানিবার শিখিবার বিষয় আছে, এ ভাব সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে ও তাহা লিপিবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হইতেছে। গদ্য পদ্য হইতে ভাব-প্রকাশের নিকৃষ্টতর ভঙ্গী, এমন কি অন্য আকারে ভাবের অভিব্যক্তি বিদ্যাহীনতা ও অপাণ্ডিত্যের লক্ষণ—এ সংস্কার হইতেই এ দেশে কাব্য ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থও পদ্যেই রচিত। এমন কি,—জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, এবং কঠোর অঙ্কশাস্ত্রও পদ্যের ললিত মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া, তাহার কোমল বাহুপাশে স্ব স্ব কর্কশতা লুকাইবার ও তাহার রস-সাহায্যে লোকচিত্ত আকর্ষণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। উপন্যাস—লোকের অতি-সাধারণ জীবন মরণের ঘটনাবলী লইয়া বিরচিত; তাহা ব্যতীত গদ্য ছাড়া অন্য আকারে ইহার বেশ ভূষা অসম্ভব। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে ইহার এত বিলম্বে আবির্ভাব—ইহাই কি তাহার কারণ নয়?

দশকুমার চরিত, বাসবদত্তা, কাদম্বরী, হর্ষচরিত—সংস্কৃত সাহিত্যে এ সমুদয় গদ্যগ্রন্থ আবির্ভূত হইয়াছিল, খ্রীষ্ট ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে। যদি ভবিষ্যৎকালে ভারত-বর্ষে অন্যান্য জাতি প্রবেশলাভ না করিতে পারিত এবং হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের নিম্নে বহির্জগতের সহিত বিরল-সংস্পর্শ হিন্দুজাতি নিজভাবে জীবনগতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে খুব সম্ভব ভারতের প্রতিভা এবং জ্ঞানানুশীলন প্রবৃত্তি ও বর্ত্তমান কালের উপন্যাসের আকারে অথবা তদ্রূপ অন্য কোনও প্রকারে প্রকাশিত হইলেও হইতে পারিত। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থনিচয়ে মূল বক্তব্য বিষয়ের তুলনায়, স্বভাব ও অন্যান্য অবান্তর বিষয়ের বর্ণনার পরিমাণ অত্যধিক। চরিত্রচিত্রণও নাই বলিলেই চলে। পুরুষ ও রমণীর প্রেমের ভাব-, যাহাই ধরিতে গেলে উপন্যাসের মূল উপাদান, তার স্বরূপ ও বিকাশ এবং সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে সময় বিশেষে

লোকচরিত্র কেমন বিসদৃশ আকার ধারণ করে, আবার অন্ত সময়ে কিরূপ বিমল মধুর মূর্ত্তিতে মন হরণ করে—তাহারও তেমন আলোচনা দৃষ্ট হয় না। মানবজীবনও তখন সর্ব্বত্র, বিশেষত ভারতবর্ষে, বর্ত্তমানের জটিলতা-শূন্য ছিল। তথাপি বলিতে হইবে, কাদম্বরীর উপখ্যানের ভিতর উপন্যাসের যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে এবং সাহিত্যের এ ক্ষেত্রেও যে ভারতীয় মনীষা স্বীয় বিশেষত্ব ও প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হয় নাই,—তার একমাত্র কারণ ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয়।

বর্ত্তমান উপন্যাসের উৎস খুঁজিতে হইলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে ইহার আবির্ভাবের প্রথম সূচনা দৃষ্ট হয়। তাহার পূর্ব্বে ও ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র নানা রূপের নানা ভাবের গল্প সাহিত্য প্রচারিত ছিল। ইটালীয় প্রাচীন লেখক বোকেসিওর মনোরম গল্পগুচ্ছ এখনও পাঠকের চিত্তহরণ করিতেছে। কিন্তু এ সকলকে উপন্যাস-আখ্যা প্রদান করিতে কেহই ইচ্ছুক হইবেন না। এ সকল গ্রন্থে কেবল ঘটনা সমূহের সহজ সরল বর্ণনা রহিয়াছে, চরিত্র-বিশ্লেষণের কোন ও চেষ্টাই নাই। কিন্তু, এই চরিত্র-চিত্রণই উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। যত দিন পর্য্যন্ত কার্য্যপরম্পরাকে বাহিরের দিক হইতে দেখি, ততদিন তাহাদের সঙ্গে উপন্যাসের কোন ও সংস্পর্শ নাই। শুধু তখনই তারা উপন্যাসের পক্ষে মূল্যবান হইয়া ওঠে, যখন বাহির ছাড়িয়া মানুষের অন্তর, যেখান হইতে প্রকৃতপক্ষে তারা উদ্গত হইয়াছিল তাহার দিকে দৃষ্টি করি এবং কেমন করিয়া বাহিরের ঘটনাবলী ও মানসিক ভাবসংযোগে অন্তরের পরিবর্ত্তন হয় ও তাহা নানা সময় নানা মূর্ত্তি ধারণ করে, সে বিষয় বিবেচনা করি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডে এক ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। ইংরাজ জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহ যেন সেই মহিমান্বিতা রমণীর নিশ্বাসে অকস্মাৎ নানা ভাবে নানা রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় এক দিকে যেমন অসীম সাহসী দুর্দ্ধর্ষ নাবিক ড্রেক হকিন্স প্রভৃতি পৃথিবী পরিক্রম করিয়া নানা স্থান হইতে লুণ্ঠিত রত্ন রাজিতে ইংলণ্ডের রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মার্লো, বেন জনসন, শেক্সপিয়ার প্রভৃতি কবিগণ নানাবিধ কাব্য ও নাটক রচনা করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে ইংরাজের প্রাধান্য স্থাপন ও ইংরাজ জাতির জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান। ইহারা অসংখ্য গ্রন্থনিচয়ে, মানবচরিত্র কি অবস্থায়, কি ভাবে, কি আকার ধারণ করে, যেমন দেখাইয়াছেন, এমন অন্যত্র কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শেক্সপিয়ার এ ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ইহাদেরই প্রভাবে পরবর্ত্তী যুগে এডিসন সুবিখ্যাত স্পেকটেটার পত্রিকায়, নানাবিধ সরল ঘটনাসমূহের ভিতর দিয়া সার রোজার ডি কভেলরির যে মনোরম চরিত্রটী ফুটাইয়া তুলেন, তাহার ভিতরই অনেকে বর্ত্তমান উপন্যাসের মূল প্রস্রবন দেখিতে পাইয়াছেন। সার রোজারকে নায়ক রূপে সম্মুখে রাখিয়া লেখক তাহার জীবনের ঘটনা নিচয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের অনেক উপন্যাসই এ ধারায় রচিত।

উপন্যাসের অন্য আকার, যাহাতে নায়ক নিজ মুখে জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া থাকে—বানিয়ান তাহার সুবিখ্যাত পিলিগ্রিমস্ প্রগ্রেসে ও ড্যানিয়াল ডিফো ততোধিক সুবিখ্যাত রবিনসন ক্রুসোতে নির্দ্ধারণ করিয়া যান। কিন্তু, এই প্রকার আত্মজীবনী ভাবে লিখিত আখ্যায়িকার প্রধান দোষ এই যে নায়ককে সকল অবস্থাতেই বর্ণিত ঘটনাবলীর সময় উপস্থিত থাকিতে হয় এবং এ কারণে ঘটনাসমূহ নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

পরবর্ত্তীকালে রিচার্ডসন উপন্যাস রচনার অন্য পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। বস্তুত তাহাকেই বর্ত্তমান উপন্যাসের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। পেমেলা, ক্লেরিসা হার্লো প্রভৃতি যে সকল সুবিখ্যাত গ্রন্থাদি তিনি প্রণয়ন করেন, তাহাতে পত্রাকারে পূর্ব্বাপর বক্তব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

এই প্রকারে লেখকের পক্ষে গ্রন্থবর্ণিত পুরুষ ও নারীর চরিত্র তাহাদের নিজ কথার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তোলা অতীব সহজ। ডিফোর রবিন্সন ক্রুসো ও অন্যান্য গ্রন্থ সাধারণ লোকের জীবনের ঘটনাবলী লইয়া রচিত, কোন

ও অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ঘটনার তাহাতে স্থান নাই। রিচার্ডসেনের ভিতর, এ ভাব আর ও ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিতান্ত সামান্য ঘটনার সাহায্যে বর্ণিত বিষয় ও পুরুষ রমণীর চরিত্র নিপূণ তুলিকায় প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা তাহার ন্যায় অল্প লেখকেরই আছে। যদিচ ঠিক তাহার প্রণালীতে নয়, তাহারই প্রভাবে, ফিল্ডিং টম্ জোন্স ও স্মলেট রডারিক রেণ্ডম লিখিয়া সুবিখ্যাত হন এবং পরবর্ত্তী কালে রেডক্লিফ, ওয়ালপোল এবং এজওয়ার্থের অসংখ্য উপন্যাসনিচয়ে ইংরাজী সাহিত্য সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া ওঠে। কালক্রমে, তাহাদের অনুসরণে, ফ্রান্স ও ইয়ুরোপের অন্যত্র উপন্যাস লেখার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়া ওঠে।

রিচার্ডসেন পত্রের আকারে উপন্যাস রচনার যে প্রণালী উদ্ভাবন করেন, পরবর্ত্তী কালে কৃত্রিম বলিয়া তাহা গৃহীত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাইরণের প্রখর কবি প্রতিভার সঙ্গে প্রতি-যোগীতায় নিজকে পরাভূত মনে করিয়া, ওয়ালটার স্কট উপন্যাস রচনায় স্বীয় অনন্যসাধারণ শক্তি নিয়োজিত করেন। উপন্যাস জগতে তাহার এই মত পরিবর্ত্তন স্মরণীয় ঘটনা। তাহার পর হইতে, গ্রন্থের পর গ্রন্থ তাহার অমর লেখনী হইতে প্রসূত হইতে থাকে। ইহাদের অনেকেরই ব্যক্তব্য বিষয় পর্ব্বতমালায় বিভূষিত তাহার জন্মভূমি, স্কটলেণ্ডের সরল, সাহসী, রাজভক্ত, সিভেলরির ভাবে প্রাণোদিত বীর ডিউক ব্যারণ নাইট ও তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া ব্যায়তজীবন সাধারণ লোকসমূহের সুখ দুঃখ ও শৌর্য্যের কাহিনী। স্কটের বর্ণনাগুণে স্কটলেণ্ডের প্রাচীন জীবন যেন তাহার সমস্ত অন্তর্নিহিত লুপ্তগরিমা লইয়া জলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপন্যাস রচনা করিয়া এমন প্রতিপত্তি বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহই লাভ করিতে পারেন নাই।

যাহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে, স্কটের উপন্যা-সাবলী সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ও পার্শ্বে পার্শ্বে সাধারণ লোকের জীবন কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালেও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় এই রীতিই অনুসরিত হইয়া থাকে। কিন্তু এভাবের লিখিত উপন্যাস আর পূর্ব্বের ন্যায় লোকচিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছেনা। অতীত যুগের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া, অনেক সময় লেখকের হস্তে বর্ত্তমানের ভাব ও ভাষাই প্রকটিত হইয়া পড়ে। ফলে, ঐতিহাসিক উপ-ন্যাস প্রায়ই কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। এই সকল কল্পনা মূলক গ্রন্থাবলী, যাহাতে সত্য অপেক্ষা ভাবেরই আধিক্য, প্রকৃত জীবন অপেক্ষা কাল্পনিক ঘটনারই অধিক সমাবেশ, চরিত্র-বিশ্লেষণ অপেক্ষা বর্ণনার প্রাচুর্য্যই অধিক, বর্ত্তমানের সত্যান্বেষী বিশ্লেষণাত্মক বৈজ্ঞানিক যুগে আর উপন্যাস সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপে গৃহীত হইতেছেনা।

এইজন্যই গার্হস্থ্য উপন্যাসের (Domestic Novel) আবির্ভাব। ডিকেন্স এক্ষেত্রে প্রবর্ত্তক বিশেষ। তাহার পিকউইক্ পেপার্স, অলিভার টুইষ্ট, ডেভিড কোপার ফিল্ড প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাসাবলীতে ইংলণ্ডের সম-সাময়িক জনসাধারণের, বিশেষত দরিদ্র শ্রেণীর প্রণয়, সুখ, দুঃখ, সাহস, হাস্য কৌতুকের কত কাহিনীই না নিপূণ-ভাবে বিবৃত হইয়া আছে। তাহারই সমসাময়িক, কাহারও মতে তাহার অপেক্ষাও প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ থ্যাকারির ভেনিটি ফেয়ার, এবং অন্যান্য গ্রন্থেও এই জনসাধরণের প্রাত্যহিক জীবণ মরণের কাহিনাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথিতযশা সার্লটী ব্রন্টি সুবিখ্যাত জেন আয়ার গ্রন্থে সাধরণ মানবের প্রেমভাবটি যেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এমন বোধ হয় আর কোথায়ও দৃষ্ট হইবেনা। এই সময়েরই অন্য লেখিকা জর্জ্জ ইলিয়াট এডাম বিড ও অন্যান্য গ্রন্থে মূলত এই সকল সাধারণ বিষয়েরই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থাদি দর্শনের ভাব-সমূহে অনুপ্রবিষ্ট। তাই, চিন্তাশীল পাঠক ব্যতীত, সাধারণ লোকের কাছে তাহার তেমন প্রতিপত্তি নাই। কিন্তু ইংরাজ ঔপন্যাসিকের ভিতর বলিতে গেলে তিনিই একমাত্র ঔপন্যাসিক, যাহার গ্রন্থ পাঠে মানবজীবনের মহত্বের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া ওঠে ও তাহাকে উচ্চভাবের দিকে লইয়া যায়। বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডে অসংখ্য ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হইয়াছে কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যে কয়জনের স্থান হইবে এখনও বিবেচ্য।

ইংরাজ-সমাজ কোনও নূতন ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়—অতি ধীরে। পিউরিটানদের অস্বাভাবিক কঠোর নীতির ভাবে পুষ্ট ইংলণ্ডে উপন্যাসের তাই তেমন বিকাশ হয় নাই। ইংরাজী উপন্যাস পাঠে মন তেমন নূতন ভাবের আবেশে, আলোড়িত বিলোড়িত হয় না। সব অতি সাধারণ কথা মিষ্টি ভাবে লেখা। ইংরাজের গার্হস্থ্য জীবন সুখের, তাহাদের ঔপন্যাসিকগণের তুলিকায় ইহারই চিত্রগুলি নানাবিধ মনোরম ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। নবীনভাব ও নূতন চরিত্রের অবতারণা অত্যল্প।

ফরাসী দেশ সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক ভাব সম্পদের উদ্দাম লীলার স্থান। যখনই এ সব সম্বন্ধে কোনও নূতন ভাব কাহারো প্রাণে আঘাত করিয়াছে, তখনই এখানে বিকশিত হইয়াছে ও যদৃচ্ছা ক্রীড়া করিয়া গিয়াছে। উপন্যাস, মানবের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্নিহিত ভাব ও বহির্জগতে প্রকটিত অভিব্যক্তি সমস্তই যাহার বর্ণনীয় বিষয়, তাহার সম্যক পরিস্ফুটন এমন দেশেই হওয়া সম্ভবপর। তাহা ব্যতীত গন্ত সা হত্যে ইয়ুরোপে ফরাসী লেখকের সমতুল্য নাই। সংযত সৌন্দর্য্য এবং ললিত কলার অপরূপ গরিমা ভাবার অঙ্গে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ধ্রুব নক্ষত্র-রূপে এ ভাবটী ফরাসী লেখককে পূর্ব্বাপর চালিত করিতেছে। ফরাসী সাহিত্যে উপন্যাস এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভিক্টোর হিউগো লা মিজারব্লে বর্ত্তমান জীবনের মহা কাব্য প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছেন। অপূর্ব্ব কলাকৌশলের গুণে গ্রন্থবর্ণিত চরিত্রগুলি যেন চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে। ভাষায় ও ভাবে, মনোরম, পড়িতে পড়িতে মন কেমন উচ্চাদর্শে পূর্ণ হইয়া ওঠে। সমাজের তাড়নায় ও আইন কানুনের চাপে পড়িয়া, সাধু লোক ও কি প্রকারে প্রপীড়িত হইয়া থাকে ও তাহার সম্মুখে মনুষ্যত্বের পথ চিরজীবনের জন্য কি প্রকারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, কেমন বিশদভাবে না বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাও বলিতে হয়, গ্রন্থখানি কথঞ্চিৎ কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। লোকচরিত্র যেমন, ঠিক তেমন ভাবে দেখান হয় নাই। ব্যালজাকের হাতে এসকল দোষ অন্তর্হিত হইয়াছে। যে সকল ভাব ও ভাবনা তাহার সময় সমাজে ক্রীড়া করিতেছিল এবং যে সকল লোক নানাস্থানে নানাভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, সকলই তাহার La Comedie Humaine এ স্থান পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্স তাহার সুখ দুঃখ সৎ অসৎ সব লইয়া যেন তাহার গ্রন্থাদির ভিতর নিবদ্ধ হইয়া আছে।

ষ্টেণ্ডাল এবং পরবর্ত্তী কালে ব্যালজাক এই দুইজনের সময় হইতে Realistic ও Idealistic—বাস্তবতা মূলক ও আদর্শ মূলক এই দুইভাগে উপন্যাস সাহিত্য বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমশ্রেণীর লেখকগণ দেখাইতে চাহেন, প্রকৃত জীবন যে ভাবে চলিতেছে তাহা, দ্বিতীয়শ্রেণীর উদ্দেশ্য—জীবন যেমন হওয়া উচিত সে দিকে পাঠককে লইয়া যাওয়া। তাই শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকদের গ্রন্থে এমন সব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাহা সমাজে দৃষ্ট হয় না, অনেক সময়ই অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, প্রথম শ্রেণীর দোষ তাহারা সত্যের দিকে এতই দৃষ্টি দেন যে যত সব ঘৃণাকারজনক কাহিনীতে গ্রন্থ পূর্ণ হইয়া ওঠে। দুইটীরই প্রয়োজন আছে। একটী মানবের দুঃখ কষ্ট, পাপতাপ, জ্বালাযন্ত্রণা, কুৎসিৎ ও ভয়াবহ আচার ব্যবহার বর্ণনা করিয়া তাহার জীবন যে সুখের নয় ও নানা ভাবে যে পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় তাহার দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া থাকে। অন্যটী মহত্বের দিকে, নূতন জীবনাদর্শের দিকে তাহাকে লইয়া যায়। তাও বলিতে হইবে বাস্তবতা মূলক উপন্যাস দ্বারাই মুখ্যত উপন্যাসের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে। এক্ষেত্রে ফরাসীদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক গাষ্টাভাস ফ্লবার্ট। ইহারই শিষ্য গিডোমো পাসা ও এমিলি জোলা। ইহাদের লেখা পাঠে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদয় হয়, এই কি মানব সভ্যতা—যাহার মহিমা মানব গাহিয়া বেড়ায়? কোথায় পার্থক্য মানব আর পশুতে? এ অবস্থার কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন কি সম্ভবপর নয়?

ইটালীতে এক সময় উপন্যাসের যুগ আসিয়াছিল। ম্যানজনির নাম ভুবন-বিখ্যাত কিন্তু বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সমাজের উপর তাহার কোনও প্রকার প্রভাব পরিলক্ষিত

হইতেছে না। জার্ম্মেনি দার্শনিকের দেশ এক মাত্র গেটের উইলহেলম মিষ্টার ব্যতীত সে দেশের অন্য কোনও উপন্যাসের নাম তেমন শ্রুত হওয়া যায় না।

ফরাসী দেশে যে বাস্তবতা মূলক উপন্যাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি দেখিতে হইলে অর্দ্ধ সভ্য রুশিয়ার দিকে দৃষ্টি করিতে হয়। সেখানকার জন সাধারণ বহু যুগ ধরিয়া বিসদৃশ শাসন চক্রের নিম্নে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেছিল। রাজ্য পরিচালনায় তাহাদের কোন ও প্রকার হস্ত ছিল না; সার্ফভাম নামক ক্রতদাস প্রথার বিধানানুসারে ধনীগণ দরিদ্রের জীবন মরণের নিয়ামক ছিল এবং অর্থ যাহা তাহা ভূস্বামিগণ, সম্রাট ও তাহার আত্মীয়-স্বজন ও পোষ্যবর্গের বিলাসবাসনা চরিতার্থতায় ব্যায়িত হইত। যদি কখনও কেহ এই বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলিত, নির্জ্জন সাইবেরিয়ার মেরু প্রান্তরে ভীষণ কারাগারে তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত। ক্রমে, ইয়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশের ভাব সমূহ প্রচলিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের পক্ষ হইতে ও প্রতিবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রুশিয়ার বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস রাজা প্রজা, ন্যায় অন্যায়, ধনী নির্ধনের, প্রবল ও দুর্ব্বলের সংর্ঘষের ইতিহাস। ইহার ফলে অবশেষে প্রজাশক্তি জয়যুক্ত হইয়াছে এবং রাজা অন্তর্হিত হইয়াছে। যে লেখকদিগের কল্যাণে রুশিয়ার অন্তর্নিহিত দুঃখ দৈন্য, অত্যাচার অবিচারের ভয়াবহ কাহিনী জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল এবং যাহার দরুণ সভ্য সমাজের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রুশিয়ার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক—টলষ্টয়, টার্জেনিভ, ডষ্টয়ভেস্কি, গোর্কি প্রভৃতির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের লেখার ভিতর দিয়া যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানব জীবনের মহত্বের ভাব প্রকটিত হইয়াছিল তাহাই ক্রমে সমস্ত রুশিয়াকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ফরাসী উপন্যাস সমূহে সমাজের অন্যায় শাসনে নিষ্পেষিত দরিদ্র ও দুর্ব্বলের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে সত্য কিন্তু কি ব্যালজাক কি জোলা ইহারা Realisticঔপন্যাসিক হইলেও প্রকৃত দুঃখের সহিত পরিচিত হইবার ইহাদের তেমন সুযোগ হয় নাই। টার্জেনিভ, গোর্কি, ডষ্টয়ভেস্কি—অনেকের কারাগারে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। জীবনে নানা প্রকারে যেসকল দৈব দুর্ব্বিপাকও যাতনা ইহারা ভোগ করিয়াছিলেন সমস্ত যেন জমাট হইয়া ইহাদের গ্রন্থে বিরাজ করিতেছে। ইহাদের লেখায় ভাষার তেমন লালিত্য নাই, শুধু সত্যের ভয়াবহ বিকট বিসদৃশ স্বরূপ দেখাইয়া ইহারা লোকের মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ইহারাই প্রকৃত পক্ষে বাস্তবতামূলক উপন্যাস লিখিয়াছেন; ইহাদের এক এক জনের জীবনই এক এক খানা এমন উপন্যাসের খণ্ডাংশ বিশেষ।

বাঙ্গলায় যে উপন্যাসের যুগের সূচনা হইয়াছে, তাহার উৎপত্তি বিলাতে। অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র এ দেশে সাহিত্যের এ ধারার প্রবর্ত্তক। কিন্তু তিনি যে উপন্যাসের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান বাস্তবতা মূলক উপন্যাসের দিনে আর তাহা তেমন আনন্দ দান করিতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় স্কটের প্রভূত প্রতিপত্তি। তাহারই অনুকরণে তাহার প্রথম গ্রন্থ দুর্গেশনন্দিনী ও অন্যান্য গ্রন্থ রচিত। এই সকল কল্পনা প্রধান উপন্যাসে সত্যের সমাবেশ নিতান্তই কম। লেখক নিজেই অনেকাংশে তাহার বর্ণিত জগৎ ও চরিত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, জীবনে যে সকলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব; তাই, দেবীচৌধুরাণী, মৃণালিনী, সীতা রাম, রাজসিংহ, ইন্দিরা প্রভৃতি যে সকল উপন্যাস এক সময় বাঙ্গলার পাঠকবৃন্দের মহা আদরের জিনীষ ছিল ক্রমে ক্রমেই তাহারা অন্তঃসারশূন্য গল্প স্বরূপে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা হইতে বহির্ভূত হইতেছে।

বাঙ্গালী লেখক কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল ও আর দুই এক খানি গ্রন্থব্যতীত অন্যত্র তাহার গ্রন্থে প্রকৃত বাঙ্গালীর সাহিত তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিও নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রাণের প্রসারতা ছিল না বলিলেও চলে। যে সাম্য ও উদারতার বাণী পূর্ব্বে রাজা রামমোহন প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন ও তাহার সময়ে কেশবচন্দ্র প্রচার করিতেছিলেন—তাহার ক্ষীণ পরিচয়ও তাহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বর্ণনীয় বিষয়ের ভিতরও নুতনত্ব কিছুই নাই। সেই মামুলীধরণের রাজা, বাদসাহ,

ওমরাহের কাহিনী; সেই প্রাচীন কালের সতী ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার। রমণীর সম্মুখে যে বিশালকার্য্য ক্ষেত্রের দ্বার খুলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, যেখানে সে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার পাইবার জন্য উদগ্রীব, সে বিষয়ের সঙ্গেও তাহার কোন ও সংশ্রব নাই। প্রাচীনভাবে পুষ্ট সমসাময়িক লোক তাহার লেখায় মোহিত হইয়াছিল, এখনও সে মোহ সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই কিন্তু তাহার প্রভাব যে দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। যাহারা শুধু লোকমতের দিকে চাহিয়া লেখেন, চিরকালই তাহাদের এ দশা। সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থায়ী যশ অনেক সময়েই মৃতের জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

বঙ্কিম যুগের আর একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য ও তাহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত ঔপন্যাসিক — রমেশচন্দ্র। ভারত-ইতিহাসের এমন সব গৌরবময় অংশের ভিতর তিনি তাহার গল্পের বিষয় স্থাপন করিয়াছেন যে আপনা হইতেই পাঠে প্রাণ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার ভাবের গভীরতা নাই। চরিত্র সমূহ মাটীতে গড়া পুতুল বিশেষ। বাহিরের চাকচিক্য, সাজ সজ্জায় ভূষিত কিন্তু প্রাণহীন। এই সময়েরই অন্য গ্রন্থ 'স্বর্ণলতা', বাঙ্গালীর সরল গার্হস্থ্য জীবনের সুন্দর করুণ কাহিনী। ইহার সঙ্গে গোল্ডস্মিথের ভিকার অব উয়েকফিল্ডের ( Vicar of Wakefield তুলনা হইতে পারে কিন্তু উভয়ের কোনটীকেই ঠিক উপন্যাস সংজ্ঞাভুক্ত করা যায় না। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত 'রায় পরিবার' ও 'অনাথ বালক'। বাঙ্গালার স্কুল কলেজের ছেলেদের ও অর্দ্ধ শিক্ষিত গ্রাম্য যুবকদের এবং বৌদের পাঠের উপযুক্ত গ্রন্থত্রয়—যাহার কল্যাণে ঘরে ঘরে পতিভক্তির যথেষ্ট চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু নারী মূর্ত্তিতে প্রকৃত মানুষ সৃষ্ট হইতেছে না।

বর্ত্তমান কালে রবীন্দ্রনাথের জগৎব্যাপী যশ। তাঁহার কবিপ্রতিভার কথা বলিব না। যেমন কাব্য ক্ষেত্রে, তেমনি বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্যেও তিনি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার 'ছোট গল্পের' তুলনা নাই। সে ক্ষেত্রে গিডে মোপাশাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের স্থির বিশ্বাস কালে যেমন কাব্য ক্ষেত্রে তেমনি এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী লেখকের প্রতিভার সম্মুখে ইয়ুরোপকে পরাভব মানিতে হইবে। এমন সব প্রাণের নিগূঢ় কথা, প্রাত্যহিক জীবনের ছোট খাট ঘটনাবলী, এমন সব লোকজন যাদের সঙ্গে আমাদের অহরহ সংস্পর্শ, কে এমন কবিত্বপূর্ণ অপূর্ব্ব গরিমা পূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিবে? তথাপি বলিতে হয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমাদের বাঙ্গালীর প্রাণের কথা ব্যক্ত হয় নাই, ঠিক বাঙ্গালীর জীবন বর্ণিত হয় নাই। সে যে রেলে ষ্টীমারে, রাস্তাঘাটে অত্যাচারিত হইতেছে; অর্দ্ধাশনে, ওলাউটা, ম্যালেরিয়ায়, বসন্তে মরিতেছে; সে যে সন্ধ্যায় ফিরিয়া অন্ধকার দীপহীন গৃহে বুভুক্ষিত সন্তানগণের আহারের আর্ত্তনাদে উন্মাদপ্রায় হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছে; সে যে জমীদারের ও মহাজনের ভয়ে অস্থির; জাতি ভেদের বিষময় ফলে, লোকের বাহির, কুকুরেরও অধম; সে যে অশিক্ষিত; অসার সামাজিক তর্ক বিতর্কে নিমজ্জিত সে যে আশাশূন্য; আকাঙ্ক্ষাশূন্য, দুর্ব্বল, কুসংস্কারগ্রস্ত; সে যে ত্যাগ ও অসারত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে; কোথায় বাঙ্গালার বিশ্ববিখ্যাত লেখকের লেখায় এ সকল চিত্রের সমাবেশ?

রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান, কলিকাতাবাসী, দরিদ্রের জীবনের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার সুযোগ তাহার নাই। এ সকল ভাব তাহার লেখায় ফুটিবে কেমন করিয়া? তাঁহার রচিত 'চোখের বালি,' 'নৌকাডুবি' ও 'গোরাকে' বিশ্লেষাত্মক বাস্তবতা মূলক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি যে পথ প্রদর্শক ইহাদিগকে দেখাইয়া তাহাও বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যই কি Realistic উপন্যাসের আখ্যা পাইবার দাবী ইহাদের আছে? প্রথমোক্ত দুইটী নিতান্ত অস্বাভাবিক ঘটনা সমূহে পরিপূর্ণ। 'চোখের বালিতে' বিনোদিনী ও 'নৌকা ডুবিতে' কমলা যে সকল কাণ্ডকারখানার ভিতর দিয়া স্ব স্ব নারী-মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা বাস্তব জগতে নয়, কল্পনার কুহেলিকার ভিতরই সম্ভব। বস্তুত এই দুইখানি গ্রন্থ ভাষার লালিত্য গুণেই যা কিছু লোকচিত্ত হরণ করে, উপন্যাসের উপকরণ ইহাদের ভিতর নাই। 'গোরা'

শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ কিন্তু ঘটনার নিতান্তই অভাব। বিনয়ের গৃহ হইতে গোরার গৃহে এবং সেখান হইতে পুন বিনয়ের গৃহে প্রত্যাগমন—হাটিতে হাটিতে পাঠকেরও যেন ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পড়ে। তাহা ব্যতীত গ্রন্থে অনেক অসার চীৎকার ও বক্তৃতা আছে, যাহা প্রাণ স্পর্শ করেনা। গ্রন্থশেষে আনন্দময়ীর উদ্দেশে উক্ত 'তুমিই আমার মা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ', গোরার মুখে স্থাপিত এই কথাগুলি নিতান্ত উপন্যাসের মতই বলিয়া বোধ হয়। রবীন্দ্র নাথ গীতি কবিতা লেখক, বড় কিছু লেখা তাহার পক্ষে তেমন সম্ভবপর নয়। 'ঘরে বাইরের' ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর তাহার অপূর্ব্ব প্রতিভা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন আর কোনও গ্রন্থে নয়। যেমন ভাষা, তেমন ভাব। বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস।

উপন্যাসের কার্য্য ক্ষেত্র বিশাল, বিস্তৃত। বাঙ্গলায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উপন্যাস রচনা দুরূহ ব্যাপার। প্রথমত গৃহাবদ্ধ বাঙ্গালীর জীবনের পরিসর নিতান্ত ক্ষুদ্র; দ্বিতীয়ত বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের নিয়মানুসারে পুরুষ ও রমণীর যদৃচ্ছা মিলন এবং তাহার ফলে যে প্রেমের ভাবের উদয় হয় তাহার বিকাশ একপ্রকার অসম্ভব। বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসও তেমন গৌরবময় নয় যে ওয়াল্টার স্কটের মত কোনও ঔপন্যাসিক ঐন্দ্রজালিক তুলিকায় বর্ণনা করিয়া জগৎবরেণ্য হইবেন। কঠিন ব্যাপার কিন্তু প্রতিভা ও উদ্যমের কোন্ দাবী অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে? শুধু বাস্তবতা মূলক উপন্যাস লিখিলেও চলিবেনা, কারণ বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও অতীত জীবনের ভিতর এমন সুমহান সত্য খুব কমই আছে যাহাকে ধরিয়া সে জীবন পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। যদি কোনও জাতির পক্ষে আদর্শ মূলক উপন্যাসের প্রয়োজন থাকে তবে এই সাহস উদ্যম উচ্চাদর্শবিহীন জাতির। আজ সমস্ত জগৎ ভরিয়া যে সাম্য ও প্রেমের মহামন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে তাহার ভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে হইবে। প্রাচীনকে বহুল ভাবে পরিত্যাগ ও কতক সংস্কৃত করিয়া, নবীনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যদি নবজীবনের ভাবে জাতিকে উদ্বোধিত করিবার কাহারও ক্ষমতা থাকে তাহা সাহিত্যেরই আছে এবং সে ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভিতরও উপন্যাসের সর্ব্বাগ্রে স্থান।

বীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

# সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

২০ তারিখে আমরা আবুহাম্মাদ সহরে উপস্থিত হইলাম। এইস্থান হইতে নীল নদী ঠিক উত্তর বাহিনী হইয়াছে। সম্মুখ হইতে এই সহর পর্য্যন্ত নদীর আকার অনেকটা ইংরাজি অক্ষর S এর মত। আবু হাম্মাদ নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হাজার। ইহা একটি জেলা। এখানেও অনেকগুলি ইংরাজ বাস করেন। ভারতের ন্যায় সুদনও মিশরের সর্ব্বত্র ইংরাজেরা সহরের বাহিরে অবস্থান করেন। এখানে মধুর কারবার যথেষ্ট হইয়া থাকে। নিকটে জঙ্গল বলিয়া এই কারবারের বিশেষ সুবিধা। আমরা এখানে দুইদিন অবস্থান করিয়াছিলাম। যাঁহার বাড়ীতে ছিলাম তাঁহার প্রসিদ্ধ মধুর কারবার।

তাঁহার কাছে আমাদের অবস্থান কালীন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার অবসর হইয়াছিল। ঘটনাটা নূতন রকমের বলিয়া এখানে বর্ণনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

যেদিন আমরা আবুহাম্মাদে উপস্থিত হইলাম, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা স্থির হইল যে, পরদিন প্রাতঃকালে গ সাহেব (যাঁহার বাড়ীতে আমরা অবস্থিতি করিতেছিলাম) নিজে, আমাদের কাপ্তেন সাহেব, রতি এবং আরও ১০ জন ঐ দেশীয় লোক ১০টা মধুমক্ষিকা বোঝাই উট লইয়া ৬ মাইল দূরবর্ত্তী জঙ্গলে গমন করিব। ইহার কয়েকদিন আগে ঐ সকল মৌমাছি কন্দেবা প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল।

এক ফুটলম্বা ও প্রায় আধ ফুট চওড়া ছোট ২ কাঠের বাক্সের মধ্যে মৌমাছি রক্ষিত ছিল। এক ২ বাক্সে প্রায় ১৭০০ মাছি ছিল। অনেকেই হয়ত জানেন, উটের দুই পাশে বোঝাই করিতে হয়। প্রত্যেক দিকে এপ্রকার চারিটি করিয়া বাক্স বোঝাই হইল—অর্থাৎ প্রত্যেক উটের উপর আটটি করিয়া বাক্স দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ ১০টা উট লইয়া আমরা প্রাতঃকাল ৬টার সময় গ সাহেবের বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। কয়েকজন

উষ্ট্র চালকের হাতে 'নেয়ি' নামক বাঁশী ছিল। ইহা ঈগল পক্ষীর হাড়ে প্রস্তুত এবং প্রত্যেক বাঁশীতে ৫টি করিয়া ছিদ্র। সহর ছাড়িবামাত্র উহারা সকলে একসুরে যখন বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল, তখন প্রকৃতই বড় মনোরম বোধ হইতেছিল। যাহাদের নিকট নেয়ি ছিল না, তাহারা গলা ছাড়িয়া দিল। এইভাবে আমরা প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিলাম।

তখন বেলা প্রায় ৯টা। আর অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিলেই আমরা একখানি বড় গ্রামে প্রবেশ করিব। মধ্যস্থলে পাকা সরকারী রাস্তা, দুইধারে বড় ২ পাথরের বাড়ী যেন কেল্লার মত দাঁড়াইয়া আছে। উক্ত গ্রামে আহারাদি করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর বেলা ৩ টার পর আমরা আবার রওনা হইব এই প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। আমিও রতি দুইজনে গল্প করিতে ২ যাইতেছি এবং কয়রো পঁহুছিয়া কি করিব তাহার পরামর্শ করিতেছি, এমন সময় এক ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইল।

পরে শুনিয়াছিলাম যে দুই একটা মাছি কোনও রকমে বাক্স হইতে বাহির হইয়া একটা উটের বিশেষ কোনও কোমল স্থানে হুল ফুটাইয়া দেয়। উট তখন যন্ত্রণায় দৌড়াদৌড়ি করিতে আরম্ভ করে, এবং তখন উটে ২ ঠোকা ঠুকি আরম্ভ হয়। পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইল। বাক্সগুলা রাস্তার উপর ধপাধপ পড়িতে লাগিল এবং খণ্ড ২ হইয়া গেল। তখন হাজার মাছি উড়িয়া আমাদিগকে একবারে ঘেরিয়া ফেলিল। প্রথমে উট চালকেরা লম্বা লম্বা পদ বিক্ষেপে অদৃশ্য হইল। তবে মাছিরা যে তাহাদিগকে 'সুধু মুখে' যাইতে দিয়াছিল, এমত বোধ হয় না। বিশেষ দক্ষিণে ও বামে পলাইবার উপায় না থাকাতে ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই কাজ করেন বলিয়া গ সাহেব এপ্রকার ঘটনার জন্য একেবারে যে অপ্রস্তুত ছিলেন এমত নয়। তিনি আমাদের প্রত্যেককে মুখ ঢাকিবার এক রকম জাল দিয়াছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে ২ তিনি উহা মুখে লাগাইবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। আমরা যথা সম্ভব শীঘ্র তাঁহার কথানুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু মাছিরা তাহাদের কাজ এত শীঘ্র আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল যে জাল পরিবার পূর্ব্বেই আমার মুখের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনধিক ৭।৮টা মক্ষীকা ১২।১৪ স্থানে মনের সাধে হুল ফুটাইয়া দিল। সাহেবরা সম্মুখে না থাকিলে আমি যে গলা ছাড়িয়া কাঁদিতাম তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। জুতা, মোজা, পাজামা, কোট ও পাগড়ী দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল বটে, কিন্তু ঐ ছোট ২ প্রাণীগুলা ঐ সকল বর্ম্ম অতিক্রম করিয়া শরীরের কত গুপ্ত ও প্রকাশ্য স্থানে গমন করিয়া যে কামড়াইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

কিন্তু বাহাদুর গ ও কাপ্তেন সাহেব। সাহেব বলিয়া মাছিরা যে তাহাদিগকে ছাড়িয়া কথা কহিয়াছিল, এমন যেন কেহ মনে না করেন। তাঁহারা কিন্তু সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে ঐ সকল বাক্স মেরামত করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার পর মাছিগুলাকে ধরিতে লাগিলেন। ঠিক ঐ সময়ে একজন বৃদ্ধ পাদরী অশ্বারোহণে ঐ পথে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত রাস্তাময় আমরা ও আমাদের উটগুলা ( ৩টা মাত্র, অবশিষ্টগুলা অদৃশ্য হইয়াছিল ) পাগলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতেছি দেখিয়া তিনি প্রথমে বিস্মিত ও পরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। সরকারি রাস্তার মাঝখানে ঐ ভাবে পাগলামি করিবার যে আমাদের বিন্দুমাত্র অধিকার নাই, তাহাই তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় কয়েকটা মাছি তাঁহার নাকে ও তাঁহার ঘোড়ার শরীরের কোনও স্থানে হুল ফুটাইয়া দিল। তাঁহার উপদেশ আর শেষ হইল না। উভয়ে যুগপৎ ভিন্ন ২ সুরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পর মুহূর্ত্তে দুইজনেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

যাহা হউক, প্রায় ৫ ঘণ্টা কাল অমানুষিক পরিশ্রমের পর মাছিগুলা পুনরায় ধৃত ও আবদ্ধ হইল। অবশ্য অনেকগুলা যে পলাইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আমার পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল মধু ব্যবসায়ীরা জঙ্গলে গিয়া চাক ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু এখানে

অবসরে ইচ্ছা করিলে সূর্য্যকান্ত ৪।৫ হাজার টাকা হাত করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহার অবাধ্য পুত্র পিতার মতের প্রতিকূলে পাড়ার এক অনাথা বিধবার একমাত্র মেয়ের পাণি গ্রহণ করিতে জেদ করিল। শেষে সূর্যকান্ত অগত্যা ৪।৫ হাজার টাকার লোভে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইলেন। পাড়ার স্বর্গীয় হরিচরণ দত্তের মেয়ে মনোরমার সঙ্গে শচীকান্তের বিবাহ হইয়া গেল।

তারপর ছেলে যখন বি, এ, পাশ করিল তখন পিতা পুত্রকে ওকালতি করিতে পরামর্শ দিলেন ; ইহার কারণ সূর্য্যকান্ত খুব মামলা বাজ লোক, পুত্র উকীল হইলে প্রতিবাসী শত্রুগণকে জব্দ করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। কিন্তু অবাধ্য পুত্র তাহার আদেশে সম্মত হইল না। সে বলিল জাল জুয়াচুরীর প্রশ্রয়ে মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়া দেশের অধঃপাতে যাওয়ার পথটাকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া—আমার দ্বারা হবে না। শচীকান্ত কিছু দিন পরেই একটা হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া চলিয়া গেল।

( ২ )

সূর্য্যকান্ত ভয়ানক মামলাবাজ লোক ছিলেন। পাড়া প্রতিবেসীকে তিনি মামলা মোকদ্দমায় জড়িত করিয়া এমন হয়রান করিয়া দিয়াছিলেন যে পাড়ার লোক তাঁহার ছায়া দেখিতে পারিত না। এমন কি সর্ব্বদা তাঁহাকে হত্যা করিবার ফন্দি আঁটিত। গ্রামে ভদ্র লোক বড় বেশী ছিল না, এক ভট্টাচার্য্যদের বাড়ী কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গেও সূর্য্যকান্তের অহি নকুল সম্বন্ধ ছিল। গ্রামে সূর্য্যকান্তের কয়েক ঘর মুশলমান ও চণ্ডাল প্রজা ছিল। সূর্য্যকান্ত তাহাদের উপর আজ গোপাটের মোকদ্দমা, কাল গরু ছিনান, পরশ্ব চুরি, এইরূপ একটা না একটা মিথ্যা মোকদ্দমা লাগাইয়া রাখিতেন। অনেক মিথ্যা মোদমায় তিনি তাহাদিগকে জেল খাটাইয়াছেন। শেষে যন্ত্রনায় অতিষ্ট হইয়া দলবদ্ধ প্রজারা জুবার করিয়া তাহার ঘরে আগুণ দিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যকান্ত তাহাতেও নিরাশ হন নাই। তিনি আজীবন তাহাদের সঙ্গে শত্রুতার আগুণ জালিয়া রাখিতে এমনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন। মামলা মোকদ্দমায় সূর্য্যকান্তের সঙ্গে কাহারও পারিয়া উঠার আর কোনই উপায় ছিল না।

পিপীলিকাকে যখন লোকে পদতলে পিষ্ট করিতে যায় তখন ক্ষুদ্র পিপীলিকাও আততায়ীকে দংশন করিতে ক্ষান্ত হয় না। অশান্তির তীব্রতা যখন গ্রামবাসীর একান্ত অসহ্য হইল, তখন সেই ধর্ম্ম জ্ঞান হীন উত্তেজিত প্রজাগণ পরামর্শ করিয়া ইহাই স্থির করিল যে অতঃপর এমন একটা কাজ করিতে হইবে যাহাতে বেহ গ্রাম হইতে সূর্য্যকান্তের বাস উঠাইতে হয়।

( ৩ )

চণ্ডেশ্বর সূর্য্যকান্তের এক দুর সম্পর্কিয় ভাগিনা। সে এতদিন সূর্য্যকান্তের অন্নেই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল। চণ্ডেশ্বর গাঁজা খাইত, মদ খাইত, এক কথায় সংসারের এমন কোনও নেশা ছিল না, এমনকোনও দুষ্কর্ম ছিলনা, চণ্ডেশ্বরের দ্বারা যাহা সাধিত না হইতে পারিত। পাড়ার মেয়ে ছেলেরা চণ্ডেশ্বরকে রাহুর মত ভয় করিত। যে সূর্য্যকান্তের অন্ন কাকে পর্য্যন্ত খাইতে পাইত না সেই সূর্য্যকান্ত কেন যে এমন নরপশুকে অন্ন বস্ত্রদ্বারা প্রতিপালন করিতেন—তাহার কারণ নির্য্যাতনে চণ্ডেশ্বর সূর্য্যকান্তের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। তাহার শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল। চণ্ডেশ্বর লাঠি হাতে করিলে বিশ জন লোক তাহার সাম্‌নে আসিতে ভয় করিত। দশটী টাকা হাতে তুলিয়া দিলে তার পরিবর্ত্তে সে একজনের একটা মাথা আনিয়া দিতে পারিত। সূর্য্যকান্ত কয়েক বার চণ্ডেশ্বরের দ্বারা তাহার শত্রুদের বাড়ী ঘর পোড়াইয়া দিয়াছেন। চণ্ডেশ্বরের জোরে অনেক যায়গা নিজের জবর দখলে আনিতে পারিয়াছেন। একবার তিনি চণ্ডেশ্বরের মাথায় ছুরী মারিয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় গ্রামের কয়েকজন লোককে ছয় মাস করিয়া জেল খাটাইয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে—চণ্ডেশ্বর না থাকিলে এতদিন সূর্য্যকান্তকে অপমৃত্যু মরিতে হইত।

( ৪ )

গ্রীষ্মের বন্ধে শচীকান্ত বাড়ী আসিল। পিতার এই সমস্ত অন্যায় কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া শচীকান্ত এক দিন বিনীত ভাবে পিতার কাছে বলিল—বাবা

মামলা মোকদ্দমাটা বড়ই অশান্তির বিষয়, চিরকালই এইরূপ করিলে জীবনে আর শান্তি মিলিবে কবে? তার চাইতে আপনি আমার সঙ্গে চলুন, সেখানে থাকিলে এ প্রবৃত্তিটা অনেক কমিয়া যাইবে। গ্রামের লোকের যেরূপ ভাব তাহাতে আমার স্বতই ভয় হয়। শুনিয়া সূর্য্যকান্ত ভারি রাগিলেন। বলিলেন—তোর সঙ্গে কোথায় যাব? আমার বাড়ী ঘর আছে; মামলা মোকদ্দমা আছে, সকল ফেলিয়া চলিয়া যাই। বেটাদের বাড়ীতে ঘুঘু না চড়াইয়া আমি ছাড়িব না। শ্মশান পর্য্যন্ত আমার প্রতিজ্ঞা, তার পর আমার সমস্ত সম্পত্তি চণ্ডেশ্বরকে এই মর্ম্মে উইল করিয়া দিয়া যাইব, যেন সে আজীবন তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তুই আমার ত্যজ্য পুত্র তোর কথা আমার অশ্রাব্য। শচীকান্ত বলিল—তা আমার সঙ্গে না যান পাড়ার লোকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বন্ধুভাবে থাকিতে দোষ কি? সদ্ব্যবহারে বনের পশু বশ হয় এরা ত মানুষ। সূর্য্যকান্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন "রামকৃষ্ণ উপদেশ শুনিতে চাই না। তোর যা ইচ্ছা তুই তাই কর।"

শচীকান্তের ইচ্ছাছিল যে পিতা ও মনোরমাকে লইয়া এই জতুগৃহের মধ্য হইতে দূরে যাইয়া বাস করে। চারিদিকে রক্তবীজের মত রাশি রাশি শত্রু, তার মধ্যে মনোরমাকে ও বৃদ্ধ পিতাকে রাখিয়া যাইতে তাহার মনে যেন একটা দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু পিতাত যাইবেন না। শচীকান্ত পায় ধরিয়া দেখিল, সূর্য্যকান্ত অটল অচল। শচীকান্ত পারিত মনোরমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে। কিন্তু বৃদ্ধ পিতাকে একাকী ফেলিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া যাওয়াটা তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞানের মধ্যে স্থান পাইল না। পিতাকে কে সেবা শুশ্রূষা করিবে, দু বেলা কেই বা দু মোটা অন্ন দিবে? শচীকান্ত চলিয়া গেল।

( ৫ )

দিন কয়েক পর মনোরমা একখানা চিঠি পাইল— শচীকান্তের জ্বর। বিদেশে জীবনের একমাত্র ধ্রুব তারা স্বামী পীড়িত—মনোরমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই দিন হইতে মনোরমা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। আকুল চিন্তা তরঙ্গ মনোরমাকে লইয়া দুকূলে আছাড়ি বিছাড়ি খায়। এমন একজন সহায় সুহৃদ নাই যাহার কাছে একদণ্ড বসিয়া সে তাহার দুঃখের একটী কথা কহিয়া প্রাণের ভার লাঘব করিবে। গণ্ডারের বাস-স্থানের ত্রিসীমায় যেমন অন্য বন্য জন্তু আসিতে সাহস পায়না সেইরূপ পাড়া প্রতিবাসী সূর্য্যকান্তের ভয়ে তাহার আঙ্গিনায় আসিতে ভয় পাইত। মনোরমা সারাদিন সারানিশি একলাটী বসিয়া কাটিত। তাহার শূন্যময় একক জীবনের একমাত্র সুখ ছিল স্বামী চিন্তা। শচীকান্ত মধ্যে মধ্যে তাহাকে গল্পের বই কিনিয়া আনিয়া দিত; মনোরমা তাই নিয়া থাকিত; শচীকান্ত যে কয়েক দিন বাড়ী থাকিত সেই কয়েকটা দিন মনোরমার কাছে দুর্গোৎসবের মত কাটিয়া যাইত। শচীকান্ত প্রবাসে যাইত, মনোরমার হৃদয় বিজয়ার অন্ধকারে ঢাকা পড়িত। আজ সেই না স্বামী, জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বামী তাহার, বিদেশে পীড়িত। মন ভালরদিকে না যাইয়া মন্দেরদিকেই যাইল। শেষে হৃদয় বেগ যখন অসহ্য হইল তখন মনোরমা শ্বশুরকে পত্রখানা দেখাইল। পত্র দেখিয়া সূর্য্যকান্ত বলিলেন এটা পাগলা জ্বর, তিন দিনের বেশী থাকিবে না, কিছুই নহে।

তিন দিন পর টেলিগ্রাম আসিল। শচীকান্ত নেমোনিয়ায় আক্রান্ত, বাঁচিবার আশা নাই। টেলিগ্রাম পাইয়া সূর্য্যকান্ত চণ্ডেশ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন—ওরে শচী নাকি কাতর, তুই একখানা নৌকা করে বৌমাকে নিয়ে সহরে যা। চণ্ডেশ্বর নৌকা লইয়া ঘাটে আসিল।

ঘাটে নৌকা বাধা; মনোরমা বার বার লুটীয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরের পা ধরিয়া বলিল "আপনিও সঙ্গে চলুন।" সূর্য্যকান্ত বলিলেন—তা কি হয় বাড়ী ঘর ফেলে যাব? আজই শালারা আমার মামলা মোকদ্দমার দলিল পত্র টাকাকড়ি সব চুরি করিয়া নিয়া যাইবে। মনোরমা বলিল "চণ্ড বরং বাড়ীতে থাকুক।" সূর্য্যকান্ত বলিলেন না। আগামী সোমবারে আমার একটা বড় রকম মোকদ্দমার তারিখ। আমার এর মধ্যে একপাও নড়বার যোগাড় নাই।

( ৬ )

শচীকান্ত আসিয়া সূর্য্যকান্তের পদ ধূলি লইল। সূর্য্যকান্ত বলিলেন—শরীরটা এখন সারিয়াছে? বৌমা কোথায়?" শচীকান্ত যেন আকাশ হইতে পড়িল। বিষয় কি? শেষে পিতার কাছে শচীকান্ত সমস্ত শুনিল। হায় পিতা, আপনি চণ্ডেশ্বরের পাপের প্রশ্রয় দাতা। না জানি কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে? দশটা টাকা দিলে যাহার অসাধ্য কর্ম্ম জগতে নাই, এমন দুষ্টের সঙ্গে আপনি আপনার বালিকা পুত্র বধুকে যাইতে দিলেন!

অনুসন্ধানের পালা পড়িল। থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। একমাস। ক্রমে দুমাস। মনোরমার কোনও সংবাদ নাই। সতীলক্ষ্মীকে লইয়া রাক্ষস কোন বিজন গহ্বরে পালাইয়াছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শচীকান্ত মনোরমার অন্বেষণ করিতে লাগিল।

তিন মাস পর কলিকাতার পুলিশ এক পতিতার গৃহ হইতে হতভাগিনীকে উদ্ধার করিয়া আনিল। সঙ্গিগণ সহ চণ্ডেশ্বর ধরা পড়িল। বিচারে চণ্ডেশ্বর ও তাহার সাহায্যকারী দুর্ব্বৃত্তগণের গুরুতর দণ্ড হইয়া গেল।

আসামীর দণ্ড হইল বটে, কিন্তু সেই নিরাশ্রয়া হতভাগিনীর কি উপায় হইবে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিল না। শ্বশুর সূর্য্যকান্ত পুত্র বধুকে গৃহে স্থান দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। নিরাশ্রয়া হতভাগিনী অপবাদের ডালি লইয়া দুঃখিনী বিধবা জননীর গলগ্রহ হইল। সমাজ মনোরমাকে ত্যাগ করিল বটে কিন্তু মা ত আর মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারে না।

( ৭ )

পূজার বন্ধে যখন শচীকান্ত বাড়ী আসিল, তখন সূর্য্যকান্ত আবার তাহাকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিলেন। বিবাহ তিনি একরূপ ঠিক করিয়াই রাখিয়া ছিলেন। শচীকান্ত পিতার কথায় হাঁ না কিছু না বলিয়া সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে শ্বশুর বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল।

শচীকান্ত শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছা মাত্র একটা কান্নাকাটীর রোল পড়িয়া গেল। শচীকান্ত বহু কষ্টে তাহাদিগকে থামাইয়া বলিলেন কর্ম্মদোষ অলঙ্ঘনীয় যা হইবার তা হইয়াছে। সে রাত্রে শচীকান্ত শ্বশুর গৃহেই রহিল।

( ৮ )

নির্ব্বাপিত আলোক রশ্মিটার মত সঙ্কোচিত ভাবে মনোরমা শচীকান্তের শয়ন গৃহের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইল। প্রথম দৃষ্টিতে সেই মর্ম্মাহতা নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর কঙ্কালাবশিষ্ট দেহটী দেখিয়া শচীকান্ত চিনিতে পারিল না। তাহার জীবন সরোবরের সেই হেম নলিনী হিমতাপে এমন করিয়া দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। মনোরমার অমন জলন্ত রূপের প্রভা বেদনার আবিল ভস্মে ঢাকা প'ড়িয়াছে। মলিন বসন, মস্তকে রুক্ষ কেশ পাশ। শচীকান্ত ডাকিল—"একি মনো?" মনোরমা শচীকান্তের কাছে যাইতে সাহস পায় নাই। আলোর পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের ন্যায় হতভাগিনী দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা স্বামীর আহ্বান দেবতার বীণার ন্যায় তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কতকাল, কতকাল, যেন কত যুগ যুগান্ত বহিয়া গিয়াছে, যেন কতকালের অনাবৃষ্টিতে হৃদয় পুড়িয়া পুড়িয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর অকস্মাৎ এই বারিবিন্দু। চক্ষের জলে মনোরমা পথ দেখিতে পাইতেছেনা। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শচীকান্তের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল। যেন আজ কে তাহার এই জীবন ব্যাপী শোক দুঃখ লাঞ্ছনার, তীব্র তাপ দগ্ধ প্রাণের মুক্তির জন্য তাহার অভিষ্ট দেবতার চরণে বদ্ধ দিল। দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু শচীকান্তের পায় গড়াইয়া প'ড়িল। শচীকান্ত মনোরমাকে তুলিয়া পার্শ্বে বসাইয়া বলিল—"মনোরমা যা হইবার তা হইয়াছে, বিধির নির্ব্বাহ অখণ্ডনীয়, এক্ষণে কর্ত্তব্য?" মনোরমা বলিল—তোমার কর্ত্তব্য তুমি দেখ, ভগবান আমার সকল আশা সকল সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। লাঞ্ছিতা পতিতা দুঃখিনীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখিতে পাইলাম, ইহার চেয়ে ভগবানের কাছে আমার কাম্য কিছুই ছিল না। আর যে তুমি আমায় দেখা দিবে, সে আশা হৃদয়ে স্থান দিই নাই; আমার সে অসম্ভব আশাও সফল হইল।

শচীকান্ত মনোরমার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া

বলিল—"সে কি মনোরমা?" মনোরমা বলিল—যে সমাজ পরিত্যক্তা, পৃথিবীতে যাহার স্থান নাই, আশ্রয় নাই, তাহার গতি কি? যার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই, সে কোথায় যাইবে?"

শচীকান্ত—সেই জন্যই আসিয়াছি মনোরমা; মনের বলে তুমি পবিত্র, যার মন পবিত্র, জগতে যদি সতী বলিতে হয়, তাকেই, তাকেই বলিব। দৈব বশে যাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য তুমি দোষী নও। সমাজ পরিত্যক্তা হইতে পার কিন্তু পতি পরিত্যক্তা নও।"

মনোরমা—"সেটা তোমার মনের বিশেষত্ব কিন্তু তাহাতেও শান্তি পাইবেনা। জীবনন্তকাল লোকে এ কলঙ্ক ঘোষণা করিবে; সমাজে তুমি মুখ দেখাইতে পারিবেনা। তার চেয়ে আবার বিবাহ করিয়া সুখী হও, আমার জন্য ভাবিও না।

শচীকান্ত—"সমাজ যা বলে বলুক আমি তোমাকে গ্রহণ করিব।"

সেই রাত্রে হতভাগিনী স্বামীর শয্যা পার্শ্বে স্থান পাইয়া পাপীর স্বর্গ লাভের মত স্বীয় জীবনকে ধন্য মনে করিল।

( ৯ )

পর দিন শচীকান্ত মনোরমাকে নিয়া পিতৃ গৃহে প্রবেশ করিলে গ্রামে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সূর্য্যকান্ত শুনিলেন। তিনি শচীকান্তকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে বউকে নিয়ে এলি;—এখনই যে সমাজে আটক হব? শীগ্‌গির আমার বাড়ী থেকে ওকে বাহির করে দে; তোকে সোণার বউ বিয়ে করাব।—শচীকান্ত বলিল—"বাবা সমাজ টমাজ বুঝিনা, চল এখান হইতে কিছু কালের জন্য অন্যত্র যাই। পাড়া গাঁয়ে অনেক কলঙ্ক সময়ে সুধরায়। আমরা সমাজ হইতে কিছুকাল দূরে যাইয়া বাস করি, সময়ে আবার আসিব।" সূর্য্যকান্ত বলিলেন "আমার এত গুলো মোকদ্দমা মামলা ফেলিয়া আমি যাইতে পারিবনা। তুই উটাকে ত্যাগ কর।"

শচীকান্ত—"তার কি দোষ?"

সূর্য্যকান্ত—দোষ টোষ বাপু সমাজের কাছে খাটেনা।

শচীকান্ত—তবেকি বিনা দোষে একজন কে ত্যাগ করিতে হইবে?

সূর্য্যকান্ত—তা সমাজ ধরিলে উপায় নাই।

শচীকান্ত—আচ্ছা আমি সমাজকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যে ব্যক্তি দৈব লাঞ্ছিত, মনে যার, কিছু মাত্র পাপ নাই, সমাজ তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহা করিতে চান? যে নিরাশ্রয়া কৃপা প্রার্থী হইয়া সমাজের পায়ে স্থান মাগে, তার প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য কি?

সূর্য্য—কর্ত্তব্য টর্ত্তব্য চুলোয় যাক্, দশের সঙ্গে পারা যায় কিরে?

শচী—তবে শুন, যে সমাজ নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয় না, ব্যথীর ব্যথা বুঝেনা, যেখানে ন্যায় সঙ্গত বিচার নাই, সে সমাজ ত্যাগ করাই সঙ্গত। আমি জানি, আমার স্ত্রীর মনে পাপের লেশ মাত্র নাই, সে দৈব লাঞ্ছিতা। স্ত্রী যদি পতিতাও হয় তবে তাকে বুঝাইয়া ধর্ম্ম পথে আনাই স্বামীর কর্ত্তব্য, তাকে পরিত্যাগ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাকে পত্নিরূপে গ্রহণ করিয়াছি, আমি সমাজ পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সমাজের জন্য ধর্ম্ম পত্নী ত্যাগ করিতে পারিনা।

সূর্য্যকান্ত—হাঁরে সীতার মত যে পবিত্রা অগ্নি শুদ্ধা পত্নী রাম তাকেও সমাজের ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহা যে শাস্ত্রের লিখা।

শচীকান্ত—আর পতিতা আশ্রয় হারা জাহ্নবী যখন পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন তখন এমন একজন মহাপুরুষ সমাজ কে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়া ছিলেন, এওত সেই শাস্ত্রেরই লিখা।

সূর্য্যকান্ত পুত্রের সঙ্গে কথায় না পারিয়া রাগিয়া বলিলেন—"লক্ষীছাড়া কুপুত্র, লেখা পড়া শিখিয়া এই বুঝি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বুঝিয়াছিস্? তুই তোর বউকে নিয়া এই মুহুর্ত্তে আমার বাড়ী থেকে বাহির হইয়া যা।

শচীকান্ত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্ত্রীকে নিয়া সেই দিন পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীঃ—

# আলোচনা।

## হিন্দু বিবাহ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য অনারেবল শ্রীযুক্ত পেটেল হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহের অবাধ প্রচলন উদ্দেশ্যে এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। তাহা নিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণের মধ্যে অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। সে সম্পর্কে নানাস্থানে যে সকল সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছে, তাহাই তাহার পরিচায়ক।

শ্রীযুক্ত পেটেলের প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির মোটামুটি মর্ম্ম এই যে, কোনও হিন্দু যদি অপর কোন অসবর্ণা নারীকে বিবাহ করেন, তবে সেই বিবাহও বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে, সুতরাং সেই বিবাহ জাত সন্তান সন্ততিও অপর সবর্ণ পতি-পত্নী-সঞ্জাত সন্তান দিগের ন্যায় সমাজে সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

হিন্দুর শাস্ত্র চির দিনই অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী বলিয়া আমাদের বোধ হয়। স্মৃতি শাস্ত্রে অষ্ট প্রকারের বিবাহ এবং অনুলোম, প্রতিলোম, এই দুই প্রকার অসবর্ণ বিবাহেরও উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু অনুলোম প্রতিলোম এই উভয় প্রকার বিবাহই হিন্দু শাস্ত্র মতে নিন্দনীয়। পুরাণেতিহাসে অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত থাকিলেও তাহার প্রশংসা নাই। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক পণ্ডিত গণের অভিমত এই যে, পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠির, কৌরব-দুর্য্যোধনাদির বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও, ভারতের তৎকালিক শক্তিমন্ত, সামন্ত রাজগণের, যুধিষ্ঠিরের রাজসিংহাসন প্রাপ্তিসম্পর্কে আন্তরিক অনিচ্ছাই তাঁহার সহজে রাজ্য লাভের অন্যতম অথবা প্রধান অন্তরায় ছিল। কেননা যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ঔরসে জন্ম বিষয়ে তাঁহাদের অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ভ্রাতাদির জন্ম সম্পর্কে সূর্য্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতাদিগের মহোচ্চ নাম সংসৃষ্ট থাকিলেও, তাঁহাদের জন্ম রহস্য নিবিড় প্রহেলিকাচ্ছন্ন। ঐ শ্রেণীর পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পাণ্ডু রাজের পত্নী গর্ভজাত হইলেও প্রধানতঃ এই একটী কারণেই, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি শক্তিশালী সামন্ত রাজগণের মনে মনে যুধিষ্ঠিরের রাজসিংহাসনাধিরোহণ অনুমোদনীয় হইতে পারে নাই এবং এই জন্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাই কৌরব দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেন। কারণ দুর্য্যোধন কনিষ্ঠ হইলেও শুদ্ধ শোণিত; সুতরাং তিনিই রাজচক্রবর্ত্তীর আসনে অধিষ্ঠিত হন, ইহাই তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন। পরবর্ত্তী কালে মগধেও চন্দ্রগুপ্ত নির্ব্বিবাদে রাজপদ প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় তাঁহার শুদ্ধ শোণিতের অভাব বলিয়াই ঐ সকল পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

অসবর্ণ মিলনজাত সন্তানেরা বর্ণশঙ্কর বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে—পুরাণেতিহাসে সর্ব্বত্র নিন্দিত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণশঙ্করের বহু নিন্দা করিয়াছেন। মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রকার ঋষিগণ, অসবর্ণ বিবাহকে প্রীতি বা অনুরাগের চক্ষে দর্শন করেন না, তাহা বোধহয় সকলেই অবগত আছেন।

অসবর্ণ বিবাহের আধুনিক সমর্থক দিগের কেহ কেহ বলেন যে, প্রাচীন ভারতে কোন কোন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও, ক্ষত্রিয় নিম্ন অসবর্ণ জাতা কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন, সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ পুরাকালে হিন্দু সমাজে প্রচালিত ও অনিন্দনীয় ছিল। অর্জ্জুনের চিত্রাঙ্গদা, উলুপী প্রভৃতির পাণি গ্রহণ তাঁহারা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেন। কিন্তু যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা বর্ণান্তর জাতা রমণী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সকল মহিলাকে কিম্বা তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণকে, অপর ক্ষত্রিয় কুল জাতা পত্নীর বা ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত সন্তানগণের সহিত তুল্য সামাজিক সম্মান দিতেন না, কিম্বা দিতে পারিতেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বভ্রুবাহন আমন্ত্রিত হন নাই, ইহাতেও বোধ হয়, বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের ঔরসজাত হইলেও, শুদ্ধ শোণিত অপর ক্ষত্রিয় গণের সহিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার অনধিকারী ছিলেন। অপর দিকে শকুন্তলা ব্রাহ্মণ ঋষির পালিতা মাত্র, কিন্তু ক্ষত্রিয় কন্যা, সুতরাং শকুন্তলার গর্ভজাত শিশু সর্ব্বপ্রকারেই রাজা দুষ্মন্তের স্নেহ, সমাদর ও সমাজের নিকট সম্মান পাইবার অধিকারী ছিলেন।

আর্য্য শাস্ত্রকারগণ বলেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। হিন্দুর পত্নী গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্র প্রজনন। এমনকি জ্যেষ্ঠ পুত্রই হিন্দু শাস্ত্রকারের নিকট একমাত্র "পুত্র" পদ বাচ্য। অপর পুত্রেরা "কামজ পুত্র" বলিয়া নিন্দিত, সুতরাং তাহারা জ্যেষ্ঠ পুত্রের তুল্য গৌরবের অধিকারী নহেন। হিন্দু শাস্ত্রকার-গণের নিকট হিন্দুর পত্নী কিরূপ উচ্চ সম্মানের পাত্রী, কিরূপ মহোচ্চ গৌরবের অধিকারিণী, একটুকু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা অবস্থায়, অথবা পত্নীর মৃত্যু ঘটিলে পর, অনেক হিন্দু দারান্তর গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকার গণের চক্ষে তাহা প্রশংসনীয় নহে। হিন্দু পতি-পত্নীর সম্পর্ক অপর ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মত চুক্তি মূলক "কনট্রাক্ট", সাময়িক সুখ সুবিধার জন্য পরস্পরের জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী—নহে; এমনকি হিন্দু পতি পত্নীর সম্বন্ধ একের বা উভয়ের জীবনান্তেও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। মহারাজ দশরথ কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা এই পত্নীত্রয়কে বিবাহ করিয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহারই ফলে পরবর্ত্তী কালে যোগ্যতম এবং সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরাম চন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা সত্বেও বনবাস দিতে বাধ্য হন এবং পরিশেষে দারুণ দুঃসহ পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ করিয়া বহু পত্নীকের উপযুক্ত প্রতিফল ভুগিয়া বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করেন, মহাকবি বাল্মীকি তাঁহার অমর কাব্যে তাহা প্রদর্শন করিয়া লোক শিক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। বহু বিবাহ অপর সাধারণের পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য, এমন কি ভারতের একচ্ছত্র মহারাজ দশরথের ন্যায় অসামান্য শক্তিশালী পুরুষও বহু বিবাহের বিষময় ফলে জর্জ্জরিত দেহে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। শাস্ত্রে হিন্দু পুরুষের বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণে দারান্তর গ্রহণের অনুমতি আছে বটে, কিন্তু তাহা দৈহিক ভোগ সুখ বা বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া পরে যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাতে সোনার সীতা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বামে রাখিয়াই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তিনি তখন ইচ্ছা করিলেই দারান্তর গ্রহণ করিয়া "সপত্নীক ধর্ম্মাচরণ" করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কবিগুরু বাল্মিকী এখানেও সমাজ শিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন। হিন্দুর মতি গতি শাস্ত্র ও সদাচারের গূঢ় মর্ম্ম এখানেও বিদ্যমান। সে যাহা হউক, হিন্দুর চক্ষে পত্নী যে বিলাস ভোগের সামগ্রী নহে, পরন্তু ধর্ম্ম কার্য্যের শ্রেষ্ঠ সঙ্গিনী এবং দেবী বলিয়া সমাদৃতা এবং সম্পূজিতা এ দেশের শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

অসবর্ণ বিবাহের পরিপোষক প্রবর্ত্তকেরা পত্নীকে বিশেষ গৌরবের চক্ষে দর্শন করেন—এরূপ বোধ হয় না। তাঁহারা বলেন, "জীবনের বড় সুখ ভালবাসা, তাহাতে অপরের বাধা দিবার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। নরনারীর মিলন ব্যাপারে দেশ, সমাজ, স্বীয় আত্মীয় বন্ধু, পরিবার, এমন কি পিতা মাতারও অঙ্গুলি সঙ্কেত করা অস্বাভাবিক, অসঙ্গত অত্যাচার। ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাধীনতার এ ক্ষেত্রে অপরের হস্তক্ষেপ নিতান্তই দুঃসহ এবং অবৈধ।" পাশ্চাত্য সাহিত্যের, নাটক নভেলের আপাত মনোরম নায়ক নায়িকাদের মোহমাদকতাময় চিত্র চরিত্রের অনুধ্যানে যে সকল তরলবুদ্ধি ব্যক্তির চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাঁহাদের মুখে এরূপ উক্তি শুনিয়া দুঃখিত হইলেও আমরা বিস্মিত হইনা। কিন্তু পাশ্চাত্য ধর্ম্ম শাস্ত্রেও পুরুষের সহিত পত্নীর সম্পর্ক যে অতীব পবিত্র হওয়াই সঙ্গত তাহার বিশিষ্ট আদেশ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পতি পত্নীর সম্পর্ক সম্বন্ধে ফারিসিরা মহাত্মা ঈষাকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"They are no more twain but one flesh" পতি পত্নী বস্তুতঃ পরস্পর পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ এবং উভয়ের পবিত্র সম্মিলনে তাঁহারা উভয়ে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য পদ বাচ্য হন। পতিপত্নীর মিলনে দৈহিক সুখ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম জীবন যাপন এবং সৃষ্টি প্রবাহ সংরক্ষায় সহায়তা করিয়া ভগবানের মঙ্গলময় মহদুদ্দেশ্য সাধন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুপ্রজনন বিদ্যা শাখার এখনও শৈশবাবস্থা। কিন্তু সুপ্রজনন বিদ্যায় যাঁহারা পণ্ডিত

# আমেরিকার সংবাদ পত্র।*

ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে আমেরিকানেরা জগতের জাতি সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সংবাদপত্র প্রিয়। ইহাদের সংবাদ জানিবার ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসী—একরকম রাক্ষুসে বলিলেও চলে। আমেরিকানেরা বরং একবেলা না খাইয়া থাকিবে তবু সংবাদপত্র পাইলে না পড়িয়া ছাড়িবে না। এক এক জন দিনে দুই তিন খানা, অনেকে তাহারো অধিক সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া থাকে।

আমেরিকান সংবাদপত্রে ব্যক্তিত্ব জাহির করিবার উপায় নাই, তাহা অজ্ঞাত, অদৃশ্য, সার্ব্বজনীন শক্তির সংহিত বিকাশ। সম্পাদকগণ তাঁহাদের নামের জোরে সাধারণত: পরিচিত নহেন। লুইভেল কুরিআরের Colonel Henry Waterson বা Arthur Brisbane র ন্যায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সম্পাদকগণের কথা অবশ্য ধর্ত্তব্য নহে। Arthur Brisbane. আধুনিক আমেরিক সংবাদপত্র সম্পাদকবর্গের অগ্রণী, সম্ভবতঃ তিনি যাহা লিখেন তাহা যত লোকে আগ্রহ সহকারে পড়ে এত আর কাহারো নহে। যে কাগজে তাঁহার লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হয়, তাহার দৈনিক গ্রাহক সংখ্যা দুই লক্ষেরও অধিক সুতরাং তিনি যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অপেক্ষা অধিক মাসোয়ারা পাইবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

Thomas Carlyle একস্থানে লিখিয়াছেন, সংবাদপত্র পরিচালন কার্য্যটা কি মহৎ! এক একজন সম্পাদক কি বস্তুতঃ জগতের শাসক নহেন? তাঁহারা যে শাসকদিগকেও চালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক আমেরিকার সংবাদপত্র সম্পাদকগণের সে মর্য্যাদা খসিয়া পড়িয়াছে, অতীতকালে তাঁহারা শাসক সম্প্রদায়ের উপরও কাঠি চালাইতেন বটে। তৎকালে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলির কাজ ছিল লোকমত গঠন করা, সংবাদ প্রচারের কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা আধুনিক রূপে সম্পাদিত হইত না।

এখন আমেরিকার সংবাদপত্রে সাধারণতঃ চার হইতে ছয় কলম সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকে। সে গুলি ছোট ছোট স্বতন্ত্র প্যারায় বিভক্ত; সাময়িক সংবাদের উপর ছোট খাটো মন্তব্যে তৎসমুদায় পূর্ণ থাকে। সম্পাদকের মাতব্বরী মন্তব্য পড়াটা আমেরিকানদের নিকট নিতান্ত অনর্থক কাজ; কেন? তাহাদের কি নিজেদের মতামত প্রকাশের শক্তি কোন অংশে অপচুর? সংবাদটা জানাই তাহাদের নিতান্ত গরজের; এজন্য অন্যান্য বিবরণ পড়িয়া যদি যথেষ্ট সময় থাকে তবে আমেরিকানেরা সম্পাদকীয় স্তম্ভের দিকে তাকায়। বস্তুতঃ আজকাল পুস্তক, মাসিক পত্র, এবং সাপ্তাহিক নানা বিষয়িনী পত্রিকাদির যেরূপ বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সময়ের সদ্ব্যবহারী আমেরিকানগণ যে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। ইলিনোইস্ সহরের একখানা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের শিরোভাগে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে "সম্পাদকীয় স্তম্ভটি না দেখিয়া কাগজ ফেলিবেন না—এই অনুরোধ" কথায় আছে গরজ বড় বালাই।

এখন, কথা হইতেছে, যদি লোকে সম্পাদকের মতামতেরই তোয়াক্কা না রাখে তবে তাঁহারা কিরূপে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করেন?

আমেরিকান্ সম্পাদকেরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিপক্ষের প্রতি পরুষ বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া পুরুষোচিত ক্ষমতা প্রদর্শনের পক্ষপাতী নহেন; তাঁহারা দিব্য একটু গিন্নিপনা খাটাইয়া নিজেদের কাজ বাগাইয়া লইয়া থাকেন। মনে করুন, কোন একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কোন পত্রিকার মতের বিপক্ষে দাঁড়াইলেন পত্রিকা সম্পাদক অমনি তাঁহাকে দাগীর ফর্দ্দে ফেলিবেন। তাঁহার সম্পর্কে ঘুণাক্ষরে ও আর কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। রাজনৈতিক বিভাগে প্রতিষ্ঠাবানের পক্ষে তাঁহাদের নাম জাহির হইবার পথে কাঁটা খাঁড়া করিলে সেটা যে কত বড় শাস্তি আজ কালকার সাম্প্রদায়িক হল্লার বাজারে অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন। Los Angeles Times পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক Labour Union এর প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রবল লোকমত গঠন করিয়াছিলেন। যাহা Union এর বিরোধী, এরূপ সংবাদ তিনি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন; অনুকূল যাহা কিছু, তৎসমুদায়ের পরিবর্জ্জনই

* প্রোফেসার সুধীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লিখিত (ইণ্ডিয়ান রিভিউ হইতে।)

তাঁহার সিদ্ধি লাভের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ ছিল।

নেপোলিয়ান বলিয়াছেন— পুনরাবৃত্তি জিনিষটা বড় প্রয়োজনীয়। অনেকে উহার কদর জানে না বা উহা প্রয়োগ ক'রবার উপযুক্ত মুন্সীয়ানা তাহাদের নাই। আমেরিকান সম্পাদিকেরা কিন্তু উহাকে ষোল আনা বুঝিয়া লইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত নিজেদের কাজ হাসিল না হয় তাবৎ নানা ছলাকলায় একই বিষয় ফেনাইয়া ফেনাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া আবৃত্তি করিতে তাঁহারা কিছু মাত্র বিরক্তি বোধ করেন না। তাঁহাদের হুনিয়ারী সর্ব্বাপেক্ষা ইহাতেই। একজন সম্পাদক লিখিয়াছেন, "বল আবার বল ইহাই আমাদের ইষ্টমন্ত্র।" ছয় মাস হইল আমি এক খানা সংবাদ পত্র লইতেছি কাগজ খানি সৈন্য ও নৌবিভাগ প্রসারণের পক্ষপাতী। এমন দিন নাই যে সংবাদ পত্র খানি ঐ সম্বন্ধে আলোচনা না করিতেছে।

ভারতীয় সম্পাদকগণ জন সাধারণ হইতে দূরে দূরে আপনাকে বাঁচাইয়া চলেন। * সাধারণতঃ তাঁহারা জন সাধারণের এক প্রকার অনধিগম্য। তাঁহারা গিরিগুহা-বাসী হইয়া ধ্যান ধরিয়া থাকেন। আমেরিকার সম্পাদক গণের এমন পেচক স্বভাব সুলভ বিবিক্ত দেশ সেবিত্বের স্পৃহা নাই, সাধারণের জন্ম তাঁহাদের দ্বার সতত উন্মুক্ত। জন সাধারণের হৃদয়ের পূর্ণতত্ব যাহাতে লইতে পারেন তাহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য; তাঁহারা যে সমগ্র জাতির নাড়িটা হাতে লইয়া বসিয়া আছেন।

আফিসের কর্ম্মচারী বর্গের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ দৃষ্টি জন সাধারণের প্রতি তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। বড় বড় সংবাদপত্রের পরিচালন সমিতি আছে; প্রাত্যহিক ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে তাহার বৈঠক বসিয়া থাকে। ইহা সংবাদপত্রের ক্যাবিনেট বা মন্ত্রণাসভা।

* পাঠকগণ শুনিলে বিস্মিত হইবেন আমার জনৈক নমঃশূদ্র জাতীয় বন্ধু একদা বিশিষ্ট সংবাদপত্র সম্পাদক এবং জন সাধারণের নেতৃত্বস্পর্দ্ধি বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট গিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুবরের পরিচয় লইয়া, তাঁহার জামাতাকে বলিয়াছিলেন ওঃ তবে ইহারা হিন্দু! বেশ, ইহাদিগকে আমরা ছাড়ি কেন? আমাদের দলপুষ্ট হইবে।
অপর একজন জননায়ক আমার বন্ধুকে বলিয়াছিলেন তোমরা কি মরা পোড়াও? ইনি কিন্তু আধুনিক বঙ্গের নেতৃমণ্ডলের মধ্যমণি!

লেখক।

আমার পরিচিত একজন সম্পাদক বলেন, বরং সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাড়া কাগজ চলিতে পারে কিন্তু টাট্‌কা খবরের যোগানি নহিলেই নয়। প্রকৃতপক্ষে খবর যোগা-ইতে আমেরিকার সংবাদপত্র সমূহ বিশেষ সুদক্ষ। সংবাদ জিনিষটা কি, ইহা লইয়া আমেরিকার সম্পাদক মহলে বেশ জটলা উঠিয়াছে। কাহারো কাহারো মতে ঘটনা মাত্রেই খবর। Newyork Tribune এর সুযোগ্য সম্পা-দক Horace Creekly বলেন জগদীশ্বর যাহা ঘটিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তিনি এতটা অহঙ্কারী নহেন যে তাহা রটাইবার অনুপযুক্ত মনে করিবেন। অনেকের মতে যাহা প্রকাশের যোগ্য হয়, তাহাই প্রকাশ কর।

আবার এমন সম্পাদকও অনেক আছেন যাহারা মনে করেন সংবাদ সাধারণ ঘটনা হইতে বিশিষ্টতাযুক্ত হওয়া উচিত; আকস্মিক, অসাধারণ, অচিন্ত্য মানবের আবেগ, উৎসাহের ও কৌতূহলের উদ্দীপক যাহা, যদি সংবাদ বলিতে হয়, সংবাদের মত সংবাদ তাহাই।

কোন সম্পাদক বলিয়াছিলেন—তুমি দেখিলে একটা কুকুর কোন লোককে কামড়াইতেছে; ইহা বাস্তবিক সংবাদ নহে, কারণ কুকুরে মানুষকে কামড়াইয়া থাকেই। যদি দেখ, মানুষ কুকুরকে কামড়াইতেছে, অচিরাৎ তার করিবে। উপরের সূত্র অনুসারে নীচের ঘটনাটী—সংবাদ যে কি—তাহার একটি সেরা নমুনা। বিগত গ্রীষ্মকালে একব্যক্তি নিউইয়র্কের প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘর প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রকাশ করে যে সে সতর রকমের হাঙ্গর বেমালুম উদরসাৎ করিয়াছে। সংবাদ দাতাগণের পক্ষে ইহা একটী লোভনীয় সংবাদ। তাঁহারা অর্দ্ধেক কলম ভরিয়া নানা সাজে এই ঘটনা উপন্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

বাস্তবিক ইহা যে হইবারই কথা। কোন অজানিত কাল হইতে হাঙ্গর নর মাংসে উদর পূর্ত্তি করিয়া আসিতেছে সুতরাং মানুষ খোর হাঙ্গরের এমন কোন কেরামতি নাই যাহা শুনিতে তেমন আগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু মানুষে যদি হাঙ্গর খাইয়া থাকে, তবে সে যে এক নূতন জীব! কে কোথা শুনেছে হেন কে কোথা দেখেছে? সুতরাং সম্পাদকগণ সাগ্রহে সংবাদটা লুফিয়া লইলেন, মন্তব্যের উপর মনোহারী মন্তব্য বলিতে লাগিল— মানুষ হইয়া

হিত্র হাঙ্গর ভোজন ! তাহাও দুই একটা নয়, দশের পিঠে সাত—সতরটা ! আচ্ছা বাপের বেটা বটে। ওঃ হাঙ্গর মহলে না জানি কি দুরন্ত দুর্দ্দিন ! না জানি সে দুরধিগম্য রসাতলপুরে আজ কি দুর্যোগের ঘনান্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আসিতেছে। হে মহামান্য হাঙ্গর ভুক পুরুষ প্রবর, আপনাকে অভ্যর্থনা করিতে আমাদের হৃদয় জলধিমাঝারে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন !

যাঁহারা সংবাদ পত্রের প্রভাবে বিশিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাদের মতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ও তাহাকে সরস এবং সজীব ছাচে ফেলিয়া ছাপাইবার দক্ষতার উপরেই সংবাদ পত্রের উন্নতি নির্ভর করে। কোথায় কোন শুভ মুহূর্ত্তে নরকের জীবন্ত লোমহর্ষণ চিত্রের প্রতিচ্ছবি পড়িবে তাহা জানিয়া যথাসময়ে তথায় সংবাদ দাতা মোতায়েন রাখা চাই। সংবাদ পত্র চালনে সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজনীয়তা হইল সংবাদ দাতার। তিনি সংবাদপত্ররূপ মহার্ণব যানের নালিকাস্ত্র সমূহের নায়ক। সংবাদের গন্ধে তাঁহার পায়ে পাখা বাঁধা চাই। তিনি সতত অবহিত, ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিত এবং তীক্ষ্ণধী হইবেন। সংবাদ দাতাগণ ভয় কাহাকে বলে জানেন না। টাটকা খবর পাইবার সম্ভাবনা হইলে তাহাদের মাথায় টনক পড়ে। রণে, কান্তারে, শত্রু মধ্যে, অনলে-সংবাদ লইবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্র যাইতে বদ্ধপরিকর। সাহস, অধ্যবসায় প্রয়োজন হইলে ফিকিরফন্দী মানুষের ক্ষমতায় যতদূর কুলায়, তাহা করিতে সংবাদ দাতা কুণ্ঠিত নহেন। আবশ্যকমত ঘটনার উপর রং ফলাইয়া লইতে ও তাঁহাদের বিশেষ যোগ্যতা আছে। কোন সময়ে আমি উদ্যোক্তা হইয়া চিকাগোয় ছাত্র দিগকে লইয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক ছাত্রসম্মিলনী করিয়াছিলাম। Chicago Record Herald এর কোন সংবাদদাতৃ ধুরন্ধর কোন ক্রমে উক্ত সম্মিলনীর একখানা ফটো গ্রহণ করেন। সভ্যগণের সুন্দর নামকরণ তাহার সুযোগ্য মস্তিষ্কের পরিচায়ক হইয়াছিল। আমার ভাগ্যে নামটি জুটিয়াছিল James' O'Brien আইর্‌ল্যাণ্ডের ডাবলি সহরের বাসিন্দা।

আধুনিক তৎপরতার যুগে সংবাদ দাতাগণকে কঠোর কাটিয়া ছাঁটিয়া লিখিবার অবকাশ নাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহাদিগকে খবরগুলি টাইপ করিয়া প্রতীক্ষমান মুদ্রাকরের হস্তে দিতে হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার কম্পোজ হইয়া যায়।

আমি কোন সময়ে সংবাদ পত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলাম; আমার মনে হয়, আমরা কোন বিখ্যাত ফুটবল ম্যাচের বিস্তৃত বিবরণ খেলা সাঙ্গ হইবার দশ মিনিটের মধ্যেই ছাপাইয়া ফেলিয়া ছিলাম। ক্রীড়াস্থলে টেলিফোঁ জুড়িয়া মিনিটে মিনিটে সংবাদ লওয়া হইতেছিল। যেমন সংবাদ পাওয়া, অমনি তাহার কম্পোজ। যেই খেলা শেষ হইবার বাঁশী বাজিল, আর দর্শকগণ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি আমাদের হকারেরাও হাঁক ছাড়িল—"চাই খেলার সংবাদ।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

---

# গোবিন্দ প্রসঙ্গে।

জন্ম ৪ঠা মাঘ, ১২৬১—মৃত্যু ১৩ই আশ্বিন, ১৩২৫।

আমাদের প্রিয় কবি, গোবিন্দ দাস আর ইহ জগতে নাই। তাঁহার বীণার ঝঙ্কার চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে। জগতের নিদারুণ অবহেলার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তিনি শান্তিময়ের প্রশান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথায়—

"যাইয়া মায়ের কোলে, জনকের স্নেহ বোলে
সারদার প্রমদার প্রীতি মমতায়।"

আমাদের সমস্ত অনাদর ভুলিতে পারিবেন, ইহাই এখন আমাদের সান্ত্বনা হউক

ঢাকার অন্তর্গত ভাওয়াল জয়দেবপুর তাঁহার জন্মস্থান। তিনি কোন্ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। তাঁহার পত্নি-বিয়োগ, ভ্রাতৃ-বিয়োগ, কন্যা-বিয়োগ, নির্ব্বাসন, নিপীড়ন, কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় নিরাশ্রয় ভাবে নানা স্থানে ভ্রমণ, এবং নিত্য ঋণের তীব্র দংশন ভাবিলে মনে হয়, দৈন্য-লগ্নে: তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সরস্বতীর সেবায় দারিদ্রই পুরস্কার। মাইকেল মধুসূদনের

"হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদ যুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।"

ভগবান দুঃখদণ্ডের পেষণে কবির হৃদয় হইতে রসের ধারা প্রবাহিত করিয়া থাকেন। গোবিন্দ দাস দরিদ্র না হইলে আমরা হয়ত তাঁহার নিকট হইতে আন্তরিকতায় করুণ, উদ্দীপনায় পূর্ণ, এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে এমন মধুর কবিতা পাইতাম না।

যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তৎকালে জয়দেবপুর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কিন্তু এই অরণ্যভূমি, প্রকৃতির নানা উপাদানে অলঙ্কৃতা হইয়া স্বভাব কবির হৃদয়ে নীরবে যে কত ভাবের সঞ্চার করিত, এখন কে তাহার নির্ণয় করিবে? জয়দেব নামেই যেন প্রতি লতা বল্লরী সুললিত পদাবলীর অনুকরণ করিত, ঝিল্লিরবে শত বীণা ঝঙ্কার দিয়া উঠিত; শালবন ভাবের উচ্চতা দেখাইত; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতে শান্তির ধারা বহিয়া যাইত। প্রকৃতিদেবী গোবিন্দদাসকে প্রিয় সন্তানের ন্যায় সস্নেহে পালন করিয়া ছিলেন। জয়দেবপুরে তাঁহার বাল্যজীবন কিভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা "ভাওয়াল রাজ দুহিতা শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী" শীর্ষক কবিতায় প্রকাশিত এবং প্রভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

গোবিন্দদাস ময়মনসিংহের কবি। তাঁহার কবি-জীবনের কথা উল্লেখ করিতে গেলে ময়মনসিংহের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর পুরাতন কথা, শিক্ষা, সাহিত্য এবং সমাজের অবস্থা আলোচনা করিতে হয়। ঠিক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১২৮৬ বঙ্গাব্দে গোবিন্দদাস ময়মনসিংহ উপনীত হন। স্বর্গগত স্মরণীয় বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রথম বয়সে ভাওয়ালের রাজা উদারহৃদয় ৺কালীনারায়ণ রায়ের সস্নেহ আশ্রয়ে বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে সেই সময়ে গোবিন্দদাসের সখ্য স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রকিশোর কতিপয় বৎসর পর ময়মনসিংহ নগরে ব্রহ্মপুত্র তীরে "দেব নিবাস" নামে এক সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। দেবনিবাস ময়মনসিংহে গোবিন্দদাসের প্রথম আশ্রয়। দেবেন্দ্রকিশোরের দেবনিবাস মনোহর উদ্যানউপবন বেষ্টিত। প্রকৃতিদেবী যেন স্নেহময়ী মাতার ন্যায় ভাবী কবিকে এক কোল হইতে অন্য কোলে তুলিয়া লইলেন। গোবিন্দদাস সুম্বোধন-সম্পর্কে দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র কন্যাগণের কাকা। তাহারা ঐ ডাক শিশু-সুলভ মধুরতার টানে "কাকাটু" করিয়া লইয়াছিল। এই কাকাটুই ভবিষ্যতে বাঙ্গালার কবি-কুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল।

গোবিন্দ দাস যখন ময়মনসিংহ আসিয়াছিলেন তখন তিনি নবীন কবি। তাঁহার দুই একটী কবিতা কলিকাতার "বীণা" পত্রিকায় ও ঢাকার "বান্ধবে" প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র।

এদিকে ময়মনসিংহে এই সময় সাহিত্যের সুবাতাস উচ্চ স্তরেই প্রবাহিত হইতেছিল। ময়মনসিংহের সাময়িক পত্র "বাঙ্গালী" উঠিয়া গেলেও উহার সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীশ্রীনাথ চন্দ সাহিত্য চিন্তায় বিরত ছিলেন না। তিনি তাঁহার সাধনা বালক দিগের জন্য নীতি পুস্তক রচনায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। কবি দীনেশচরণ বসু তখন "মানস বিকাশ" ও "কবি কাহিনীর" কবি বলিয়া বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অভিনন্দন লাভ করেন। কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের "হেলেনা কাব্য" তখন সাহিত্য সারথিগণের তীব্র-সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। মিত্র কবি তাঁহার "মিত্র কাব্যের" নূতন কাঠামো প্রস্তুত করিতেছিলেন। তৎকালে "নব প্রবন্ধ" বাহির হয় নাই বটে কিন্তু উহার লেখক বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাসের সুচিন্তিত প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে বান্ধবে প্রকাশিত হইতেছিল। ভারত মিহিরে বাবু অনাথবন্ধু গুহের উদ্দীপনা পূর্ণ প্রবন্ধ ও বাবু অমরচন্দ্র দত্তের সরল সরস রচনা উহার পাঠকদিগকে তৃপ্তি দান করিত। ভারত মিহিরের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় কালীনারায়ণ সান্যাল ভারতমিহির কার্য্যালয়ে সাহিত্যিক পণ্ডিত মণ্ডলির কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রসংগ্রহ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংহিতাদি গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছিলেন। স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র লাহিড়ী "কুল কালিমায়" বঙ্গদর্শনের প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া নবীন উৎসাহে সামাজিক প্রবন্ধ রচনায় তৎপরতা দেখাইতেছিলেন। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

"উন্মাদ বিলাপ" "সুখ মুকুর কাব্য" "বৈদেহী নির্বাসন গীতাভিনয়" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণসিংহ "অশ্বতত্ত্ব" প্রকাশের পর গোপালন ও কৃষি সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছিলেন। সুসঙ্গের কবি রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণার" অনুকরণে নিরবচ্ছিন্ন পদ্যে "কৌমুদী" পত্রিকা বাহির করিয়া কাব্যে স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিতেছিলেন। এই সময় "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" রচয়িতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সদ্যঃজাত "নব মিহিরের" সম্পাদক রূপে সমুদিত। ময়মনসিংহের সাহিত্য চর্চ্চার এই নবযুগে গোবিন্দ দাসের ময়মনসিংহে আবির্ভাব।

১২৮২ সনে কলিকাতায় সারস্বতগণ বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে সম্মিলিত হইয়া যেরূপ উৎসব করিয়া ছিলেন, উহার অনুকরণে ১২৮৪ সনে সরস্বতী পূজার দিন বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় ময়মনসিংহে সারস্বত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতার সারস্বত উৎসবের প্রথম বর্ষে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়মনসিংহে প্রথম বর্ষের কবিতা "বাণীবন্দনা" পাঠ করিলেন, হেলেনা কাব্যের কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র। দ্বিতীয় বর্ষের কবি কবিবর দীনেশচরণ বসু। তাঁহার রচিত "মহামায়ার চিত্র পট" বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় বর্ষে—১২৮৬ সালে দাস কবি ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষ বাবু অমরচন্দ্র দত্তের অনুরোধে "বাণী আরাধনা" শীর্ষক কবিতা রচনা করেন। সারস্বত মঞ্চে ঐ কবিতা পাঠ করেন বাবু অমরচন্দ্র দত্ত। গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা, অমরচন্দ্রের কণ্ঠ। সাভিনয়ে যখন উহা পঠিত হইতেছিল, তখন গোবিন্দ কবির প্রশংসা ধ্বনিতে সারস্বত মণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অগ্নি কখনও ভস্মাচ্ছাদিত থাকিতে পারে না। এই একটী কবিতায় গোবিন্দ দাস ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর হইতেই দাস কবি "সারস্বত কবি" নামে খ্যাত। অতঃপর দ্বাদশ বর্ষ তাঁহার কবিতা সারস্বতগণের বাণীবন্দনায় অর্ঘ্য দান করিয়াছে। তিনি অধিকাংশ উৎসবেই উপস্থিত থাকিতেন। না থাকিলেও কবিতা পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার কবিতায় প্রতি বর্ষে নব বল এবং নব আশার সঞ্চার করিত। তিনি সারস্বতের এক উৎসবে কবিতায় লিখিয়াছিলেন "ভাই — মৃত মৃত্তিকার মূর্ত্তি দিছে পূজ আর" ঐ বৎসরের অধিবেশন সময়ে মাইকেলের প্রসিদ্ধ "শ্রীপঞ্চমী" কবিতা—

> নহে দিন দূর দেবি, যবে ভূভারতে
> বিসর্জ্জিবে ভূভারতে, বিস্মৃতির জলে,
> ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে ;—
> কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
> *     *     *     *     *
> কি কাজ মাটীর দেহে তবে, সনাতনে ?

মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। এই ঘটনায় হিন্দু সমাজের সভ্যগণ অতিশয় রুষ্ট হইয়া উঠেন। সমিতির বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। ধলার প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী (রায় বাহাদুর) হিন্দু সমাজের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তাঁহার মধ্যস্থতায় আন্দোলন প্রশমিত হইয়া যায়। গোবিন্দদাসের সারস্বত কবিতা অব্যাহত ভাবে বর্ষে বর্ষে পঠিত হইতে থাকে।

এবার কবিতা ত্রাণ পাইয়া গেল বটে কিন্তু সম্মুখে আর এক সংঘর্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। গোবিন্দ কবির দেশাত্মবোধ অতি প্রবল ছিল। তাঁহার কবিতায় ক্রমেই স্বদেশ [illegible]র স্পষ্ট লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। বহু রাজপু[illegible]স তখন সারস্বতের কাণ্ডারী থাকিতেন। তাঁহারা গোবি[illegible]সের কবিতায় প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। অন্যদিকে সারস্বতগণ, উৎসব-সময়ে গরুর মেলায় লাভের আশায় মাতিয়া উঠিলেন। প্রতিবাদ ঔদাস্য উভয় দিকের পীড়নে সারস্বত কুঞ্জের সুসজ্জিত দ্বার গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে রুদ্ধ হইল। পরিতাপের বিষয় এই সারস্বতগণের গব্যরসও সংগ্রহ করা হইল না, কাব্যরসও শুকাইয়া গেল। কমলার কৃপা পাইতে যাইয়া তাঁহারা সারদীর কোপে পড়িয়াগেলেন। সমিতির শেষ দশায় অনুরোধে পড়িয়া দরিদ্র কবি তথায় ধনের পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য "কমলা করুণাকর এ দুঃখী দীন দেশের" ইত্যাদি কতিপয় গান লিখিয়াছিলেন। গানেও সমিতির প্রাণ বাঁচিল না।

কাব্যের অর্চ্চনায় রত থাকিলে বুঝিবা সারস্বত তিষ্টিতে পারিত। ৩৩ বৎসর পরে সারস্বত উঠিয়া গেল; এতদিন পরে সারস্বত কবিও চলিয়া গেলেন। যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে সুসঙ্গের মহারাজা স্বর্গীয় কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সারস্বত মণ্ডপের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তথায় এখন পাটের হাট বসিয়াছে। মন্দির নির্ম্মিত হইলে, সারস্বত সমিতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইত না, গোবিন্দ কবির জীবন্ত ছবি উহাতে স্থান পাইত। সারস্বত কবি এবং সারস্বত মন্দির পরস্পরের কি শোভাই না হইত!

---

# মশক নিবারণের উপায়।

মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, মড়ক প্রভৃতিকে সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় করিতে অনেকেই নারাজ। কিন্তু এইসকল সাহিত্য-প্রসঙ্গ-বর্জ্জিত উপসর্গের উপদ্রবে যে সাহিত্যের মহারথিগণও প্রতিনিয়ত উদ্বেগগ্রস্ত তাহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। অন্যগুলির কথা রাখিয়া আপাততঃ মশার কথাই বলিব। শীতের অবসান হইতে না হইতেই মশকের চতুর্দ্দিকে অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং সাহিত্যিকগণের নিরাপদে সাহিত্য চর্চ্চা করিবার উপায়—যদি কিছু থাকে—তবে আলোচনা অসাহিত্যিকের কার্য্য হইতে পারে কিন্তু তাহা অসাময়িক ও অন্যায় কিছু হইবে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।

মশকেরা প্রায়ই শব্দ ও বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

অনেক সময় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে গুণ গুণ স্বরে গীত গাহিলে মশককুল আকৃষ্ট হইয়া গায়কের উপদ্রব জন্মাইয়া থাকে। আজ ছয় বৎসর হইল, একবার তারকেশ্বর অঞ্চলে জনৈক উচ্চবংশ সম্ভূত শিক্ষিত ব্যক্তি নিম্নস্বরে হারমনিয়ম্ বাজাইয়া প্রায় দেড় হাজার মশক আকর্ষণ করেন। অনেক সময়ে মাঠে দাঁড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, পাঁচ ছয় জনের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশী কথা কহে, তাহার মস্তকে ঝাঁকে ঝাঁকে মশক আসিয়া একত্র হয়।

মশকেরা গাঢ়নীলবর্ণেরবড় ভক্ত এবং হরিদ্রাবর্ণের উপর বিশেষ বিরক্ত। একটী ঘরে নীলবর্ণের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে দেখা যায় ঘরটি মশকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ পরীক্ষার জন্য নীলবর্ণের একটী বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিয়া ৪। ৫ ঘণ্টার মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে ঘরটি একেবারে মশকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

একজন সৈনিক আফ্রিকাদেশে গিয়াছিল, সে মশক নিবারণার্থে কাফ্রি পোষাক পরিধান করে ও অদূরে এক স্থানে নীলবর্ণের অনেকগুলি বালিশ একত্র করিয়া রাখে। তখন মশকগণ সৈনিক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া ঐ নীলবর্ণের বালিশগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়ে।

ব্যাক্টীরিওলজিকেল পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে,

| | |
|---|---|
| গাঢ় নীলবর্ণে শতকরা— | ৫২টী |
| গাঢ় রক্তবর্ণে—" | ৪৫টী |
| ঈষৎ সবুজবর্ণে—" | ২টী |
| ঈষৎ নীলবর্ণে—" | ১½টী |
| শ্বেতবর্ণে—" | ১টী |
| নেবর বর্ণে—" | ১টী |

মশক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। গাঢ় হরিদ্রাবর্ণে একেবারেই মশক আকৃষ্ট হয় না।

একবার কতকগুলি ইংরাজ পুরুষ বৈদ্যুতিক মোটার দ্বারা মশকবৎ ধ্বনি উৎপাদন করায় শত সহস্র মশক এই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে যদি হরিদ্রা বর্ণের মোজা পরিয়া বসিয়া নিঃশব্দে সাহিত্য চর্চ্চা করা যায়, তাহা হইলে মশক-দংশন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মশকগণ প্রায়ই পায়ে দংশন করে। হরিদ্রা বর্ণের মোজা ব্যবহার এখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে।

স্ত্রী মশকেরা দংশন করে ও পুং মশকেরা শব্দ উৎপাদন করে।

শ্রী:—

# বৈদিকযুগে উৎপত্তি ও লয়বাদ।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই লয় হয়, এই মত আমরা ঋগ্বেদের মধ্যেই দেখিতে পাই। ঋষিগণ মনে করিতেন যে ব্রহ্মের চক্ষু হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, নাভি হইতে অন্তরিক্ষ ( অর্থাৎ আকাশ ), মস্তক হইতে দিবালোক, পদ হইতে ভূমি ও কর্ণ হইতে দিক সকল উৎপন্ন হইয়াছে। (১) মানব দেহের ইন্দ্রিয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মন চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন। সেইজন্য তাঁহারা মনে করিতেন, মানব মৃত হইলে তাহার চক্ষু সূর্য্যে গমন করে, আত্মা ( অর্থাৎ প্রাণ ) বায়ুতে, দিবালোক ও পৃথিবী ধর্ম্মাক্রান্ত অঙ্গগুলি দিবালোকে ও পৃথিবীতে, জলীয় অংশ জলে, অপুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ওষধীতে গমন করে। দেহের মধ্যে একটী 'অজ' ( অর্থাৎ জন্ম রহিত ) অংশ আছে। উহাকে অগ্নি স্বর্গলোকে বহন করে। (২) পরবর্ত্তী যুগের পঞ্চ মহাভূত বাদের ইহাই মূল। কিন্তু মহাভূত বাদ উৎপত্তির পূর্ব্বে নানা প্রকার মত প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। এই জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মৈত্রেয় নামক ঋষির একটী মত দেখা যায়। (৩) তাঁহার মতে বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, বায়ু হইতে ক্রমানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে।

মৈত্রেয় ঋষি মনে করেন, বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। কারণ দেব ও মানবের বল, বায়ু বা প্রাণ সম্ভূত। ঐ বলের প্রয়োগে অরণিকাষ্ঠ মথিত হইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। অগ্নি রক্তবর্ণ। যে দেশ বা বস্তু রক্তবর্ণ দেখায়, তথায় অগ্নি বর্ত্তমান, ইহাও ঋষিদিগের মত। প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ব ও পশ্চিম গগন রক্তবর্ণ দেখায়। অতএব ঐকালে অগ্নি তথায় বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু কিরূপে অগ্নি তথায় আগমন করে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ঋষিগণ মনে করিতেন দেবগণ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে অরণিযোগে আকাশে অগ্নি উৎপাদন করেন। মৈত্রেয় ঋষির মতে এই দেব মথিত অগ্নি হইতে সূর্য্য প্রাতঃকালে জন্ম গ্রহণ করে এবং সন্ধ্যাকালে উহাতেই পুনরায় লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব এই ঋষির মতে বায়ু হইতে অগ্নি এবং অগ্নি হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হয়; পুনরায় সূর্য্য অগ্নিতে এবং অগ্নি বায়ুতে লয় পায়।

মৈত্রেয় ঋষি মনে করিতেন চন্দ্র, সূর্য্য হইতে উৎপন্ন ও সূর্য্যে লয় পায়। কারণ তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেন, অমাবস্যার দিন চন্দ্র অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রতিপদ দিবসে যখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়, তখন ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিম গগনেই প্রকাশিত হয়। ইহার পর প্রতিদিন চন্দ্র, সূর্য্য হইতে সরিয়া আসে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঋষি এইরূপ দেখিয়া কল্পনা করিলেন যে চন্দ্র অমাবস্যা দিবসে সূর্য্যে লয় পায় বলিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে। প্রতিপদ দিবস হইতে উহা সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ উৎপন্ন হইতে থাকে। পূর্ণিমা দিবসে ইহার উৎপত্তি সম্পূর্ণ হয়। তৎপর দিবস হইতে উহার ক্ষয় বা লয় আরম্ভ হয়। কারণ তখন হইতে উহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। অমাবস্যার দিন চন্দ্রের শেষকলাও সূর্য্যে লয় পায়।

প্রায় দেখা যায় পূর্ণিমার সময় বৃষ্টি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা লক্ষ্য করিয়া ঋষি মনে করিলেন চন্দ্র হইতেই বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। আর্য্যগণ চন্দ্রকে সোমরূপ অমৃতের আধার মনে করিতেন। ইহাই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের মনের প্রথম রস। এই রস বৃষ্টিরূপে পতিত হইলে ওষধী ও বৃক্ষে শস্য ও ফল উৎপাদন করে। বৃষ্টি জল ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। সরোবর ও নদীর জল কমিয়া যায়। ঋষিদিগের মতে জল সকল পুনরায় চন্দ্রে গমন করিয়া লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া অদৃশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য প্রতিবৎসর বর্ষাকালে জল সকল চন্দ্র হইতে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

বৃষ্টিবারি পতনকালে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। মৈত্রেয় ঋষির মতে বৃষ্টিবারি হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিজলেই লয় পায়। বিদ্যুৎকে সেকালে অগ্নির একটিরূপ বলা হইত।

এইরূপে দেখা গেল, ঋষি যে মত প্রচার করিয়াছেন

[১] ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্তের ১৩শ ও ১৪ ঋক্।

[২] ঐ ১০ম মণ্ডল ১৬ সূক্তের ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫মঋক্

[৩] ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪০। ৫। ২৮

তাহা তাঁহার প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণের ফল। একালেও আমরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অনেক বিষয়ের তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তদ্ভিন্ন আর এক উপায় আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। তাহাকে আমরা 'পরীক্ষা' বলি। নানা প্রকার যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা আমাদের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা যেরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, শুধু পর্য্যবেক্ষণে তাহা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক মৈত্রেয় ঋষি বিভিন্ন ঘটনাবলী যে এক সূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিজ্ঞানের মূল সূত্র অবস্থিত দেখিতেছি। তাঁহার মতে বায়ুই ব্রহ্ম; কারণ তাঁহা হইতে প্রথম অগ্নি উৎপন্ন। অগ্নি হইতে সূর্য্য; সূর্য্য হইতে চন্দ্র; চন্দ্র হইতে জল এবং জল হইতে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ জলে, জল চন্দ্রে, চন্দ্র সূর্য্যে, সূর্য্য অগ্নিতে এবং অগ্নি বায়ুতে লয় পাইলে বিশ্ব জগতে বায়ুই অবস্থান করেন। অতএব বায়ুই ব্রহ্ম। তাঁহারা সেইজন্য ব্রহ্মকে নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, প্রাণস্বরূপ ও সর্ব্বদেবের উৎস মনে করিতেন। মানব, জীব, জন্তু প্রভৃতি দেবতা ও ব্রহ্মের অংশ সকলের মিলনে উৎপন্ন হইয়া থাকে ও পুনরায় সেই সকল দেবতায় লয় প্রাপ্ত হয় এই বিশ্বাস আর্য্য ঋষি দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

## সুদিনের প্রতীক্ষা।

এদিন এভাবে যাবে? কখনো তা নয়!
সকলি ঘুরিয়া চলে চাকার মতন;
অমা-যামিনীর শেষে উদিছে তপন,
জাগিতেছে ভীতি-মাঝে দেবের অভয়!
বিরস বদনে হয় হাসির উদয়,
দুখী সত্য পেয়ে সুখের জীবন,
তুচ্ছনহে বুকভাঙা কবির কাঁদন,
সে শুধু গলাতে পারে পাষাণ হৃদয়!
দেখি চাঁদ উঠে কিনা হৃদয়-আকাশে,
জোৎস্না ছড়ায় কি না জীবন-মাঝার;
আর কভু দেখি প্রাণ হাসে কি না হাসে,
একটা সুখের স্রোতে ভাসি কি না আর;
আমি তাই বসে আছি সেদিনের আশে,
দেখি চাকা ঘোরে কি না কপালে আমার!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

## বাণীর পূজা।

স্বরগ হ'তে মর্ত্তে নেমে
করল এমন পথটাকে?
ফুলের দলে সুবাস ঘেরা
আনন্দ আজি রথটাকে?
ঊষার ছোট্ট ঘরটী ছুঁয়ে
ছুঁয়ে জলের পদ্মটী,
আলোক ঝরা নামিয়ে এলো
নাইত 'টুঁ' 'টা' শব্দটী;
বেসুর বীণে সুর চড়াল
মন্ত্র দিয়ে হস্তকে,
ভুলে যাওয়া গান শিখালে
হাত বুলিয়ে মস্তকে;
সোনার কাটী ছুঁইল যাহার
অন্তরেরই অন্তপুর,
রইল তাহার নিত্য বাঁধা
স্পর্শমণির স্বর্ণপুর;
রথথেকে যে নাম্‌ল হেথা
অতিথ সবা'র একদিনের,
রাখ্‌তে পেলে হৃদয় দিয়ে
হবে সেত সব দিনের;
বুকের কাছে পেয়ে মাণিক
হেলায় ফেলি কোন দুখে,
রাখব বেঁধে মাথার মণি
ভক্তি দিয়ে এই বুকে।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

---

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে—শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

# সৌরভ

সপ্তম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২৫। পঞ্চম সংখ্যা।

## সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

### নবম পরিচ্ছেদ।

২৮এ আমরা আবুশিম্বেল্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহা মিশরের এক অতি প্রাচীন সহর। এখন কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট। আমাদের সময় অল্প বলিয়া এখানে কয়েক ঘণ্টা মাত্র অবস্থিতি করিয়াছিলাম। নদীর ধার বড়২ প্রস্তরখণ্ড ও বালুকায় পরিপূর্ণ। অল্প দূরে এক বিশাল মন্দির। মিশর সম্রাট রমেসিস্ ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শুনিলাম আফ্রিকায় ইহা অপেক্ষা বৃহৎ মন্দির আর নাই। মন্দিরের মধ্যে ঐ সম্রাটের চারিটি বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি। চারিটি মূর্ত্তিই প্রস্তর নির্ম্মিত এবং যেন এক ছাচে ঢালা।

চারিটী মূর্ত্তির মধ্যে দুইটি দক্ষিণ ও দুইটি বাম দিকে। বাম দিকের একটি মূর্ত্তির মস্তক নাই। ভগ্ন মস্তকটি মূর্ত্তির ঠিক পদতলে পতিত দেখিলাম। চারিটি মূর্ত্তিই উপবিষ্ট। ইহাদের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্রতর মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। প্রধান মূর্ত্তি চারিটিই এক মাপে প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রত্যেকটির উচ্চতা ৭০ ফুট। ব্যাপার বুঝুন! তালগাছ প্রমাণ চারিটি মূর্ত্তি এক মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত। অধিকতর বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রত্যেক মূর্ত্তি এক২ খণ্ড প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দির ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে দেখিবার ও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। আমাদের সময় না থাকাতে আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

ইহার পর আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র ২ গমন করিয়া ১৩ই আগষ্ট কায়রো উপস্থিত হইলাম। সাহেব দুইজন স্থানীয় একজন উচ্চইংরাজ কর্ম্মচারীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আমরা দুইজনে মস্কি নামক এক মহল্লায় একজন আগ্রা সওদাগরের বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। যাঁহারা কাশী,লক্ষৌ, লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি সহর দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রাচীন রাজধানীর বেশ একটা ছবি কল্পনা করিতে পারিবেন: সেই রকম ছোট ২ গলি, সেই রকম মৌচাকের মত গায়ে ২ বাড়ী, সেই রকম রৌদ্র বিরহিত ময়লার রাস্তা। নূতনের মধ্যে এই যে, এখানে ছোট বড় গুম্বজ ও মিনারেট ওয়ালা নানা আকারের মস্জিদ সহরের যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এত মস্জিদ শুনিলাম পৃথিবীর আর কোনও সহরে নাই। প্রাচীন সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি মুসলমান নরপতি মিশরে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই কায়রোতে একাধিক মস্জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া নিজের সময়ের শিল্প কলার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ এই সকল মস্জিদ ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনি মিশরের শাসন কর্ত্তাদের একটামোটা মুটি হিসাব অনায়াসে পাইতে পারেন।

সহরের মধ্যে টুলুঁ মস্জিদ সকলের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল। সুলতান হাসন চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে মস্জিদ নির্ম্মাণ করহিয়াছিলেন উহা সমগ্র মিশরের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্জিদ বলিয়া বিখ্যাত। দিল্লীর জুম্মা মস্জিদ অনেকটা এইভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। এল্ আজহরের

মস্‌জিদ দেখিতে তেমন সুদৃশ্য না হইলেও আজকাল এদেশে অত্যন্ত বিখ্যাত, কারণ এই স্থানে এখন এক আরব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমান জগতের ভিন্ন ২ স্থান হইতে ছাত্রেরা এখানে আসিয়া থাকে। শুনিলাম ভারত হইতে প্রত্যেক বৎসর অনেক ছাত্র গমন করিয়া থাকে। ৫০।৬০ জন ভারতীয় ছাত্র সর্ব্বদা এখানে উপস্থিত থাকে।

কায়রো সহরকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রাচীন কায়রো ও নবীন কায়রো। প্রাচীন সহর আধুনিক সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। পুরাতন সহরের মধ্যে কেল্লাটি একটি দেখিবার জিনিস। ইহা সুলতান সালাদিনের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোকাট্রাম পাহাড়ের এক শৃঙ্গের উপর ইহা দণ্ডায়মান। নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল পিরামিড ছিল, এই কেল্লা তাহাদেরই মাল মশলায় প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা অনেকটা চুনার দুর্গের মত। এই কেল্লার একদিকে অমরু মস্‌জিদ। একত্রে এত স্তম্ভের সমাবেশ আর কোথাও দেখিয়াছি মনে হয় না। যে খানে ৮।১০ টা হইলে যথেষ্ট হইত, সেখানে ৭০।৮০ টা দণ্ডায়মান। দুর্গের মধ্যে মহম্মদ আলির মস্‌জিদটি বেশ সুন্দর। অনেক দূর হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অবশ্য খুব আধুনিক। যাঁহারা শিল্প কলা দেখিতে জানেন, তাঁহারা এই নূতন মস্‌জিদ ও অন্যান্য ভগ্ন প্রায় প্রাচীন মস্‌জিদ দেখিয়া অনায়াসে বলিতে পারেন যে প্রাচীন ও নবীন মিশরের মধ্যে স্থাপত্য কৌশলে কাহার বাহাদুরি অধিক। এ বিষয়ে ভারত ও মিশরের সমান অবস্থা। অতি প্রাচীন কালে মিশরের যে সভ্যতা, বিদ্যা, এবং বুদ্ধির গৌরব ছিল, এখন তাহার কণামাত্রও নাই। য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে মিশরের সভ্যতা ভারত অপেক্ষাও প্রাচীন। আমাদের প্রাচীনতম পুস্তক ঋগ্বেদের বয়স তিন হাজার বৎসরেরও কম! কিন্তু মিশর দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও জগতে অতি সভ্য দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। য়ুরোপের অনেক বড় ২ অধ্যাপক এই মিশরের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

দিল্লীর দুর্গ ও রাজ প্রাসাদের ন্যায় এই প্রাচীন কেল্লা এখন সামরিক দপ্তর ও কর্ম্মচারী দিগের আবাস স্থল রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সরকারি টাকশাল ও আর সেনেল (বারুদ খানা) ও এই খানে অবস্থিত। দুর্গের উচ্চ প্রাকারের উপর দাঁড়াইলে কায়রো সহরের দৃশ্য বড়ই মনোরম বোধ হয়। সমস্ত সহর খানি যেন ছবির মত মনে হয়। নীল নদী দূরে একটি পাকা রাস্তার মত যেন আকাশের কোলে যাইয়া মিশিয়া গিয়াছে। নদীর ওপারে দিগন্ত ব্যাপী আফ্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সাহারা মরুভূমি।

নবাগতের নিকট কায়রোর অপরিমিত ভিস্তির দৃশ্য প্রথমেই বড় অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। শুনিলাম সমস্ত সহরের মধ্যে প্রায় ২০০০ ভিস্তি আছে। ইহাদের প্রত্যেকের হাতে একটা টিনের পান পাত্র থাকে। যে কেহ জল চাহিলে ইহারা ঐ পাত্রে করিয়া জল দেয়। ইহার জন্য তাহারা পয়সার দাবি করে না। পরে জ্ঞাত হইলাম যে সহরের অর্থশালী লোক মৃত্যুর সময় পাড়ার বিশেষ ২ কয়েক জন ভিস্তিকে কিছু ২ অর্থ দান করিয়া যান।

এখানে অবস্থান কালীন আমি এক বরযাত্রীর দল দেখিয়াছিলাম। ব্যাপারটা নূতন রকমের। বিবাহ করিতে যাইবার সময় বর ও তাঁহার সঙ্গের লোকদের উটের উপর যাইতে হয়। অন্য কোনও প্রকার যান ব্যবহার হয় না। বরের মুখ ও অন্যান্য অঙ্গাদি এমনভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হয় যে উটের উপর মানুষ আছে বা একবস্তা কাপড় আছে তাহা বোঝা যায় না। বরযাত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশই রমণী। তাহাদেরও সর্ব্বাঙ্গ বোরকা দ্বারা ভাল করিয়া ঢাকা থাকে। বিবাহ প্রথাটা ভারতের মুশলমানদের মত। বিবাহের পর বর কনেকে এক উটের উপর বসাইয়া আনা হয়। তখনও অবশ্য দুইজনকে বেশ ভাল করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের পরই পুরুষ বরযাত্রীরা পদব্রজে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেন। বরের সঙ্গে কেবল মেয়েরা থাকে। তখন এক এক উটের উপর দুইজন করিয়া স্ত্রীলোক থাকে।

এখানকার দরিদ্র লোকেরা মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাড়ীতে বাস করে। বাংলা দেশের মত বাড়ীর চাল খড়ের।

ঘরের মধ্যে কোনও গবাক্ষ রাখে না। সাহেবরা ইহার জন্য এদেশের লোকের উপর কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিলে ইহা খুব স্বাভাবিক মনে হইবে। মিশর দেশ একত বিষুব রেখার নিকট, তাহার পর দেশটা মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। এদেশে বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই। এইজন্য এখানকার গরম জগত বিখ্যাত। বৎসরের মধ্যে প্রায় নয়মাস গ্রীষ্ম থাকে। এই জন্য এখানকার অধিবাসীরা বৎসরের অধিকাংশ সময় খোলা আকাশের নীচে রাত্রে শয়ন করিয়া থাকে। দিনের বেলা ঘরের মধ্যে থাকে। ঐ সময় এমন ভীষণ লু বহিতে থাকে যে ঘরের দরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া থাকিতে হয়। এরকম অবস্থায় ঘরে যদি জানালা থাকে, তাহা হইলে ঘরে টেকা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এদেশে বৃষ্টি একবারে নাই ৮।১০ বৎসর অন্তর কখনও ২ সামান্য দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে, কিন্তু তাহা এত কম যে অনেকে তাহা জানিতে পর্য্যন্ত পারে না। নীল নদী আবিসিনিয়া প্রদেশের কিনিয়া পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ষার সময় আবিসিনিয়ায় যখন বৃষ্টি পাত হয় তখন নীল নদীর জল বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয় এবং দুই দিককার সমতল ভূমি সকল ডুবিয়া যায়। প্রায় ২৫।৩০ দিন পর্য্যন্ত এইভাবে ডুবিয়া থাকে। তাহার পর জল সরিয়া যায়। ঐ সকল জলমগ্ন ময়দানের উপর এক মোটা পলি মাটির স্তর পড়িয়া যায়। তখন ধান, গম, ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য উহার উপর বপন করা হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে এই ভাবে কৃষি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বৃষ্টির অভাবে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। নীল নদীর খাল কাটিয়া বহুদুর পর্য্যন্ত জল সরবরাহ করা হয়। মিশর ও সুদনে নীলের জলে চাষ হয়, ইহার জল পান করা হয়, বাণিজ্যাদিও ইহার সাহায্যে চলিয়া থাকে। এই জন্য এদেশকে 'নীলনদীর দেশ' নামে অভিহিত করা হয়। বাস্তবিক, নীল নদী না থাকিলে সমগ্র মিশর ও সুদন একবারে মরুভূমিতে পরিণত হইত।

এ দেশে মৃত দেহের সহিত যাইবার জন্য এক শ্রেণীর লোক ভাড়া করা হয়। ইহাদের মধ্যে অন্ধের সংখ্যাই অধিক। ইহারা মৃত দেহের সঙ্গে ২ বুক চাপড়াইতে ২ ও শোক পূর্ণ গীত গাহিতে ২ গমন করে। প্রথমে ইহারা, তাহার পর মৃতের আত্মীয়েরা, তাহার পর মৃত দেহ ও সর্ব্ব পশ্চাৎ স্ত্রীলোকেরা বোরকা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গোযানে গমন করে।

মিশর য়ুরোপের অতি নিকট প্রতিবাসী বলিয়া এখানে ইংরাজ, ফরাসী, স্পেনবাসী, গ্রীক, ইটালিয়ান, তুর্কি প্রভৃতি নানা প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরব, পারস্য বাসী, চীন, জাপানি এবং ভারতের লোকও অনেক। সহরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। বিদেশীদের মধ্যে ফরাসীর আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার লোক অনেকেই এই ভাষায় মোটামুটি মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। সহরের অনেক ছোট বড় দোকান ফরাসী দিগের হাতে। শুনিয়াছিলাম ইহারা বড় সভ্য জাতি। কিন্তু দোকানে ইহারা যে প্রকার দরদস্তুর করে, তাহাতে ইহাদের উপর সহজেই অশ্রদ্ধা হয়। জিনিসের চারিগুণ দর হাঁকা ইহাদের নিত্য কর্ম্ম; তাহার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে, সহরের প্রায় সমস্ত কসাই ফরাসী।

শ্রীঅতুল বিহারী গুপ্ত।

---

# প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের আলোচনা

অন্যান্য দেশের ন্যায় গ্রীস দেশেও প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগেই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। এবং অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় ঐদেশেরও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিহাস কিম্বদন্তির নিবিড় গর্ভে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হারকিউলিয়ান যুগেই ইঁহারা নক্ষত্রসমূহের গতি সম্বন্ধে একটু একটু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মিশর দেশ হইতেই গ্রীকগণ ইহাদের দেবতা ও শিল্পবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ মিশর দেশ হইতেই ইহারা গগন পর্য্যবেক্ষণেরও রীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। আর ইহাও অনুমান হয় যে খৃষ্টের জন্মের ১২।১৪ শত বৎসর পূর্ব্বেই ইহারা বিভিন্ন নক্ষত্র

পুঞ্জের সঙ্গে মিল রাখিয়া গগন মণ্ডল ( রাশি চক্র ) বিভক্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের পৌরাণিক গল্পে আকাশের অনেক বিবরণ নিহিত আছে। অনেকগুলি পৌরাণিক গল্পে সৌরজগতের গতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী রূপকচ্ছলে বিবৃত করা হইয়াছে। মনোমুগ্ধকরী কল্পনা ও বিচিত্র অনুভূতির সাহায্যে এই নিপুণ ও বুদ্ধিমান জাতি সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধুর ও কণ্টকময় পথকে পুষ্প-শয্যার ন্যায় কোমল করিয়া তুলিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর বিষয়েও চিত্ত চমৎকারিণী প্রতিমার স্থাপন করিয়া মানবের দৃষ্টি ঐ দিকে আকৃষ্ট করিতেন। সুতরাং দেবদেবীর এবং বীর সমূহের সাহসিকতার গল্পে এবং বিভিন্ন প্রেমোপাখ্যানে ইহারা শীঘ্রই নভোমণ্ডল বিভূষিত করিয়া তুলিলেন। গ্রীকগণের কল্যাণেই আমরা আজ নভোমণ্ডলে মহাবীর হারকিউলিস্, রাজা সেফিউস, মহারাণী এণ্ড্রমিডা এবং কেশ বিন্যাস-নিরতা সুন্দরী কেসিওপিয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রীসে বহু মত প্রচলিত ছিল। থেলিস প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে একজন ছিলেন। ইনি মিলিটাস্ নগরে (Miletus) নগরে খৃঃ পূঃ ৬৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যোনাইন (Jonine school) নামে তিনি একটী দল বা সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারাই গ্রীস দেশে বিজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। যদিও তাঁহার জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় মতে অনেক ভুল ও অসম্ভব কথা লিখিত আছে তথাপি তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও ( উক্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধে ) তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিতেন যে নক্ষত্রগুলি আগুনের ফুলকি; চন্দ্র সূর্য্য হইতে আলোক গ্রহণ করেন এবং পৃথিবীও সূর্য্যের মধ্যস্থলে, ইহাদের সমসূত্রপাতে অবস্থান কালে সূর্য্য-রশ্মিতে অদৃশ্য হইয়া যাওয়ায় অমাবস্যার সৃষ্টি হয়। তিনি তাহার শিষ্যগণকে বিশ্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত পৃথিবীর গোলত্ব শিক্ষা দিতেন†। পৃথিবীর গোলাকার উপরি ভাগকে তিনি পাঁচটী মণ্ডলে * বিভক্ত করিয়াছিলেন।

† তিনি ভৌম কেন্দ্রিক মত প্রচার করিতেন।
* Zones—Artics &.

কিন্তু এই কথাটী কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারিনা। খৃঃ পূঃ ১৬০০ হইতে খৃষ্টের জন্মের পর পর্য্যন্ত আমরা যে যে মানচিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি অদ্ভুত। কোনটীতেই এই প্রকার মণ্ডলের উল্লেখ নাই। ঐ সকল মানচিত্রে যে যে স্থান অঙ্কিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মিশর, আরব, গ্রীস্ এসিয়া মাইনর ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল দেশই কল্পিত বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিয়া, ইণ্ডাস্, গঙ্গা ইত্যাদিরও এক একটী স্থান আছে বটে কিন্তু এগুলি কল্পিত। * ইহা হইতে আমরা এই অনুমান করিতে পারি যে খৃষ্টের জন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বেও কোন না কোন প্রকারে ভারতবর্ষের খ্যাতি মিশর ও গ্রীস দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বাণিজ্য ও ভ্রমণই ইহার সূত্র হইয়া থাকিবে। ঐ সকল প্রাচীন মানচিত্রে বক্ট্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে কিন্তু চীনদেশের নামোল্লেখ নাই। যাহা হউক থেলিসের মতেও বিষুবদবৃত্ত রাশিচক্রকর্ত্তৃক তির্য্যগভাবে ও মধ্যন্দিন রেখা দ্বারা লম্বভাবে কর্ত্তিত।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে তিনি গ্রহণ-পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাহারই সম্বন্ধে হিরোডোটাস্ বলিয়াছেন যে তিনি একটী প্রসিদ্ধ গ্রহণ গণনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে মেডিস্ ও লাইডিয়ান জাতি দ্বয় পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে মত্ত ছিলেন। এই গ্রহণ দর্শনে ঐ সকল লোক এত ভীত হইয়াছিল যে আতঙ্কে অভিভূত হইয়া ইহারা যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। কোন্ দিন বা কোন্ মাসে ও কখন গ্রহণ দৃষ্টি গোচর হইবে তাহা বলিতে তিনি সাহস করিতেন না সুধু গ্রহণ সঙ্ঘটিত হওয়ার বৎসরটী নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। সুতরাং দর্শনাকাঙ্খী ব্যক্তি গণকে সারা বৎসর আকাশ পানে তাকাইয়া থাকিতে হইত। কেলিমেকাসের ( Callimachus ) মতে, তিনি লঘুঋক্ষমণ্ডলের ( Lesser Bear ) অবস্থান নির্দ্দেশ

* আমরা যতগুলি প্রাচীন মানচিত্র দেখিয়াছি, তাহাদের সকল গুলিতেই গ্রীস, মিশর, আরব, এসিয়া মাইনর, লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের কতক অংশ এবং ইটালির অবস্থান প্রায় যথা যথ লিখিত আছে। সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট ঐ ঐ স্থানগুলি সুপরিচিত ছিল। বলা বাহুল্য ঐ মানচিত্রগুলি গ্রীস ও মিশর দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন। এই নক্ষত্র পুঞ্জের সাহায্যে ফিনিসিয়ান জাতি তাহাদের বাণিজ্য-জাহাজ পরিচালনা করিতেন।

কোন প্রকার যন্ত্রাদির সঙ্গে থেলিসের পরিচয় ছিল না। তবুও তিনি এত বিশুদ্ধরূপে ও সূক্ষ্ম মতে নক্ষত্র-বৃন্দের অবস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া নাবিকগণের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় তিনি শুধু নক্ষত্র গণের পরস্পর সন্নিবেশ (configuration) নির্দ্ধারণ করিয়া উক্ত তারকাপুঞ্জের মধ্যে উজ্জ্বলতর তারকাটীর নির্দ্দেশ করিতেন।

অনাক্সিমান্দার (Anaximander)—ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। থেলিসের মতের সঙ্গে ইঁহার মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার মতে সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর সমান। ইনি ছায়া ঘড়ি বা শঙ্কু (Gnomon) আবিষ্কার করেন। ক্রান্তিপাত ও অয়নসন্ধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য একটী শঙ্কু লেসি-ডিমন নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ভূগোল শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রেই তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। তাঁহাকে জ্যোতি-র্ব্বিদ না বলিয়া দার্শনিক বলাই সঙ্গত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন খৃঃ পূঃ ৫৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। আবার কেহ২ বলিয়া থাকেন যে খৃঃপূঃ ৬১১—খৃঃ পূঃ ৫৪৭ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি মিলে-টাস (Miletus) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনাক্সিমেনিস্ (Anaximenes)—প্লিনি বলিয়াছেন ইনিই সর্ব্বপ্রথম সূর্য্য ঘড়ি প্রস্তুত করেন এবং কিরূপে এই ঘড়ি প্রস্তুত করিতে হয় তাহা তিনি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীকগণ ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিয়া সময় নির্ণয় করিতেন। ইনিও মিলেটাস (Miletus) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি মনে করিতেন যে বায়ু হইতেই সকল পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অনাক্সগোরাস্ (Anaxagorous)—ইনি পূর্ব্বোক্ত অনাক্সিমেনিসের শিষ্য। তাহার মতে সূর্য্য একটী সুবৃহৎ অত্যুত্তপ্ত লৌহপিণ্ড বা অত্যুষ্ণপিণ্ড বিশেষ; The Pelo-honesus হইতে কতকটা বৃহত্তর। আকাশটা প্রস্তর গম্বুজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্ত্তুলাকার গতির নিমিত্তই ইহা পড়িয়া যাইতেছে না। সূর্য্য উষ্ণমণ্ডল অতিক্রম পূর্ব্বক কর্কট ক্রান্তি বা মকর ক্রান্তি ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে না। কেননা অতি গাঢ় বায়ুমণ্ডলে আঘাত লাগিয়া ইহার পূর্ব্বপথ অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা গ্রীক গণের এই উক্তিটিকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন। তিনি আকাশের গতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান প্রদান করিয়া যান নাই। চন্দ্র গ্রহণের কারণ দর্শাইতে গিয়া এবং একেশ্বর বাদ শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতার অভিযুক্ত হন। কেননা ইহাতে দেবগণের শক্তি ও গুণ প্রাকৃতিক ঘটনাবলিতে আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই দার্শনিক পণ্ডিত এবং তাহার পরিবারের সকলেরই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল। তাহার বন্ধু ও শিষ্য পেরিকলস্ (Pericles) বহুতর চেষ্টা করিয়া এই দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত করেন। তৎপর ইনি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত হন। আইওনিয়ার (Ionia) অন্তর্গত স্থান বিশেষে খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার জন্ম হয়। কিন্তু তিনি এথেন্স নগরেই শিক্ষাদান কার্য্যে ৩০ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার শিষ্যগণের অনেকেই বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ও ইহার শিষ্য ছিলেন। মহাত্মা গ্যালিলিওর ন্যায় ইহাকেও অধর্ম্ম মূলক (?) তত্ত্ব প্রচারের জন্য এথেন্স হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪২৮ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

পিথাগোরাস্—(Pythagorous) যখন আইও-নিয়ান বাসী গ্রীকগণ এই প্রকারে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি ও বিস্তার মানসে প্রকৃতি রাণীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া জ্ঞান লাভ করিতে ছিলেন সেই সময়ে পিথাগোরাস্ ও ইটা-লিতে অপেক্ষাকৃত উন্নত এক জ্যোতির্ব্বিদ সম্প্রদায় গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। পিথাগোরাস্ মিশর দেশে আসিয়া রাশিচক্রের প্রবণতা এবং প্রাতঃ ও সান্ধ্যতারার একত্ব প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবী ও সূর্য্যের আপেক্ষিক গতি সম্বন্ধে তিনি যে মত

পোষণ করিতেন, তাহার জন্যই তিনি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছেন। সাধারণের নিকট তিনি ভৌম কেন্দ্রিক মত প্রচার করিলেও তাহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে সৌর কেন্দ্রিক মতই শিক্ষা দিতেন। পিথাগোরাসের এই সিদ্ধান্তটীই কপারনিকাস নামক প্রসিদ্ধ জর্ম্মন জ্যোতির্ব্বিদ সপ্রমাণ করিয়া পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন। ইহার মতে গ্রহগণ বাদ্যযন্ত্রের তানলয় সঙ্গত সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় ললিত মধুর ধ্বনি করিয়া তালে তালে নাচিতে নাচিতে সবিতা দেবতার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে *। কিন্তু মানুষের কর্ণ এত স্থূল যে সেই সুমধুর শব্দ কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি ইহা ব্যতীত আরও অনেক রকম আকাশ কুসুমের চিন্তা করিতেন। তাঁহার খেয়াল সম্বন্ধে যতদূর শুনিতে পাওয়া যায় তাহা সত্য কিনা বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক গ্রীকগণের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। পিথাগোরাস্ খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন ( সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৫৮২—খৃঃ পূঃ ৫০০ )। ইনি ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতিষ শিক্ষা দিতেন। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে আইওনিয়ানগণ হইতে ইঁহার জ্ঞান উন্নত ছিল।

* "Music of the Spheres" — Miltons Comus.

† শ্রুতি গ্রাহ্য শব্দের একটী সীমা আছে। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় এরূপে গঠিত যে শব্দটী অতি উচ্চ বা খুব নিম্ন হইলে কর্ণের ভিতর স্থিত পরদায় যাইয়া আঘাত করিতে পারে না। সুতরাং সেই সকল শব্দ আমরা শুনিতে পাইনা। অতিবেগে একটী ঢিল ছুরিলে, ইহা পন্ পন্ শব্দ করিয়া বায়ু বেগে চলিতে থাকে। গ্রহগণও অসাধারণ গতিতে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিন্তু যে বায়ুমণ্ডলে ইহারা বিচরণ করিতেছে উহা অতি লঘু। সুতরাং উহাদের গতিনিবন্ধন, ঢিল ছুরার ন্যায় কোন প্রকার শব্দ হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রকার লঘু বায়ু মণ্ডলকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ইথার বলিয়া থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানেই ইথার বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ইহা কোন প্রকার ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রাদির গ্রাহ্য নহে। ইহা শুধু বৈজ্ঞানিকগণের কল্পনাতেই স্থান পাইয়া আছে। সুতরাং ইথরের সঙ্গে জ্যোতিষ্কগণের ঘর্ষণ হওয়ায়, কোন প্রকার শব্দোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা প্রমাণ করিবার কোন উপায় আজ পর্য্যন্তও উদ্ভাবিত হয় নাই।

যৌবনে পিথাগোরাস্ থেলিসের শিষ্য ছিলেন। তখনকার দিনের ইটালির অধিবাসিগণ বিদেশ পর্য্যটন ভিন্ন জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিতেন না। এই সর্ব্বজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত জ্ঞানলালসায় প্রণোদিত হইয়া মিশর, ফিনিসিয়া, কেলডিয়া, এবং ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং এই সকল স্থানের বিজ্ঞমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানে আজও তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন পাওয়া যায়। সেমোসের অত্যাচারি রাজা পলিক্রেটু ( Polycrates ) তাঁহাকে মিশর দেশের তদানিন্তন রাজা ( Amadis ) এমাডিসের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুপারিশে তিনি মেফিস্ ( Mephis ) নামক স্থানের কলেজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। পুরোহিতেরা এবিষয়ে প্রথমত ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেও পরে রাজাদেশ বলবৎ হইল। তাহাদের গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে পুরোহিতেরা তাঁহাকে কয়েকটী কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া লইলেন। এই পরীক্ষা গুলির অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। শিক্ষা না দেওয়ার একটা ফন্দি বা উপায় মাত্র। এই পরীক্ষা গুলি এত কঠিন ছিল যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও উৎসাহশীল পুরুষকেও ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইত। সম্ভবতঃ বিদেশীয় গণের মধ্যে একমাত্র পিথাগোরাসই মিশর দেশের পুরোহিত গণের এই পরীক্ষা রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর দেশ পর্য্যটণ করার ফলে নানা দেশীয় জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়া তিনি গ্রীস দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর জন্মভূমি সেমোস্ ( Samos ) নামক স্থানে থাকিয়াই তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইটালির অন্তর্গত টেরেণ্টাম্ ( Tarentume ) নামক স্থানে গ্রীকগণের একটী উপনিবেশ ছিল। শীঘ্রই তিনি তথায় যাইয়া ক্রোটনা ( Crotona ) নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তথায় অতি দ্রুত তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ফিলোলাস্—(Philolaus of Crotona)—ক্রোটনাবাসী ফিলোলাস্ পিথাগোরাসের শিষ্য ছিলেন। তিনি

তাঁহার গুরুদেবের সৌরকেন্দ্রিক মত মানিতেন। কিন্তু তাঁহার মতে সূর্য্য একটী কাচের থালা এবং এই থালাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল আলো প্রতিফলিত বা কেন্দ্রিভূত হইত। তিনি ২৯½ দিনে চান্দ্র মাস, ৩৫৪ দিনে চান্দ্র বৎসর ও ৩৬৫¼ দিনে এক সৌর বৎসর গণনা করিতেন।

থিওফ্রেটাস্—(Theophrastus) ইনি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের একখানা ইতিহাস লিখিয়াছিলেন এবং নিজেও একজন জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ইহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৩৭২—খৃঃ পূঃ ২৮৬ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি ২২৭ খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এবং এরিষ্টটালিয়ান লাইব্রেরীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না।

নিকেটাস্—(Nicetas of Syracuse) ইনি সর্ব্বপ্রথম পিথাগোরাসের সৌরকেন্দ্রিক মত প্রকাশ্যভাবে প্রচার করেন। নিকেটাসের মতে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে। তাহার ফলে নক্ষত্রগণের গতি অনুভূত হয়। ইনি সিরাকিউস্ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

মিটন ও তাহার পৌনঃপুনিক চক্র—পৌনঃপুনিক চক্র আবিষ্কার করিয়া মিটন গ্রীস্ দেশে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ কেল্‌ডিয়ানগণ এই চক্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিটন ও ইউটেমন নামক দুইজন এথেন্সবাসী জ্যোতির্ব্বিদই ঐ চক্রের গণিত শাস্ত্র সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বেবিলোনিয়ান গণের সেরোস্ বা তালিকা নিয়া গবেষণা করিবার কালেই ইহারা ঐ সিদ্ধান্তটী পাইয়াছিলেন। ঐ চক্র খৃঃ পূঃ ৪৩৩ অব্দের ১৬ই জুলাই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীকবাসীগণ অতি আনন্দের সহিত ঐ চক্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাদের উপনিবেস সমূহেও ইহা প্রচার করিয়াছিলেন। তাম্র নির্ম্মিত বোর্ড খোদিত করিয়া তাহার উপর ইহা সোণার অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতেই গোলডেন নাম্বারের উৎপত্তি হয়। সুতরাং মিটনই গোলডেন নাম্বারের জন্মদাতা। ইউরোপের সকল পঞ্জিকাই এই গোলডেন নাম্বারের উপর সংস্থিত।

এক্ষণে মিটনের চক্রটীর একটু আলোচনা করা যাউক। মিটনই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে ১৯ বৎসরকে দিনে পরিবর্ত্তন করিলে ৩৬৫.২৫ × ১৯ = ৬৯৩৯.৭৫ দিন হয়। আর এক চান্দ্র মাসকে ২৩৫ দ্বারা গুণ করিলেও ২৯.৫৩০৫৮৮৭ × ২৩৫ = ৬৯৩৯.৬৮৮ দিন হয়। অর্থাৎ ৬৯৩৯.৬৮৮ দিনের মধ্যে ২৩৫টী চান্দ্র মাস আছে। সুতরাং অদ্য চন্দ্র ও সূর্য্য রাশিচক্রের যে যে স্থানে পরস্পর যে যে ভাবে আছে ১৯ বৎসর পরেও আবার রাশিচক্রের সেই সেই স্থানে সেই সেই ভাবে অবস্থান করিবে। মোট কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯ বৎসরে চন্দ্র ও সূর্য্যের পরস্পর অবস্থানের যে ক্রমিক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী ১৯ বৎসরেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে। কাজেই, পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯ বৎসরে যে মাসের যে তারিখে যে তিথি হইয়াছিল, পরবর্ত্তী ১৯ বৎসরেও সেই মাসের সেই তারিখে সেই তিথিই হইবে। এবং চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধিও সেই ভাবেই হইবে। কেবল মাত্র পার্থক্য এই হইবে যে এই তিথিগুলি পরবর্ত্তী চক্রে প্রায় এক ঘণ্টা কাল পূর্ব্বে হইবে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই ১৯ বৎসরের চক্রকে মিটনের চক্র বা চন্দ্রের চক্র (Cycle of the moon) বলিয়া থাকেন। এই চক্রের সাহায্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি অতি সহজেই গণনা করিতে পারা যায়। আজ যে তিথি ১৯ বৎসর পরে এই দিনে আবার সেই তিথি হইবে। কিন্তু আজ যে সময়ে এক তিথি ছাড়িয়া অন্য তিথি আরম্ভ হইবে ১৯ বৎসর পরে এই দিনে তাহার প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে সেই তিথি ছাড়িয়া তাহার পরবর্ত্তী তিথি আরম্ভ হইবে। খৃষ্টানেরা ইষ্টার পর্ব্বের দিন গণনা করিবার জন্য এই মিটনের চক্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ এই পর্ব্বোপলক্ষে প্রতি বৎসর ২১শে মার্চ্চের পরবর্ত্তী পূর্ণিমার পরেই যে রবিবার হয়, সেই রবিবারেই উৎসবাদি ধুমধাম হইয়া থাকে। এই কারণেই ১ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত ১৯টী সংখ্যাকে সোণার সংখ্যা (Golden number) বলা হইয়া থাকে। কোন

খৃষ্টাব্দে ১যোগ করিয়া তাহাকে ১৯দ্বারা বিভক্ত করিলে যে অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই ঐ বৎসরের সুবর্ণ-সংখ্যা বলা হয়। যেমন ১৯০২ সনের গোল্ডেন নম্বর বা সুবর্ণসংখ্যা তিন। যখন অবশিষ্ট না থাকে, তখন সুবর্ণসংখ্যা ১৯।

ইউডক্সাস্- (Eudoxus)—৩৭০ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক কালে ইনি একজন বড় জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি গ্রীসদেশে ৩৬৫¼ দিনে বৎসর প্রতিষ্ঠিত করেন। আর্কিমিদিস বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাহার মতে সূর্য্যের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাস অপেক্ষা—নয়গুণ বড়। তিনি তিনখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বেবিলোনিয়ানগণের ভবিষ্যৎ বাণী তিনি ঘৃণা করিতেন এবং প্রত্যেক ঘটনারই বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির সম্বন্ধে তিনিও অদ্ভুত একটা মত পোষণ করিতেন। মিশর দেশে থাকিয়া তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

প্লেটো—(Plato)—যদিও প্লেটোকে প্রকৃত প্রস্তাবে জ্যোতির্ব্বিদ বলিতে পারা যায় না, তবুও তাঁহারই প্রতিভা বলে জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছিল। তিনি গ্রহণ হওয়ার কারণ জানিতেন। তাঁহার অনুমান এই যে জ্যোতিষ্কগণ ঋজু রেখায় ভ্রমণ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু মধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণের টানে ইহারা বৃত্তাকারে চলিতে বাধ্য হয়। তিনি জ্যামিতির খুব চর্চ্চা করিতেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টের জন্মের ৪২৭ বৎসর পূর্ব্বে এথেন্স নগরে বা ইজিনা দ্বীপে ইহার জন্ম হইয়াছিল।

এরিষ্টটল—(Aristotle)—প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান এরিষ্টটলের নিকট কিছু ঋণী। তিনি তাঁহার একখান পুস্তকে কতকগুলি পর্য্যবেক্ষণের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে চন্দ্র কর্ত্তৃক মঙ্গলের উপগ্রহণ, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক মিথুন রাশিস্থিত একটী নক্ষত্রের গ্রহণ উল্লেখ যোগ্য। এই প্রকারের গ্রহণ কদাচিৎ হইয়া থাকে। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির প্রতি তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন!

হিপার্কস—এরিষ্টটলের পরে বহুতর জ্যোতির্ব্বিদ প্রাদুর্ভূত হইয়া গবেষণা করেন। ইহাদের পরিশ্রমের ফলে হিপার্কাসের পথ পরিষ্কার হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে হিপার্কাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এথেন্স নগরে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্লেটুর শিষ্য ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩৪২—খৃঃ পূঃ ৩৩৯ পর্য্যন্ত ইনি মহাবীর আলেকজেণ্ডারের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ৬২ বৎসর বয়সে ইহার ভবলীলা শেষ হয় (খৃঃ পূঃ ৩২১ অব্দে)।

হেলিকোন—(Helicon of Cyzicus)—ইনি পূর্ব্বেই গণনা করিয়া একটী গ্রহণের ভবিষ্যৎবাণী বলিয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে গ্রীস দেশে মাত্র তিনজন জ্যোতির্ব্বিদ গ্রহণ গণনা করিয়া বলিতে পারিতেন। ইহারা যথাক্রমে থেলিস্ হেলিকোন ও ইউডেমস্। হেলিকোন যে গ্রহণ গণনা করিতে পারিতেন একথা প্লুটার্ক (Plutarch)ও বলিয়া গিয়াছেন।

ইউডেমস্ -(Eudemus)—ইনি একখানা জ্যোতির্ব্বিদের জীবন চরিত ও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থখানার সকল অংশ পাওয়া যায় না। ইহাতে লিখিত আছে যে বিষুবদবৃত্ত ও রাশিচক্রের মেরুদণ্ডদ্বয় পরস্পর ২৪° ডিগ্রীর কোণে অবচ্ছেদ করিতেছে। ইহার পূর্ব্বে গ্রীকগণের মধ্যে কেহই রাশিচক্রের প্রবণতা নির্ণয় করেন নাই।

অটোলিকাস্ (Autolycus of Pitane)—ইনি দুই খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের একখানি চলন্ত গোলক (moving sphere) সম্বন্ধে ও অন্যটী নক্ষত্রের উদয়াস্তের সম্বন্ধে। এই দুই খানি পুস্তক অক্ষত ভাবে এখনও পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন।

পিথিস্ (Pytheas)—ইনি মার্সিলিন (Marseillen) নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি বিভিন্ন অক্ষান্তরের শঙ্কুচ্ছায়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ ও ভূগোলের তত্ত্ব সংগ্রহার্থে তিনি কয়েক বার সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন এবং একবার আইসলণ্ডেও গিয়াছিলেন। তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও হিসাব পত্রাদি মিথ্যা ও কাল্পনিক বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহাদের অধিকাংশই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

কেলিপাস্ (Calippus)—মহাবীর আলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্ব্বে একটী চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। এই গ্রহণের সাহায্যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মিটনের চক্রে ৬ ঘণ্টার ভুল আছে (প্রায় ¼দিন) সুতরাং ৯৪০টী চান্দ্র মাস ৪টী মিটনের চক্র হইতে ১দিন কম। অর্থাৎ গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে ৯৪০ চান্দ্রমাস = ৪ মিটনের চক্র — ১দিন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর।

## ( ৩ )

### বিদ্যার নিকট সুন্দরের মালা প্রেরণ।

ধীরে ধীরে আশ্রয়হীন অতিথির মত সুন্দর সন্ধ্যাকালে মালিনীর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বাসরে ঘৃতের বাতি জ্বালে কুলবালা।
রবিপাটে বসে রায় হেন সন্ধ্যাবেলা॥
ধীরে ধীরে উপনীত হইলেন তথা।
কিঞ্চিৎ কহিব আমি মালিনীর কথা॥
চারি কোণা পুষ্করিণী তাহার কিনারে।
মালিনীর বাড়ী খানি ঝলমল করে॥
চৌচালা ঘর খানি দেখিতে সুন্দর।
উসারা পসারা তার অতি মনোহর॥
চাছা ছোলা সুন্দি বেতে বান্ধা চাল খানি।
রাজার কামেলা দিছে উলুছনের ছানি॥
উঠা পৈঠা পরিপাটী লেপা মুছা ধার।
ক্ষুদ্র সে উঠানখানি অতি পরিস্কার॥
উত্তর দুয়ারী ঘর খাগরের বেড়া।
আঙ্গিনার চারিদিকে মালঞ্চেতে ঘেরা॥
আয়নার মত সাদা ঝলমল করে।
সিন্দুর পড়িলে ভুঁয়ে তুলে নিতে পারে॥
মল্লিকা মালতী ফুটে অঙ্গন ভরিয়া।
নানা জাতি ফুল ফুটে গন্ধে আমোদিয়া॥
লতায় পাতায় ফুল ফুলের বাহার।
শাখায় ফুটিছে ফুল হীরামন হার॥
কেতকী কনক চাম্পা ভুঁয়ে পরি হাসে।
মানুষ ভুলিয়া যায় গোলাপের বাসে॥
নারী মন ভুলাইতে ফুটে গন্ধরাজ।
বকুলের বাসেতে আকুল ভৃঙ্গরাজ॥
বেড়াখানি ঘেরা তার কুঞ্জলতা দিয়া।
মধু লোভে ভৃঙ্গ গায় উড়িয়া পড়িয়া॥
টগর কামিনী কত ভুয়েতে লুটায়।
মালিনীর কুঞ্জে পিক বার মাস গায়॥
মদকল দধিকল শ্যামা ধরে তান।
অঙ্গনে খঞ্জ নাচে সারী গায় গান॥
পাপিয়ার পিউ পিউ বুলবুলি হাকে।
নিশিকালে যত পাখী কুঞ্জে আসি থাকে॥
প্রভাতে সোনার রৌদ্র জুরে আঙ্গিনায়।
কেহ ডাকে ডালে বসি কেহ উড়ে যায়॥
বার মাস বসে হেথা বসন্ত মদন।
না শুকায় পুষ্প হেথা না টলে যৌবন॥

* * * *

পুষ্পাকীর্ণ পথ দিয়া পুষ্প শাখা সকল ধীরে সরাইয়া সুন্দর মালিনীর ফুলের আঙ্গিনায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দুই একটী ভ্রমর আগন্তুক অতিথিকে সারা দিয়া আবার ফুলের উপর উড়িয়া বসিল। তখনও মালিনী ঘরে সাঁঝের বাতি জ্বালে নাই। আঙ্গিনার ধারে রজনী গন্ধা ও সন্ধ্যামালতী সবে মাত্র ফুটিতেছে। মালিনীর কুঞ্জ তখন সায়াহ্নের নিরবতাকে ধীরে আলিঙ্গন করিতেছিল। দূরে চাম্পার রাজ বাড়ীতে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেছে; মালিনী ঘরে বসিয়া প্রদীপের যোগাড় করিতেছিল।

* * * *

আঙ্গিনায় থাকি রায় মনেতে হাসিল।
মাসী মাসী করি তবে তিন ডাক দিল॥
জ্বালিতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালিতে না পারে।
হাতের শলিতা তৈল ভুয়ে গেল পরে॥

এইরূপে ত্রস্তভাবে মালিনী ঘরের বাহির হইয়া আসিল। মালিনী

আঙ্গিনায় চাহিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
এমন সুন্দর রূপ না দেখিছে আর॥
কিবা অপরূপ রূপ মদনে জিনিল।
চাঁদের কিরণে বিধি ইহারে গড়িল॥
কি কব রূপের কথা কহিতে না জোয়ায়।
আজি কিরে চান্দ মোর উদয় আঙ্গিনায়॥
হলুদ বরণ সোনার কিরণ যেন কাঞ্চা সোনা।
লাজ বাসে শশী হেরী বদন চন্দ্রমা॥
চোখ ভুরু দেখি যেন মদনের ধনু।
কি দিয়ে গড়িল বিধি হেন সোনার তনু॥
ভাসা ভাসা দেখি দুটী ডাগর নয়ন।

কটাক্ষে হরিতে পারে কামিনীর মন॥
তিল ফুল জিনি নাশা সুন্দর ললাট।
বসিবারে লক্ষ্মী যেন পাতিয়াছে পাট॥
এমন কপালে নাই চন্দনের তিলা।
এমন গলায় নাই রঙ্গনের মালা॥
কোথা হইতে আইসে কুমার কোথায় জানি থাকে।
আইল আমারে বুঝি পড়িয়া বিপাকে॥

মালিনী অবাক হইয়া সুন্দরের সৌন্দর্য্য দেখিতে ছিল। সুন্দরও ততক্ষণ মাসীর পানে চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে ছিলেন।

মালিনীর রূপ বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন:—

মালিনীর রূপের কথা শুন সভাজন।
যখন আছিল তার ভরা যৌবন॥
রত্ন অলঙ্কার যত যেত গড়াগড়ি।
হাওয়েতে উড়িয়া যেতো গঙ্গাজল শাড়ি॥
একগাছি মালা তার লক্ষ টাকা ছিল।
কটাক্ষে * * * *॥
গোলাপ ঝড়িয়া গেছে আছে মাত্র ডেটা।
যৌবন তরঙ্গ নাই আছে মাত্র ভাঁটা॥
ঝড়িয়া পড়িয়াছে ফুল শূন্য ফুলবন।
কয়দিন রহে বল নারীর যৌবন॥
ধরায় বসন্ত আসি কয়দিন থাকে।
কয়দিন ডালে বসি পিক কুহু ডাকে॥
গলে চন্দনের মালা হইয়া গেছে বাসি।
চিরল দন্তেতে আজও আছে তার মিশি॥
দুই একগাছি কেশ পাকিছে মাথায়।
যৌবন ধরিয়া আজও রাখিবারে চায়॥
বয়সের দোষ কভু না যায় সকাল।
পান গুয়া খাইয়া তার ঠোট দুটী লাল॥
রাজার বাড়ীতে ফুল যোগায় মালিনী।
আজি কালি এই মাত্র কাজ তার জানি॥

* * * *

তখন—মালিনীরে কহে রায় মনে মনে হাসি।
আমি তোমার বোন্ পুত তুমি মোর মাসী॥
দেশে বিদেশেতে ঘুরি মাসিরে খুজিয়া।
আজি বুঝি ভাগ্যে বিধি দিল মিলাইয়া॥
শৈশবে মরিল মাও খেদাইল পিতা।
আজি রাত্রি শুনাইব মাসী মোর দুঃখের কথা॥
রসের মালিনী তবে ভাবিয়া নিশ্চয়।
বাহিরে দেখায় কোপ মনে হাসিকয়॥
কোথা হতে আইলা তুমি কোথায় বাড়ী ঘর।
মাসী মাসী বইলা ডাক মনে লাগে ডর॥
কোন দিন নাহি জানি বহিন মোর ছিল।
কোথায় ছিল বইন পুত কোথা হইতে আইল॥
সাত জন্মে মাও নাই মাসী চার পাঁচ।
মাসী বলি ভাড়াও বলিয়া সাত পাঁচ॥
আমার দুঃখের কথা শুইনা বৃক্ষের পাতা ঝরে।
তিন কুলে কেউ নাই সুধায় আমারে।
শিশুকালে বাপ মৈল মাও গেলা ছাড়ি।
দশ না বছরের কালে হইয়াছি রাড়ী॥
বিপদে পড়িয়া গেলাম বড় ভাইয়ের বাড়ী।
ভাই বউ তাড়াইল দিয়া বেড়া বারি॥
ভাই বন্ধু নাই মোর সুহৃৎ সুজন।
মায়ের পেটের ভাই হইল দুষমন॥
সুতের সেওলা হইয়া ভাসিয়া বেড়াই।
সংসারের লোকে মোর না করিল ঠাই॥

কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে এক্ষণে আমার দিন ফিরিয়াছে।

চিকন চালের ভাত পান গুয়া খাই।
দিন গেছে ফিরে তাই বইন পুতে পাই॥
বাপ মায় খেদাইল দিয়া বেড়া বাড়ি।
বিপদে পড়িয়া বুঝি আইলা মোরে স্মরি॥
চোর ডাকাত কিম্বা হবে বাট্ পার।
আমার বাড়ীতে ঠাঁই নাহৈবে তোমার॥
কোন দিন না দেখি না শুনি কোন কালে।
রাজার কোটালে কহি দিব তোমা শালে॥

রাজপুত্র দেখিলেন বিপদ্। তিনি তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই উদ্ধত ফণা মালিনীর মাথায় কৌশলে ধুলি পড়া দিলেন, এক থলিয়া সুবর্ণ মুদ্রা ঝনাৎ করিয়া মালিনীর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন—'মাসী এই নাও।'

এই সময় তারাদল সহ সারাটা আকাশ যদি মালিনীর মাথার উপর খুলিয়া পড়িত বোধ হয় তথাপি মালিনী এমন আশ্চর্য্যান্বিত হইত না। একেত অযাচিত, তার উপর আবার আশাতিরিক্ত—মালিনী টাকার থলিয়া রাখিয়া ভূতলে পড়িয়া আছারি বিছারি খাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিলাপ রাগিণী,কিন্তু স্বর অনুচ্চ,কিজানি শুনিয়া পাড়ার পোড়ার মুখীরা দৌড়িয়া আসে।

মালিনী কাঁদিছে সোনা বইনেরে ডাকিয়া।
হায় হায় বুক মোর যায় রে ফাটিয়া॥
আছিলী যমজ বইন গো মার কোল যোরা।
অল্লেতে ছাড়িল মোরে মুঞ কপাল পোড়া॥

মালিনীর কান্না আর ফুরায় না। সাত জন্মের দুঃখ আজ তাহার উথলিয়া উঠিয়াছে। অনেক কষ্টে রাজকুমার তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন চিকন মালিনী মাসী মনেতে হাসিয়া পঞ্চশত তঙ্কা লইল গুনিয়া বাছিয়া॥ তার পর "বসিতে আসন দিল কাঁঠালের পিড়ি।" শুধু আসন দিয়াই মাসী ক্ষান্ত হইল না।

"আশা ধানের খাসা চিড়া বিন্নি ধানের খই।
সুন্দরে খাইতে দিল গামছা বান্ধা দই॥
পাতে মজা সবরী কলা সর পড়া ক্ষীর।
সুন্দরের কাছে আনি করিলা হাজির॥

তিন দিনের উপবাসী কুমার তখন মাসীর বহু যত্নের প্রদত্ত ভোজের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। মালিনীর বাড়ীতে দৈ, চিড়া খাওয়ার জাত বিচার সম্বন্ধে কবি এখানে কিছুই বলেন নাই। সুন্দর আহারান্তে খড়কেজিড়া সুপারী সাচি পান কেওয়া খত চিবাইতে চিবাইতে সুকোমল পুষ্প শয্যার উপর পড়িয়া অচিরেই নিদ্রাগত হইলেন। আজ প্রায় একমাসের পর এই তাঁহার শান্তিতে আহার নিদ্রা। দুঃখের পর সুখ কত মিষ্ট!

এইরূপে সুন্দর চার পাঁচ দিন মাসীর বাড়ী থাকিয়া মালিনীর নিকট হইতে রাজবাড়ীর সমস্ত খোজ খবর লইলেন। একরাজা তিন রাণী, সন্তানের মধ্যে একমাত্র ষোড়শী কন্যা। কন্যার রূপের কথা বলিতে মালিনীর ভাষায় আর কুলায় না। সে বলিল আমার বাগানে যত ফোটা ফুল, আকাশের যত তারা সকল একত্র করিলেও বুঝি রাজকন্যার রূপের তুলনায় সমান হয় না।

রাজার কন্যার কথা বলিবার নাই।
আপন জানিয়া কিছু কহিনু তব ঠাই॥
মুখে চন্দ্র দেখি চন্দ্র মেঘেতে লুকায়।
চাচর চিকন কেশ পায়েতে লুটায়॥
কভু বা আলুই কেশ কভু বান্ধা বেণী।
চপল যুগল আঁখি বনের মৃগজিনি॥
ইন্দ্রধনু জিনিয়া সুন্দর যুগ্ম ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা সরু॥
মৃণাল পাইল লাজ ভুজলতা হেরি।
মদন ভুলিয়া রূপে রতিরে পাশরি॥
দেহের লাবনী পড়ে ভূয়েতে ঝরিয়া।
হীড়ামন লাজ পায় অঙ্গেতে থাকিয়া॥
বায়ু হয় সুরভিত অঙ্গের বাতাসে।
চাহিলে আসমানে কন্যা তারা পড়ে খসে॥
গাহনা শুনিলে লাজ পায়ত কোকিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে॥
ষোল বছরের কন্যা পরমা যুবতী।
বিয়া না হইল আজও ঘরে নাই পতি॥
বাপ মায় বিদ্যা নাম রাখিয়াছে তার।
তাহার লাগিয়া নিতি গাঁথি পুষ্প হার॥
কি কব দুঃখের কথা কইতে বাসি ডর।
রূপে গুণে দেখি তোমা তার যোগ্য বর॥

তখন রাজপুত্র বলিলেন ষোল বৎসরের কন্যা আজও তার বিবাহ হয় নাই, মাসী এত বড় আশ্চর্য্যের কথা! মাসী তখন হাতের উপর হাত রাখিয়া নানাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল।

"কি কব কন্যার কথা কইতে বাসি ভয়।
আপন জানিয়া তোমা কহি সমুদয়॥
কন্যার মনের কথা বুঝা হলো দায়।
কত রাজপুত আসি ফিরে ফিরে যায়॥
পণ করিয়াছে কন্যা কি জানি ভাবিয়া।
জিয়ন্তে পুরুষে কভু না করিবে বিয়া॥

রাজপুত্র বলিলেন মাসী এ প্রতিজ্ঞার কারণ কি!

মালিনী বলিল আমি কারণ টারণ জানিনা বাপু রাজ রাজরার ঘরের কথা, একটু খানি তরসপরস হইলে শেষে গর্দ্দান যাবে। সুন্দর তখন লোভের মাত্রা চড়াইয়া দিলেন। আরও এক থলিয়া টাকা—গুপ্ত সংবাদটা চাই।

মালিনী বিষম লোভে পড়িল। ভাবিল এ নিশ্চয় কোন রাজ রাজরার কাণ্ড! ছেলে—রূপে গুণে কার্ত্তিক কুমার, তা না হইলে এত সোনার টাকা কোথায় পাইবে? যাক, মরি বাঁচি সংবাদটা জানিতেই হইল।

পর দিন রাজ বাড়ীতে ফুলের যোগান দিয়া মালিনী বাড়ী ফিরিল; সুন্দর মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মালিনী—"ফাঁদিয়া কথার ফাঁদ সুন্দরের ছলে।

আগাস্ত বাগাস্ত কথা আগে কত বলে॥
তার পর আরম্ভিল চিকন মালিনী।
রাজার বাড়ীতে আমি ফুলের যোগানী॥
গৃহ ছিদ্র কথা বাপু প্রকাশ হইলে।
আমার গর্দ্দান যাবে তুমি যাবে শালে॥

রাজপুত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—কথা বাতাসের কানেও পৌঁছাইবেন না; মালিনী প্রথমে অনেক বাহাদুরী দেখাইল "আমি বলে জানিয়াছি অন্যে কি তা পারে।" অনেক কথার পর আসল কথা বাহির হইল—

"হরিণা হরিণী দুই ছিল এক বনে।
শিশু দুটী ছিল তার বাপমার সনে॥
অকস্মাৎ একদিন কর্ম্মদোষে হায়।
আগুণে জ্বলিল বন ভষ্ম হইয়া যায়॥
হরিণা চলিয়া যায় প্রাণে করি ভয়।
হরিণী ডাকিয়া কয় শুন মহাশয়॥
দুই জনে যত্ন করি শিশুরে বাঁচাই।
হরিণা কহিল আগে নিজে রক্ষা পাই॥
এত কহি হরিণা পলায় দূরবনে।
শিশু ছাড়ি হরিণী না গেল অন্য স্থানে॥
সন্তান সহিত সেই পুইড়া ভষ্ম হইল।
হরিণী আছিল তেই মানবী হইল॥
জাতিস্মরা কন্যা তেই পূর্ব্ব কথা জানে।
প্রতিজ্ঞা করিছে কন্যা ভাবি মনে মনে॥
বড়ই দারুণ পণ শুন মনদিয়া।
পুরুষ বেইমান জাতে না করিবে বিয়া॥

তখন উৎকণ্ঠিত ভাবে রাজপুত্র—বলিলেন "মাসী আজকার রাতটা কোন রূপে পোহাক, তোমার যোগানের কালিকার মালাটা আমি গাঁথিব।

রাত্রি প্রভাত হইল। সদ্য ফুট শিশির স্নাত কুসুম-রাশি চয়ন করিয়া সুন্দর চিকনিয়া মালা গাঁথিলেন তেমন অপূর্ব্ব মালা মালিনী আর জীবনে কখনও দেখে নাই।

মল্লিকা মালতী আর জুই চাঁপা বেলা।
সাত লহরে গাঁথে চিকনিয়া মালা॥
মালা দেখি মালিনী ভাবিল মনে মন।
এত দিনে হইল কন্যার যোগ্য আভরণ॥
বিনাসূতে গাঁথা দিব্য কুসুমের হার।
মালিনী ভাবিল মনে নিজ পুরস্কার॥

এই সম্মোহন মালা দেখিয়া রাজকন্যা নিশ্চয়ই মালিনীকে বহুমূল্য পুরস্কার প্রদান করিবে। আর সেই গুপ্ত সংবাদ টা আনিয়া দিতে পারিলে মালাকারও তাহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিবেন। মালিনী সুধার আশায় রজনী বঞ্চিয়া এতদিনে সুধানিধিকেই হাতে পাইয়াছে।

এদিকে—মালাটী গাঁথিয়া কুমার কি কাম করিল।
পুষ্পের আড়ালে পত্র লিখিয়া রাখিল॥
যতন করিয়া কুমার পত্র যে লিখিল।
চাম্পা পুকুরের ঘাটে যাহে দেখাইল॥
আরত লিখিল কুমার নিজ সমাচার।
মালিনীর বাড়ীতে বাসা যেরূপ তাহার॥
নিজ পরিচয় লেখে পূর্ব্ব দেশে ঘর।
বাপ মার নাম লেখে কুমার সুন্দর॥
কৌশলে নিজের নাম পত্রেতে লিখিল।
যে কারণে বনে আসি ঘোড়া হারাইল॥
আর লেখে চাম্পা রাজ্যে আগমন কথা।
সকল লিখিয়া কুমার লিখে মনের ব্যথা॥
সর্ব্বশেষে কন্যার যৌবন দান চায়।
মালা দিয়া মালিনীরে করিল বিদায়॥
তখন—মালা লইয়া মালিনী চলিল রাজবাড়ী।
মনে ভাবি সাত পাঁচ পারি বা নাপারি॥
অন্ধি সন্ধি জানে মনে নানা বুদ্ধি ধরে।
একবারে উপনীত বিদ্যার মন্দিরে॥

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

# উদ্ভিদ।

মানবের মত উদ্ভিদও যে এক প্রকার জীবিত পদার্থ সে সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। বৃক্ষাদি ঠিক আমাদের মতই পান আহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও বিবাহ, বংশ বৃদ্ধি ইত্যাদি নিষ্পন্ন হয়। উদ্ভিদের ফুল হইতেই জননকার্য্য সম্পন্ন হয়। উচ্চ জাতীয় বৃক্ষের পুরুষ পুষ্পের পুং চিহ্নকে (Stamens) ষ্টেমেন বলে এবং তাহাতে যে পুং শক্তি সম্পন্ন হলুদরঙ্গের পরাগ থাকে তাহাকে (Pollen) পলেন বলা হয়। উচ্চজাতীয় স্ত্রীচিহ্নকে (Pistil) বলা হয়। ইহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা বা ডিম্বকোষ। পুং পরাগের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভ সফল হইলে ইহাই বর্দ্ধিত হইয়া ফলে পরিণত হয়। পুষ্পের এই মিলন কার্য্য কীট পতঙ্গ পাখী কিম্বা বায়ু দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ জগতে উচ্চ শ্রেণীর বৃক্ষরাশির মধ্যেই এইরূপ জননকার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে অন্যরূপ পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

কখন প্রশ্ন হইয়া থাকে যে সর্ব্বপ্রথমে জীবের সৃষ্টি কি উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছিল? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ভক্ষকের পূর্ব্বেই ভোজ্য বস্তুর সৃষ্টি সম্ভবপর, নচেৎ ভক্ষক কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে? সিংহ, ব্যাঘ্র জন্মিবার পূর্ব্বে যে ইহাদের ভোজ্য মৃগের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা একরূপ অবধারিত। জীবমাত্রেই সাক্ষাৎভাবে কিম্বা পরোক্ষে উদ্ভিদাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। একভাবে বলিতে গেলে উদ্ভিদগণ উৎপাদন করে এবং জীব ভক্ষণ করে। অগ্নি ও ইন্ধনের যে সম্বন্ধ ইহাদের সম্বন্ধও তাহাই। ইহা ভালরূপ বুঝিতে হইলে একটু চিন্তার দরকার। একখানা কাষ্ঠ কিম্বা কয়লা খণ্ড, ইহাতে কিছু হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং কার্ব্বণ (Carbon) বিদ্যমান রহিয়াছে। কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নিসংযোগ কর, ইহা জ্বলিয়া যাইবে। এই জ্বলনের অর্থ কি? কাষ্ঠের কার্ব্বণ ও হাইড্রোজেন অকসিজেনের (Oxygen) সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস ও জলে পরিণত হইবে। কাষ্ঠস্থ কার্ব্বণ অকসিজেনের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া উর্দ্ধে বায়ুতে মিলাইয়া যাইবে এবং হাইড্রোজেন অকসিজেনের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া জলীয় বাষ্পরূপে বায়ুতে মিশাইবে। কাজেই দহনের অর্থ কাষ্ঠস্থিত কার্ব্বণ ও হাইড্রোজেনের সহিত ভূ-বায়ুর অকসিজেনের সংমিশ্রিত হওয়া। এই দহন কার্য্যের সময়ে আলো ও উত্তাপ উদ্ভব হইয়া থাকে। এই আলো ও উত্তাপ কাষ্ঠফলকে গুপ্তাবস্থায় (latent) অবস্থিত ছিল। উত্তাপকেই প্রকারান্তরে শক্তি বলা যায়। কাজেই বিশুদ্ধ কার্ব্বণ কিম্বা হাইড্রোজেনের মধ্যে এই শক্তি নিবদ্ধ আছে। অকসিজেনের সংমিশ্রনে আসিলে ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদিও কাষ্ঠফলকের কার্ব্বণ ও হাইড্রোজেন একেবারে বিশুদ্ধ নয় তথাপি আমরা বর্ত্তমানে উহাদিগকে বিশুদ্ধ মনে করিয়া লইব।

এখন এই দহন কার্য্যে যে আলো ও উত্তাপ পরিলক্ষিত হইল ইহা কোথা হইতে আসিল। এই কাষ্ঠখণ্ড কোন এক বৃক্ষের অংশ বিশেষ; যে বৃক্ষ মুক্ত বাতাসে সূর্য্যের উত্তাপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পাথর কয়লাও কোন এক বহু পুরাতন বৃক্ষের অংশ বিশেষ যাহা মৃত্তিকার চাপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াও জনক বৃক্ষের দাহিকা শক্তি বর্ত্তমান রাখিয়াছে। কয়লা ও কাষ্ঠ উভয়েই মহাশক্তির আধার, সূর্য্য হইতে আলো ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষে সূর্য্যের আলো পতিত হওয়াতে বৃক্ষের সবুজ (chlorophyll) পত্রের সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বণিক এসিড বিযুক্ত হইয়াছে এবং বৃক্ষ ঐ কার্ব্বণ গ্রহণ করিয়াছে। সূর্য্যকিরণ বৃক্ষের রসভাগের অকসিজেন বিযুক্ত করিয়া দেওয়াতে বৃক্ষ জলভাগের হাইড্রোজেন অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছে। বৃক্ষের জননকার্য্যে যে সূর্য্যের কিরণ ব্যয়িত হইয়াছে এখনও বৃক্ষে পরোক্ষভাবে সূর্য্যের সেই শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। শক্তি কখনও ধ্বংশ হয় না। অন্য কথায় বলিতে গেলে এখন বৃক্ষটী দাহন করিয়া যে পরিমাণ আলো ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইবে উহা নির্ম্মিত হইতে সূর্য্যের ঠিক সেই পরিমাণ আলো ও উত্তাপ খরচ হইয়াছিল।

বৃক্ষ দাহন করিলে উহার মধ্যস্থ এক ভাগ কার্ব্বণ ( Carbon ) ২ভাগ অকসিজান ( Oxygen ) মিলিত হইয়া কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস হইবে। এই কার্ব্বণিক এসিডের পরিমান কত? ঠিক ততখানি যতখানি কার্ব্বণিক এসিড ইহা নির্ম্মিত হইতে বায়ু হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। জল ( $H_2o$ ) সম্বন্ধেও ঐ কথা। অন্য কথায় বলিতে গেলে ঠিক সেই পরিমাণ অকসিজেন ( Oxygen ) যাহা প্রথমতঃ কার্ব্বণ ও হাইড্রজেন হইতে বিযুক্ত হইয়া বৃক্ষের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছিল এখন দহনকালে ঠিক সেই পরিমান অকসিজেন ( Oxygen ) কার্ব্বণ ও হাইড্রজেনের সহিত সম্মিলিত হইয়া আলো ও উত্তাপ উৎপন্ন করে। এই আলো ও উত্তাপের পরিমাণ ঠিক ততখানি, সূর্য্যের যতখানি আলো ও উত্তাপ ঐ বৃক্ষের জননকালে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস ও জল হইতে অকসিজেনকে বিযুক্ত করিতে প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্রকৃতির দুইটী মূল পদার্থ কার্ব্বণ ও হাইড্রজেন যাহা অকসিজেনের সহিত রাসায়নীক ভাবে সম্বদ্ধ থাকে উদ্ভিদগণ সূর্য্য কিরণ সহযোগে উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার যন্ত্র বিশেষ। জীবজগৎ উদ্ভিদের বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকে। উদ্ভিদ নির্ম্মানকারী, জীব ধ্বংশকারী। উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ জাত পদার্থ ভক্ষণ করিয়া, জীব, জীবণ ধারণ করে এবং উহা দগ্ধ করিয়া সেই আলো ও উত্তাপের দ্বারা আত্মরক্ষা ও নানারূপ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। উদ্ভিদ কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস বিচ্ছিন্ন করে, জীব উহা নির্ম্মান করে। বৃক্ষ সূর্য্য হইতে শক্তি সঞ্চয় করে, জীব তাহা ক্ষয় করে।

এখন ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে বৃক্ষের আগে জন্ম কিম্বা জীবের আগে জন্ম। পৃথিবীর জীব জন্তুর জীবনের উপাদান বৃক্ষই অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। উদ্ভিদ ভিন্ন জগতে কোন জীবের সম্ভব হইত না। বৃক্ষের হরিৎ বর্ণ ( Chlorophyll ) পদার্থেই মৃত সঞ্জিবনী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। যে সূর্য্য কিরণ ইহাদের ( Chlorophyll ) উপর পতিত হয় তাহা কিরূপে সঞ্চয় করিতে হয় এবং কিরূপে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ইহারা জানে। উদ্ভিদের প্রস্তুত পদার্থ জীব ধীরে ধীরে ধ্বংশ করিয়া নিজে গ্রহণ করে। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ খণ্ড দগ্ধ করিয়া জল ও কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস প্রস্তুত করে ইহা ঠিক সেইরূপ ধ্বংশ।

ইহা একরূপ প্রমাণিত হইল যে জীবের পূর্ব্বেই বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই উদ্ভিদ হরিৎবর্ণ ছিল এবং উহার সূর্য্য কিরণের সহায়তায় অকসিজেন হইতে কার্ব্বণ ও হাইড্রজেন বিচ্ছিন্ন করিবার ক্ষমতা ছিল। প্রকৃত উদ্ভিদ জগতের ইহাই কার্য্য, যদিও বর্ত্তমানে কোন উদ্ভিদ তাহাদের প্রকৃত স্বভাব ত্যাগ করিয়া জীব জগতের অনুরূপ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে।

কিরূপে প্রথম উদ্ভিদের জন্ম হইল তাহা এখন কেহই বলিতে পারে না। তখন হয়ত ভূত সমূহের এরূপ অবস্থান ছিল যখন আপনা হইতেই তাহা হইতে উদ্ভিদ ও জীবের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আর এরূপ দেখা যায় না। হয়তঃ অণুসকলের পরিবর্ত্তনে আর স্বয়ম্ভু হওয়া সম্ভব নহে। জীব হইতে জীবের উৎপত্তি এবং উদ্ভিদ হইতে উদ্ভিদের উৎপত্তি অর্থাৎ পিতামাতা হইতে উৎপত্তিই বর্ত্তমান নিয়ম। উদ্ভিদের আদিম অবস্থায় নিজেরা বর্দ্ধিত হইয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুই ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। আমার কথা শুনিয়া কেহ হয়ত অবাক হইবেন। আমি বড় জাতীয় উদ্ভিদ আলু, সিমের কথা বলিতেছি না। আমি উদ্ভিদের কথা বলিতেছি যাহা সেওলার মত জলে ভাসিয়া বেড়ায়, যাহা হয়ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন দেখিবার যো নাই। অথচ এই নগণ্য উদ্ভিদ হইতে সময়ে বৃহৎ বন রাজির উদ্ভব হইয়াছে।

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যখন ইহা জলে পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন হয়ত সেই জলধি গর্ভে প্রথম উদ্ভিদের সৃষ্টি এবং ক্রমে তাহা হইতেই অন্য জীবজন্তু বৃক্ষাদির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলে সমুদ্র হইতে জীব আরম্ভ হইয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না।

জলের মধ্যে শেওলার মত যে আণুবিক্ষণিক আদিম উদ্ভিদের কথা বলা হইল উহারা বর্দ্ধিত হইয়া এরূপ

অবস্থায় উপনীত হয় যখন উহা দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটী ভিন্ন উদ্ভিদে পরিণত হয়। তখন দুইটীই ঠিক একরূপ থাকে এবং ক্রমে স্বাধীনভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে সময়ে কাহাকেও জনক বলা যায়না। এই সময়ে কে জনক কে পুত্র নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। উচ্চ শ্রেণীর বৃক্ষাদির মধ্যে দেখিতে পাই আদি জনক বৃক্ষ স্থির ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার বীজ হইতে নূতন বৃক্ষের সৃজন হয়। আদি গুল্ম যাহা নিজে দ্বিখণ্ডিত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে তাহদের কোন লিঙ্গ নাই অর্থাৎ সেখানে স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর বৃক্ষ কিম্বা জীব জগতে স্ত্রী পুরুষ ভেদ দেখিতে পাই। সেজন্য তথায় বংশ বৃদ্ধি করিতে স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন দরকার। এবং তাহাদের সন্তান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতামাতার গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

জীবজগতের আদি অবস্থায় প্রাণীগণের পূর্ব্বে উদ্ভিদের সৃষ্টি। উদ্ভিদ ব্যতীত কোন প্রাণীর উদ্ভবই সম্ভব হইত না। বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত পদার্থ হইতে সূর্য্যকিরণ সহযোগে উদ্ভিদ জীবনী শক্তির সৃজন করে। আদি কালে উদ্ভিদের জন্ম কিরূপে হইল তাহা আমরা জানি না, তবে ইহা অনুমান করা যায় যে নানারূপ কারণ সমূহের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে কোনরূপ ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদের সৃজন হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ ঐরূপ কারণ সমূহের অভাবে আদি উদ্ভিদের অনুরূপ স্বয়ম্ভু উদ্ভিদ জন্মিবার সম্ভব নাই। ইহা একরূপ স্থির নিশ্চয় যে আদি অবস্থায় জলমধ্যে কোনরূপ শেওলার আকারে আদি উদ্ভিদের জন্ম এবং তাহা নিশ্চয়ই হরিৎবর্ণ ছিল এবং উহারা সূর্য্যকিরণ সহযোগে জীবনীশক্তির উৎসরূপ কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন ও অকসিজেন বিশ্লেষণ করিতে পারিত। ইহারা বর্দ্ধিত হইয়া দুই কিম্বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া জননকার্য্য সম্পাদন করিত। খুব সম্ভব এই আদি উদ্ভিদাণু হইতে ক্রমে সমস্ত উদ্ভিদ ও জীব জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে সকল উদ্ভিদ সমান নহে। একদিকে বিশাল মহীরুহ, অপরদিকে ক্ষীণ নগণ্য গুল্ম। কিন্তু উভয়ই যে এক বংশের সন্তান তাহা কে বিশ্বাস করিবে? এই ব্যতিক্রম ক্রমবিকাশের ফল। প্রাণীজগতেও ইহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রাণীর মত আদি উদ্ভিদও হয়ত একটি মাত্র ডিম্ব-কোষ (cell) ছিল। এই ডিম্বকোষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া হইয়া বিদীর্ণ হইয়া দুইটী ডিম্বকোষে পরিণত হইত। ইহার এক একটি ডিম্বকোষই একটী উদ্ভিদ। কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থায় না পড়িলে এইরূপ বংশবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকটী ডিম্বকোষ (cell) বা উদ্ভিদ জলে ভাসিয়া ফিরিত। যদি কোন কারণ বশতঃ এই ডিম্বকোষ ভাসিয়া ফিরিবার সুযোগ না পাইত, তাহা হইলে একটীর গাত্রে অপরটী সংলগ্ন থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিত। এই আণুবিক্ষণিক ডিম্বকোষদ্বয়ের একটী হয়ত ভালরূপ সূর্য্যের কিরণ ও বাতাস প্রাপ্ত হইয়া সুন্দররূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং অপরটী অন্যরূপ অবস্থায় পড়িয়া ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িল। এইরূপ ক্রমবিকাশ ও পরি-বর্ত্তনের দ্বারা হয়ত এক নব উদ্ভিদের সৃজন হইল। প্রকৃতিতে কোন একটী গুল্ম কিম্বা জীব যদি নির্ব্বিবাদে বংশবৃদ্ধি করিতে পায় তবে তাহারা সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইবার কথা কিন্তু নানারূপ প্রতিকূল কারণ বশতঃ তাহা কখনও হয় না। এই বংশবৃদ্ধিতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection or survival of the fittest) বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নচেৎ একটী মৎস্য হইতে ১০০ এবং তাহা হইতে ১০ সহস্র মৎস্য জন্মিয়া জল মৎস্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা কখন হয় না। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও তাহাই। এইরূপ হওয়া সম্ভব হইলে একরূপ উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণী দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইত।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

# নীলের গীত।

এক সময় ভারতীয় নীল ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করিয়া ব্যবসায়ীগণ বিলক্ষণ লাভ করিতেন। সে সময় বাঙ্গালায় যত নীলের চাষ হইত বেহার প্রদেশে তদপেক্ষা বেশী নীল চাষ হইত। বর্ত্তমানে বেহারে নীলের চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে। জর্ম্মানির সঙ্গে প্রতিযোগীতায় ভারতীয় নীলের ব্যবসায় হটিয়া গিয়াছিল। নীলের অত্যাচারে বাঙ্গালা যখন টলমল করিতেছিল তখন বেহারও কম অত্যাচারিত হইতেছিল না। নীলকরেরা ক্রমে যখন জমিদার হইয়া বাঙ্গলা ও বেহারের মাটীতে শিকড় গাড়িয়া বসিলেন তখন অত্যাচারের মাত্রা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার "নীলদর্পণে" চোখে আঙ্গুল দিয়া এ সকল কাহিনী বিলক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশীয় লোকের সহায়তায়ই নীলকরেরা অত্যাচার করিতেন। দেশীয় লোকেরাও এই উপায়ে যথেষ্ট লাভ করিত। যখন নীলের চাষ এ দেশ হইতে উঠিয়া গেল, অনেক সাহেবই জমিদারী বিক্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন দেশের লোকের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, তাহারা নিরাপদ হইল মনে করিল। সাহেবেরা বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেলেন কিন্তু বেহারে তাহাদের আড্ডা অনেক দিন পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। তাহারা আকের চাষ করিয়া সে প্রদেশে বিলক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন। পরে তাহারা অনেকেই সে ব্যবসায়ও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদিগের খুব লড়াই হইত। উহাকে এদেশীয়েরা সাজ কহিত। হাঙ্গামার অপর নাম সাজ। যখন এদেশ হইতে অস্ত্র আইনের সাহায্যে আগ্নেয়াস্ত্র উঠিয়া গেল তখন এদেশে সাজ হইত বাঁশের সাহায্যে। বাঁশ দিয়া লাঠি, হলঙ্গা, সড়কী, রায়বাঁশ প্রস্তুত করিয়া প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রাম হইত। আঠারবাড়ীর স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র রায় বড় বড় লম্বা বাঁশের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া তাহা দিয়া সংগ্রাম করিতেন, তাই তাহার নাম হইয়াছিল "রায় বাঁশ"। এই "রায় বাঁশের" নাম এখনও অনেক লোকের মুখে শুনা যায়। "রায় বাঁশের" আগা সরু করা হইত; উহা দ্বারা প্রতিপক্ষের লোক জনকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলা যাইত। "রায় বাঁশের" আগায় লৌহ ফলক আটিয়া দিয়া তাহা দিয়াও প্রতিপক্ষকে জখম করা যাইত। অপর লোকেরাও যখন হাঙ্গামা করিত তখনও সকলে "রায়বাঁশ" ব্যবহার করিত। সুপারি গাছ কাটিয়া একপ্রকার দণ্ড প্রস্তুত করা হইত, তাহার আগা সরু থাকিত। উহা দ্বারাও মানুষকে জখম করার বিলক্ষণ সুবিধা ছিল, উহাকে হলঙ্গা বলে। দেশে এখন শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এসকল অস্ত্রের ব্যবহার একরূপ লোপ পাইয়াছে কিন্তু তাহার স্মৃতিটা এখনও মানুষের হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে।

নীলের কারখানায় ও তাহার কার্য্যে যাহারা গাফিলি করিত তাহাদিগকে মালখানায় নিয়া আটক করিয়া বেত্র দণ্ড দেওয়া হইত। মাল থাকিত বলিয়া উহাকে মালখানা কহিত না। কয়েদীরা আটক থাকিত বলিয়াই উহাকে মালখানা কহিত। তারপর উহাদিগকে তৈয়ার ও কার্য্যে স্বীকৃত করিয়া বড়ি গোদামে নীলের উপর তক্তা জাত করিবার কাজে নিযুক্ত করা হইত। এ কাজে বড় পরিশ্রম তাই সাধারণতঃ অপরাধী গণকেই এই কাজে দেওয়া হইত। বড়ি গোদাম অর্থে বড় গোদাম ও ছোটি গোদাম অর্থে ছোট গোদাম। ছোটি গোদামে যাহারা কাজ করিত তাহারা নীল বাক্সবন্দি ও প্যাককরা প্রভৃতি কার্য্যেই রত থাকিত। নীলকরেরা সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারী দিগকে খুব খাতির করিতেন। তাঁহারাও নীরকর দিগের সাতখুন মাপ করিতেন। সুতরাং নালিশ করিয়াও সাধারণ লোকে ফল পাইত না। এদিকে মাঝে মাঝে জেলার সদর হইতে সাহেবেরা নীল কুঠিতে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন, তখন দেশের লোক মনে করিত কোম্পানী বাহাদুর নিজেই বুঝি নীলের চাষ করিতেছেন, আর প্রতিবাদ করিয়া ফল কি হইবে, রাজার হুকুম, প্রজাদেরত কাজ করিয়া দিতেই হইবে। ইত্যাদি মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া নীলের কাজে লাগিয়া যাইত। নীল প্রস্তুতের সময় সারি ও জারীগান হইত, তাহাতে ম্যানেজার সাহেব ও দেওয়ানজী প্রভৃতিকে গালাগালি করিয়া গান করিলেও

তাহারা কিছু বলিতেন না। তাহা শুনিয়া হাসিতেন এবং আমোদ উপভোগ করিতেন। নীলের কাজের সময় যে সকল গান হইত তাহার কয়েকটি নিম্নে প্রদান করিলাম।

( ১ )

হায় কি চীজ বানাইছে কোম্পানী,
সারদিন কাম করি পেটে নাই দানা পাণি।
মাগ পোলা লইয়া ঘরে থাকতে কই পারি।
পা ফেলিতে সরদারেরা দেয় মাথায় বারি।
কছিমদ্দির ভাইরে লৈয়া গেল সাহেবের সরদারে।
পাড়া পড়সী ডোকরাইয়া কান্দে আইজ বাঁচে কি মরে।
কথা বার্ত্তা না শুনে সে দেওয়ানজী বেটা।
সাহেব বড় পাজি তাই করছে আরো লেঠা।
সাহেবত মানুষ নয় সে যে এক্‌টা জন্তু।
আমরা মরি দুঃখ নাই মাগ পোলা মরে কিন্তু।
শালা বেটা শুনে না কথা আরো গর্জ্জে উঠে।
গালি দিতে মারে কিল, লাঠি পড়ে পাঠে।
সাবাস দেওয়ান মহেশ বটে সে যে মস্ত শালা:
কিল খাবার আগে সরে পড় এই বেলা।
কাজ নাই মহেশ দেওয়ান বড় পাজি।
তারে সিধা কইরা দিছে রহিমদ্দিন কাজি।

( ২ )

দৌলত মুদী কইরা কুদি
বেদখল করলো কুঠীর সরদার।
নাছির মামুদ করছে আমোদ
কেটা ঘাড়ে ধরে তার।
বেটা বটে তিন চারটা
নাছির মামুদ তার হুকুক দার।
সে বেটা শালা দেয় কাণ মলা
হুসিয়ার হও তোমরা তাবেদার।
দেওয়ানজী বেটা করছে লেঠা
লম্বা দাড়ি ছিড়ে তারে কর বাট।
সাহেব শালা পাজি আরো কথা শুনে না মোটে কার
নালিসেও শালা করে চোট পাট।

( ৩নং )

দুঃখীর দুঃখের কথা বলিয়া জানাব কত
অরণ্যে রোদন জানি সব বৃথা
কারে কব সে সব দুঃখের কথা
আসিল শাউন ভাদ্র কখন বৃষ্টি-কখন রৌদ্র
রোদের চোটে ফেটে যায় মেদিনী
হায় কি দারুণ নীল পয়দা
করছে কোম্পানী।
দুঃখীর দুঃখের কথা——
আষাঢ় মাসে সুসার নাই করজা করে ভাত খাই
সে সময়ে খাওনের টানা টানি
জানত যায় না বাঁচানো।
দুঃখীর দুঃখের——
আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাস ক্ষেতে হলো পাঠ ধান
সে সময় যৎ কিঞ্চিৎ আমদানী।
দিন ভরা কাজ করলে মিলে না দু'আনী
দুঃখীর——
পাট ধান সব ফুরাইল, মহাজন ক্রোক করিল
ক্ষেতে তে প্যাদা মোতায়নী।
নীলের সরদারেও করে টানা টানি
দুঃখীর——
মাথার ঘাম পায় পড়ে এ দুঃখ কি বুঝে পরে
কে বুঝিবে গরিবের কাহিনী
দেখি নীলের সরদারের আমদানী
দুঃখীর——
সাহেব গুণ্ডা, দেওয়ান মিত্র তাতে নাই অষুধ পত্র
মরণের বাকী কি আছে
কাটাঘায়ে লুণ ছিটা দিছে
দুঃখীর——
আছি আছি নাই নাই ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই
যার কাছে যাই হই অপমানী
সাহেব কয় যাও নীল কাটানি।
দুঃখীর দুঃখের কথা বলিয়া জানাব কত
অরণ্যে রোদন জানি সব বৃথা
কারে কব সে সব দুঃখের কথা।

( ৪ )

মনরে তোরে পাইছে শত নীলের ভুতে
ঘরের কার্য্য নষ্ট কর্‌ল নীল কুঠির দুতে
মনরে তোরে পাইয়ে সাত নীলের ভুতে।
মাথার ঘাম পায় ফেলাইয়া দু'কড়া হয় আমদানী
বাদ সাধিয়া তাও চায় কেড়ে নিতে
যতই কুদি কতই কাঁদি
ডেরে আসে কাটা ঘায় মুণ দিতে
মনের সাধে কাঁদব কেউ না রবে সঙ্গে যেতে
মনরে তোরে পাইছে——
ভাদরিয়া রোদের চোটে শক্ত মাথা ও ফাটে
বেটারা কয় বেগার দিতে।
কয় নীলের আমদানী ভয় দেখায় কালাপাণি
সাগর পার করে চায় নিতে
টানা টানি করে সাত ভুত।
মনরে ——
জবাবের মত জবাব পেলে চাপট মারে দুই গালে
ধপ্ ধপানি হয় সতেক কিলে
ঘর নাই জারী নাই নাল আন আমা ঠাঁই
এমনি সাদা কথা সাহেব বলে।
কান্দানী করে সকলে
মনরে——
বস্ত্র নাই গায় দিতে কেঁপে মরি ভরা শীতে
বেটারা কয় পয়নালা কাটিতে
সাদা কথায় কাট নীল তাতে নাই মারকিল
কবে প্যাদা করবে কম জল দিয়া তা ভরতে
পেটের পীলা কেঁপে উঠে তাদের কন্ কনানিতে
মনরে——
ঘরে নাই অন্ন মুঠি কথা কয় পরি পাটী
ঘাড়ে ধরে আসে মারতে তিন ভুতে
কাজের কথায় আলসি করলে জুতা লাঠি বকশিশ মিলে
পেটের পীলা ফাটে তাদের লাথিতে।
ফের বার হয়ে মর তাদের চোখ রাঙ্গানিতে
মনরে তোরে পাইছে সাত নীলের ভুতে।

ইহা ব্যতীত অনেক অশ্লীল গানও হইত। সাহেব, দেওয়ানজী বা অপর কর্ম্মচারীরা কোন স্ত্রীলোক আনিয়া আমোদ প্রমোদ করিলে এই সকল গানে হাটের মাঝে হাড়ি ভাঙ্গিয়া দিত। সাহেব বা দেওয়ানজী এই সকল গানে বিরক্ত হইতেন বোধ হইত না। সরকার এই সকল গান প্রস্তুত করিয়া বেগারদের সঙ্গে গাইত, কখন কখন গ্রাম্য লোকেরাও গান প্রস্তুত করিয়া দিত।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

---

# ব্যর্থ।

সংসার অরণ্য মাঝে কেহ দেয় ফল,
কেহ দেয় ফুল, কেহ পল্লব কেবল।
কেহ দেয় ছায়া, কেহ পাখীরে আশ্রয়,
কেহ দেয় সব, কেহ সর্ব্বগুণময়।
যার কিছু নাই নাই ফুলের সৌরভ,
স্নিগ্ধচ্ছায়া মিষ্টফল পল্লব গৌরব—
সেও হয় ব্যর্থ নহে নিজ অঙ্গ দিয়া
বিশ্বের জীবন যজ্ঞ রাখে সঞ্জীবিয়া।

শ্রীকালিদা রায়।

---

# ভাই।

( ১ )

শিক্ষা ও যশের সুবর্ণ কীরিট মাথায় পরিয়া যতীশচন্দ্র যখন তাহাদের গ্রাম্য ষ্টেশনে নামিলেন তখন বেলা একপ্রহর উঠিয়াছে যতীশ ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিলেন—তাঁহার ভাইদাদা সতীশ বেদাস্তরও ভ্রাতার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। যতীশ নামিয়াই দাদাকে প্রণাম করিল। ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সতীশ বলিলেন "রাত্রে কোন অসুখ হয় নাই তো"?

"না তেমন কিছুই হয় নাই" বলিয়া যতীশ গাড়ী হইতে জিনিষ পত্র নামাইয়া লইলেন।

তখন বেদান্তরত্ন মহাশয় একখানা গাড়ী করিবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিলেন। ছোট ষ্টেশন মাত্র একখানা গাড়ী। পূর্ব্ব দিন যে ভাড়া লইয়া গিয়াছে দিনের দুর্য্যোগে সে গাড়ী আর ফিরিয়া আসে নাই। সত্বরই আসিবে আশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বেলা চড়িতে লাগিল। যতীশ বলিল "গাড়ী পাইবার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন চলুন হাঁটিয়াই যাওয়া যাউক বেলা করিয়া কাজ নাই"

সতীশ যতীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "পথ অনেক, এতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে কি?"

যতীশ হাসিতে হাসিতে বলিল "কেন, বাড়ী যাব তাতে আর হাঁটিতে পারব না"?

"তবে চল, কিন্তু একটা কুলি চাইযে কুলি আসিল। কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক ও হাতে বেগটা চাপাইয়া দিয়া দুই ভ্রাতা গ্রাম্য রাস্তা ধরিয়া চলিলেন।

চৈত্র মাস। নিদাঘ মার্ত্তণ্ডের প্রখর উত্তাপে চলিতে চলিতে উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। দুই ক্রোশ আসিয়াছেন, আরো এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। যতীশ বলিল "দাদা, চল একটু বসি। সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল "তোর কি অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে? পূর্ব্বেইত বলিয়াছিলাম, অনেক পথ।

( ২ )

ব্রহ্মপুত্র তীরে বিশাল বৃক্ষ। সে বৃক্ষ কত দিনের কেহ বলতে পারেনা। কত যুগের ঝঞ্ঝা বাত্যা ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে কথার সাক্ষ্য দিবার জন্য কেহ তার নীচে প্রস্তর ফলক রাখিয়া দেয় নাই। কেহ এ বৃক্ষ চিনেনা। তবে বহু প্রাচীন লোকেও বলে, তাহারা প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছে, এই গাছ এ ভাবেই চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। ইহাকে কেহ চিনেনা, কেহ জানেনা। তবে সকলেই ইহাকে 'চণ্ডীগাছ" বলিয়া পরিচয় দেয়। গ্রীষ্মে কত পাখী ইহাতে বসে, কত লোক ইহার নীচে বসিয়া বিশ্রাম করে, তাহার সংখ্যা নাই। বর্ষার ভীষণ প্লাবনে এ বৃক্ষের শাখা পত্র নিমজ্জিত হইতে কেহ কখনও দেখে নাই, কেহ কখনও শুনে নাই। কেহ ইহার একটী ডাল পত্র ছিন্ন করিতেও সাহস পায়না।

এই বৃক্ষ তলে দুইটী রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে। একটী ষ্টেশনে যাইবার, অপরটী জেলায় যাইবার।

উভয় ভ্রাতা এই বৃক্ষ নিয়ে বসিলেন। আরো কত কত লোক সেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। উন্মুক্ত মাঠ ঝর ঝর করিয়া ব্রহ্মপুত্রের শীতল সলিল সিক্ত বায়ুতে পথিকের ক্লান্ত দেহ শীতল করিতেছে বহুক্ষণ তাহারা বসিয়া বিশ্রাম করিলেন তারপর যতীশ বলিল "আচ্ছা দাদা এই গাছটা কত দিনের? আমরা ছোটবেলা হইতে এই ভাবেই দেখিয়া আসিতেছি। আমার বেশ মনে আছে সেই বড় বন্যার সময় এই গাছে কত লোক আশ্রয় নিয়াছে। এ গাছটা এ দেশের কত জনকে বিপদে আশ্রয় দান করিয়াছে। মানুষের কত স্মৃতি ইহার সহিত জড়িত।"

সতীশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "ভাইরে অন্যের কেন আমাদেরও বহু স্মৃতি ইহার সহিত জড়িত। ইহার নিম্নে আমাদের মহাতীর্থ। সেই এক দিন— বাবার জীবনের সেই এক দিন আজও মনে আছে ভাই— বাবার অসুখ শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ, তাতে দারিদ্র্যের ভীষণ মর্ম্ম পীড়া ঘরে চাল নাই তার উপর কাকার চক্রান্তে বাবা দেনার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত পথের ভিখারী——" বলিতে বলিতে সতীশের চক্ষু হইতে টস টস করিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। যতীশের প্রাণে একটা দুঃখের বান ডাকিয়া গেল। সে করুণস্বরে বলিল "দাদা অনর্থক কাঁদিয়া এখন ফল কি?"

"বাবা বড় কষ্টে এই গাছতলায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। ঐ জায়গাটায় বসিয়া বাবা আমায় বলিলেন "সতীশ এখন তুমি বড় হইয়াছ, একটা কথা শুন: জগতে ভাইয়ের সমান মিত্র নাই, আবার ভাইয়ের মত শত্রুও নাই। আমার ভাই আমাকে যে প্রকার দুঃখ কষ্ট দিয়াছে, আজীবন শঠতার চক্র জালে আমাকে যে প্রকার জ্বালাতন করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে ভাই এর জন্য ভাই এর স্নেহ মমতা জগতে আছে একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সর্ব্বত্র এমন হয় না। কিন্তু সতীশ! যতি আজও

নিতান্ত অবোধ, কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইওনা। সে যাহাতে একটু লেখা পড়া শিখে তাহা করিও—উপকারের প্রত্যাশায় করিওনা।" বলিতে বলিতে বাবার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাবার মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।"

অগ্রজের কথা শুনিয়া যতীশের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। যতীশের জলভরা চক্ষু দুটী দাদার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া বলিল "তারপর বাবা কি করিলেন।"

"বাবা শুইয়া পড়িলেন। আমি শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। বাবা নিষেধ করিয়া বলিলেন "বাতাস করিলে প্রাণের জ্বালা যাইবে না। এই যে পরিশ্রম করিয়া ঘরে যাইব, খাইব কি? তখন পেটের জ্বালা নিবাইবে কে? সতীশ!"

বলিয়া সতীশ একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। যতীশ দাদার কান্না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না সে ও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল।

যে স্থান এক দিন গঙ্গাপ্রসাদের উষ্ণ অশ্রুতে কর্দ্দমাক্ত হইয়া ছিল আজ তাহা তাঁহার পুত্রদ্বয়ের প্রেম পূতঃ অশ্রুতে অভিষিক্ত হইল।

তাহারা বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যতীশ বলিল "দাদ আমাদের মত হতভাগ্য আর ধরাতলে নাই। আমরা টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতেছি কিন্তু আমাদের বাবা অর্থাভাবে কত কষ্ট পাইয়াছেন। বলিতে বলিতে তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। সতীশ বলিল "ভাই কাঁদিয়া আর কি ফল হইবে, আমাদের অদৃষ্টে পিতৃ সেবার সার্থকতা বিধি লেখে নাই। অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতৃ সেবা করা জন্মান্তরের সাধনার ফল।"

সতীশের কথায় যতীশের অন্তঃকরণটা যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। সে বলিল "আচ্ছা দাদা আমরা জেলায় গেলে কেন?"

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া সতীশ বলিল "সে ভাই অনেক কথা। বাবা ও খুড়া মহাশয়কে শিশু রাখিয়া আমার ঠাকুর দাদা মারা যান। ঠাকুর দাদার কিছু ঋণ ছিল। সে ঋণের জন্য আমাদের ভদ্রাশন বাড়ী খানা ব্যতীত আর সব নীলাম হইয়া যায়। এক শত টাকা ঋণ তখনও থাকিয়া যায়। শুধু বাড়ীখানা ও চারি কাণি মাত্র জমি ছিল। এই টাকার যখন ম্যাদ যায় তখন বাবা সাবালক হইয়াছেন তিনি স্বীয় নামেই খত লিখিয়া দেন। খুড়া মহাশয় বাঁচিয়া যান। তারপর খুড়া মহাশয় যখন বয়োপ্রাপ্ত হইলেন তখন বাবাই খরচ পত্র করিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। সে বিবাহেও কিছু ঋণ হয়; তাহাও বাবার স্কন্ধেই পড়ে। বাবা কনিষ্ঠের মুখের দিকে তাকাইয়া দুঃখে কষ্টে সংসার চালাইতে থাকেন। বাবা এক জমিদার বাড়ীতে কাজ করিতেছিলেন, তাহাতে মাসে যৎসামান্য আয় হইত। এই সময় খুড়া মহাশয়ের স্বভাবের একটু চাঞ্চল্য দোষ ঘটে। সে জন্য বাবা খুড়া মহাশয়কে বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ করিবার জন্য স্বীয় কার্য্য ভ্রাতার হস্তে দিয়া তিনি বাড়ীর তত্ত্বাবধানে মনোযোগী হন। খুড়ামহাশয় কার্য্যে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন বেশ টাকা পয়সা দিতে লাগিলেন; এইরূপে দুই বৎসর চলিয়া গেল। তারপর এক বার খুড়ামহাশয় শ্বশুর বাড়ী গেলেন, সেখান হইতে আসিয়া তিনি জবাব দিলেন, তিনি সংসারের কোন খরচ পত্র আর দিতে পারিবেন না। বাবা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। আমরা তখন ছোট্ট। আমাদের ঘরে চারিটী—লোক। পৈত্রিক ঋণ তখন মাথার উপর।"

"কাকার দু পয়সা আয় আছে খরচ নাই। বাবার যথেষ্ট খরচ, আধ পয়সা আয়ের উপায় নাই। কাকা হাতে কিছু টাকা করিয়াছিলেন। খুড়িমার চক্রান্তে মা কে জব্দ করিবার জন্য কাকা অপরের দ্বারায় বিনামীতে বাবাকে টাকা ধার দিতে লাগিলেন। আর ঐ টাকা যখন বৃদ্ধি হইয়া উঠিল তখন নালিশ করিয়া টাকা আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন, বাবা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অবশেষে যখন ভিটাবাড়ী নীলাম হইল, কাকা তাহা কিনিয়া বাবাকে বাড়ী ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে নোটীশ দিলেন; তখন বাবার চক্ষু ফুটীল। তখন আর উপায় নাই। চক্ষু মুছিতে ২ বাবা পৈতৃক বাড়ী হইতে

বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। তখন বাবা ও মার উপর কি নির্য্যাতনই গিয়াছে। ইহাতেও আমাদের স্নুয়াস্থি নাই। বাবার নামে কাকা ৩।৪ খান জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাবার ধর্ম্মে বড় মতি ছিল, তাই ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

অবশেষে কাকার পাপের মাত্রা যখন বাড়িয়া গেল, তখন তিনি এক জাল মোকদ্দমায় পড়িয়া ফৌজদারীতে সপর্দ্দ হইলেন। সে সময় বাবা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাকার বিপদ বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল তিনি মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য জেলায় চলিলেন, আমিও সঙ্গে চলিলাম। তখনও বাবা তিন দিনের উপবাসী। সেই দুর্দ্দিনেও কাকা এই অযাচিত উপকার পাইয়া তাঁহাকে একবার আহারের জন্য অনুরোধ করেন নাই।"

"আচ্ছা দাদা! সে মোকদ্দমায় বিচারে কাকার কি হইল।"

"দুই বৎসর ম্যাদ হইয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইলে আর তাঁহার কোন খোজ খবর প্রাপ্ত হই নাই। কত অনুসন্ধান করিয়াছি কোন কূল কিনারা করিতে পারি নাই।"

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সতীশ বলিতে লাগিলেন।

"ভাইরে, দুঃখ চির কাল থাকে না। ভগবানের কৃপায় আমাদের সে দুঃখ নিশি প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু বাবাকে আমরা আমাদের এই সুখের ভাগী করিতে পারিলাম না। তিনি কেবল আমাদের জন্য দুঃখের বোঝাও বহন করিয়া গিয়াছেন। বলিতে বলিতে সতীশ কাঁদিতে লাগিল। যতীশও স্থির থাকিতে পারিল না। উভয়ে আবার বহুক্ষণ কাঁদিল। বহুক্ষণ উভয়ে নীরব।

চক্ষু মুছিয়া যতীশ বলিল "দাদা এই জায়গাটা কার?"

"কেন? শুনিয়াছি এ জায়গাটা সত্বরই বিক্রি হইবে। ঘোষেরা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

যতীশ বলিল "আমাদিগকে এই স্থানটা কিনিতেই হইবে এবং এখানে এমন একটা কিছু করিতে হইবে, যাহাতে লোকে দেখ্‌বে যে জগতে সুখ দুঃখ চিরকাল সমান থাকে না। জগৎ দেখিবে দুঃখের পর সুখ অনিবার্য্য।"

যতীশের কথা শুনিয়া সতীশের মুখ উজ্জ্বল হইল। তখন কুলির মাথায় মুট চাপাইয়া উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিল।

*    *    *    *

পুত্র বাড়ী আসিয়াছে। মায়ের মনে কত আনন্দ। পুত্রদ্বয়কে স্নান করিতে বলিয়া মা তাহাদিগের আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যতীশ ও সতীশ আহারে বসিল। যতীশ আহারে বসিয়া বলিল। "মা পথে আসিতে আসিতে একটা কথা মনে পড়িয়াছে। বাবার জন্য একটা কিছু করিতে চাই" পুত্রের কথা শুনিয়া মার বুকের ভিতর হইতে একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের অস্ফুট স্বর ফুটিয়া উঠিয়া পুত্রদ্বয়কে আকুল করিয়া তুলিল। মা ধীরা গলায় ভরা আওয়াজে বলিলেন "যদি জীবিত থাকিতেন, তোমাদের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া সুখী হইতেন। ভাতের কষ্টে জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন এখন তোমরা তাঁর কি করিবে?" মায়ের চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। যতীশ বুঝিলেন কথাটা তুলিয়া ভাল হয় নাই। তাই আর কোন কথা বলিয়া মায়ের প্রাণে কষ্ট দিতে চাহিলেন না।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় পরামর্শে স্থানটা ক্রয় করাই স্থির হইয়া গেল।

(৩)

দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে যতীশচন্দ্র আবার বাড়ীতে আসিয়াছেন। সে বার কাল শুদ্ধ ছিল। তার উপর বুধাষ্টমী। এই মাহেন্দ্র ক্ষণে যতীশ পিতার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। সেই ব্রহ্মপুত্রের তীরে চণ্ডী গাছের নীচেই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মর্ম্মর মূর্ত্তিটী সেই চণ্ডীগাছ নিম্নে সুন্দর সুসজ্জিত মর্ম্মর বেদীর উপর স্থাপিত হইয়াছে। এই অষ্টমী যোগেই প্রস্তর মূর্ত্তি ও তাহার নিকট অন্নছত্র খোলা হইবে। এই দিন যত লোক সমবেত হইবে সকলকেই দরিদ্র পিতা গঙ্গাপ্রসাদের আত্মার সদ্গতির জন্য—অন্ন বিতরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

অষ্টমী স্নানের দিন প্রতি বৎসরই এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এ বার পূর্ব্ব হইতেই এ মেলার স্থানটী অতি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। দূর দূরান্তর হইতে বহু দোকান পশারি আসিয়া দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে। ক্রেতা ও দর্শকের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

অদ্য অষ্টমী স্নান। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিজন চণ্ডীতলা জন কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। গ্রাম হইতে লোকের স্রোত আসিয়া প্রান্তরের সেই বিশাল জন স্রোতে মিশিয়া যাইতেছে, আর সেই বিস্তৃত মাঠ লোকারণ্যে পরিণত হইতেছে। খোল করতালের উচ্চ বাদ্য, হরি সঙ্কীর্ত্তনের মধুর তানে, শঙ্খ ঘণ্টার বিপুল বাদ্য ঝঙ্কারে, ঢোল কাসি সানাইয়ের বাদ্যে সমস্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলের ই মুখে একটা আনন্দের দীপ্তজ্যোতি খেলা করিতেছে; সকলেই হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে ছিল। যখনই যে চণ্ডীগাছ তলে যায় সে তখনই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখে, বৃক্ষ নিম্নে একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর রেলিং সংযোগে একটী মনোরম উদ্যান রচিত হইয়াছে। অনতি দূরে দুইটী কক্ষ তার গায় বড় বড় অক্ষরে লেখা "গঙ্গাপ্রসাদ অন্ন ছত্র।" সম্মুখে পুণ্যতোয়া ব্রহ্মপুত্র নদ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, উপরে সেই বহু যোগের মহাদ্রুম—তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা দ্বারা আশ্রিতকে আশ্রয় ও শীতল ছায়া দান করিতেছে।

শুভ মুহূর্ত্তে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইল। গঙ্গা প্রসাদের বহু আত্মীয় স্বজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলই দেখিলেন সেই প্রশান্ত উদার চরিত্র ধর্ম্ম ভীরু গঙ্গা প্রসাদের মূর্ত্তি অবিকল হইয়াছে, যেন তিনিই বসিয়া আছেন। সেই দুঃখে কষ্টে অচল, সুখ সম্পদে অবিকৃত ভাব, সেই তেজস্বী গঙ্গাপ্রসাদ বসিয়া যেন লোককে বলিয়া দিতেছে—সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নহে।

একদিকে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকেরা; তাঁহাদের মধ্যে এক জন ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার রুদ্ধ হৃদয়ের বদ্ধ আবেগ যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বলিতেছিল "স্বামী দারিদ্র্যের শত জ্বালা বুকে করিয়া চলিয়া গিয়াছ, আজ স্বর্গ হইতে দেখ, তোমার উপযুক্ত বংশধর কেমন করিয়া শত সহস্র ক্ষুধার্ত্তকে মুক্ত হস্তে অন্ন দান করিতেছে।"

* * * *

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর আরো দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে এই বিরাট অন্নছত্রের নাম ডাক বাড়িয়া গিয়াছে। কত দীন দরিদ্র প্রতিপালিত হইতেছে, কত সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক আসিতেছে যাইতেছে কেহ তাহার খবর করেনা, কিন্তু আজ কয়েক দিন হইতে সেই প্রস্তর মূর্ত্তির সন্নিকটে এক নূতন ব্যাপার দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে একটী উন্মাদ প্রত্যহ আসিয়া সেই প্রস্তর মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ দীপ জ্বালাইয়া বহুক্ষণ আরতি করে, তারপর সেই মূর্ত্তির পদতলে সাষ্টাঙ্গে নত হইয়া পড়িয়া থাকে। যাইবার পূর্ব্বক্ষণে বিকৃত স্বরে বলে "আমার কি ক্ষমা নাই। তোমার এই প্রস্তর মূর্ত্তি কি জগতে চিরকাল ভাতৃ বিচ্ছেদের হোমানল প্রজ্জলিত করিয়া রাখিবে।" তারপর চীৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া যায়, কেহ ধরিতে পারেনা।

বৎসর ঘুরিয়া আবার অষ্টমী স্নান আসিয়াছে। এই সময় প্রতিবৎসরই যতীশ যেখানেই থাকে আসিয়া স্নানার্থী অগণিত জন সঙ্ঘের মধ্যে কর্দ্দমাক্ত ব্রহ্মপুত্র নীরে আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া স্নানতীর্থের জন শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করে। এবারও আসিয়াছে। ছত্রে উপস্থিত থাকিয়া দুইভ্রাতা স্নানার্থিনী অন্ধ খঞ্জ, দীন দরিদ্রকে অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করিতেছে।

ক্রমে লোক জনের কর্ম্ম কোলাহল কমিয়া আসিল। সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া সেই বীচিবিক্ষোভিত নদীর নীরে ও বিশাল প্রান্তরের উপর ধীরে ধীরে ঘন আস্তরণ বিছাইয়া দিল। সকলই বাড়ী যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সেই বিকট চীৎকার।

সহসা এই বিস্ময়কর ব্যাপারে সকলই চমকিয়া উঠিল। যতীশ ও সতীশ একটু দূরে ছিল। তাঁহারা দৌড়িয়া আসিয়া যখন সেই উন্মাদ পাগলকে মূর্ত্তির সম্মুখে পতিত অবস্থায় ধরিল, তখন সে ভ্রাতার চরণ উদ্দেশে বহু উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রী—

# আলোচনা।

( ১ )

শিক্ষার প্রতি এদেশের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরই অধুনা অনুরাগ বাড়িতেছে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কতিপয় বৎসর মধ্যে আমাদের এই ময়মনসিংহ জেলাতেই অনেক গুলি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুপরিচালিত হইতেছে। প্রায় সকল গুলিরই ছাত্র সংখ্যা সুপ্রচুর। পরিচালক সমিতি বা ম্যানেজিং কমিটি সুগঠিত। গৃহ এবং অন্যান্য উপকরণ প্রয়োজনানুরূপ। সুতরাং প্রায় সকল গুলি স্কুলই শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ—ইনস্পেক্টর এবং বিশ্ব বিদ্যালয় সকলেরই নিকট সহানুভূতির চক্ষে অবলোকিত হইতেছে—অনেকগুলিই এফিলিয়েসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এ সমস্তই সময়ের শুভ চিহ্ন—দেশের ভবিষ্যতের উন্নতির চিহ্ন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দেশের নানা দুঃখ, দুর্গতি, দুর্বুদ্ধি দুর্নীতি, দুরাচার, দারিদ্র্যের মূলে শিক্ষার অভাবই প্রধানতঃ উপলব্ধি হয়। সুতরাং দেশের সর্ব্বত্র আরও বহুসংখ্যক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সুখের বিষয় এবং আশার কথা এই যে এ বৎসরও এই ময়মনসিংহ জেলার কতিপয় স্থানে নূতন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ভগবানের কৃপায় এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রভৃতির প্রচেষ্টায় সকল গুলিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করতঃ দেশে সুখ শান্তি স্বস্তি শুদ্ধি বর্দ্ধিত করুক এই আমাদের প্রার্থনা।

( ২ )

সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে শিল্প বাণিজ্য কৃষি বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা প্রচারেরও বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া এখন নিতান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয় নানা আন্দোলন আলোচনা জল্পনা কল্পনা সত্ত্বেও দেশে সেরূপ শিক্ষা বিস্তারের উপযোগী বিদ্যালয় বা বীক্ষণালয় আজও প্রতিষ্ঠিত হইল না। ইউরোপ, এমেরিকা, জাপানের গল্প গাথা শুনিয়া আমাদের কিছু লাভ হইবে না। আমাদের দেশ কালাদির বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া কি প্রকারের শিক্ষা প্রচার আবশ্যক এবং সুলভে কি প্রকারে সাফল্য লাভ করিয়া দেশ সুখী, সমুন্নত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে তাহার উপায় চিন্তন এবং সেইরূপ শিক্ষা কেন্দ্র সংস্থাপনের ব্যবস্থা বিধান করিতে যাওয়া রাজা প্রজা সকলেরই কর্ত্তব্য।

( ৩ )

এদেশ শুধু কল কারখানায় কদাচ সুখী, শান্ত, সমৃদ্ধ সমুন্নত হইতে পারিবে না। ভারতবর্ষের জল বায়ু, জাতি, জাতীয় রীতি, জীবন যাত্রা পদ্ধতি, সমস্তই কল কারখানা অপেক্ষা কুটীর শিল্পের অনুকূল। কল কারখানায় নূতন নূতন নগরের অভ্যুদয় ফলে পল্লীর অনিষ্ট। পতি পত্নী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন সমন্বিত কৃষি বা শিল্পী পরিবার যে যতই দরিদ্র হউক না কেন এ দেশের প্রায় সকলেই পল্লীতে স্ব স্ব পৈতৃক বাস্তু ভিটার প্রতিবেশীদের সহিত পুরুষ পরম্পরায় প্রীতি মধুর সম্পর্ক বন্ধনে পরম সুখে দিনযাপন করে। কিন্তু অধুনা এদেশে যে যে খানে কাজের কুলি মজুরের দল নানা দিদ্দেশ হইতে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে, সে খানে তাহাদের পৈতৃক প্রিয় মধুর বাস্তুভিটা বলিতে কাহার কিছু নাই স্বজাতি সমাজ বলিতেও কাহারও কিছু নাই। ফলে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ করিতে করিতে শুধু যে তাহাদের দেহ ক্লিষ্ট হইতেছে তাহাই নয়, তাহাদের সরল মধুর হৃদয়ও পেষণ পিষ্ট বুদ্ধি বিকৃত দুষ্ট হইতেছে দেশে গ্রামে ভদ্রাভদ্র, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ সকলেরই স্ব স্ব বংশের পরিবারের এক একটী স্বতন্ত্র ধারা আছে। সেই বংশ ধারায় গৌরব মহিমার কথা, পিতৃ পিতামহ এবং পল্লী প্রতিবেশীয় প্রমুখাৎ জানিয়া শুনিয়া, অনেকেই সেই বংশের ধারা অক্ষুন্ন রাখিতে স্বভাবতঃই অভিলাষী হয়। কিন্তু যে দিন হইতে পল্লীর প্রকৃত জন কল কারখানার কাজে ব্রতী হইবার জন্য পিতৃ ভবন পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ বাসী হয় তখনই সে নগর বা উপনগরের নাগর দলে মিশে এবং "নাগর" সাজিয়া বসে বটে কিন্তু তখন হইতেই বস্তুতঃ ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। যে সকল পৈশাচিক পীড়নে ইউরোপ এমে-

রিকার কল কারখানার কুলি মজুরদিগের মধ্যে সোসিয়েলিষ্ট, নিহিলিষ্ট, এনার্কিষ্ট সক্ রিজিষ্ট্ প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। এদেশেও এই অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সূচনা পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহা দেখিয়া শুনিয়া এবং তাহার পরিণাম ভাবিয়া, রাজা প্রজা সকলেই এখনই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। সে জটীল সমস্যাকে জটীলতর হইতে না দিয়া সত্বর সহজে সমাধানের জন্য, দেশ ও সমাজের হিতৈষী চিন্তাশীল সুধীবর্গের এবং বিজ্ঞসহৃদয় রাজপুরুষগণের এখনই সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

( ৪ )

বিজয় স্মৃতি সংরক্ষার সম্পর্কে ময়মনসিংহের হাঁসপাতালের সমুন্নতি সাধন জন্য আমাদের সুযোগ্য সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রীট্ মিঃ হফকিন্‌স মহোদয় এবং মাননীয় ঢাকা বিভাগের কমিশনর সাহেব বাহাদুর বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। সুখের বিষয়, ময়মনসিংহের মাননীয় রাজা শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, মাননীয় শ্রীযুক্তবাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী মহোদয় প্রভৃতি ভূস্বামী সম্প্রদায়ের শিরোমণি গণ সেই শুভ সংকল্পকে সুপরিণত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সহৃদয় সদাশয়তার জন্য দেশ কৃতজ্ঞচিত্তে চিরদিন তাঁহাদের যশোগান করিবে। ভরসা করি তাঁহাদের এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এ জেলার অপর সমৃদ্ধ ভূম্যাধিকারী এবং জনসাধারণের—সকলেই এই সাধু প্রস্তাবটীকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করিয়া দেশের মঙ্গল এবং ময়মনসিংহের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। সুদূর কলিকাতায় ব্যয় বাহুল্য এবং ক্লেশ ও কালবিলম্ব সহ্য করিয়া সুচিকিৎসিত হইবার জন্য গমন করা এ জেলার অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠেনা। ফলে কুচিকিৎসায়—বিনা চিকিৎসায় অকালে অনেকের প্রাণ বিয়োগও ঘটে। ময়মনসিংহে ব্যবস্থায়োজন থাকিলে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাধিরও প্রতিকার হইতে পারে।—

( ৫ )

এদেশের বহু পল্লীতে সুচিকিৎসক নাই বলিলেই হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার স্কুল কলেজ প্রভৃতির সংখ্যা আজও অতি অল্প। যে সকল বালক এণ্ট্রান্স শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এমন কি যাহারা মাইনর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহারা অন্ততঃ দুইবৎসর কাল প্রস্তাবানুযায়ী সুপুষ্ট ময়মনসিংহ বিজয়স্মৃতি হাঁসপাতালে শিক্ষার সুযোগ পাইলে তাহারা মফঃস্বলে নানা গ্রামে গিয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা তাহাও "মন্দের ভাল" সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মাইনর-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করিয়া যে সকল ব্যক্তি ক্যাম্বেল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সুচিকিৎসক বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিমান ও সাবধান ব্যক্তিগণ আমাদের এই হাঁসপাতালে ও তৎ সংসৃষ্ট বিদ্যালয়ে ডাক্তারী শিখিলে তাঁহারা চিকিৎসা কার্য্যে পারদর্শী হইবেন না—এরূপ আশঙ্কা বা আপত্তি অসঙ্গত।

( ৬ )

এ দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি। কৃষির উন্নতি সাধন জন্য পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য ও সমৃদ্ধ দেশে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে—এ দেশের কৃষকদিগের তাহা একেবারেই অবিদিত। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব বঙ্গে ঢাকা মনিপুরায় এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন এবং এ জেলায়ও একজন ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিকালচারের অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এদেশের কৃষককুল বিশেষ উপকৃত হইতেছেনা। এই বৃহৎ জেলার সদর ষ্টেশনে, প্রতি সব্‌ডিভিসনে এবং অন্যান্য কতিপয় কেন্দ্রে এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সত্বর সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অথচ দেশকালোপযোগী ভাবে কার্য্য পরিচালন করিলে—চাষ ও সার গোবর ইত্যাদি দিলে বিভিন্ন বীজে বিভিন্ন জাতীয় শস্য বপন করিলে—কিরূপে অল্প ব্যয়েও অধিকতর লাভবান হইতে পারা যায়, তাহা আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দেখাইবার, শুনাইবার, শিখাইবার, আবশ্যক। এ বিষয়ে শুধু রাজপুরুষ দিগকে দোষ না দিয়া দেশের ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়—এবং অপর সমৃদ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গেরও ভাবিবার ও করিবার অনেক আছে। নচেৎ দেশের দুঃখ দুর্গতি দূর হইবেনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

Printed by S. C. Rai, at the Jagat Art Press, Dacca

সপ্তম বর্ষ। ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২৫। ষষ্ঠ সংখ্যা।

## সেবা ধর্ম্মের বিকাশ।

একদিকে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ও অন্যদিকে মিলন, সাহচর্য্য--এই দুটী নিয়মের উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও স্ফূরণ প্রতিষ্ঠিত। জীবনসংগ্রামে যে নিজকে প্রকৃষ্টরূপে পরিচালন করিতে অক্ষম, তার মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, যে একাকী তারও তেমনি। যারা মিলিতে জানেনা, বিপদের দিনে একে অন্যের সাহায্য করেনা তারা নিজে নিজে শক্তিমান হইলেও অন্যের সঙ্গে জীবন যুদ্ধে দুর্ব্বল। এমনি ভাবে ডায়নোসোরাস প্রভৃতি কত বিশালকায় জীব জন্তু সময় বিশেষে আবির্ভূত হইয়া জগতের পৃষ্ঠায় কঙ্কাল স্থাপন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত প্রাণী আদিমকাল হইতে জীবন ধারণ করিয়া আছে।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের ভিতর এই মিলনের ভাবটী যেমন পরিস্ফুট এমন কোনও প্রাণীর ভিতরই নয়। জীবনোৎকর্ষের ইতিহাস পাঠে দৃষ্ট হইবে, যে সে প্রথমে স্ত্রী পুত্র পরিবেষ্টিত পরিবার সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের একাংশস্বরূপে কোনও নেতার অধীনে বাস করিত। কালক্রমে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া, দেশ বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা জাতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে যারা সুসভ্য মানব নামে পরিচিত তারা প্রত্যেকেই এই প্রকার এক একটী জাতির অন্তর্গত। যতই দিন যাইতেছে ততই এই জাতিত্বের ভাব পরিস্ফুট হইতেছে এবং মানবের ভিতর যাঁরা হৃদয়ের মহত্ব ও বিস্তারতাগুণে অন্যান্য সকলের ভক্তি অর্ঘ্য পাইয়া আসিতেছেন, তাঁদের ইহাও বিশ্বাস কালে সমস্ত মানব হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে।

একাধারে পশু ও দেবতা এই মানুষ। তার অত্যাচারে কত আদিম অসভ্য জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাদের হিংসা দ্বেষ রূপ বহ্নি হইতে অহরহ যে অগ্নিশিখার উদ্গারণ হইতেছে, তার স্পর্শে কত অসংখ্য অসংখ্য লোকের এখনও প্রাণ সংহার হইতেছে। কিন্তু এই মহা সংহার ব্যাপারের ভিতর হইতেও প্রেম ও মৈত্রীর মধুরবাণীও উত্থিত হইতেছে। যে রণক্ষেত্রে নিষ্ঠুর প্রকৃতির নর, ভাইর বক্ষ তরবারির আঘাতে বিদীর্ণ করিতেছে,—তারই অন্য পার্শ্বে দয়াবতী প্রেমময়ী রমণী ক্ষতবিধ্বস্ত ভ্রাতার প্রাণটুকু বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা যত্ন করিতেছে। এই যে আর্ত্ত মানবের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা; তার সাহয্যের জন্য নিজকে দান করিবার আকাঙ্ক্ষা—ইহা মানুষের জন্মগত সংস্কার। তার হৃদয়ে যে ভালবাসার বীজ জন্ম হইতেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে—যে সর্ব্বক্ষণই ভাই ভগ্নীর দুঃখ মোচনের প্রচেষ্টার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। একাকী বাস করিবার জন্য, শুধু নিজ সুখ সচ্ছন্দতার দিকে চাহিয়া অন্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া জীবন যাপন করিবার জন্য, তার জন্ম হয় নাই। মিলনেই তার বিকাশও। এই যে মিলনের ভাব—এই যে সাহায্যের ভাব—ইহারই রূপান্তর সেবা। এই প্রবৃত্তি যেমন আজন্ম প্রসূত; তেমনই ইহা মানব জীবনের মহা সম্পদ।

ধনী হোক নির্ধন হোক, বলশালী বা বলহীন হোক—জগতে কে আছে এমন, যে কখনও দুঃখ-কষ্টের তাড়না ভোগ করে নাই বা পীড়ার যাতনা অনুভব করে নাই? যার গৃহে মৃত্যু কখনও দর্শন দেয় নাই? যে দুঃখের দিনে, পীড়ার দিনে, পিতা কি মাতা, ভাই কি ভগ্নী, স্ত্রী কি পুত্র, কন্যা কি বন্ধুর স্নেহ বাক্যে বা মধুর সেবা পরিচর্য্যায়—কষ্টের লাঘবতা অনুভব করে নাই? তবে জগতে ধনীর সংখ্যা, সুখীর সংখ্যা নাকি মুষ্টিমেয়—তাদের সেবা করার—যাতনা লাঘব করার জন্য—লোকের অভাব নাই। তাদের তুলনায়—দরিদ্র, দুঃখীর সংখ্যা অনন্ত। সেবা কোনও ধর্ম্মবিশেষের বিশেষ অঙ্গ নয়। সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেরই ইহা সার এবং এই সব দীনদরিদ্রকে সাহায্য করা, পরিচর্য্যা করা—নানাবিষয়ে তাদের হিতসাধন করা—ইহাই সেবার প্রধান লক্ষ্য। ইহাদের দুঃখবিনাশনের সঙ্গে জাতির উন্নতিও বিশেষ ভাবে জড়িত, কারণ যেমন মানব শরীর—তেমনি জাতি—সকল অঙ্গ সমানভাবে পুষ্ট ও বলশালী না হইলে—কারো পক্ষেই জীবন যাপন সহজ ও স্বচ্ছন্দকর হইয়া ওঠে না।

পূর্ব্বাপরই মাতা সন্তানকে, ভাই ভগ্নীকে,—জন্মগত সংস্কার হইতেই পীড়িত, নিঃসহায় দুর্ব্বল অবস্থায় সেবা শুশ্রূষা করিয়া আসিয়াছে। সভ্য বা অসভ্য—সকল জাতির ভিতরই এভাবটী একপ্রকার পরিস্ফুট। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যতই মানব-সমাজ উন্নত হইতেছে, ততই এই সেবার ভাবটী পরিবার-রূপ কেন্দ্র ছাড়িয়া, সমাজের অন্যান্য লোকের দিকেও ধাবিত হইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশের অন্যান্য জাতির লোকের দিকেও প্রসারিত হইতেছে। এমন কি, পশু-পক্ষী ও মানবের ভালবাসা এবং যত্নে সিঞ্চিত হইতেছে। বস্তুত যে সমাজে এই সেবার—প্রেমের ভাবটী বিকশিত হয় নাই বা যে ধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে ইহা স্থান পায় নাই—সে সমাজ ও ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ আখ্যালাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত।

আজ সর্ব্বত্রই এই সেবা-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইতেছে। কত রেডক্রস সোসাইটী, কত হিউমেনেটিরিয়ান সোসাইটী, কত মিশন, কত সোসিয়াল সার্ভিস লিগের দলভুক্ত হইয়া—কত লোক বিপন্ন ও দরিদ্রের উদ্ধারের জন্য অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া নিজ নিজকে ধন্য মনে করিতেছেন। এই সার্ব্বজনীন দয়ার প্রেমের সেবার ভাব যাঁর হৃদয়ে প্রথম জাগরুক হইয়াছিল, যিনি ইহাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া প্রথম জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, অধুনা অধঃপতিত এই ভারত ভূমিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতে অনেক সময় অনেক রত্ন উদ্ভূত হইয়াছে—কিন্তু দ্বিসহস্র বৎসরের পূর্ব্বে কপিলাবস্তুর সন্নিকটে লুম্বনীর বনে সিদ্ধার্থ নামে যে মহাপ্রাণের আবির্ভাব হইয়াছিল—এমন রত্ন ধরণী পূর্ব্বে বা পরে বোধ হয় কখনও ধারণ করে নাই। বাল্যকাল হইতেই রাজকুমার সিদ্ধার্থের চক্ষে ভোগ ঐশ্বর্য্যের মহত্ব অপেক্ষা তাদের অসারত্ব ও জীবনে প্রকৃত শান্তিদান করিবার অক্ষমতার ভাবটীই অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সংসারও তাতে ব্যপ্তি—মানবের জীবন তাঁর নিকট মহা দুঃখময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পীড়া, দারিদ্র্য, জড়া, মৃত্যু—নানারূপে লোক প্রপীড়িত। ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া কি প্রকারে মানবকে শান্তিদান করিবেন,—ইহাই তার জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বহু বর্ষব্যাপী কঠোর জপতপের অবসানের পর তিনি যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন এবং জীবনের উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস—তাঁর চক্ষে প্রকটিত হইয়া পড়িল, তখন তাঁর প্রথম চিন্তাই হইল, কেমন করিয়া নিজের ন্যায় সংসারের অন্যান্য ভ্রাতা ভগ্নীকেও দুঃখ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবেন। অন্যান্য সত্যের সহিত—এই সত্যও তাঁর জ্ঞানচক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—যে সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেমের ভাব, মৈত্রীর ভাব পোষণ করিতে করিতে ও তাদের সেবায় জীবন যাপনের ফলে—অবশেষে হৃদয়ে এমন অনাবিল সুখ শান্তি ও আনন্দের ভাব উদ্গত হয়—যে সামান্য দুঃখের ক্ষুদ্রাংশটুকুও তাতে আর দৃষ্ট হয় না। ইহাই নির্ব্বাণের অবস্থা—যখন বাসনা বহ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইয়া আসে; শত্রু মিত্র আত্মীয় অনাত্মীয় জ্ঞান বিদূরিত হইয়া যায়; উর্দ্ধে অধে বামে দক্ষিণে এক মহাপ্রেমের মধুর লহরী ক্রীড়া করিতে থাকে এবং অনাবিল আনন্দ স্থির

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হৃদয় প্রদেশ আলোকিত করিয়া বিরাজ করে। ঈদৃশ ভাবাপন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী, বুদ্ধ—প্রাণ যাঁর দর্শনে আপনা হইতেই পদতলে লুটাইয়া পড়ে।

শিষ্যগণকে উদ্দেশ করিয়া বুদ্ধদেব বলিয়াছেলেন, যাও তোমরা জগতের হিতার্থে, লোক উদ্ধারার্থে। দয়ার ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া লও—এই মহা ধর্ম্ম প্রচার কর। প্রফেসার বিল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব এই যে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ প্রেমের ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার প্রধান শিক্ষা পরের হিতসাধনই—নিজের হিত ও সুখলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। এই ধর্ম্মের চক্ষে—মানব-মাত্রেরই সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার এবং জন্মগত কাহারো শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্ঠতা নাই। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল—কোনও বিশেষ পার্থক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে—এসকল অসার অ সত্য অনুদার ভাবের স্থান ইহাতে নাই। মানবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্য জীবন—সম্পূর্ণরূপেই তার নিজকৃত কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে—ইহা তার শিক্ষার মূলতত্ত্ব। মৃত্যুর রজনীতেও ভক্ত শিষ্য আনন্দকে উদ্দেশ করিয়া বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, আনন্দ! নিজেই নিজের আলো হইয়া থাকিও, পরমুখাপেক্ষী হইওনা। মূর্খতা ও অজ্ঞানতা যে সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ,—ইহা তাঁর মত কেহই উপলব্ধি করে নাই। গুরুর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ও তাঁর উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁর শিষ্যগণ, এই মহাধর্ম্ম,—লোকসেবা, দীনদরিদ্রের সেবা, আর্ত্ত পীড়িত পশু পক্ষীর সেবা যার প্রধান অঙ্গ, সাম্যের ভাবে লোক সমূহকে উদ্বোধিত করিয়া তোলা এবং জ্ঞানালোকের সাহায্যে সমস্ত সংশয় সন্দেহ দুঃখের জাল ছিন্ন করা যার লক্ষ্য—ভারতের নানাস্থানে প্রচার করিয়া ছিলেন। বস্তুত যে সাম্য ও ন্যায়ের ভাব, সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচার, সেবা ও প্রেমের ভাব—বর্ত্তমানে নানাবিধ অশান্তি কর ঘটনার ভিতর দিয়া—নানাভাবে প্রচারিত হইতেছে—বৌদ্ধধর্ম্মের কল্যাণে তাহার অনেকাংশই বিভিন্নরূপে মধুর স্নিগ্ধভাবে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধশ্রামণগণের দ্বারা মানবসেবা ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়া—যে মিলনের মহাগীতি উচ্চারিত হইতেছিল, তার ফলে ভারতের সকল বর্ণেতে মিলিত হইয়া এক নূতন মহাজাতি গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কন্যা সদৃশ কিন্তু তুলনায় অনেক বিষয়েই জননীর অপেক্ষা সুশ্রী। তারই কল্যাণে ভারতবর্ষ নির্লিপ্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া জগতের ইতিহাসে স্বীয় বিশেষত্ব স্থাপন করিবার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে। মহাপ্রাণ মহারাজ অশোকের নেতৃত্বাধীনে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে যে বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিষ্ঠান হয়, তাতে জগতের অন্যান্য জাতি সমূহকে বাহু বা অস্ত্রবলে নয়, সত্য ও মৈত্রীর বলদ্বারা জয় করিবার এক নূতন ভাবের অবতারণা করা হয়। এমন মহান ভাব কোনও দেশের কোনও শাসকের হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। সেই সভায় পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহে বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য 'প্রচারক' নিযুক্ত করিবার—এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। ইহাই প্রচারক সাহায্যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিবার জগতে প্রথম চেষ্টা; পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্ট, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা স্ব স্ব ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য বিস্তার কল্পে এই পথই অনুসরণ করিয়াছেন। যতই কেন মানব—জাতি, ভাষা, বর্ণ ও আচার ব্যবহার গুণে একে অন্য হইতে পৃথক না হৌক, মূলতঃ—তারা সকলেই একইবংশ সম্ভূত এবং প্রত্যেকই একে অন্যের দুঃখ অপনোদন এবং সুখবিধানের জন্য দায়ী—সংক্ষেপতঃ মানব জাতি-এই সংজ্ঞাটী কথার কথা মাত্র নয়—ঈদৃশ শিক্ষা ও ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া—উপরোক্ত মহাসঙ্ঘের অধিষ্ঠানের পর হইতে তৃষিত তাপিত দুঃখদগ্ধ দারিদ্র্য পীড়নে ক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগ্নীর সাহায কল্পে বৌদ্ধশ্রামণগণ ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া,—উত্তর ও পূর্ব্বে চীন, কোরিয়া, সাইবেরিয়া এমন কি ব্যারিং প্রণালী পার হইয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত, অন্যদিকে পারস্য, তুর্কিস্থান, সিরিয়া ও মিশরে বুদ্ধদেবের সাম্য ও প্রেমের মহা বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং যজ্ঞোপলক্ষে ছাগ শিশু বলিদানের প্রথা নিবারণকল্পে নিজের গ্রীবা কর্ত্তন করিবার জন্য ঘাতককে দান করিয়াছিলেন;

তাঁর শিষ্যগণও যেখানে গিয়াছেন সেখানেই লোক সেবা, দীনদরিদ্রের পরিচর্য্যা, প্রাণীসেবার জন্য নিজে নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় কত স্থানে মানব ও ইতর প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য কত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কত অতিথিশালা, পান্থশালা, জ্ঞানমন্দির, কত দীর্ঘিকা রচিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায়ও বৌদ্ধধর্ম্মের কল্যাণে ব্রহ্মদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। বরবুধর ও অনুরাধাপুর এবং চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানের মহৎ ধ্বংসাবশেষ সমুহ এখনও বৌদ্ধ শ্রামণগণের ললিতকলার প্রতি প্রীতি, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং জীবের প্রতি অপার করুণা ও সেবার ভাব বিঘোষিত করিতেছে।

আজ আর বৌদ্ধধর্ম্মের সুমহান মৈত্রীর বাণী ভারতে শ্রুত হওয়া যায় না। প্রাচীন বেদান্ত ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত জাতিভেদ মূলক ভাব সমূহের পুনঃ আবির্ভাবের সঙ্গে ঐক্যের বাণী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তৎস্থলে বৈষম্য দেখা দিয়াছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে—খৃষ্টধর্ম্মের অনেক ভাব এমন কি অনেক প্রচলিত বাক্য বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত, অন্ততঃ তাহার ভাবে অনুপ্রাণিত। মানবমাত্রেই সকলে যে একে অন্যের ভাই; একের অন্যের দুঃখ দূর করা, পীড়িতাবস্থায় সেবা ও যত্ন করা যে প্রত্যেকেরই প্রধান কর্ত্তব্য—পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্টধর্ম্মের কল্যাণে এই সত্য প্রচারিত হইতে থাকে। মহাপ্রেমিক যীশুখ্রীষ্ট যে সামান্য কয়েক বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন—এই প্রকার পর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কত অন্ধ, খঞ্জ, পীড়িত ব্যক্তি নাকি তাঁর পবিত্র স্পর্শে রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছিল। জগতে ঈদৃশ দুঃখীলোকের সংখ্যার অভাব কখনও নাই। ইহাদের ও দীনদরিদ্রদের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, শস্য যথেষ্ট কিন্তু কর্ত্তন করিবার লোকের অভাব; তাই, শস্যের প্রভু যিনি—তাঁর নিকট প্রার্থনা কর—তিনি তোমাদের সাহায্যে আরও শস্য সঞ্চয়কারী প্রেরণ করুন। বুদ্ধদেবের ন্যায় তিনি তাঁর দ্বাদশ জন শিষ্যকে প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, যাও তোমরা; স্বর্গরাজ্য শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইবে, ঘরে ঘরে এই সুসমাচার প্রচার কর; সঙ্গে সঙ্গে পীড়িতকে রোগমুক্ত করিবে, মৃতকে জীবন দান করিবে, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবে। ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া তিনি নিজে প্রাণ হারাইয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহাপ্রেমিকের প্রেমের ভাবের সামান্যরূপেও স্খলন হয় নাই। ঘাতকদিগকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও বলিয়াছিলেন, ক্ষমা করো পিতা! এদের, কারণ জানে না এরা কি কুকাজ করিতেছে। তাঁর অন্তর্ধানের পর, তাঁর কত শিষ্য এ ভাবে প্রাণ হারাইয়াছেন,—কত দরিদ্রের পীড়িতের সেবার ইচ্ছায় নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আজও খ্রীষ্টের ভক্তগণ কত বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া, কত ঠাট্টা বিদ্রূপ অত্যাচার উৎপাত সহ্য করিয়া তাঁর ধর্ম্ম সেবা যার ভূষণ—প্রচার করিয়া নিজেরা ধন্য হইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে যে দেশে যাইতেছেন, তারও অশেষ ভাবে উন্নতি সাধন করিতেছেন। বস্তুতঃ—যতদূর নয় ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের দ্বারা—যেমন এই সেবার ভাবের সাহায্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ সেই ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছেন। বর্ত্তমানে জগতে এমন কোনও স্থান নাই—যেখানে তাদের চেষ্টায় খ্রীষ্টের বাণী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণপ্রদ ভাব সমূহ কিয়ৎ পরিমাণে প্রচারিত হয় নাই। ইহাদের নিকট জগৎ অশেষভাবে ঋণী।

এই যে সেবার ভাব—একে অন্যকে সাহায্য করা—ইহা হইতেই ক্রমে ক্রমে সমাজের ভিতর সর্ব্ব বিষয়ে সমবায়ের ভাব বিকশিত হইয়া উঠে। রাজ্য-শাসনরূপ ব্যাপার এই সমবায় শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে দেশ সমস্ত জাতিরই সম্পত্তি। যাহাতে দেশের সকল লোকের সর্ব্বতোভাবে শক্তির বিকাশ ও স্ফুরণ হয়—তাহাই সকলের চিন্তার বিষয়। দরিদ্র এতদিন উপেক্ষিত হইত। কিন্তু এক্ষণে এই সত্য প্রত্যেক সভ্য সমাজেই গৃহীত হইয়াছে যে প্রত্যেকটী মানুষই,—ধনী বা নির্ধন, সবল বা দুর্ব্বল—সমাজের অমূল্য সম্পদ। তাকে দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অন্যান্য বিপত্তির হস্ত হইতে

উদ্ধার করিয়া শক্তিমান ও জ্ঞানবান করিয়া তুলিবার জন্য—সকল সমাজেরই চেষ্টা। এইজন্য ইয়ুরোপেও অন্যত্র—দুর্ব্বল, পীড়িত, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদিকে যাতে মানুষ করিয়া তোলা যায়, তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে। সামান্য শক্তিটুককেও সমাজের কার্য্যে নিয়োগ করা—রাজনৈতিকের প্রধান লক্ষ্য। তাই প্রত্যেক রাজশক্তিই এক্ষণে লোক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে, লোকসেবার ভারও বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মজগতে এ ক্ষেত্রে যে সকল ভাব প্রচারিত হইতেছে বা হইয়াছে তার প্রত্যেকটীই ক্রমে ক্রমে শাসন যন্ত্রের অঙ্গীভূত হইতেছে। এক্ষণে কুষ্ঠরোগীগ্রস্তকে আর Good Samaritanর দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না; অন্ধকে আর শিক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না; পীড়িতকে আর পথের ধারে পড়িয়া মরিতে হয় না—রাজসরকার ইহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, রাজ সরকার হইতেই লোক নিযুক্ত হইয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগের সেবার জন্য ধাবিত হয়। তাও কিনা জগতের দুঃখ যাতনা দারিদ্র্যের তুলনায় মানবের দান, সেবা—অতি সামান্য। তাই সমস্ত স্বদেশেই রাজসরকার হইতে যেমন লোকশিক্ষা ও সেবার চেষ্টা হইতেছে—সেই প্রকার সে-সব দেশের জনসাধারণও কতভাবে ভাই ভগ্নীর দুঃখোপনোদনে নিজ নিজকে নিযুক্ত করিতেছেন। কেহ চিকিৎসালয় স্থাপন করিতেছেন; কেহ দারিদ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছেন; কেহ সন্তান-সম্ভাবিতা জননীর শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতেছেন; কেহ দরিদ্রদের বাস জন্য সুখ-ভোগ্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন; কেহ অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তির আহারের উপায় করিয়া দিতেছেন—কতভাবে যে মানবের অন্তর্নিহিত প্রেমের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া বসুন্ধরার কঠিন বক্ষ সিঞ্চিত করিতেছে—বলিবার নয়।

হিন্দু জাতির ভিতর দেশাত্ম ভাবটী—জাতির ভাবটী কখনও তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। আত্মার মুক্তির চিন্তায় চিরকাল বিব্রত, জাতিভেদরূপ নাগপাশের বন্ধনে আবদ্ধ হিন্দু জাতির ভিতর সেবার ভাবটী কখনও তেমন ক্রীড়া করিবার সুযোগ পায় নাই। তাও মানবের স্বাভাবিক প্রেম প্রবৃত্তি হইতেই—নানা অতিথিশালা, পান্থশালা, দীর্ঘিকা—হিন্দুর হস্তে স্থাপিত ও রচিত হইয়াছে। ভারতের অতি প্রাচীন জৈন ধর্ম্মের ভিতর এই সেবার ভাবটী পূর্ব্বাপর বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। পশুদিগের ক্লেশ নিবারণের কল্পে প্রতিষ্ঠিত পিঞ্জরাপুল সমূহ জৈন ধর্ম্মাবলম্বীদের হৃদয়ের মহত্ত্ব ও প্রেম প্রবণতার পরিচয় দিতেছে। ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ও দেশাত্ম ভাবের বিকাশের সঙ্গে এই সেবার ভাবটী দিন দিনই আমাদের সমাজে ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহা মহা সুলক্ষণ এবং আমরা যে জগতের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাইব না তার একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাম্যবাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, এই সেবার ভাবটী সেই ধর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত আর্য্যধর্ম্মের ভিতর দিয়াও তাহা প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু প্রথমোক্তটীর জীবনশক্তি দিন দিনই যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—আমাদের দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয়টীর প্রভাব পঞ্জাব ব্যতীত অন্যত্র উপলব্ধি হইতেছে না এবং বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান অননুমোদিত এমন সব ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অন্যত্র তার বিস্তার সম্ভবপর নয়। বেদ ভগবানের মুখ নিঃসৃত অভ্রান্ত বাণী আর্য্য ধর্ম্মের এই মূলসূত্রে কে এই বিজ্ঞানের দিনে আস্থা স্থাপন করিবে?

বর্ত্তমান ভারতে এই সেবার ধর্ম্ম অদম্য উৎসাহী বিবেকানন্দের কল্যাণেই আবার বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইতেছে। তাঁর অনন্ত উৎসাহের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী বালক প্লেগাক্রান্ত কুটীরে ভাইর সেবায় ছুটিয়া গিয়াছে; কন্যার মুখে নিজ প্রাণ সঁপিয়া দিয়াছে; আজ ও কত স্থানে কতভাবে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, পীড়িত, আর্ত্ত ভাইভগ্নীর সেবা করিয়া দেশকে ধন্য করিতেছেন। এমন নিঃস্বার্থ ভাবে লোক সেবা আত্মবিসর্জ্জন বৌদ্ধ যুগের তিরোধানের পর ভারতে দৃষ্ট হয় নাই। স্বার্থত্যাগ ও চরিত্রের উপরই—যত না মূলতত্ত্বের বিশুদ্ধতার উপর—সকল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। তাই বিবেকানন্দ এই সেবার ভাব ব্যতীত অন্য কোনও নূতন

ভাব সমাজে না দিয়া যাইতে পারিলেও তাঁর ভক্তবৃন্দে দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ঠিক বলিতে গেলে, বিবেকানন্দের শিক্ষার ফলে একদিকে যেমন উপকার হইতেছে, অপকারও হইতেছে যথেষ্ট। লোক-সেবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পূজারও প্রবর্ত্তন হইতেছে। রামকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই অবতার রূপে পূজিত হইতেছেন; পূর্ব্বকালে চৈতন্তের ন্যায় তাঁর ও তাঁর ভক্তের মূর্ত্তির পূজা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের বৈধব্য প্রথাও রমণীর পরাধীনতা দূরীকরণ; স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন; জাতি ভেদ বিলোপ; অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তন ইত্যাদি সমাজের কোনও উন্নতিকর প্রাণবর্দ্ধক প্রস্তাবের সপক্ষে তাঁর শিষ্যবর্গকে শক্তি নিয়োগ করিতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, তাদের শিক্ষার ফলে প্রাচীন কুসংস্কার সমূহ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে এবং তাদের অনুকরণে নানা বেশধারী সন্ন্যাসী ও শিষ্য সমূহের আবির্ভাবে বঙ্গের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে।

দেহ ও মন লইয়া মানব এবং মানবের সমষ্টি জাতি। যাতে সমাজের প্রত্যেকের দেহ ও মন সমান ভাবে উন্নত করিয়া প্রত্যেককেই শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত করা যায়, এবং ভবিষ্যৎ বংশ যাতে এমনি সব মানবরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ও সকলের সমবায় শক্তি, দেশের সমাজের জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত হয়—ইহাই হইবে সেবা ধর্ম্মের আদর্শ। এক্ষণে নিজ শক্তির উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত কোনও ধর্ম বিশেষের অঙ্গ হইয়া ইহার প্রচারের আর তেমন প্রয়োজনও নাই; তাতে হিত অপেক্ষা অনেক সময় অহিতই হইয়া থাকে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান সম্মত যুগ ধর্ম্ম। ফরাসী দার্শনিক কমটে তাঁর প্রবর্ত্তিত Religion cf Huminity মানব ধর্ম্মে এই ধর্ম্মেরই আভাস দিয়া গিয়াছেন। ইহার বিশাল পতাকাতলে আসিয়া জগতের সকল ধর্ম্মের লোকই কালে একত্র হইবে। কেহ বা হিন্দু কেহ বা বৌদ্ধ; কেহ বা খ্রীষ্টান, কেহবা মুসলমান, কেহ বা ব্রাহ্ম কেহ বা বৈদান্তিক; কেহ বা ছোট কেহ বা বড়; সকলেই একে অন্যের ভাই, প্রত্যেকেই পরের তরে; আর প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা মহীয়ান গরীয়ান যার শিক্ষায়, যার স্পর্শে, যার পরিচালনায় মানুষ দেবত্বের পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে।

এদেশের ন্যায়, এধর্ম্ম প্রচারের এমন প্রকৃষ্ঠ স্থান কোথায়? এমন আধি ব্যাধির স্থান কোথায়? এমন অজ্ঞানতাই বা কোথায়, কুসংস্কারের স্তুপই বা কোথায়? এই মূর্খতা ও ব্যাধি দূরীকরণ—ইহাই প্রত্যেক দেশবাসীর বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত এবং কালক্রমে হইবেও তাহা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—এই দুটী প্রশ্নের সহিত সকল দেশের উন্নতি মূলতঃ জড়িত। চিকিৎসক ও শিক্ষকের হস্তেই চিরকাল জগতের উন্নতি নির্ভর করিয়া আসিতেছে। এক মহাপ্রেমের ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে; সমস্ত বিদ্বেষ হিংসা বিদূরিত করিতে হইবে; জাত্যাভিমানের সামান্য অংশটুকও হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে এবং যেখানে দুঃখ, যেখানে দরিদ্রতা, যেখানে মূর্খতা—সেখানে যাইয়া—তাদের অপসারণ করিবার জন্য সর্ব্ব শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। কোনও রাজনৈতিক বা সমাজিক প্রশ্নের গন্ধ পর্য্যন্ত ইহার প্রচারে স্থান পাইবেনা; স্বদেশ বিদেশ, স্বজাতি, অপরজাতি এই বৈষম্য জ্ঞান থাকিবেনা—সকলের প্রতি সমান ভাবে প্রেমবারি বর্ষিত হইবে। মৃত্যুর ভিতরই জীবন—পর সেবায় আত্মবিসর্জ্জনের ভিতরই আনন্দের অধিষ্ঠান—সকল ধর্ম্মই এ সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। সেবক যিনি তার দেহ স্বাস্থ্যপূর্ণ হইবে; হৃদয় নির্ম্মল, পবিত্র হইবে; এবং প্রেম উদ্যম ও আনন্দের ভাবে সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ থাকিবে, যেন দর্শনেই লোকচিত্ত আপনা হইতেই তার দিকে নত হইয়া পড়ে। ঘরে ঘরে এমন সেবকের আবির্ভাব হৌক, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

---

# বাঙ্গালা টাইপরাইটার যন্ত্র।

বাঙ্গালা ভাষায় টাইপরাইটার হইতে পারে কিনা, তাহা লইয়া বিগত কয়েক বৎসর হইতে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। রেমিংটন টাইপরাইটার কোম্পানী একটী বাঙ্গালা লিখন যন্ত্র এদেশে বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করিয়াছিল। ঐযন্ত্রে বাঙ্গালা কতকগুলি অক্ষর দেওয়া ছিল মাত্র, বাঙ্গালা ভাষার জটিল যুক্তাক্ষরগুলি তাহাতে লিখিবার উপায় ছিলনা; হসন্ত দ্বারা যুক্তাক্ষর লিখিতে হইত। বলা বাহুল্য তদ্রূপ প্রণালী প্রচলিত সংযোগ নীতির বিরুদ্ধ হওয়ায়, তাহা সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের নিতান্ত অনুপযোগী সাব্যস্ত হইয়াছে।

ফলে ঐ যন্ত্র অধিক বিক্রয় হয় নাই।

ময়মনসিংহ বাসীর পক্ষে বড় আনন্দের সংবাদ, শুধু আনন্দের কেন গৌরব করিবার বিষয় যে, এরূপ গুরুতর সমস্যা একজন ময়মনসিংহ বাসী দ্বারা সমাধান হইয়াছে। কিশোরগঞ্জের অধীন ধনকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মজুমদার বাঙ্গালা ভাষার যুক্তাক্ষর লিখনপ্রণালী সমাধান করিয়া একটী বাঙ্গালা টাইপরাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালার জটিল যুক্তাক্ষরগুলি অতি সুন্দর রূপে লিখা হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে এ যন্ত্র বোধ হয় বৃহদাকার এক বিরাট-জিনিষ হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। প্রচলিত ইংরাজী টাইপরাইটার যন্ত্র যেরূপ, ইহার আয়তনও তদ্রূপ; তবে কলকব্জায় কতক পার্থক্য আছে। সত্যবাবুর যন্ত্র সাহায্যে লিখিত কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের একটী সঙ্গীতের প্রতিলিপি নিম্নে মুদ্রিত হইল। তদ্দৃষ্টেই যুক্তাক্ষর লিখন ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তুমি সুন্দর হৃদিরঞ্জন, তুমি নন্দন-ফুলহার।

তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।

নীল অম্বর-চুম্বন-নত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,

অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত, গুঞ্জরে অনিবার।

ঝলকিছে শত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ,

চরণ ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।

ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন, তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন,

লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন, বন্দন-উপহার।

সত্যবাবুর যন্ত্র সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ বলিয়া তিনি বলেন না। ইহার আরও উৎকর্ষ হইতে পারে এবং তাহা করিতে হইবে। কিন্তু অর্থাভাব সে উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে পরিপন্থি হইয়াছে। সত্যবাবু বিগত ৭ বৎসর কাল নানারূপ পারিবারিক বিপদে জড়িত থাকিয়াও এ সাধনায় একনিষ্ঠ ভাবে ব্রতী ছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় তাঁহার সাধনা এখন সিদ্ধির পথে দাঁড়াইয়াছে। তিনি তাঁহার নবাবিষ্কৃত প্রণালী অনুযায়ী এই যন্ত্রটী প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে যুক্তাক্ষর সহ লিখন চলে। এখন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলেই এ আবিষ্কার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। বিগত ৭ বৎসর কাল তিনি নিজশক্তি অনুসারে অর্থব্যয় করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কতক পরিমাণে ঋণও করিতে হইয়াছে; নিজ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কথাতো বলাই বাহুল্য। একজন সাধারণ অবস্থার চাকুরী জীবীর পক্ষে কল কব্জা সম্বন্ধীয় শিক্ষা ব্যতীত, শুধু মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা একার্য্য সাধন করা অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। ইহাতে আবিষ্কারকের উদ্ভাবনী শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সে শক্তির বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এতদুভয়েরই অভাব।

একবার আমেরিকার এক সংবাদ পত্রে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবিষ্কার" (minor inventions) শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেখিয়াছিলাম, তথাকার জনৈক দরিদ্র যুবক "নেকটাইর" কি একটা উন্নতি সাধন করিয়া বিভিন্ন সমিতি ও ব্যক্তি হইতে ১০,০০০ডলার কেবল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জাপান প্রভৃতি দেশে সাধারণ বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পারিলে রাজশক্তি সর্ব্বপ্রকারে আবিষ্কারের সাহায্য করিয়া থাকেন। সত্যবাবুর এ আবিষ্কারকে minor invention বলা যায় না। বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য এ আবিষ্কারে কতদূর উপকৃত হইবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পরিবেন। কিন্তু কয়জন লোক বা কয়টা সমিতি এ আবি-

তাঁহাকে অর্থ সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিবেন, তাহা দেখিবার বিষয়।

আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। ভরসা করি, বঙ্গীয় মন্ত্রী সভার দেশীয় সদস্য, কবি ও সাহিত্যিক, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এবিষয়ে অগ্রণী হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সত্যবাবুকে উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান ক্রমে যাহাতে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্য সমিতি সমূহের এবং সাহিত্যরথীদিগের দৃষ্টিও আমরা এবিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

অবশেষে এ সংশ্রবে ময়মনসিংহ বাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট একার্য্যে সহায়তা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেও ময়মনসিংহবাসী সত্যবাবুকে অবহেলা করিতে পারেন না, কাজেই এবিষয়ে ময়মনসিংহবাসীর কর্ত্তব্য গুরুতর। সত্যবাবু যে পরিমাণ অর্থের জন্য আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে পারিতেছেন না, ময়মনসিংহের পক্ষে তাহা কিছুই নহে। অথচ এ আবিষ্কার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে একজন ময়মনসিংহবাসী দ্বারা সম্পন্ন হইলে, বাঙ্গালার জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সহায়ক রূপে ময়মনসিংহ যে গৌরব লাভ করিবে তাহার তুলনায় এ ত্যাগ তুচ্ছ। তাই আমরা ময়মনসিংহ বাসীর ও এজেলার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। যাহাতে সত্যবাবুর এ উদ্যম সার্থক হইতে পারে—ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডেরও তৎপক্ষে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করা উচিত। ভরসা করি এবিষয়ে ময়মনসিংহের গুণগ্রাহী জমিদার সম্প্রদায় ও উদাসীন থাকিবেন না।

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার।

---

## চৈত্র—১৩২৫

হাস্য পূরিত আস্য শোভা
প্রেমেএ পবিত্র গান,
ফুল্ল হৃদয়ে চন্দন হার
দুলিত নাচিত প্রাণ
গন্ধে বিভোর নন্দন ফুল
প্রেমের পীযূষ ধারা,
অম্বর চুমি অন্তবিহীন
প্রণয়ে পাগল পারা
বৈশাখী ভানু দুপুর দিনে,
বুলাত বদন খান,
সান্ধ্যবীণে বাজায় বেণু
জুড়াত কতই প্রাণ।
তপ্ত হৃদয়ে শ্রাবণী ধারা
শ্রান্তি করিত নাশ,
ধুয়ে মুছেদিয়ে সারাটীঅঙ্গে
আসিত সুরভ বাস।
সৌম্য শারদ শান্ত হাসি
চাঁদিমা ধরণী ছায়,
মন্দ মধুর গন্ধে মাতি
মদির মলয় বায়
স্পর্শ মণির পরশ শিক্ত
সোনার ক্ষেতের ধান।
বিশ্বপিতার সান্ধ্য গানে
ভরিত হৃদয় খান
মধু ফাল্গুণের মন্দ বাসে
স্ফুরিত কোমল কলি,
কুঞ্জ বিথানে মঞ্জরী শাখে
গাহিত কুহুর বুলি;
বারটী মাসের বন্ধন তার
আজিকে তুহিন রাতে,
মর্ম্মফলকে চিহ্ন কেন
কাহার চরণ পাতে:
দীপ্তি টুটিল তৃপ্তি নাশি
জনমমরণ বাতি
অঙ্কিত রল অঙ্কে বধূর
চৈত্র শেষের রাতি।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

# কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর

## ( ৪ )

### বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন।

কঙ্কের মালিনী বিদ্যার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল।

ফুলের পালঙ্ক তথা ফুলের বিছানা।
কেহ বা বাজায় বীণা কেহ গায় গানা॥
বসন্ত কালেতে যথা মত্ত সে কোকিলা।
পরম সুখেতে করে পুষ্প লয়ে খেলা॥
পালঙ্ক উপরে তথা বসিয়া সুন্দরী।
আবের পাখায় বাতাস করে সহচরী॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার জলে পিয়াসা মিটায়।
নানা জাতি পুষ্প-লতা মেঝেতে লুটায়॥
চান্দ কি বসিয়া তথা অধেক শয়নে।
শতদল মালা কিম্বা মৃণাল শিথানে॥

পুষ্প পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় ষোড়শী রাজকুমারী। চারিদিকে আবের পাখা হস্তে সহচরীগণ যেন কুরুবক কুসুমালঙ্কৃতা লজ্জিতা দেব বল্লরীতে বাতাস করিতেছে। আশে পাশে নানাজাতি সুরভী কুসুম গন্ধে দিক্ আমোদিত করিতেছে। সহচরীগণের কেহ বীণা বাজাইতেছে, কেহবা সেই বীণার তানে বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠ মিশাইতেছে, কেহবা সুগন্ধী কুসুমদলে চিকনিয়া মালা গাঁথিতেছে, আবার কেহবা সেই গাঁথা মালা আপন গলায় পড়িয়া হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দ্বারে "দোয়েল কোকিল শ্যামা ধরিয়াছে তান। মধু লোভে আসে ভৃঙ্গ জানিয়া সন্ধান।" কেহবা পরিহাসচ্ছলে কোন অজানিত দেশের রাজপুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছে, আবার কেহ নিজেই পুরুষ বেশে বর সাজিয়া—

"আমারে সুন্দর কন্যা যৌবন কর দান।
শয়নে রচিয়া দিব ফুলের বিছান॥
গলায় গাঁথিয়া দিব বিনা সুতে হার।
গঙ্গাজল শাড়ি দিব পরণে বাহার॥
আর দিব আর দিব জীবন যৌবন।
পরান ভরিয়া দিব প্রেম আলিঙ্গন॥
হাস্য পরিহাসে ঘর তোলা পাড়া করে।
হেনকালে মালিনী যে উপনীত দ্বারে॥

মালিনীকে দেখিয়া তখন সমবেত সুন্দরীগণ—

কি আনিছ কি আনিছ চিকণ মালিনী।
বেষ্টন করিল তারে ছিল যত ধনী॥
খুলিতে না খুলে ধাই অঞ্চলের গির।
ভাবিয়া মালিনী মাসী হইল ফকির॥

মালিনী তখন কথার ফাঁদ পাতিল—

আছয়ে গোপন কথা তোমারে জানাই।
কানে কানে কব কথা চল অন্য ঠাই॥
আজিকার অপরাধ ক্ষমা কর মোরে।
বাগানের ফুল যত নিয়া গেছে চোরে॥
দায়েতে ঠেকিনু আমি পরের লাগিয়া।
চোরেরে শালেতে দেও বাপেরে কহিয়া॥

অন্যস্থানে আর যাইতে হইলনা, রাজকন্যার সঙ্কেত পাইয়া সহচরীগণ চলিয়া গেল। তখন—

আস্তে ব্যস্তে মালা খুলি অঞ্চল হইতে।
মালিনী তুলিয়া দেয় রাজ কন্যার হাতে॥

তখন রাজকন্যা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল—

নিতি নিতি গাঁথ হার তাও দেখি ভাল।
আজিকার এই হার কোন জনে গাঁথিল॥
শচীর বাগানে কি ফুটিল হেন ফুল।
কোন জনে গাঁথিল মালা মজাইতে কুল॥
গাঁথিতে এমন মালা শক্তি আছে কার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা ইহার মালাকার॥
সত্য কথা সুবদনী কও মোর কাছে।
পুরস্কার দিব তোমা ভাল বুঝি পাছে॥
এতবলি যত্নে মালা কণ্ঠেতে পড়িল।
মালাতে আছিল পত্র সুন্দরী দেখিল॥
লিপি খানা পড়ি কন্যা মনে মনে হাসে।
বিধি মিলাইল নিধি ভেসে যদি আসে॥
থাক থাক প্রাণেশ্বর মালিনীর বাড়ী।
আজি হইতে আমি তব হইনু কিঙ্করী॥

মালিনী যেন এবার কিছু দেখিয়াও দেখিল না সে বলিল—

দেবতা গন্ধর্ব্ব নয় শুন রাজবালা।

যে জন গাঁথিয়া দিছে এই দিব্য মালা ॥
সম্পর্কেতে হয় সেই আমার ঝিয়ারী।
ভাল বরে দিছি বিয়া নামটী পিয়ারী ॥
এর চেয়ে আরও ভাল জানে গাঁথিবার।
পরীক্ষা করিয়া দেখ বিনাসুতে হার ॥

রাজকন্যা তখন মালিনী প্রদত্ত পুষ্পহার গলায় ধারণ করিয়া বলিলেন—'দেখ দেখি আমারে কেমন যায় দেখা" মালিনী আর সে রূপের তুলনা খুজিয়া পায় না বলিল—

চাঁদেরে পড়াই যদি তারকার মালা।
সেহি মত তোমারে দেখায় রাজবালা ॥
বয়স হইল বড় না হইল বিয়া।
কবেবা দেখিব আমি নাত জামাইয়া ॥

রাজবালা ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলেন—

আজি কি আনন্দ ধাই কহন না যায়।
মনোমত পুরস্কার কি দিব তোমায় ॥
অমূল্য তোমার মালা মূল্য নাই তার।
ধর লও কণ্ঠহার দিনু পুরস্কার ॥

রাজকন্যা মালিনীকে বহুমূল্য হীরার হার প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমার এই অমূল্য পুষ্পহারের পরিবর্ত্তে সামান্য কিছু তোমাকে দিলাম। মালিনী ভাবিল, আমার কপাল ফিরিয়া গিয়াছে।

কাচদিয়া মালিনী কাঞ্চন লয় বান্ধি।
কুমার আনিতে কন্যা করিলেক ফন্দি ॥

তখন—রাজকন্যা বলে শুন চিকন মালিনী।
আজি বুঝি পোহাবে না আমার রজনী ॥
যে জন গাঁথিল এই কুসুমের হার।
কি দিব তাহারে আমি যোগ্য পুরস্কার ॥
আমার হৃদয়ে সুখ দিলা যেই জন।
বদলে হৃদয় তারে করিব অর্পণ ॥

কাল প্রভাতে তুমি যখন মালা লইয়া আসিবে, তখন তোমার ঝিয়ারীকে সঙ্গে করিয়া আনিও।

এমন সুন্দর মালা গাঁথিল যে জন।
না জানি সে ঝিয়ারী তব দেখিতে কেমন ॥
মায়েরে কহিয়া আমি পাঠিব সহেলা।
কালিকে গাঁথিয়া আইন জোড়া দিব্যমালা ॥

মালিনী তখন বাহানা ধরিল—

ভিতরের অন্দি সন্ধি মালিনী না জানে।
ভ্রমর হইল ফাক ভাবে মনে মনে ॥
প্রকাশ হইলে কথা যাইবে গর্দ্দাণ।
কিরূপে কন্যার কাছে পাই পরিত্রাণ ॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া মালিনী তবে কয়।
রাজার বাড়ীতে আসা মনে বড় ভয় ॥
ফুল তুলি মালা গাঁথি অন্য নাহি জানি।
কুটুনী কাটনী কথায় নাহি থাকি আমি ॥
ঝিয়ারীরে লইয়া কিবা পড়িব বিপদে।
ক্ষমা কর রাজবালা ধরি তব পদে ॥

রাজকন্যা অভয় দিয়া বলিল তোমার কোন ভয় নাই। আমি মা'র কাছে বলিয়াই সব করিব। তথাপি মালিনী সহজে স্বীকৃত হয় না, সে বাহানা ধরিল—

কালি গেছে পুষ্প ব্রত আজিকে পারণ।
হাটিয়া আসিতে কন্যা হইবে অক্ষম ॥

রাজকন্যা বলিলেন—"কাল পাঠাইব আমি স্বর্ণ চতুর্দোলা"। মালিনী দেখিল, তাতেও বিপদ—

সাতদিন গেছে বাছার হাড় ভাঙ্গাজ্বরে।
কোমর ফুলিয়া গেছে বাতের কামরে ॥
কিছু কিছু মাথা বিষ আজ তার আছে।
বেদনা বাড়িয়া যায় তাই ভাবি পাছে ॥
রাজকন্যা বলে ভাল শুনালে মালিনী।
মাথা বিষের ঔষধ যা ভাল জানি আমি ॥
লোহা পুরাইয়া কোমরে দাগ দিব।
ঝাড়িয়া মাথার বিষ ভূয়ে নামাইব ॥

রাজকন্যার হস্ত হইতে আর পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া মালিনী বলিল,

পরের ঘরের মেয়ে আসিতে না চায়।
কন্যা বলে আমি তার করিব উপায় ॥
তখন মালিনী কয় শুন রাজবালা।
যুবতী ঝিয়ারী মোর রয়েছে একেলা ॥
আসে বা না আসে কাল দিব সে উত্তর।
কি জানি যাইবে কবে শ্বশুরের ঘর ॥
কন্যা বলে সব কথা ভাল জানি আমি।

ছলনা কর মোরে চিকন মালিনী ॥
ভাল যদি চাও তবে রাখ মোর কথা।
কোটালের হাতে নইলে যাবে তব মাথা ॥
তরাসে মালিনী তবে কাঁপিতে লাগিল।
করযোরে মিনতি করিয়া জানাইল ॥
কাঙ্গালের ঘরে বাছা আঁধারের মণি।
গোবরে ফুটিল পদ্ম রূপের বাখানি ॥
বর্ষাকালের ভরা নদী উথলাইয়া চলে।
যৌবন তরঙ্গ তার সর্ব্ব অঙ্গে খেলে ॥
পড়িতে বসন নাই সর্ব্ব অঙ্গ খালি।
একখানি বস্ত্রে তার সাত জোরা তালি ॥
ভস্মেতে ঢাকিয়া রাখি জলন্ত আগুনি।
ভূয়েতে ঝড়িয়া পরে অঙ্গের লাবনী ॥
থাকুক সোণার কথা লোহা অঙ্গে নাই।
কেমনে আসিবে কন্যা মনে ভাবি তাই ॥

তখন রাজকন্যা মল্লিকা ফুলের তুল্য শুভ্র জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল সদ্যবিধৌত পট্টাম্বর, হার কেয়ূর কুণ্ডলাদি সহ মালিনীকে বিদায় করিলেন। বিদায় করিবার সময়

কাপড়ের ভাজে কন্যা ভাবি মনে মনে।
সুন্দরে লিখিল পত্র সুগন্ধী চন্দনে ॥
মিনতি করিয়া পত্র লিখিলা সুন্দরী।
আমার মন্দিরে তুমি আইস কৃপা করি ॥
সর্ব্বস্ব বিকাইয়া পদে লইনু স্মরণ।
চরণে দিলাম তুলি জীবন যৌবন ॥
জাতি কুল ছাড়িলাম ছাড়িলাম বাপ মাও।
যদি নাহি আইস বন্ধু মোর মাথা খাও ॥

বস্ত্রালঙ্কার সহ মালিনী বাড়ী গেল। রাজপুত্র এত বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন—মাথায় হাত দিয়া মালিনী মাসী কয়।
বিপাকে ঠেকাইল বিধি কি জানি কি হয় ॥
আমি মরি ক্ষতি নাই যা থাকে কপালে।
কাল প্রাতে তুমি বাছা যাবে কিন্তু শালে ॥
পলাইয়া পরের ধন যাও নিজ দেশে।
মালিনীর দুঃখে সুন্দর মনে মনে হাসে ॥
সুন্দর বলেন মাসী নিশি হউক ভোর।
বুদ্ধিবলে জিনি রণ চিন্তাকর দূর ॥
পরদিন নিশি ভোরে উঠিয়া সকালে।
সুন্দর গাঁথিল মালা বাছা বাছা ফুলে ॥
আস্তে ব্যস্তে ছাড়ে রায় পুরুষের বেশ।
শিরেতে পড়িল দিব্য চাঁচরিয়া কেশ ॥
প্রথমে পড়িল শাড়ি নামে গঙ্গাজল।
নখের আগে লইলে শাড়ি করে টলমল ॥
জমিনে থইলে শাড়ি বাতাসে মিলায়।
আপনি আপন রূপে পালটিয়া চায় ॥
নাকেতে বেশর দিল কানে কর্ণ ফুল।
মেন্দিতে রঙ্গিল পাও পদ্ম সমতুল ॥
পঞ্চম গুঞ্জরী দিল আরবেকী পায়।
সোণার নূপুর রুমু চরণে লুটায় ॥
হাতেতে চিরাণ শাখা বাজু বন্দ তার।
গলাতে পড়িল দিব্য গজমতি হার ॥
সূর্য্যমণি চন্দ্রহার তবে নিতম্বে পড়িল।
সরুয়া সিন্দুরে ভালে তিলক কাটিল ॥
কাজলে রচিল কন্যা যোড়া দিব্য ভূরু।
হাটিতে ভাঙ্গিয়া পরে কটি খানা সরু ॥
এহি মতে সুন্দর পড়িয়া নারী বেশ।
মালিনীরে ডাকে মাসী নিশি হইল শেষ ॥
কিছু বেলা হইলে পর উঠিল মালিনী।
অঙ্গনে চাহিয়া দেখে সুন্দর কামিনী ॥
কন্যারে দেখিয়া মাসী চমকি উঠয়।
আজি কিরে উষা মোর উদয় আঙ্গিনায় ॥
চিনিতে না পারে মাসী ফিরি ফিরি চায়।
কার কন্যা কিবা নাম বলহ আমায় ॥
দেবের কামিনী বুঝি ছলিতে আমারে।
নহে কি চান্দের আলো মোর ভাঙ্গা ঘরে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা হইবা আপনি।
অথবা হইবে কোন রাজার নন্দিনী ॥
রায় বলে শুন মাসী পরিচয় করি।
সম্বন্ধেতে হই আমি তোমার ঝিয়ারী ॥
শীঘ্রকরি চল মাসী রাজ বাড়ী যাই।
কালিকার কথা মাসী আজ মনে নাই ॥

তখন মালিনীর সঙ্গে ছদ্ম বেশধারী সুন্দর—

সাজাপারা করিয়া মুখেতে দিল পান।
ঘরতলে বাহিরিল পূর্ণমাসীর চাঁদ॥
সমুদ্র মর্দ্দন কালে সুধার কারণ।
ধরিয়া মোহিনী মূর্ত্তি দেব নারায়ণ॥
অঙ্গে নাই ধরে রূপ পড়ে উছলিয়া।
পন্থেতে পথিক সবে দেখে নেহারিয়া॥
অঞ্জন গঞ্জণ আঁখি যার পানে চায়।
শিরে হাত দিয়া সেই করে হায় হায়॥
বসন্তের লতা যেন বাতাসে পড়ে এলি।
মুখ পদ্ম মধু আশে উড়ে আসে অলি॥
রতি যেন চলিয়াছে মদন মন্দিরে।
চন্দ্রাবতী যায় যেন কৃষ্ণ অভিসারে॥
আগেতে মালিনী পিছে কন্যার গমন।
জরার পশ্চাতে যেন চলিছে যৌবন॥

ছদ্মবেশী সুন্দর মালিনী সহ একেবারে রাজকন্যার মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন—রতি যেন ফিরিয়া পাইল মৃত পতি।

যামিনী পাইল হারা মাণিকের পাতি॥
নিশি যেন শশীরে পাইল নিজকোলে।
শ্যামেরে পাইয়া যেত চন্দ্রাবলী ভোলে
সই সই বলি কন্যা সুন্দরেরে ধরে।
প্রবেশ করিল কন্যা শয়ন মন্দিরে॥

রাজ কন্যা যাইবার পূর্ব্বে মালিনীকে—

রত্ন অলঙ্কার দিয়া করিল বিদায়।
শুন মাসী এক কথা বলিব তোমায়॥
ঝিয়ারী থাকিবে মম শয়ন মন্দিরে।
রজনী বঞ্চিয়া প্রাতে যাবে তব ঘরে॥
তরাসে কাঁপিল অঙ্গ মনে বড় ভয়।
রত্ন অলঙ্কার লোভ ছাড়িবার নয়॥

মালিনী চুপচাপ বাড়ী চলিয়া গেল।

তারপর—সুবর্ণ পালঙ্ক পরে যতন করিয়া।

সুন্দরে বসায় কন্যা হাসিয়া হাসিয়া॥
পরাচুল খুলে কন্যা খোপা চমৎকার।
একে একে খুলে কন্যা সর্ব্ব অলঙ্কার॥
সিথির সিন্দুর তুলে অঞ্চলে মুছিয়া।
চন্দ্রহার খুলে কন্যা হাসিয়া হাসিয়া॥
খুলিল গলার দিব্য গজমতি হার
বাহু হতে খুলে কন্যা বাজু রত্নহার॥
গঙ্গাজল শাড়ী খুলে বুকের কাচলী।
সুন্দরে দেখিয়া কন্যা হাসে খল খলি॥

তারপর রাজকুমারী—পড়ায় পুরুষ বেশ অতি সুলক্ষণ।

সর্ব্বঅঙ্গে লেপে কন্যা সুগন্ধী চন্দন॥
পড়ায় চিকনি ধুতি ফুয়ে উড়ি যায়।
আপনি থাকিয়া রতি মদনে সাজায়॥
এইরূপে সাজা পারা করিল সুন্দর।
শচীর সম্মুখে যথা দেব পুরন্দর॥
রাধার কুঞ্জেত যথা দাঁড়াইল কানু।
উষার কোলেতে যেন উদয় হৈল ভানু॥
মনে মনে করে কন্যা রূপের বাখান।
মুখেতে তুলিয়া কন্যা দেয় খাচী পান॥
দুই জনে হইল পরাণ বিনিময়।
দুই জনে মিলিয়া মনের কথা কয়॥
বহুদিন পিপাসিত চকোর যেমন।
প্রাণ ভরি পান করে চান্দের কিরণ॥

তারপর—রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে কন্যা কিকাম করিল।

সুন্দরে করিয়া সঙ্গে পুষ্প তোলা গেল॥
সখিগণ অচেতন ছিল ঘুম ঘোরে।
এতেক না জানে তারা বিদ্যা যাহাকরে॥

তারপর সুন্দর সুন্দর ফুল তুলিয়া দুজনে মিলিয়া চিকনিয়া মালা গাঁথিল।

গন্ধর্ব্ব বিবাহ তবে হইল এহি মতে।
সুন্দর পড়ায় মালা বিদ্যার গলেতে॥
বিদ্যা নিজ গাঁথা মালা সুন্দরে পড়ায়।
দুই জনে মিলি রঙ্গে বাসর সাজায়॥

এইরূপ গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইয়া গেল। নৈশ তারকার মালা হইল বাসর দীপ; লতা, পুষ্প ও পালিতা হরিণী সকল হইল বাসর সঙ্গিনী।

আর—পাপিয়া কোকিলা গায় বাসরের গান।

ভ্রমরা ঝঙ্কার দেয় শ্যামাধরে তান॥

শিখিনী খঞ্জনী যত হইল নাচুনী।
গীত বাদ্যে এইরূপে চলিল রজনী ॥

*　　*　　*　　*

কবি কঙ্ক কহে কন্যা কিকাম করিল।
রাজার কুমারী হৈয়া কুলে কালি দিল ॥

তারপর রাজকন্যা সুন্দরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া গোপনে উদ্যানে আসিবার গুপ্ত পথের সন্ধান দেখাইয়া দিল।

বলিয়া দিল—মানুষ দূরের কথা দেবে নাহি পারে।
এহি পথে আইস বন্ধু আমার মন্দিরে ॥
যাবত না আস তুমি তোমার লাগিয়া।
প্রতি নিশি আমি হেথা রব দাঁড়াইয়া ॥
এইরূপে কহে কন্যা জানায়ে মিনতি।
নিমিষে পোহাইয়া গেল আজিকার রাতি।
সুন্দর বলেন নিশি পোহাইয়া যায়।
যাইতে মাসীর বাড়ী করহ উপায় ॥
সুখের রজনী তবে যদি পোহাইয়া গেল।
পুষ্প লইয়া রাজবাড়ী মালিনী আইল ॥

তখন সুন্দর রাজকন্যার প্রদত্ত রত্নালঙ্কার ও গঙ্গাজল শাড়ী পড়িয়া মালিনীর সঙ্গে ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রতিনিশি করে আনাগোনা।
মালিনী আটিল ফন্দি শুন সর্ব্বজনা ॥

মালিনীর লোভ সেই গঙ্গাজল শাড়ী ও রাজকন্যার প্রদত্ত রত্নালঙ্কারের উপর। একদিন, দুইদিন, তিনদিন এইরূপে গেল, সুন্দর স্বেচ্ছায় সেই অলঙ্কারাদি মালিনীকে না দিয়া মালিনীর ভাবগতিক দেখিতে লাগিলেন ;

একদিন মালিনী আসি সুন্দরেরে কয়।
বিপদ হইল বড় শুন মহাশয় ॥
দিবসে লুকায়ে থাক ফুলের বাগানে।
কি জানি রাত্রিতে তুমি যাও কোন স্থানে ॥
আনাগোনা তোমার যতেক ভাল নয়।
কোটাল জেনেছে বাপু কাণ্ড সমুদয় ॥
কালিকে ধরিয়া তোমা নিবে শালে দিতে।
আমারও গর্দ্দাণ যাবে তোমার সহিতে ॥
কাজ নাই বাপু তুমি দেখ অন্য ঠাই।
আমার বাড়ীতে বাপু তোমার স্থান নাই ॥
কথা শুনি রাজপুত্র মনে মনে হাসে।
রত্ন অলঙ্কার দিয়া মালিনীরে তোষে ॥
হাসি হাসি রাজপুত্র মালিনীরে বলে।
ধন রত্ন দিয়া তুমি মানাও কোটালে ॥
মালিনী ভাবিল মোর সিদ্ধ হইল কাম।
চিকণ বুদ্ধিতে হইল চিকণী মোর নাম ॥
সুন্দরেরে বলে বাপু থাক তুমি সুখে।
ধুলাপড়া দিব আমি কোটালের চোখে ॥
এইরূপে বিদ্যার মন্দিরে আনাগোনা।
পরেতে হইল কিবা শুন সর্ব্বজনা ॥

অল্পদিন মধ্যে রাজকন্যার ভাবান্তর ঘটিল। ক্রমে সখিগণের সহ মনান্তরও ঘটিতে লাগিল।

যেই সখীগণ ছিল নয়নের তারা।
তারাই হইল তবে দারুণ পাহারা ॥

রাজকন্যা সর্ব্বদা একাকিনী থাকিতে ভালবাসে, সখীদের কথায় বড় একটা উত্তর দেয় না। কাছে আসিলে উঠিয়া যায়—বড় গরম—বড় অসহ্য। এদিকে সহচরীগণ- আবের পাখা লইয়া দেয় শ্রীঅঙ্গে বাতাস।

ততই কন্যার মুখে বাড়ে হা হুতাশ ॥

রাজকন্যা ফুল তুলিতে যায়, তাও একাকিনী।

সঙ্গে যেতে সখীগণে কন্যা করে মানা।
পুষ্প নাহি তুলে কন্যা থাকে অন্য মনা ॥
গুণ গুণ সুরে কন্যা সদা গায় গান।
কি হল নূতন রোগ লোকের অজান ॥
কোকিল কোকিলা করে পঞ্চমের ধ্বনী।
লতার আড়ালে থাকি সিউরে সিমন্তিনী ॥
নয়নের জল কন্যা অঞ্চল ধরি মুছে।
কি জানি মনের কথা জানে কেহ পাছে ॥
দিনে যথা কুমুদিনী চান্দের বিহনে।
সেই মত দহে কন্যা মনের আগুনে ॥
দিবস না যায় কন্যার নাঁহি আসে রাতি।
কবি কঙ্ক কহে এহি নূতন পিরীতি ॥

উদাস নয়ন, চঞ্চল দৃষ্টি, অকারণ ভ্রমণ, অকারণ গমন, অকারণ হাসি কান্না, সর্ব্বদা অন্যমনক ভাব; অভাবশূন্য

দুঃখ—রোগ শোকহীন বা হুতাশ—এই সব ভাবান্তর সখীগণ পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। আরও লক্ষ্য করিতেছিল—"প্রভাতের আলো যেন আগুনের কণা। দিবা দ্বিপ্রহরে বাড়ে বিরহ বেদনা॥" "ক্রমে ক্রমে হয় যবে অপরাহ্ন বেলা। পুষ্প তুলিয়া কন্যা গাঁথে দিব্য মালা॥" অপরাহ্ন বেলা সেই উৎকণ্ঠিতা অভি-সারিকা ফুল তুলিয়া নির্জ্জনে একাকিনী বসিয়া মালা গাঁথে।

আবার—রজনী আসিলে কন্যা আনন্দিত মন।
দিব্য বস্ত্র পড়ে যত দিব্য আভরণ॥
বাটা ভরি সাজাইয়া রাখে খাচী পান।
এসব না রহে কিন্তু সবার অজান॥

বিদ্যা যতই গোপনে এ সব কার্য্য করেন, সহচরী-গণের তাহা অজানিত রহিল না। সে আপন মানসিক চাঞ্চল্যের উপর যতই আবরণ দিতেছিল, সখীগণের মনে ততই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল।

একদিন সখীগণ ... চায়
... ... চিহ্ন অঙ্গে দেখা যায়॥
অধরে ... প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত শয্যার পুষ্প সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকে। সন্দেহ অপনোদন মানসে একদিন সহচরীগণ মন্দিরের দ্বারে সিন্দুর ছড়াইয়া রাখিল, পরদিন তাহাতে প্রকৃতই তাহারা পুরুষের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিল। তারপর একদিন মধ্যরাত্রে গবাক্ষের ছিদ্রপথে স্পষ্টই দেখিল—

বিদ্যার কোলেতে শুয়ে সুন্দর নাগর
দুইজনে আলিঙ্গন শয্যার উপর॥
রতির সহিত কিবা শয়নে মদন।
সত্যভামা সহ কিম্বা কৃষ্ণের মিলন॥
জল ছাড়ি ভুতলে কুটায় অরবিন্দ।
চান্দের কোলেতে যেন ঘুমাইছে চান্দ॥

সুকোমল পুষ্প শয্যার উপর সেই আলিঙ্গনবদ্ধ যুগল মূর্ত্তি যেন চাঁদের কোলে চাঁদ ঘুমাইতেছে।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

---

# হস্তী পোষণ প্রণালী।

স্থলচর পশুদিগের মধ্যে হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা চতুষ্পদ। ইহাদের সম্মুখ ভাগে বিলম্বিত মাংস খণ্ডকে শুণ্ড বলে। এই শুণ্ড দ্বারা ইহাদের হস্ত ও নাসিকার কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কতকাল যাবৎ ইহারা মনুষ্য প্রয়োজন সাধনে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। গজায়ুর্ব্বেদ কর্ত্তা বলেন, রাজা দশরথের সময় হইতেই হস্তী মনুষ্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে যখন হস্তীর ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়, তখন যে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ মনুষ্য প্রয়োজন সাধন জন্য হস্তী ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হস্তী তৃণ ভোজী ও নির্ম্মল জল পায়ী জীব। ইহারা অত্যন্ত স্বজন প্রিয় ও ভীত প্রকৃতির। অন্যান্য পশু যেমন স্বার্থ সিদ্ধির আশা বিরহিত হইলেই অর্থাৎ মাতৃস্তন্য পান ইত্যাদি রহিত হইলেই মাতা ও সন্তান উভয়ই তাহাদের সম্বন্ধ ভুলিয়া যায়, হস্তীর সেরূপ নহে। দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত হাতীর পরস্পর আত্মীয়তা চিহ্ন অক্ষুণ্ণ থাকিতে দেখা গিয়াছে। ইহারা যেমন স্বজন প্রিয় তেমনি, ইহাদের জিঘাংসা বৃত্তিও প্রবল। একবার বৈরভাব জন্মিলে তাহা জীবনেও ভুলিয়া যায় না। সুযোগ পাইলেই শত্রুতা সাধন করিয়া লয়।

পর্ব্বতের গভীর অরণ্য প্রদেশেই ইহারা দলবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। এক দলের হস্তী সহসা অন্য দলে প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। হস্তীকে অনূ্যন শত বর্ষ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা যায়। অর-ণ্যাবস্থায় হস্তিনী প্রায় ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই সচরাচর গর্ভধারণ করিয়া থাকে। নর হস্তী প্রায় ২০ বৎসর বয়সেই যৌবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মস্তকের দুই দিকে দুইটী ছিদ্র থাকে। যৌবনের পূর্ণতা ও উত্তেজিতাবস্থায় ঐ দুইটী ছিদ্র দ্বারা দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকে মদস্রাব বলে। এই মদ নিঃসরণ সময়ে নরহস্তী গুলি অত্যন্ত অবাধ্য ও উত্তেজিত হইয়া থাকে। এই উত্তেজিত অবস্থায় নরহস্তী দিগের সদম

ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। এমন কি বন্য নরহস্তী গৃহপালিত হস্তিনীকে দেখিলে তাহার অনুসরণ করিয়া একেবারে লোকালয়েও আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ণ যৌবনাবস্থায় নর হস্তী গুলি প্রায় দলের সঙ্গ ছাড়িয়া দুই তিনটী মিলিয়া দলের অনতিদূরে বিচরণ করে। বন্য হস্তীর মধ্যে হস্তিনী প্রসূত হইলে করভ চলাচল ক্ষমতা লাভ না করা পর্য্যন্ত দলস্থ কোন হস্তীই স্থান ত্যাগ করিয়া যায় না।

অরণ্য হইতে নবধৃত হস্তীকে কি ভাবে লোকালয়ে আবদ্ধ করিয়া আনা হয় তাহা দেখিবার জিনিষ। প্রমত্ত বলশালী অতিকায় জন্তু কি কৌশলে মন্ত্র মুগ্ধের মত অবস্থিত থাকে, তাহার জন্য অশিক্ষিত মাহুত দিগকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

যে স্থানে হাতি বাঁধিয়া রাখা হয় প্রচলিত ভাষায় তাহাকে থান বলে। সর্ব্বদা একস্থানে রাখা সুবিধাজনক হয় না বলিয়াই সময় সময় থানের স্থান, ঘাস ও জলের সুবিধা বুঝিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। থানটী উচ্চ ভূমিতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। "থান" পাকা অর্থাৎ ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইলেই সুবিধাজনক। কিন্তু সময় সময় স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া কাষ্ঠাদি দ্বারা স্থান নির্ম্মাণ করাই সঙ্গত। বিশেষতঃ বর্ষাকালে "থান" সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হইলে নানা প্রকার পাদ পীড়ায় হাতিকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। "থান" দক্ষিণাভিমুখী হওয়া আবশ্যক। কারণ হাতির চক্ষু অতি কোমল; অধিক সূর্য্যোত্তাপ লাগিলে সহজেই চক্ষুরোগ জন্মে এবং অবশেষে অন্ধ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

নবধৃত হস্তীকে প্রচুর ও পরিষ্কার জলাশয় যুক্ত বৃক্ষ বহুল ও প্রচুর ঘাস তৃণাদি সুরক্ষিত নির্জ্জন স্থানে আনিয়াই তাহার গলবন্ধন রজ্জু তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিয়া পশ্চাতের পদদ্বয় কোন বড় বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিয়া সম্মুখের পদদ্বয়েও ঐরূপ অনতি দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা সম্মুখদিকে বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নবধৃত হস্তীগুলি হঠাৎ লোকালয়ে আসিলে একান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। অধিকাংশ সময়েই নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত নিবারণ জন্য বিশেষ সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন। নিদ্রার স্থানটী নির্জ্জন হওয়া চাই সেই স্থানে খড় ইত্যাদি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেও যদি সুনিদ্রা না আসে, তবে মদ আফিং ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়াও সুনিদ্রার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। হস্তী নিদ্রা না গেলে প্রায় নানা প্রকার দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। সদ্য ধৃত হাতী অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেও নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে তাহাকে পোষ মানাইবার চেষ্টা করিতে হয়।

যে স্থানে হাতীকে পোষ মানাইতে হয় সে স্থান বেশী বৃক্ষচ্ছায়া সমন্বিত নির্জ্জন, প্রচুর ঘাস ও জলের সুবিধাযুক্ত হওয়া চাই। কারণ যে হাতীকে বশে আনিতে হয় ১০ [illegible] হাতীর প্রকৃতি বিবেচনায় [illegible] পর্য্যন্ত ঘাস ও জলের সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাকে একই স্থানে রাখিতে হয়।

নবধৃত হস্তীকে কতকগুলি রজ্জু দ্বারা সমস্ত শরীর ঘেরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয় ঐ সংযুক্ত রজ্জুকে "ভামান" বলে। ঐ রজ্জু ব্যবহারের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল প্রথম প্রথম মাহুত হাতীর উপর উঠিলেই যখন কৌশলে হাতী তাহাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে তখন ঐ রজ্জু ধারণ করিয়া সে আত্মরক্ষার সুবিধা পায়। ঐ ভামান পরিহিত হাতীকে কাছে [illegible] কৌশলে লম্বা বাঁশ দিয়া দূর হইতে সমস্ত অঙ্গ [illegible] ঘর্ষণ করিয়া তাহার সুড়সুড়ী দূর করিতে হয় এবং ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হওয়ার চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ ক্রমশঃ অভ্যাসে যতই সুড়সুড়ী কমিয়া আসে এবং হিংস্র ভাবের লাঘব হয়, ততই নিকটে যাইতে হইবে এবং হস্তীর অঙ্গে হস্ত ও খড় দ্বারা সমস্ত শরীর ঘর্ষণ করিতে হইবে। এই সময়ে বিশেষ গোলমাল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ইত্যাদি করিলে হাতী মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় বশীভূত হইয়া পড়ে। তখন মাহুতের ভীতি ও অসুবিধার হাত হইতে আপনাকে অনেকটা রক্ষা করিতে পারে। এই সময় হাতীর সম্মুখ ভাগে একটা লৌহ নির্ম্মিত অঙ্কুশ প্রোথিত করিয়া হস্তীকে দুষ্ট কার্য্যের শাসন জন্য একটী লোক সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখিতে হয়। বস্তুতঃ প্রীতি প্রদর্শন ও কুকার্য্যে শাসন করাই হস্তীকে

মনুষ্যের বশীভূত করার একমাত্র পথ। প্রীতির এমনই মোহিনী শক্তি যে হিংস্রজন্তুও যখন মনুষ্যকে হিংসা শূন্য বলিয়া মনে করে তখন হিংসা করিতে ইচ্ছা করেনা। আর্য্য ঋষিদের অহিংসা মূলক ধর্ম্ম আচরিত তপোবনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

হস্তীর ভীতি ভাব দূর হইলে একটী বস্ত্র নির্ম্মিত পুতুল প্রস্তুত করিয়া দুই দিকে রজ্জু লাগাইয়া একদিক হইতে অপর দিকে তাহা টানিয়া লইতে হয়। যখন এই ভাবে হস্তী স্থির হইয়া থাকে, তখন ক্রমে অতি সাবধানে মাহুত যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। যখন হাতী বেশ সুস্থির হয় তখন তাহার কটীদেশে মাহুত চড়িয়া বসে এবং ক্রমে অগ্রসর হইয়া হইয়া একেবারে হাতীর স্কন্দদেশে গিয়া বসিতে আরম্ভ করে। এই সময় কতকগুলি চিক্কণ রজ্জু দ্বারা একটী মালার মত প্রস্তুত করিয়া হাতীর স্কন্ধে আবদ্ধ করিয়া ঐ রজ্জুর সাহায্যে দুইদিকে দুই পা দিয়া মাহুত উপবিষ্ট হইবে এবং দুই হাতে দুইটী বংশ শলাকা কর্ণের নিকট ধরিয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে কর্ণ পশ্চাৎভাগে সঙ্কুচন ও সম্মুখ দিকে বিস্তার করা অভ্যাস হইবে। হস্তী শুণ্ড ইত্যাদি দ্বারা মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে বল্লমদ্বারা সামান্য আঘাত করিয়া বশ্যতার ভাব বা অহিংসা ভাব দেখাইতে হয়, হস্তদ্বারা 'সাবাস' 'বেশ' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া মাহুত প্রীতি প্রদর্শন করিলে হাতীপ্রীত হয়।

মাহুত হস্তীর স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া গলবন্ধন রজ্জুর ('ভুলসীর') দুইদিকে দুই পা দিয়া একদিকে পা শিথিল ও অপরদিকে দৃঢ় করিয়া মস্তকে আঘাত করতঃ মুখে 'চয়' অর্থাৎ "ঘোর" এই শব্দ ব্যবহার করিলে হাতী মাথা ঘুরাইবে তখন মাহুত হাতে থাবা দিয়া প্রীতি চিহ্ন দেখাইবে। এইরূপে হস্তী দুই দিকেই যখন মাথা ঘুরাইতে আরম্ভ করে তখন দুই পদ দ্বারা সম্মুখ দিকে চলিবার জন্য সঙ্কেত করিতে হয় এবং কিছু অগ্রগমন ভাব দেখাইলেই কুম্ভদ্বয়ের মধ্যে বংশ শলাকা দ্বারা আঘাত করিয়া মুখে "দত্" (অর্থাৎ থাম) এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। এই কয়টী বোল অভ্যস্ত হইলে 'তামান' পরিহিত হস্তীর পৃষ্ঠদেশে কোন দাহক পদার্থ দ্বারা ক্ষত জন্মাইয়া ঐ হস্তীর গলায় লম্বা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া অন্য দুইটী পোষা হাতীর বক্ষস্থলে রজ্জু বাঁধিয়া একত্র বন্ধন করতঃ নদীর জলে শরীরের কিয়দংশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া মাহুতের হস্তস্থিত বংশ শলাকা দ্বারা ক্ষতস্থানে চাপ দিয়া রাখিয়া মুখে "বট বট" শব্দ করিতে হইবে। অনেকদিন স্নান না করাতে এবং ক্ষতস্থানে কষ্ট অনুভব করায় হাতী তখন অল্পে অল্পে বসিয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে অভ্যাস করাইয়া ধীরে ধীরে অল্প জলে, পরে নদীর তীরে, তৎপর বন্ধন স্থলে অর্থাৎ "থানে" আনিয়া বসান শিখাইতে হয়।

এইরূপ উঠা, বসা ও ঘোরা থামা ইত্যাদি বিষয় কতক অভ্যস্ত হইলে তৎপর পোষা হাতীর সহিত বাঁধিয়া ময়দানে দিতে হয় এবং মাহুত স্কন্ধদেশে থাকা সময় অনেক লোক গোলমাল করিয়া হস্তীর পশ্চাতে খুব জোরে পাদক্ষেপ করিতে হয়। এই সময় মাহুত 'সাবাস' 'থাম' ইত্যাদি শব্দ বিষদভাবে বুঝাইতে অভ্যাস করিবে। এইরূপ অভ্যাস হইলে পরে হাতীর কোমরের বন্ধন ছাড়িয়া দিতে হয়। পরে একদিকে ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে হস্তী আর কোন প্রকার দুষ্ট ভাব প্রদর্শন করেনা। তখন দুই দিকের বন্ধন খুলিয়া কিছুকাল পোষা হাতীর সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হয়।

এদেশে সাধারণতঃ ফাঁস, পরতালা, ও কোট, এই তিন উপায়ে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। একটী হস্তীর কোমরে বড় রজ্জু বাঁধিয়া ফাঁস প্রস্তুত করিয়া বন্য হাতীর পালের মধ্যে পোষা হাতী নিয়া পোষা হাতী অপেক্ষা ছোট বন্য হাতীর গলায় ঐ ফাঁস ফেলিয়া দেয়। ইহাকে 'ফাঁসী" শিকার বলে।

আর যখন খোলা ময়দানে নর হস্তী কামোন্মত্ত হইয়া পোষা হস্তিনীর নিকট আসে অথবা কোটে ধরা পড়িলে মাতা অথবা আত্মীয় হস্তী তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়ায় তখন ঐ হাতীরে পশ্চাৎ পদে বাঁধিয়া ফেলা হয়; ইহাকে "পরতালা" বলে। কাষ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা খোয়ারের মত ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাড়াইয়া ঐ খোয়াড়ে প্রবিষ্ট করাইয়া পূর্ব্বোক্ত পরতালার মত বাঁধিয়া ফেলাকেই "কোট" বলে।

শ্রীশিবকৃষ্ণ সিংহ।

# গোবিন্দ প্রসঙ্গে।

(২)

ময়মনসিংহ নগরের প্রথম যুগে সুরাধুনীর ধারা কিরূপ খরতর ছিল, তাহা বিশদরূপে বলিবার উপায় নাই। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই নগরে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে সুরাপান প্রবৃত্তি প্রবল ছিল, তাহার নিদর্শন আছে। 'বিজ্ঞাপনী' পত্রে "হুষ্টচন্দ্রের বৈঠকখানায় অনৈক্য নাথের অদ্ভুত জুতা খাওয়া" প্রবন্ধ উহা প্রমাণ করিতেছে। সেই সময়ে এক রজনীতে এরূপ হইয়াছিল যে নগরের পাহারাওয়ালা তখন রোঁদে বাহির হইয়া চিৎকার করিতেছে ঐ সময়ে একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি মদ খাইয়া টলিতে টলিতে যাইতেছিলেন; পাহারাওয়ালার ধ্বনী শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, সে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতে পারে, এই ভয়ে তিনি নরদমায় চতুষ্পদের মত হইয়া চলিতে লাগিলেন। পাহারাওয়ালা হাঁকিল—"ও কোন্ হ্যায়?" বাবু বলিলেন—"হাম গো হ্যায়, হামকো মৎ পাকুর।" পাহারাওয়ালার তিনি পরিচিত ছিলেন, সে তাঁহাকে বাসায় পঁহুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শিক্ষিত মাতালগণের দৌরাত্ম্যে তখন বহু সময়ে শান্তিভঙ্গ ঘটিত। বিজ্ঞাপনীর উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর সুরার স্রোত একটু থামিয়াছিল। কিন্তু উহা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮৮১-৮২ সালের কথা স্মরণ হইতেছে। ঐ সময়ে পানদোষ শিক্ষিত সমাজে পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। জেলা স্কুলের ছাত্রগণ এক "সুরাপান নিবারিণী" সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা জীবনে সুরা স্পর্শ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তি দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতেন। তৎকালের প্রসিদ্ধ উকীল ৺সতীশচন্দ্র রায় (ডি, এল) এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া মদ্যপানের অপকারিতা বুঝাইয়া দেন।

কিন্তু উহাতেও লোকের তেমন চৈতন্য হইল না। এই সময়ে কবি গোবিন্দ দাস এখানে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র সভার বার্ষিক উৎসব সময়ে তাঁহারা কবিকে অনুরোধ করিয়া একখানা ক্ষুদ্র নাটিকা লিখাইয়া লন এবং উৎসব ক্ষেত্রে তাহা অভিনয় করেন। ঐ নাটিকার নাম ছিল "সুরাসুর বধ"। মদের একটী পিপা সম্মুখে রাখিয়া যখন একটী বালক দীপ্ত স্বরে বলিতে লাগিল—

"কি বলিলে রাক্ষসীযে শুনিলে ত ভাই,
খাইয়া বুকের রক্ত আশা মিটে নাই!"

পলকে একটী অভিনেতা দৌড়িয়া আসিয়া—

"মার লাথি, ভাঙ্গ পিপা, দূর কর দেশের বালাই"

বলিতে বলিতে যখন পিপা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল, তখন দর্শকমণ্ডলী এবং সুরাপান বিরোধিগণ অনেকে উচ্চ করতালি দিয়া উঠিলেন। শিক্ষিত চিহ্নিত কতিপয় সুরাপায়ী সেইখানে উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের মুখে কালিমা পড়িয়াছিল, দেখিয়া অনেকেই বেশ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। ঐ অভিনয়ের পরে গোবিন্দ কবির রচিত "সুরাপানকরেরে ভাই গেল দেশ ছারেখারে" করিয়া দর্শকমণ্ডলী মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে তাহা শ্রবণ এই সঙ্গীতটী এইরূপ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

গোবিন্দ দাস নিজে সংযমী ছিলেন। তাঁহাকে আমরা কখন তামাক ব্যবহার করিতে দেখি নাই। আত্ম জীবনের দৃষ্টান্তে এবং কবিতার কষাঘাতে বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি বহু লোকের চৈতন্য বজায় রাখিয়াছিলেন। ইহার বহুদিন পরে উচ্চ স্তরে আবার সুরার ঢেউ খেলিয়াছিল; তাহার পর তাঁহাদের এস্থান পরিত্যাগে সে স্থান অধিকার করিবার জন্য আর কেহ থাকিল না; দেশেও ঘোর দারিদ্র্য উপস্থিত হইল। নানা কারণে ময়মনসিংহে এখন আর শিক্ষিত সমাজে সুরা স্রোত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোবিন্দ দাস বিলাসিতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সর্ব্বশেষ যখন আমাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, তখন তিনি দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি—ছিঁড়া সার্ট, ছিঁড়া জুতা, ছিঁড়া কাপড়, চখের চসমা কাণের সঙ্গে বেড়া বান্ধা তার দ্বারা সংলগ্ন—সে কি শোচনীয় অবস্থা!

যে কালে তাঁহাকে আমরা প্রথম দেখিয়াছিলাম,

সে কালে বঙ্গ সমাজে বিলাসিতার শিকর গজায় নাই। সুতরাং জেকেট আস্তিনের পিড়ান গায়ে ও চটি জুতা পায়েই তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর চটির স্থলে "হাড়ি খাঁ" তাঁহার পায়ে দেখিয়াছি—যোজা তাঁহাকে ভুলেও পায় দিতে দেখি নাই।

১৩০৮ সালে আমরা "আরতি"কে সচিত্র পত্রিকা করিতে মনস্থ করিলে গোবিন্দ বাবু তাহার বিরোধী হন। তিনি কোন জিনিষেরই চটকদারী অনুমোদন করিতেন না। তাঁহার নিজের পুস্তকগুলিও এইজন্যই সাধারণ ছাপায় এবং সেকেলে ডিমাই আকারেই রহিয়া গিয়াছে।

"সৌরভের" বিলাসিতা সূচক নামটীও তাঁহার আপত্তির কারণ হইয়াছিল। যে কারণে আমরা সে নাম রাখিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তিনি আর প্রতিবাদ করেন নাই সত্য কিন্তু সৌরভের প্রচার সম্বন্ধে তিনি কবিতায় যে পত্র আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় সৌরভের পাঠকগণ ভুলিয়া যান নাই। "সৌরভে ডুবিল বঙ্গ, আবার সৌরভ" কবিতাটী ১৩২৪ সনের বৈশাখের সৌরভে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৮ সালে ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতিতে পঠিত "মৃত মৃত্তিকার মূর্ত্তি কেন পূজ আর" কবিতা প্রসঙ্গে দলাদলির সৃষ্টি হইলে, পর বৎসর সারস্বতগণ একটী বালককে নানা বেশ ভূষায় সরস্বতী সাজাইয়া তৎসম্মুখে গোবিন্দ কবির কবিতা পাঠ করিবার ব্যবস্থা করেন; দাস কবি সারস্বতগণের এই কল্পনা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন ইতঃপূর্ব্বে তাহা আর কোথায়ও প্রকাশিত না হওয়ায় এখানে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। বিলাসিতা যে ভারতের অস্থি মজ্জা শোষণ করিয়া তাহাকে দারিদ্র্যের বিকট কঙ্কালে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে, তাহা তাঁহার এই কবিতাটীতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। দেবী সরস্বতীকে উপলক্ষ করিয়া কবি আমাদিগের বীভৎস রুচির দোষ দিয়াছেন—এই বিলাস সাগরে সন্তরণ করিতে যাইয়া আমরা যে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি—বিলাসীতার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া যে একেবারে অধঃপাতে ডুবিয়া যাইতেছি, কবি তাহা প্রদীপ্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কবি যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন—মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের সহিত তাহার শেষ কথা—"বিলাসিতা আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।"

---

# গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত কবিতা।

## ৬ষ্ঠ বৎসর।

## সারস্বত উৎসব।

( ময়মনসিংহ—১২৮৯—১লা ফাল্গুন )

দেবি!
এমনি একাগ্রচিত্ত, এমনি কুসুমে নিত্য—
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্তে সুন্দর!
এমনি বরষকত, আসে যায় অবিরত
কালের তরঙ্গ মিশে তরঙ্গ উপর!
দুরাকাঙ্ক্ষা—দুরাশায়, চিরদগ্ধ চিত্তহায়,
এমনি অতৃপ্ত আশা অতৃপ্ত অন্তর!—
এমনি ভারতবাসী, নিত্য অশ্রুজলে ভাসি
অর্পিছে অঞ্জলি শীত ও চরণ পর,—
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্তে সুন্দর। (১)

দেবি!
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্ত তিথিতে,
তুমিও এমনি সাজে, আসগো ভারতমাঝে
এপতিত ভারতেরে আস দেখা দিতে।
কোলে বীণা ছিন্নতার, বাজেনা দীপক আর
গরজেনা মেঘে মেঘ হিমাদ্রি কটিতে!
সঞ্জীবনী শক্তিহীন, ও বীণা অনেকদিন
আসগো ভারতে সেই বীণা বাজাইতে।
বিফলে তোমারে দেবি! এত যত্নে নিত্য সেবি
পারনা অমরবল মৃতদেহে দিতে!
বিফলে ভারতে আস বীণা বাজাইতে। (২)

দেবি!
কিকাজে তোমারে পূজি? বিফল কেবল!
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা— ফেলে দেও ভাঙ্গা বীণা
ত্যজ বিলাসিনী বেশ—ভূষণ কমল।
একেই ভারত হায়, নিত্য অধঃপাতে যায়,
নিপাতে বিলাস শিক্ষা আরো হলাহল,
বসন্ত কুসুম ধরে, তোমার আরতি করে
আগমন পথে ঢেলে নবফুল দল!
শ্যামা কোকিলার গানে রাগিণী ললিত তানে
তেমনি বিলাস বিষ ঢালিছে তরল!
নিপাতে বিলাস শিক্ষা তীব্র হলাহল। (৩)

দেবি!
এবেশে এদগ্ধ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
আমরা মরিলে বাঁচি, বাঁচিয়া মরিয়া আছি,
ভারতে জনম শুধু মরণ কারণ,
শোকে, দুঃখে হাহাকার, ফেলিনিত্য অশ্রুধার
মুহূর্ত্তের তরে শান্ত নহে প্রাণ মন,
যন্ত্রনার একশেষ—এত কষ্ট এত ক্লেশ
এখানে বিলাস বেশ? নাহি প্রয়োজন,
ভারত নয়ন জলে ভাসিছে এখন! (৪)

দেবি!
যাও সে সৌভাগ্যশালী যাও সেই দেশে.
যথা নর প্রতিভায়, মহিমা মণ্ডিত কায়
অকুতো সাহসে ধায় উন্নতি উদ্দেশে,
অটুট অমিতবলে, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া চলে
নক্ষত্র ছিঁড়িছে নখে যথা বীর বেশে,
তেজ বায়ু পঞ্চভূত, যাদের আজ্ঞার দূত
আতঙ্কে বাসুকী কাঁপে যাদের আদেশে,
স্বাধীনা অঙ্গনা কুল, স্বর্ণ পারিজাত ফুল
পবিত্র সুগন্ধে দিক্ পুরিছে যে দেশে,
যাও সে সৌভাগ্যশালী—আমেরিকা দেশে। (৫)

যাও দেবি রুষিয়ায়, কেবলে অসভ্য তায়—
অর্দ্ধেক পৃথিবী প্রায় তাহারি গরাসে!
নববলে বলীয়ান্ ইটালি স্বাধীন প্রাণ
যাও সে বীরের স্থান এথেন্স গিরিশে!
ফ্রেন্স স্পেন, পর্টুগাল, বীরজাতি চিরকাল
যাও সেই শ্বেতদ্বীপ, সাগরে রজত টীপ—
তোমারি মতন শ্বেত ললনা সে-দেশে,
যাও বিলাসিনী বেশে- যাও সে বৃটিশে। (৬)

যাও দেবী বীণাপাণি, যাওগো সেখানে.
এমূর্ত্তি রজত রবি, আদরে বন্দিবে কবি
দ্রবিয়া বরফ রাশি মোহময় গানে.
প্রতি দুর্গ শিরে শিরে. মোহিত বৃটিশ বীরে—
রাখিবে ক্ষণেক অসি সম্বরি নিধানে,
শ্বেতাঙ্গী ললনা কুল, ভিক্টোরিয়া পদ্মফুল
অর্পিবে চরণে তব প্রমোদ উদ্যানে,
বিলাসে বৃটিশ বালা মোহময় প্রাণে! (৭)

যাও—
এবেশে এদগ্ধরাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
বুঝেছি তোমারে দেবি, যদি কোটি যুগ সেবি
এ মূর্ত্তি হইতে আশা হবেনা পুরণ,
যে গভীর উচ্চ আশা, মৃতপ্রাণে যে পিপাসা—
এ মূর্ত্তি পূজিয়া পূর্ণ হবেনা সে পণ. —
যে উত্তম শবদেহে, মিশে আছে মেদে স্নেহে—
এতেজ হইতে তাহা হবেনা স্ফুরণ!
শুষ্ক রক্তে শিরে শিরে, যে শকতি এশরীরে
এভাঙ্গা বীণায় তার হবেনা বোধন,
যাও—এবিলাস বেশে নাহি প্রয়োজন! (৮)

কিংবা দেবি!
একান্ত ভারত যদি না পার ত্যজিতে,
ভারতের লাগি যদি কাঁদেগো অন্তর,
তবেও কুসুমহার, ও কুসুম অলঙ্কার
কিরীট কুসুম ময়—শিরে মনোহর,—
বিনোদ বিনান বেণী, শোভিত কুসুম শ্রেণী
রচিত হয়েছে যাহা যতনে বিস্তর!
বিলাসের বেশগুলি, যত আছে ফেল খুলি

দূরকর পর্য্যুসিত কুসুমের থর,
জীবনী শক্তিহীনা, দূরকর ভাঙ্গাবীণা
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার সহস্র বৎসর,
ত্যজ ও বিলাস বেস—কুসুমের থর! (৯)

এস আজ অনুমত, পরিয়ে ভূষণ যত—
সাজাইয়া আপনার দেব কলেবর,
নক্ষত্র মুকুতা হার, এস পরি একবার
বিমল বিনোদ বক্ষে শোভিবে সুন্দর!
শিরে নীলানন্ত ব্যোম, পদতলে সূর্য্য সোম
বসিও বিমানগামী ব্যোমযান পর.
এ'সো এলাইয়ে চুল, পরিয়ে উল্কারফুল
অঞ্চলে উড়িবে শত শ্বেত জলধর;
তেজ বায়ু ক্ষিতি জল, একহাতে ভূতদল—
দিও দেবী অন্য হাতে সঞ্জীবনী বর—
আসিও যেরূপে দেবে, ত্রিদিবে তোমারে সেবে
জ্ঞানময়ী মহামূর্ত্তি—দেব পুরন্দর
আসিও যেরূপে পূজে ত্রিদিবে অমর!

* * * *
* * * *

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

---

# সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

## দশম পরিচ্ছেদ।

পিরামিডের নাম অবশ্য আজকাল স্কুলের ছেলেরা পর্য্যন্ত জানে। মিশরে আসিয়া যিনি পিরামিড না দেখেন, তাঁহার মিশর দেখা না দেখা সমান। এই জন্য আমি ও রবি একদিন বেলা নয়টার সময় আহারাদি করিয়া গিজের পিরামিড দেখিতে বাহির হইলাম।

গিজে কয়রো হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে। যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী, গোযান, উট ও গাধা সচরাচর পাওয়া যায়। আমরা ৮ টাকা ভাড়ায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী সংগ্রহ করিয়াছিলাম। রাস্তা কিন্তু অতি ভীষণ। কয়রো হইতে গিজে বৎসরে লক্ষাধিক লোক গমনাগমন করে। অথচ রাস্তার অবস্থা এই প্রকার! এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট যে দৃষ্টি দেন না কেন, তাঁহা বুঝিতে পারি না।

শুনিয়াছিলাম, পিরামিড জগতের সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে একটী কিন্তু প্রথম দর্শনে আমিত বড়ই হতাশ হইলাম। প্রথম যখন আগ্রায় তাজ দর্শন করি, তখনও ঠিক এই ভাব হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাজের সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া অনুভব করিতে শিখিয়াছিলাম। যাঁহারা পিরামিডকে ভাল করিয়া বুঝিতে চান, তাঁহারা প্রত্যহ ঐ স্থানে গমন করেন। এইভাবে কয়রো গমনাগমন করিতে ২ ইহার সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়। আমাদের হাতে সময় ছিলনা বলিয়া পাঁচবার মাত্র গিয়াছিলাম। ঐ পাঁচদিনের পরিচয়েই আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমরা যদি আরও কয়েকদিন যাওয়া আসা করিতাম তাহা হইলে ইহাদের বিষয়ে পাঠককে হয়ত কয়েকটি ভালকথা বলিতে পারিতাম। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা পারিলাম পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ২৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই সকল পিরামিড অবস্থিত! নিকটে যে limestone পাহাড় আছে, পিরামিডের অধিকাংশ স্থান উহার প্রস্তরে প্রস্তুত। স্থান বিশেষে granite প্রস্তরও ব্যবহৃত হইয়াছে। সমস্ত পিরামিডগুলি একই প্রণালীতে নির্ম্মিত। একটির বর্ণনা করিলেসবগুলিই বুঝান হইবে।

ইহার ভিত্তি চতুষ্কোণ। ত্রিকোণাকার চারিটি দিক ক্রমে ২ সংকীর্ণ হইয়া উপরে এক বিন্দুতে যাইয়া শেষ হইয়াছে। এই চারিদিক এমন ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে যে প্রত্যেক দিক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর, দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া আছে। এই সমস্ত পিরামিড খ্রীষ্ট জন্মের ৩০০০—২৩০০ বৎসরের মধ্যে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল পিরামিডের বিষয়ে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া নানা প্রকার নূতন তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল কথার সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও এক বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। এখানে কেবল দুই চারিটি আবশ্যক বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

ইহাদের নির্ম্মাণের জন্য ৭০।৮০ ফুট দীর্ঘ প্রস্তর সকল ব্যবহৃত হইয়াছিল। কি উপায়ে যে ইহারা আনীত ও উপরে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। প্রাচীন জগতের লোক যে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তাহার জলন্ত নিদর্শন এই পিরামিড। গিজেতে সর্ব্বসমেত ৯টি পিরামিড আছে। ইহাদের মধ্যে কুফুর পিরামিড অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ঐতিহাসিক হেরোডোটসের মতে একলক্ষ লোক ২০ বৎসর যাবত দিবারাত্র কাজ করিয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়াছিল। এক সমচতুষ্কোণ চাতালের উপর ইহা দণ্ডায়মান। এই চাতালের প্রত্যেক দিককার লম্বাই ৭৫০ ফুট। ১৩একর জমির উপর এই চাতাল নির্ম্মিত। সমস্ত পিরামিডটির এখনকার উচ্চতা ৪৫১ ফুট। ব্যাপার যে কি প্রকার গুরুতর ইহা হইতেই পাঠকতাহার কতকটা আভাস পাইবেন।

চাতাল হইতে ৪৯ ফুট উপরে অনেকগুলি কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কক্ষে যাইবার পথ উত্তর দিকে খোলা। ইহার মধ্যে একটির নাম 'রাজার ঘর' ( King's Chamber )। ইহা ৩৪½ ফুট লম্বা, ১৭ ফুট চওড়া এবং ১৯ ফুট উচ্চ। অন্যান্য কক্ষগুলি ইহাপেক্ষা ছোট। দ্বিতীয় পিরামিডের চাতালের প্রত্যেক দিককার লম্বাই ৬৯০ ফুট এবং সমগ্র পিরামিডের উচ্চতা ৪৪৭ ফুট। তৃতীয়টির উচ্চতা মোটে ৩৫৪ ফুট। পাঠক হয়ত জানেন কলিকাতার মনুমেণ্টের উচ্চতা ১০০ ফুটের কিছু অধিক। ছয়টা মনুমেণ্ট ক্রমান্বয়ে উপরে উপরে রাখিলে যত উঁচু হয়, সর্ব্বোচ্চ পিরামিডের উচ্চতা তাহা পেক্ষাও অধিক উচ্চ। ইহা হইতে আপনারা এই পিরামিডগুলির উচ্চতা কতকটা অনুভব করিতে পারিবেন। অপর ছয়টির উচ্চতা প্রথম তিনটি অপেক্ষা অনেক কম।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে এই সকল পিরামিড প্রাচীন মিশর ভূপতিগণের কবরস্থান ও স্মৃতি চিহ্ন। আমরা প্রথম দুটি পিরামিডের উপর আরোহণ করিয়াছিলাম। ইহার জন্য সিঁড়ি আছে। তবে বড় উঁচু২। পিরামিড গুলি যে রাজাদের কবর স্থান, ইহা ২৫।২৬ বৎসর আগে কেহ জানিত না। লোকে ভাবিত এগুলা প্রাচীন কালের লোকদের একটা খাম খেয়ালির নিদর্শন।

উপর্য্যুক্ত সর্ব্বোচ্চ পিরামিডের প্রায় ৩৫০ গজ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে স্ফিঙ্কস্ অবস্থিত। পিরামিডের ন্যায় ইহাও জগতের এক আশ্চর্য্য জিনিসের মধ্যে পরিগণিত। ইহা নাকি পিরামিড অপেক্ষাও প্রাচীন। পণ্ডিতেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ইহা এক খণ্ড প্রস্তরে প্রস্তুত। এই বিশাল মূর্ত্তির উচ্চতা ১৮০ ফুট—অর্থাৎ মনুমেণ্ট অপেক্ষাও উচ্চ। স্ফিঙ্কসের ছবি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন বলিয়া এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলাম না। এক বিশাল প্রস্তর খণ্ডের উপর এক বিপুল মুণ্ড। ইহাই স্ফিঙ্কস্। এই মুণ্ডের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। কিছু দিন আগে এই মূর্ত্তির মস্তকের উপর এক প্রস্তরের টুপি ছিল। এখন ইহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চারিদিকে মরুভূমি বলিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী বালুকার আঘাতে মূর্ত্তির মুখ এখন কদাকার হইয়া গিয়াছে। নাকের চিহ্ন মাত্র নাই। কাণও প্রায় লোপ পাইয়াছে।

শুনিলাম সর্ব্বসমেত ৭০এর অধিক পিরামিড আছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি ইষ্টক ও অবশিষ্ট গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। গিজের দক্ষিণে সকারা পিরামিড স্তূপ। আমরা কিন্তু এসকল দেখি নাই। এই জন্য এই খানেই পাঠকগণকে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

কয়রোতে আমি মোটে ১৩ দিন ছিলাম। তাহার পর তিন মাসের অবসর লইয়া আমরা দুইজনে দেশে ফিরিয়া যাই। তিনমাস পরে রবি ও আমি পুনরায় আফ্রিকায় গমন করি। সে সব কথা—সময় পাইলে বারান্তরে বলিব।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

# প্রীতি-শোধ।

"ডাক্তার বাবু বাসায় আছেন?"

"কে ডাকছ হে?"

"আজ্ঞে আমি কাঁঠাল গ্রাম হইতে আসিয়াছি, সেখানকার মহিম আচার্য্যের স্ত্রীর কলেরা, আপনাকে নিতে আসিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া বাহিরে আসিবেন কি?"

তিনদিন ক্রমাগত তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ কলেরার 'কল'—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত দ্রুতপদে বাহিরে আসিলাম। লোকটি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিল। আমি বলিলাম, "মথুর বাবু, কালীবাবু এরা কি বল্লেন?" লোকটী বলিল, "আজ্ঞে খোঁজ করিয়া জানিলাম তাঁহারা মফস্বল 'কলে' গিয়াছেন।" এবার একটু বেশী গম্ভীরভাবে নাসাকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, "কলেরা কেস—দৈনিক ২৫৲ পঁচিশ টাকার কম বড় যাই না। তবে—"

"আজ্ঞে তাহাই দেওয়া যাইবে। অবস্থা গুরুতর, এখন টাকার দিকে চাহিলে চলিবে না। আপনাকে এই দশটার ট্রেণেই রওয়ানা হইতে হইবে।"

দৈনিক পঁচিশ টাকা, আমার পক্ষে যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। উৎসাহে আমার বুকের কলিজা লাফাইয়া উঠিল; অতি ব্যস্ত বাসার ভিতরে গিয়া ভাল কোট্‌ পেণ্ট্‌ পড়িয়া, আর এক সেট্‌ পোষাক ও আলষ্টার, ঔষধের বাক্স প্রভৃতি লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া গাঁটারী ও ঔষধের বাক্স তাহার হাতে দিয়া বলিলাম 'দাঁড়াও, একটা টাকা সঙ্গে নিয়া নিই, খালি হাতে ঘর হইতে যাব?"

"আজ্ঞে টাকা নিবেন কেন?" যাওয়ার খরচ আমার সঙ্গে আছে, আর ভগবানের ইচ্ছায় সেখানে গেলে টাকার জন্য ঠেকিবে না। চলুন, ষ্টেশনে আপনার জন্য বাবুদের বাড়ীর হাতী অপেক্ষা করিবে— আর দেরী করিবেন না।"

মাত্র এক বৎসর যাবৎ সহরে প্র্যাকটিস্‌ আরম্ভ করিয়াছি, পয়সার সঙ্গে সাক্ষাৎ খুব কমই হয়; তবে বাবা বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার হতভাগ্য পুত্রের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার সদ্ব্যয়ে জাঁকজমক করিতে ত্রুটী করিতাম না।"

ষ্টেশনে গিয়া লোকটী আমাকে একখানা মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া সে পার্শ্বের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসিল। অতি মাত্রায় অর্থচিন্তায় মগ্ন থাকায় এ লোকটীর নাম পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাই নাই।

যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। আমি পোষাকটা একটু ঝাড়িয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া পার্শ্বের গাড়ীর কাছে গিয়া দেখি, বহু লোক,—লোকটীর নাম জানা না থাকায় আমার বাক্স ও গাঁটারী নামাইবার জন্য "কাঁটালের মানুষ!" "ও কাঁটালেরমানুষ," "আরে—ও কাঁটালের মানুষ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম;—কোন উত্তর পাইলাম না—অস্ফুট স্বরে দু'একজন বিদ্রূপ করিল মাত্র। ঘণ্টা পড়িল—দৌড়িয়া নিজ হাতেই জিনিষপত্র নামাইয়া পুনরায় এদিক সেদিক হাঁটিয়া "কাঁটালের মানুষ" "কাঁটালের মানুষ" বলিয়া চেঁচাইলাম—প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল। একে একে টিকিট দিয়া সব লোক চলিয়া গেল, শূন্য প্লাটফরমে একা আমি। ষ্টেশন মাষ্টার বাবুকে টিকিটখানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, আমি ডাক্তার—কাঁঠাল মহিম আচার্য্যের বাড়ীতে কলেরা কেসের 'কলে' আসিয়াছি, যে লোক আমাকে আনিয়াছে, ট্রেণ হইতে নামিয়া আর তাহাকে পাই নাই, আমার পক্ষে এ সম্পূর্ণ নূতন স্থান, এখন করা কি? ষ্টেশন মাষ্টার স্বাভাবিক নীরস হাসিমুখে বলিলেন, "ঠিকই ত। লোকটা হয় ত পায়খানায় গিয়াছে।" আমি পায়খানার ধারে গিয়াও ডাকিলাম "ও কাঁঠালের মানুষ, পায়খানায় থাক ত সাড়া দেও।" কোন উত্তর নাই। ষ্টেশন ঘরের কাছে আসিয়া পায়চারি করিতে করিতে দুই এক জনকে 'কাঁঠাল গ্রাম' 'মহিম আচার্য্য', 'কলেরা কেস', 'হাতী পাঠান' প্রভৃতি নানা কথা বলিতেছি এমন সময় পেছন হইতে একটী লোক আমার হাতে একখানা বড় কার্ড দিয়া গেল, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল "You are an April fool'

দুঃখে লজ্জায় ও চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কি বেল্লিকের পাল্লায় পড়িয়াছি, একটা পয়সাও সঙ্গে আনি নাই, এখন যাই কি করিয়া। ট্রেণভাড়া তৃতীয় শ্রেণীতেও ৵৫ নয় পয়সা তাহাও সঙ্গে নাই।

বিষয়ের গোড়াতে যে ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন, তাহা ততক্ষণে বেশ বুঝা গেল। তিনি কাছে আসিয়া কপট গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, মহাশয় মুস্কিলে পড়িয়াছেন সন্দেহ নাই, তবে বাসা হইতে বে'র হওয়ার সময় আজকার তারিখটা মনে করা উচিত ছিল। যা হউক আমি একখানা টিকিট দিচ্ছি।

"বিসর্জ্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে"

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি বাসাঘরের বারান্দায় কালীবাবু, মথুরবাবু প্রভৃতি স্বব্যবসায়ী বন্ধুগণ বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই কালীবাবু বলিলেন, "কি ভাই রোগীর অবস্থা কেমন? দেখি দেখি পকেটটার অবস্থা।"

সকলে পরামর্শ করিয়াই আমাকে এমন অপদস্থ ও নাকাল করিয়াছেন। দুঃখে লজ্জায় বাসার ভিতর গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া শুইলাম, তাহারা অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিলাম না।

( ২ )

উপর্য্যুপরি দুর্ব্বিপাকের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ কি অবস্থায় পতিত হয়, আমার ডাক্তারী জীবন আলোচনা করিয়া তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। এই ঘটনার পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীহট্ট চা বাগানের ডাক্তারের পদ পাইয়া তথায় গেলাম। কতক দিন গেলে, আমার কাজ কর্ম্মে সাহেব বড় খুসী হইলেন। ক্রমে সেখানে আমার খুব প্রতিপত্তি হইল। ক্রমে আমি তথাকার বড় ডাক্তারই হইলাম। দেনার দায়ে পূর্ব্বেই পৈত্রিক বাটী বিক্রী করিয়া আসিয়াছিলাম। সুতরাং এখানে জমি কিনিয়া বাড়ীর বন্দোবস্ত করিতেছিলাম।

ক্রমে] তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। একদিন বিকালে ইজি চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, এমন সময় বন্ধুবর কালীবাবুর পত্র পাইলাম; তিনি লিখিয়াছেন "আমি গবর্ণমেণ্টের কাজ পাইয়া বোম্বে যাইতেছি, বেতন সম্প্রতি আড়াই শত টাকা, ফ্রি কোয়ার্টার। একজন সহকারী ডাক্তার লইয়া গেলে তাহার বেতনসম্প্রতি সোয়াশত টাকা এবং ফ্রি কোয়াটার দিবে। তুমিই আমার সহকারী হইতে পারিবে, বিবেচনায় পত্রলিখিলাম। যদি কোন আপত্তি থাকে, তবে পত্রপাঠ তারযোগে আমাকে জানাইবা। নচেৎ আগামী সোমবার ২টা ৩৫ মিনিটের সময় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে ৬নং ডাউন ট্রেণে আমার সঙ্গ লইবা। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি ১৯০৫ সন ১লা এপ্রিল।"

"তোমার কালী"

পত্র পড়িয়া ভাবনায় পড়িলাম। সাহেবের নিকট একমাসের ছুটী চাহিলাম, সাহেব অস্বীকার করিলেন; বেতন কর্ত্তনে দুই সপ্তাহের ছুটী চাহিলাম, তাহাও অগ্রাহ্য হইল, বন্ধুর পত্র, চাকুরীর লোভ, অগত্যা ইস্তিফাপত্র দাখিল করিয়া 'দুর্গা" বলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম,।

সোমবার। ব্যাণ্ডেল ষ্টেসনে জিনিষ পত্র লইয়া বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলাম। ৬নং ডাউন ট্রেণ প্ল্যাট্ফরমে আসিল, বহু যাত্রী নামিল। আমি কত খুঁজিলাম, 'কালীবাবু কালীবাবু করিয়া কত ডাকিলাম; প্রত্যেক গাড়ী পাতি পাতি করিয়া ও যখন পাইলাম না, তখন কত দুর্ভাবনা আসিয়া মাথায় প্রবেশ করিল; সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; মাথায় আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। হায়, হায়, বকাণ্ড প্রত্যাশীর সব গেল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। এখন কোথায় যাই; কোথায় কি করি, পৈত্রিক ভিটা বেচিয়াছি, চা বাগানের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছি, আবার কোন্ মুখে সাহেবের কাছে যাইব? নানা চিন্তার পর পরের ট্রেণেই কলিকাতা আসিয়া বিডন ষ্ট্রীটে বন্ধুবর জয়চন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

রাত্রি খাওয়া দাওয়ার পর তাহার কাছে সব কথা আগা গোড়া বলিলাম। কালী বাবুর চিঠি খানা ও তাহাকে দেখাইলাম। তিনি চিঠি খানা দেখিয়া হাস্য

করিয়া বলিলেন এযে ১লা এপ্রিলের চিঠি, তুমি কি তারিখটার কথাও একবার ভাবিলেনা ?

( ৩ )

জয়বাবুর guest হইয়া প্রায় ২ মাস মেসে কাটিলাম। পরে একটা প্রাইভেট টিউশন লইয়া ১ বৎসর কাটাইলাম। একদিন হিতবাদী পড়িতে পড়িতে "পাত্র চাই" বিজ্ঞাপন দেখিলাম। আমি অবিবাহিত ছিলাম, তাহাতে ইহাও লেখা ছিল যে পাত্র কুলীন কায়স্থ এবং ডাক্তারী ব্যবসায়ী হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। সেই দাবীই অগ্রগণ্য সুতরাং রাত্রি গোপনে সেই ঠিকানায় একখানা পত্র লিখিয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম।

সাতদিন পরে রাত্রে আহারাদির পর সকলে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় পিয়ন আসিয়া আমার হাতে এক খান আর্জেণ্ট টেলি দিয়া গেল, পড়িলাম, Come at once Joypur town Nirmmalabas. সকলেই যখন দেখিল, তখন আর না বলিয়া পারিলাম না।

সকলের বাধা ঠেলিয়াই সেই দিন রাত্রির ট্রেণে জয়পুর সহরে যাত্রা করিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে জয়পুর পৌছিয়া নির্ম্মলাবাস গিয়া উপস্থিত হইতেই একটী লোক একখানা কার্ড দিয়া গেল তাহাতে লেখা ছিল। You are an April fool.

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। চেতনা পাইলে দেখিলাম, প্রিয় বন্ধু কালী বাবু মাথায় গোলাপ জল দিতেছেন, তাহার স্ত্রী, নিকটে বসিয়া আছেন, আর ভগ্নী 'নির্ম্মল' আমাকে বাতাস করিতেছে,তখ ও কিছু ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি সুস্থ হইলে কালী বাবু তাঁহার জয়পুর সহরে আগমন, চাকুরীর অবস্থা প্রভৃতি সকল কথা বলিলেন। নির্ম্মলাবাস থাকিয়াই কালী বাবু তাহার ভগ্নী নির্ম্মলাকে আমার হাতে সমর্পন করিলেন। এই সময় তাঁহার এখানে আমি পৃথক ডিস্পেন্সারী খুলিতে চাহিলে তিনি নিষেধ করিলেন।

দুই বৎসর পরে তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এবং পঁচিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ নির্ম্মলাকে লিখিয়া দিয়া কিছু টাকা লইয়া সস্ত্রীক কাশী চলিয়া গেলেন।

৮ কাশী যাত্রার সময় বন্ধুবর বলিয়া গেলেন ভাই, শ্রীশ! শৈশব প্রীতির কিছু দিতে পারিলাম না। ভগ্নী নির্ম্মলাকেই তোমাকে আমার 'প্রীতি শোধ' দিলাম।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# প্রাচীন কাগজ।

আজকাল কাগজের এই দুর্ভিক্ষের বাজারে পুরাতন সংবাদপত্র অনেক উপকারে আইসে। 'ইহা শীতবস্ত্রের ন্যায় গায়ে দিবার কার্য্য করে। শয্যায় লেপের সহিত বড় বড় কাগজ পাতিয়া দিলে শীত নিবারিত হয়। ডাক্তার রিউ ডি বোরো বলেন—"কাগজের কোট ও লেপ বিশেষ শীতনিবারক। জাপানীগণ কাগজের কাপড় পরিধান করেন; কাগজে কোনও ফাঁক থাকে না; তাই বহির্বায়ু গাত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কোটের ভিতর একখণ্ড কাগজ রাখিয়া দিলে বুকে শীঘ্র হিম লাগে না ও শীঘ্র সর্দ্দি কাশি হয় না।" মেজর জেমস মর্লী আল্পস পর্ব্বত ভ্রমণকালে একটি বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম্ম—"যখন ভয়ঙ্কর শীতে আমার রক্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইল, আমার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, জীবনের আশায় হতাশ হইলাম, আমার বন্ধু কোনাগ আমাকে এক সুট পোষাক পরিতে দিলেন। ঐ পোষাক কাগজ নির্ম্মিত। সেই পোষাক পরিয়া ঈশ্বর কৃপায় সে যাত্রা সেই প্রাণঘাতী শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইলাম।"

পক্ষান্তরে কাগজ আবার উত্তম উত্তাপ নিবারক। ইহাদ্বারা বরফ জড়াইলে বরফ শীঘ্র গলে না; বরফ গলিত না হইয়া ১৩।১৪ ঘণ্টা ঠিক থাকিবে। ইহা বহুবার পরীক্ষা করা হইয়াছে। কোন কোন দরিদ্র ইংরাজ পুরুষ মোজার পরিবর্ত্তে পুরাতন সংবাদপত্র ব্যবহার করেন। বঙ্গদেশীয় ব্যবসায়ীগণ পুরাতন কাগজ দ্বারা মোজা প্রস্তুত করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। মৎস্য কাগজে জড়াইয়া রাখিলে শীঘ্র পঁচিয়া যায় না। প্রায় ১৭।১৮ ঘণ্টার বেশী সময় পর্য্যন্ত ঠিক থাকে। পুরাতন সংবাদপত্রে বেশ উত্তম পাপোষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বেহারে কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তির বাড়ীতে এইরূপ পাপোষ দেখিয়াছি। তুলার পরিবর্ত্তে কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া বালিশের খোলের মধ্যে দিলে, বেশ স্বাস্থ্যকর বালিশ হইতে পারে তুলার খরচ হইতে ও অব্যাহতি পাওয়া যায়।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

# সৌরভ

সপ্তম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২৬। | সপ্তম সংখ্যা।


## ঋগ্বেদে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও সূর্য্য।

বৈদিক ঋষিগণ মনে করিতেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সাতটী লোক বর্ত্তমান। সর্ব্বোচ্চ লোককে তাঁহারা পরম ব্যোম বলিতেন; তাহার নিম্নে তিন স্তরে তিনটী পিতৃ লোক অবস্থিত। এই তিনটী পিতৃ লোকের সর্ব্বোচ্চ স্তর ত্রিদিব, ত্রিনাক বা স্বর্লোক নামে অভিহিত হইত। ইহার নিম্নে দেব লোক ও তাহার নিম্নে যম লোক। রাত্রে যে নক্ষত্র লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যমলোক। সুকৃতি সম্পন্ন মানব মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করিয়া সুখে অবস্থান করেন। দিবসে আমরা এই লোক দেখিতে পাই না। তাহার কারণ বরুণ দেব সূর্য্য গমনের পথ করিয়া দিবার জন্য প্রতিদিন একটী আস্তরণ বিছাইয়া দেন। ইহাকে অন্তরিক্ষ নাম দেওয়া হইত। অন্তরিক্ষ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত স্থান রোদসী বা দ্যাব্যা-পৃথিবী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূমির নিম্নে অন্ধকার ময় স্থানকে গভীর পদ বলা হইত। পাপীগণ মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করে। দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্ধকার ময় এই গভীর পদ তিন মাতৃ লোক নামেও বিখ্যাত ছিল। অতএব এই তিন মাতৃ লোক, তাহার উপরে তিন পিতৃলোক এবং তাহারও উপরে পরম ব্যোম লইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গঠিত। পরম ব্যোম, স্বর্লোক ও দেবলোককে আমরা দেখিতে পাই না।

স্বর্লোকে ( বা স্বর্গ লোকে ) দেবলোকের রাজন্য আদিত্যগণ বাস করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ৮টী। বরুণ, ইন্দ্র, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ ও সূর্য্য তাঁহাদের নাম। বরুণ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও রাজা নামে অভিহিত হইতেন। বিষ্ণু স্বর্লোকস্থিত শ্রেষ্ঠ অগ্নি ও আদিত্য দিগের পুরোহিত। ইন্দ্র স্বর্লোকের সেনাপতি। আদিত্যদিগের মধ্যে ৭ জন অমর; কিন্তু ৮ম সূর্য্য জন্ম মৃত্যুর অধীন। ইহাঁরা অদিতির পুত্র বলিয়া আদিত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন।

দেবলোকের সৈন্যের নাম মরুৎগণ। তাঁহারা ইন্দ্রের অধীনে থাকিয়া দেব ও দেব-ভক্ত মানব দিগের শত্রুক্ষয়ে গমন করেন। দেব লোকের চিকিৎসক দুইজন। তাঁহারা অশ্বি দ্বয় নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহারা রুদ্র বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। রুদ্রদেব ভেষজের অধিপতি; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে মনুষ্য ও পশুগণ মৃত্যু মুখে পতিত হয়, ঋষিগণ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। মরুৎ গণ রুদ্র পুত্র বলিয়া অভিহিত হইতেন এবং দেব লোকের 'বিশ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব রুদ্র বংশীয়গণ দেব লোকের অধিবাসী ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

যমলোকে অগ্নিবংশীয় ঋষিগণ অবস্থান করেন। অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভৃগু, অথর্ব প্রভৃতি ঋষিগণ অগ্নি হইতে উৎপন্ন অঙ্গিরা বংশীয়। আকাশে যে সপ্তর্ষি মণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই প্রাচীন নবগ্ব অঙ্গিরা গণ। কৃত্তিকা নক্ষত্র পুঞ্জ দশগ্ব অঙ্গিরা গণ বলিয়া মনে করি। এই সকল ঋষি স্বর্গে দেবতা দিগের যজ্ঞ করিয়া থাকেন। অগ্নি ঐ সকল যজ্ঞে হোতার কার্য্য করেন।

রাজভ্রাতা সূর্য্য নিজে জন্ম মৃত্যুর অধীন বলিয়া তাঁহার বংশ পৃথিবীতে ও পিতৃ লোকে রাজত্ব করিবার অধিকারী হইয়াছে। যমকে বিবস্বান পুত্র বলা হয়।

তিনি পিতৃ-লোকের রাজা। মনুকে ও বিবস্বান বা সূর্য্যের পুত্র বলা হইত। সেই জন্ম মনু বংশীয়গণই পৃথিবীতে রাজ পদের অধিকারী। অঙ্গিরা বংশীয় গণ পৃথিবীতে ঋষি বা ব্রাহ্মণ বংশের আদি পুরুষ।

স্বর্গীয় সোম, দেব-লোকের খাদ্য—ইহাই অমৃত। চন্দ্রে স্বর্গীয় সোম উৎপন্ন হয়। ত্বষ্টাদেব তাহার রক্ষায় নিযুক্ত। তিনি ইন্দ্রের পান পাত্র ধারণ করেন এবং তাঁহাকে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনিই স্বর্গের বিশ্বকর্ম্মা। ঋষিগণ নিম্ন লিখিত রূপে চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করিতেন। এক পক্ষ ধরিয়া চন্দ্রস্থিত সোমলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহাই আমাদের নিকট চন্দ্রের বৃদ্ধি বলিয়া মনে হয়। শুক্লপক্ষে বর্দ্ধিত সোম শ্রেষ্ঠতা অনুসারে দেবতাদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহাই হ্রাসের কারণ। ইন্দ্র যুদ্ধের দেবতা বলিয়া সোমের শ্রেষ্ঠ অংশ প্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় সোমলতা হইতে শ্যেন পক্ষী শাখা আনয়ন করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া ছিল; তাহাতেই পার্থিব সোম উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যগণ যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগকে পার্থিব সোম রস প্রদান করিতেন। যে সকল আর্য্য দেবতাদিগকে যজ্ঞে সোম পান করাইতেন তাঁহারাই মৃত্যুর পর যমলোকে যাইতে পারিতেন। কিন্তু যাহারা এরূপ সুকৃতি করে নাই, তাহারা মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার লোকে গমন করিয়া নির্ঋতির অধীন হইত।

পৃথিবীর লোকের পাপ পুণ্য দেখিবার জন্ম আদিত্যগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যকে অন্তরিক্ষে উঠাইয়া দেন। এই সময়ে অগ্নিদেব দ্যাবা-পৃথিবী হইতে গমন করিয়া সূর্য্যরথে আরোহণ করেন। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে আকাশ রক্তবর্ণ হওয়া এবং পৃথিবীর অগ্নি ম্লান হওয়ার ইহাই কারণ মনে করা হইত। সূর্য্যের রথ এক চক্র বিশিষ্ট; সূর্য্যমণ্ডলই সেই চক্র। রথটীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ৭টী পীতবর্ণা অশ্বী এই রথ বহন করে। সেইজন্ম সূর্য্যের রথের অশ্বগণ হরিতাশ্ব বলিয়া বিখ্যাত।

দেবতাদিগের স্তব করা ও তাঁহাদিগকে সোম প্রভৃতি প্রদান করাই পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে আর্য্যগণ গাত্রোত্থান করতঃ অরণি ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতেন। তৎপরে উষাকে ও ঋতু বিশেষে অশ্বি দ্বয়কে স্তোত্র দ্বারা আহ্বান করিতেন। ইহার পর পূষার স্তব করা হইত। পূষার উদয়ে উষা ম্লান হইয়া যাইতেন। তখন সূর্য্য উদিত হইলে ঋষিগণ মন্ত্র, গীতি ও স্তব দ্বারা সূর্য্য ও অগ্নির অভ্যর্থনা করিতেন। সোম, ঘৃত প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহারা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। যজ্ঞকারী মানবগণ মৃত হইলে সূর্য্য নিজরথে তাঁহাদিগকে যম লোকে লইয়া যান, আর্য্যগণ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।

ঋগ্বেদের কালে মাসের নাম হয় নাই; কিন্তু ছয় ঋতুর নাম দেখিতে পাই। প্রত্যেক ঋতুতে ইন্দ্রাদি দেবগণের যজ্ঞ হইত। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ গতি দ্বারা ঋতুর উৎপত্তি হয় ইহা বৈদিক ঋষিগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৎসরে ১২টী মাস ও প্রত্যেক মাস ৩০ দিনে ধরিতেন। এইরূপ গণনায় কয়েক বৎসরের মধ্যে, যে ঋতু লইয়া বৎসর আরম্ভ হয় তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। এই দোষ নিবারণ জন্ম তাঁহারা প্রত্যেক ৫ বৎসরের শেষে একটী মাস ৫ম বৎসরের ত্রয়োদশ মাস রূপে গ্রহণ করিতেন। অতএব প্রত্যেক বৎসরে দুই দুই মাস ব্যাপী ছয়টী ঋতু এবং পঞ্চম বৎসরে এক মাস ব্যাপী একটী অধিক ঋতুর কল্পনা করিয়াছিলেন। ৭ জন আদিত্য কল্পনার বোধ হয় ইহাই কারণ।

সূর্য্য প্রাতঃকালে উদিত হইয়া সমস্ত দিবস দ্যাবা-পৃথিবী আলোকিত করেন। দিবসের শেষে তিনি স্বর্লোকে উঠিয়া যান এবং নামিয়া দ্যাবা-পৃথিবীতে অবস্থান করেন। এইরূপ মনে করিবার কারণ আমরা এই অনুমান করি যে সূর্য্যাস্তের কালেও আকাশ রক্তবর্ণ হয় এবং অগ্নি পৃথিবীতে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। বৈদিক যুগে অস্ত শব্দের অর্থ ছিল গৃহ। অতএব ঋষিগণ মনে করিতেন সন্ধ্যা হইলে সূর্য্য আপন গৃহে গমন করেন। সূর্য্য স্বর্লোকে গমন করিয়া পশ্চিম হইতেপূর্ব্ব দিকে আসেন। ঐতরের ব্রাহ্মণে

অস্ত ও উদয়ের আর এক প্রকার অর্থ করা হইয়াছে। ইহার মতে সূর্য্য সন্ধ্যা কালে আপন মুখ স্বর্গের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আসিতে থাকেন। সেই জন্য আকাশে নক্ষত্র মণ্ডল উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। প্রাতঃকালে সূর্য্য পুনরায় নিম্ন মুখী হন; অতএব পৃথিবী আলোকিত এবং উপরের লোক আঁধারে আবৃত হয়। তখন তিনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিতে থাকেন।

সূর্য্যকে মিত্র, বরুণের চক্ষু বলা হইত। কারণ সূর্য্যই লোকের পাপ পুণ্য দেখিবার জন্য প্রতি দিন তাঁহাদের দ্বারা প্রেরিত হন। আর্য্যগণ, সূর্য্য উদয় হইলে যজ্ঞ করিতেন। তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের সুকৃতি সূর্য্য অবগত হইয়া বরুণ ও মিত্রকে তাহার সংবাদ দিবেন। সূর্য্য রাজবংশীয় এবং অগ্নি তাঁহাদের পুরোহিত। যখনই রাজা বা রাজভ্রাতা কোথাও যাইতেন, তাঁহার সহিত পুরোহিত যাইতেন। পুরোহিত শব্দের অর্থ সম্মুখে অবস্থিত। অতএব রাজার অগ্রে পুরোহিতকে গমন করিতে হইত। সেই জন্য অগ্নিকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া সূর্য্য রাজ্য পরিদর্শনে প্রতিদিন গমন করেন।

সূর্য্য গ্রহণের এই কারণ মনে করা হইত যে, অসুর বংশীয় স্বর্ভাণু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে আসে। কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ ও মরুৎগণ আসিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করেন; তাহাতেই সূর্য্য তাহার কবল হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন।

পৃথিবীর নিম্নে যে নির্ঋতি লোক আছে, সেই স্থানে কৃষ্ণকায় দাস, দস্যু, ও বৃত্র প্রভৃতি আর্য্য শত্রুদিগের আদি পুরুষগণ অবস্থান করে। পণি নামক দেবদ্বেষীগণ ও তাহাদের দলপতি 'বল' পর্ব্বতে বাস করে। ইহারা মাঝে ২ দেবলোকে গমন করিয়া উপদ্রব করিত। সেইজন্য দেবলোকের অধিবাসীগণ সর্ব্বদা জাগরুক থাকিয়া স্বর্গ রাজ্য রক্ষা করিতেন। তাঁহাদের বংশধর পৃথিবীস্থ আর্য্যবংশীয়গণ পণি, দাস, দস্যু, বৃত্র প্রভৃতি পার্থিব দানব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দেবলোকের শরণাপন্ন হইতেন। ঋষিগণ সুন্দর সুন্দর স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান এবং সোম পান করাইয়া যুদ্ধার্থে উত্তেজিত করিতেন।

আদিত্যগণ ক্ষত্র অর্থাৎ বলবান।• কিন্তু তারকা ও চন্দ্র ক্ষত্র নহে; সেইজন্য তাহারা নক্ষত্র নামে অভিহিত হইত। মর্ত্ত্যগণ মৃত হইলে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া যম লোকে তারকা রূপে অবস্থান করেন। কিন্তু পণি জাতীয় গণ পৃথিবীর নিম্নে গমন করে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় ইহাদের মধ্যে মৃতের কবর দেওয়া প্রথা প্রচলিত ছিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

# নববর্ষে।

প্রকৃতি মধুর বেশে চলেছে নব জীবনে
চলেছে অনন্ত পথে আপনার প্রয়োজনে!
স্ফূর্ত্তিময় অনুপম, বসন্তে পূর্ণ উদ্যম
উৎসাহে হৃদয় ভরা তেমনি উল্লাস মনে!
উৎকণ্ঠা আশঙ্কা হীন, দৃঢ় চিত্ত চিরদিন
হয়না পশ্চাৎপদ প্রলয়ের বিপ্লাবনে!
প্রতিজ্ঞা পাষাণ ময়, নাহি চিন্তা নাহি ভয়,
নিদাঘ বরষা শীত হেমন্তের আক্রমণে।
এসহে আমরা সবে, তেমনি উদ্যমে তবে
স্বকার্য্য সাধন করি--নববর্ষ আগমনে!

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

---

# কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর।

( ৫ )

## উপসংহার।

সখীরা যখন জানিতে পারিল, তখন কিছুদিন আঁটাআঁটি কাণাকাণিই চলিল।

"পরেত ধর্ম্মের ঢোল বাজিল বাতাসে॥"

কথা পাটেশ্বরীর কাণে উঠিল। রাণীও কয়েকদিন কন্যার এই সমস্ত ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া শেষে রাজার কাছে বলিলেন—

আইবুড় হইল কন্যা নাহি দিলে বিয়া।
কলঙ্কী হইল কন্যা কুল ভাসইয়া॥

শুনিয়া রাজা—

সমুদ্রে জ্বলিল যেন বাড়ব অনল।
নিশ্বাসে বহিল ধূম অস্থির অচল॥
চক্ষু ঘুরাইয়া তবে কহিলেন রায়।
কন্যা হয়ে কালি দিল কুলেতে আমার।
জল্লাদে ডাকিয়া শির কাটিতাম তার॥
কালি প্রাতে উঠি মুখ দেখিব যাহার।
তাহাকে সপিব কন্যা প্রতিজ্ঞা আমার॥
হউক নীচ জাতি সেই চণ্ডাল মালিয়া।
যেই হউক তার কাছে কন্যা দিব বিয়া॥

তারপর—

দরবারে আসিয়া রাজা কোটালেরে বলে।
আমার ঘরেতে চোর আইসে নিশাকালে॥
নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া থাক আপন বাসরে।
নিমক হারাম বেটা শুন বলি তোরে॥
কাল যদি চোর ধরি না দেও সকালে।
তেকাঠিয়া পথে তোরে ধরি দিব শালে॥
গুষ্টিগোত্রে সব তোর লইব গর্দ্দান।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি না হইবে আন॥
কাল নেমী যমনেমী তারা দুটী ভাই।
রাজ বাড়ী পারা দেয় অন্য কাজ নাই॥
রাজার দেখিয়া ক্রোধ কাঁপে দুইটী ভাই।
চোর ধরিবারে করে গোপনে * * *॥

সমস্ত রজনী দুই ভাই গোপনে রাজবাড়ীতে সতর্ক পাহারা দিতে আরম্ভ করিল।

চোর ধরিবারে তারা নানা সন্ধি জানে।
ধরিয়া গোপন দ্বার আইল বাগানে॥
যাতায়াতে গুপ্ত পথ জানিল সন্ধান।
এই পথে আসে চোর ইতে নাহি আন॥
ঝোপের আড়ালে তারা লুকাইয়া রয়।
কোন পথে আসে চোর দেখে সমুদয়॥
এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ।
সখীগণ রচিলেক বিদ্যার শয়ন॥
সুগন্ধি কুসুম আনি রচিল বিছান।
পালঙ্ক উপরে রাখে বাটাভরা পান॥
রাণীর আদেশে তারা আর কাম করে।
সিন্দুর ছড়াইয়া দিল মেজের উপরে॥

কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র বিদ্যার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পথ এড়াইতে পারিল না। এদিকে সুন্দর যথাকালে গুপ্তপথে আসিয়া বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

পালঙ্ক উপরে কন্যা বিরস বদন।
সুন্দর আসিয়া করে অধর চুম্বন॥
শিহরিয়া সিমন্তিনী কহে করযোড়ে।
আজি নাহি রহ বন্ধু আমার মন্দিরে॥
কি জানি সকল কথা হইল প্রকাশ।
সখীরা জানিছে সব গোপন আভাস॥
আজিকার নিশি বন্ধু চিত্তে দাও ক্ষমা।
সখীরা রচিয়া দিছে ফাগের বিছানা॥
কিজানি গোপন কথা জানিছে সকল।
অমৃত পিইতে বন্ধু পিইবে গরল॥
আজি নিশি যাও বন্ধু আপন বাসরে।
পরীক্ষা হইলে শেষ দেখা দিও মোরে॥
এতেক বারণ তবু কুমার না মানে।
বাহুপাশে বিদ্যারে বাঁধিল আলিঙ্গনে॥
পালঙ্কে শুইল রায় বিদ্যা কোলে লইয়া।
মধু যথা খায় ভৃঙ্গ পুষ্প ভারাইয়া॥
কবিকঙ্ক গায় গীত শুনে বিচক্ষণ।
বিপরীত কাণ্ড যার অবশ্য মরণ॥

তারপর যেমন কর্ম্ম তেমন ফল হইল; কোটালেরা দুই ভাই মিলিয়া গুপ্তদ্বারে গগনবেড় নামক মানুষ ধরা লৌহ জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। শেষরাত্রে রাজকন্যা বিদ্যার অধরের শেষ মধুটুকু আহরণ করিয়া সেই মধুমত্ত ভৃঙ্গ যখন উড়িয়া যাইতেছিল তখন—

মাকড়ের জালে যেন পতঙ্গ পড়িল।
কোটালের কলেতে সুন্দর বন্দী হইল॥

পরদিন প্রভাতে সুপ্তোত্থিত রাজা ফটক পার হইয়াই সর্ব্বাগ্রে সেই রঞ্জিত বসন লৌহ জাল বদ্ধ রাজপুত্রকে দর্শন করিলেন। কোটালেরা যুক্ত করে বলিল—

অবধান মহারাজ কালি নিশাকালে।
এই চোর ধরিয়াছি চোর ধরা জালে॥

রাজা আরক্ত নয়নে বলিলেন—"ইহাকে আজিকার জন্য অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ কাল প্রত্যূষে ইহার বিচার হইবে।"

রাজার হুকুম পাইয়া দুরন্ত কোটালে।
সুন্দরে বান্ধিয়া লয় হাতে পায় গলে॥

লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ যুবরাজ অন্ধকার গৃহে একাকী বন্দি হইলেন। নিষ্ঠুর কোটালগণ তাহার বুকের উপর পাষাণ চাপ দিয়া রাখিল।

অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে সহসা সুন্দরের বনপ্রদেশের সেই পীর ফকিরের কথা মনে পড়িল; ফকির বলিয়া ছিলেন "বিপদে সম্পদে মোরে করিও স্মরণ"। আজিকার এই দুর্যোগময়ী নিশিতে পীর ফকিরের কথা ভাবিতে ভাবিতে "দুপ্রহর নিশি গেছে আর প্রহর আছে।

দুঃখের কাহিনী মোর কহি কার কাছে॥
সুন্দরের চক্ষে পানি বহে দর দর।
কোথা রইল মাতাপিতা কোথা বাড়ী ঘর॥
হায়রে বিদেশে, আসি মজিনু বিপাকে।
মরিতে বান্ধব নাই কেবা মোরে রাখে॥

অকস্মাৎ অন্ধকার কারাগৃহ আলোকিত করিয়া এক দেবজ্যোতি সম্পন্ন মহাপুরুষ কারাগারে আসিয়া উদিত হইলেন। তাঁহার দেহের জ্যোতি রাশিতে কারাগৃহ আলোকিত হইয়া গেল। কুমার ক্ষণকালের জন্য চক্ষু মুদিত করিলেন, তারপর চাহিয়া দেখিলেন—কানন পথের সঙ্গী সেই পীর ফকির। কুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—চারিদিকে এই সশস্ত্র পাহারা, তারপর কঠিন লৌহদ্বার, অর্গল বদ্ধ, প্রভো আপনি কেমন করিয়া এখানে আসিলেন? ফকির বলিলেন তুমি ভাবিও না—

লোহার কপাট মোর পরশে খুলিল।
মায়াতে প্রহরীগণ নিদ্রায় ঢলিল॥
এত বলি সুন্দরের অঙ্গে দিল হাত।
লোহার বন্ধন যত খোলে অকস্মাৎ॥
বুকের পাষাণ তার দূরেতে পড়িল।
পীরের চরণে রায় লুটিয়া ধরিল॥
কহ কহ প্রভো মোরে সেহি সমাচার।
কিরূপে হইব আমি বিপদ উদ্ধার॥

পীর বলিলেন—

কালি প্রাতে হবে যবে তোমার বিচার।
রাজারে কহিও তুমি এই সমাচার॥

এই বলিয়া পীর তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন বেশ করিয়া শিখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। তারপর অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান। লৌহগৃহ তেমনি অর্গল বদ্ধ হইয়া পড়িল। অলক্ষিতে যেন লৌহ শৃঙ্খল সব তাহার হাতে গলে জড়াইয়া ধরিল। যুবরাজ যেমন ছিলেন, তেমনি পড়িয়া রহিলেন।

পরদিন বিচার। রাজা সিংহাসনে বসিলেন। কোটালেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ চোরকে আনিয়া উপস্থিত করিল।

চোরের রূপ দেখিয়া রাজা অজ্ঞান—

মনে মনে ভাবে রাজা এই ভাল চোর।
যাহার রূপেতে হার মানে চন্দ্রচূড়॥
বিধাতা গড়িল চাঁদে কলঙ্কি করিয়া।
সাপেরে সাজাইল বিধি মণিমালা দিয়া॥

যাই হউক, রাজা ক্রোধ কম্পিতস্বরে বলিলেন—

মনেতে রাখিস্ যদি গর্দ্দানের ভয়।
শীঘ্র করি দেরে বেটা নিজ পরিচয়॥
মিথ্যাকথা বলিয়ে ভাঁড়াস্ যদি মোরে।
নিশ্চয় জানিস্ বেটা শালে দিব তোরে॥

রাজপুত্র কৌশলে পরিচয় দিলেন—

পরিচয় কথা মোর পূর্ব্বদেশে ঘর।
মাল্যবান নামে তথা এক সদাগর॥
তাহার তনয় আমি কহি সত্য করি।
ঘোড়া বিকাইয়া আমি দেশে দেশে ফিরি॥
এক গোটা ছিল মোর পক্ষিরাজ ঘোড়া।
চুরি করি নিল তারে যত দুষ্ট চোরা॥
তাহারে খুঁজিয়া আমি আইনু এহি দেশে।
উচিত বিচার করি শালে দেও শেষে॥

রাজা বলিলেন—

মিথ্যাকথা বলিয়া ভাঁড়াও ভাল মোরে।
কিসের বিচার দুষ্ট শালে দিব তোরে॥

সুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

বুঝিলাম এদেশের বিচার বিধান।
চোরের নাহিক দণ্ড সাধুর গর্দ্দান॥

ক্রমে তর্ক আরম্ভ হইল। কুমার পীরের নিকট হইতে শ্রুত কয়েকটী প্রশ্ন রাজার নিকট উত্থাপন করিলেন। এরাজ্যে চোর কে, আর চোরের শাস্তিইবা কিরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে? রাজা উত্তর করিলেন যে চুরি করিয়া ধরা পড়ে, আর যাহার কাছে চুরাই মাল পাওয়া যায়, সেই চোর; চোরের দণ্ড বড় ভয়ঙ্কর।

হস্তপদ কাটে কারও কাটে নাশা কাণ।
কারও কাটে যার কাহারও গর্দ্দান॥
কাহারে ধরিয়া দেয় তেকাটিয়া শালে।
চোরের কঠিন দণ্ড সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।

শুনিয়া সুন্দর বলিলেন—মহারাজ যদি চোরের মাল যার কাছে থাকে সেই চোর হয়, তবে—

বিচার করহ মোর ধর্ম্মের দোহাই।
তোমার রাজ্যেতে আমি পক্ষিরাজে পাই॥

রাজা পক্ষিরাজের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন—

কি কব কহিতে ভয় মনে লাগে ধাঁ ধাঁ।
পক্ষিরাজ আছে তব অশ্বশালে বাধা॥

তখন রাজা পক্ষিরাজের আকৃতি প্রকৃতি সব সুন্দরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। সুন্দর

শ্বেতবর্ণ ঘোড়া গোটা খাড়া দুটী কাণ।
পৃষ্ঠেতে চড়িলে উড়ে বায়ুর সমান॥

ইত্যাদি আরও অনেক রকম চিহ্নের কথা বলিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—সে ঘোড়া যে তোমার তার কি প্রমাণ আছে?

তখন কুমার আবার বলিলেন—

ডাকিলে আমার ঘোড়া আইসে মোর কাছে।
পরীক্ষা করিয়া তবে বিচার কর পাছে॥

তখন রাজা অশ্বশালা হইতে সমস্ত অশ্ব আনিয়া সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। চিহ্ন গুলি একে একে সব মিলিয়া গেল, তারপর ডাকের পালা। রাজা তাঁহার পালিত অশ্ব সকলকে একে একে নাম ধরিয়া ডাকিলেন; সবগুলি তাঁহার কাছে গেল, গেল না কেবল পক্ষিরাজ। সুন্দর ডাকিবা মাত্র পক্ষিরাজ নাচিতে নাচিতে সুন্দরের কাছে গেল।

রাজা বিষম লজ্জিত হইলেন। সুন্দর আবার বলিলেন—মহারাজ আমার প্রতি শূল দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু আমার একটী কথা আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কন্য প্রত্যূষে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে যাহার মুখ দেখিবেন, তাহার কাছেই কন্যা বিবাহ দিবেন; শুনিয়াছি যাঁহারা ধার্ম্মিক রাজা, তাঁহারা কখনই সত্য ভ্রষ্ট হন নাই।

পাশা খেলি যুধিষ্ঠির কৃষ্ণায় হারিল।
দশরথ রাজা তার পুত্র বনে দিল॥
দাতা কর্ণ নিজ করে পুত্র মাথা কাটে।
সর্ব্বস্ব অর্পিয়া বলি বামনে না ঘাটে॥
সত্য হেতু হরিশ্চন্দ্র পত্নি বিকাইল।
আপনি চণ্ডাল হইয়া শূকর পালিল॥
লোক মুখে শুনিয়াছি তুমি বিচক্ষণ।
প্রতিজ্ঞা করিছ রাজা করহে পালন॥

রাজা বিষম ভাবনায় পড়িলেন তাইত এখন উপায়?

দেখিনু ইহার মুখ প্রত্যূষে উঠিয়া।
কেমনে ইহার কাছে কন্যা দিব বিয়া॥
জাতি গোত্র নাহি জানি নাম পরিচয়।
ফাঁফরে পড়িল রাজা কবিকঙ্ক কয়॥

এই সময় অকস্মাৎ সভাতলে সেই পীর ফকিরের আবির্ভাব।

ফকির রাজার কাছে সুন্দরের সমস্ত পরিচয় বৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া রাজা রাণীর আনন্দের আর সীমা রহিলনা।

* * * * * * * *

তারপর একদিন চাম্পানগরী মুখরিত করিয়া মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাজা মহাসমারোহে সুন্দরের সঙ্গে কন্যা বিদ্যাবতীর বিবাহ দিলেন।

কিছু দিন পর অর্দ্ধেক রাজত্ব, হয়, হস্তী, ধনরত্ন, মণি, মাণিক্য ইত্যাদি বহুমূল্য যৌতুক দ্রব্য সহ সুন্দর নব পরিণীতা ভুবন মোহিনীকে সঙ্গে করিয়া নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন। অন্ধের নয়নতুল্য পুত্রকে পাইয়া রাজা

মাল্যবানের আর আনন্দের সীমা রহিলনা; রাজ-পাটেশ্বরী বরণ করিয়া অতি যত্নে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

কিন্তু সেই অফুরন্ত সম্পদেও যুবরাজ সুন্দর পীরকে ভুলিতে পারিলেন না। বিপদে স্মরণ করিয়া একদিন প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন, আজ সম্পদের কোলে থাকিয়াও পীরকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র পীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পীর তাহাকে সত্য পীরের পূজা প্রচার করিতে বলিলেন এবং সেই সঙ্গে পূজার বিধান বলিয়া দিলেন।

ঘটা করিয়া সত্য পীরের পূজা হইল—তেমন সমারোহ— তেমন দেবপূজা, পূর্ব্বদেশে আর হয় নাই। এইরূপে সত্যপীরের পূজা জগতে প্রচার হইল। এইরূপে—

সত্যের মহিমা কথা হইল প্রচার।
যে যা মানস করে সিদ্ধহয় তার ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নির্দ্ধনিয়ার ধন।
মৃত পুত্র পায় প্রাণ অন্ধেতে নয়ন ॥
আমার এ সত্য পীরে যেহি করে হেলা।
মুখেরক্ত উঠে মরে চক্ষে নামে ঢেলা ॥
আমার এ পুস্তক খানি যার ঘরে রয়।
অগ্নি চোর হতে তার নাহি কোন ভয় ॥
পন্থেতে চলিলে যদি পুথি রহে সাথে।
চোর দস্যু হতে ভয় নাহি কোন মতে ॥
যার ঘরে রহে এই সত্যের পাঁচালী।
ধন পুত্র বাড়ে তার বাড়ে ঠাকুরালী ॥

এইরূপে সত্যপীরের মহিমা গীতি গাহিয়া কবি সভার কাছে বিদায় চাহিয়াছেন।

শুন শুন সভাজন মিনতি বচন।
যার যার নিজ স্থানে করুণ গমন ॥
কিগান গাহিব আমি অতি অল্পমতি।
প্রভু মোর সত্য পীর অগতির গতি ॥
কলিযুগে সত্য পীর সর্ব্বদেবসার।
যে যে মানস করে সিদ্ধ হয় তার ॥
কোটী প্রণিপাত মোর পীরের চরণে।
সত্যের পাঁচালী গাই যাঁহার কারণে ॥
এতদূরে পাঁচালী গীত সমাপ্ত হইল।
সত্যপীর প্রীতে সবে হরি হরি বল ॥

এতদূরে বিদ্যাসুন্দরের উপখ্যান ভাগ শেষ করিলাম। কবিকঙ্ক ময়মনসিংহের কবি সুতরাং তৎকৃত বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থ কোনদিন মুদ্রিত হইয়া যে লোকলোচনের গোচরীভূত হইবে, সে আশা বৃথা। এই জন্যই কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের অনেকস্থান তুলিয়া দেখাইতে যাইয়া প্রবন্ধের কলেবর অতি মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছি। এই বর্দ্ধিত কলেবর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অবশ্যই পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিয়াছে। যাই হউক, অতঃপর সামান্য দুএকটী কথা বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষ করিব।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত আমরা আরও দুইটী বিদ্যাসুন্দর প্রাপ্ত হইয়াছি। এক কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর, দ্বিতীয় রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর। আমার বিশ্বাস রায় গুণাকর ও কবিরঞ্জন কাহারও রচনা মৌলিক নহে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে এদেশে বহু প্রাচীন সঙ্গীত ও ছড়া উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় রচিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। এই চির-প্রচলিত কাহিনীই উভয় গ্রন্থের উপাদান। কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দরও মৌলিক নহে। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের বহু পূর্ব্ব হইতে যে এতদঞ্চলেও বিদ্যাসুন্দরের কাহিণী প্রচলিতছিল তাহা প্রচলিত প্রাচীন পল্লিসঙ্গীত সকল হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে। কবিকঙ্ক তাঁহার যবন গুরুর নিকট হইতে এই কাহিনী সর্ব্বপ্রথম শুনিয়াছিলেন। "গুরুর আদেশে গাহি পীরের পাঁচালী" একথা তিনিও স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

উপাখ্যান ভাগে গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর ও কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দর উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখাযায়। বলিতেকি কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দর এক সম্পূর্ণ অভিনববস্তু। সাদৃশ্য কেবল নায়ক নায়িকার নাম, সুন্দরের মালিনীর বাড়ীতে স্থিতি, মাল্য রচন, মালার ভিতর পত্রলিখা, গোপনে মিলন, কোটালের হাতে বন্দী, বিচার, বিদ্যালাভ, ইত্যাদিতে—

কিন্তু প্রভেদ অনেক খানি। কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর

অনেকটা রূপকথার ছাচে ঢালা। রাজার মৃগয়া গমন, তোতা পাখী দর্শন, পুত্রলাভ, পুনশ্চ সুন্দরের মৃগয়া যাত্রা, মায়ার হরিণ দর্শন, অপহৃত অশ্বের অন্বেষণ, পীর ফকিরের সলাভ ইত্যাদি। কবিকঙ্কের নায়িকার কোনও পণ-প্রতিজ্ঞা ছিলনা। গুণাকরের সুন্দর যে অস্বাভাবিক কৌশলে নায়িকার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন কঙ্ক তাহার নায়ককে সেপথে লইয়া যান নাই। তিনি এক সম্পূর্ণ অভিনব পথেরই আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, সেপথ যেমন সুন্দর তেমনি স্বাভাবিক ও কৌতুহলোদ্দীপক। তার পর যে বিভৎস দৃশ্য দেখিয়া রাজাবীরসিংহ কোটালকে চোর ধরিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে শ্রাদ্ধ তত অধিক দূর গড়ায় নাই। পরন্তু সখীগণ যে সকল চিহ্ন ধরিয়া বিদ্যার চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা অতি সরস ও সুন্দর। সমাজের চক্ষে নিন্দণীয় হইলেও তত বিভৎস নহে। রায় গুণাকরের মালিনী তাহার কৃতকার্য্যের ফল যথেষ্ট রূপেই পাইয়াছিল; সে রাজার কোটালের করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত, পক্ষান্তরে কঙ্কের মালিনী প্রভূত পুরস্কৃত। এই স্থলে বলিতে হইবে, রায় গুণাকরের বিচার সমাজ সম্মতই হইয়াছিল।

কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের সখীরা অতি-ধীর বুদ্ধি ও বিচক্ষণা; তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, বুদ্ধিমতী সহচরীগণ রাজকন্যার মন্দির দ্বারে সিন্দুর ছড়াইয়া রাখিয়া পুরুষের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিল, যে রজনীতে চোর ধরিবার জন্য কোটালেরা ফাঁদ পাতে সেই রজনীতে বিদ্যার অলক্ষিতে পুষ্প শয্যায় সিন্দুর ছড়াইয়া দিয়াছিল; এই সব কারণে বুঝাযায় বিদ্যার সহচরীগণ সকলেই সুরসিকা, বুদ্ধিমতী ও ধৈর্য্যশীলা, একবারে ধ্রুব সত্যের আবিষ্কার নাকরিয়া তাহারা কথা রাণীর কাণে তোলে নাই। তারপর কুমারী কন্যার ঈদৃশ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাহারা খুব সময় থাকিতেই সাবধান হইয়াছিল।

দেখিতে পাই, রাণী ও বিলক্ষণ ধৈর্য্যশীলা। তিনি কুমারী কন্যায় কলঙ্কের কথা শুনিয়া হাত নারা যমডাকে পুরজনকে চমকাইয়া ধরায় আঁচলফেলিয়া দৌড়িয়া যান নাই। সখিগণের কথা শুনিয়াও স্থির চিত্তে কিছুকাল কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন।

কিন্তু চোর ধরিবার কৌশলটীতে রায় গুণাকর কঙ্কের উপর টেক্কা দিয়াছেন। গুণাকরের কোটালগণ যে কৌশলে চোর ধরিয়াছিল তাহা অতীব সুন্দর, সরস, ও হাস্যোদ্দীপক। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের চোর সম্পূর্ণ বিভিন্ন কৌশলেই ধরা পড়িয়াছিল।

তারপর বিচার বধ্যভূমিতে সুন্দরের গমন, পরিচয় ইত্যাদি। পরিচয় গুণাকরের সুন্দর। বধ্যভূমিতে তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন দেশ কাল ভেদে তাহা অনেকটা অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কঙ্কের সুন্দর অতি সরলভাবে স্বল্পকথায় আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ কোন বাড়াবাড়ি নাই।

উভয়েই নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতার কৃপায় মুক্ত। কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের দেবতা সত্যপীর, রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের দেবতা কালী। উভয় নায়কই অভীষ্ট দেবতার বর প্রভাবে সিদ্ধ মনোরথ।

উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য-- রায়গুণাকর যে উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া, থাকুন তাহার রচনার লক্ষণ দেখিয়া আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি, মুখ্যতম, মুখ্য ও গৌণ। মুখ্যতম—বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট বার বার লাঞ্ছিত কবি তাঁহার পরিবারের একটা স্থায়ী কলঙ্ক চিহ্ন রাখিয়া দিবার জন্যই নিজ অসামান্য কবিত্ব প্রতিভা সেই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

মূল উদ্দেশ্য —লোকরঞ্জন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই কবি গ্রন্থ খানাকে অশ্লীলতা দোষে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু গণের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া কবির রুচি চির দিনের জন্য মলিন হইয়া রহিয়াছে। এই অশ্লীলতার জন্য গুণাকরকে ততটা দোষ দেওয়া যায় না, দেশকাল পাত্র যতটা দোষী। গায়ক সুখের জন্য, অর্থের জন্য, গায়, শ্রোতা কর্ণ বিনোদনের জন্য শুনে। এই হিসাবে রাজাকৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় সভাসদগণ কবির অপেক্ষা অধিকদোষী। কবি অশ্লীলতার

অন্নদাতা, রাজা ও সভাসদগণ অনেকেই তাহার প্রশ্রয় দাতা। এই কারণে আমরা রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরে ফরমায়েসী গানেরই বাহুল্য দেখিতে পাই। রচনার লক্ষণ দেখিলেই ফরমায়েসী গান (অর্থাৎ যাহা কেবল শ্রোতা গণের তৃপ্তি বিধানার্থ তাহাদের ইচ্ছামত গায়ককে বাধ্য হইয়া গাহিতে হয়) গুলিকে বাছিয়া লওয়া যায়। বিপরীত বিহার, দিবাবিহার, মানভঙ্গ, নারী গণের পতি নিন্দা, প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনা। মূল বিদ্যাসুন্দর হইতে এই কয়েকটী কবিতা বাদ দিলে রসের হানি হয় বটে কিন্তু গ্রন্থের অঙ্গ হানি হয় না। পরন্তু অশ্লীলতার চিহ্ন অনেকটা মুছিয়া যায়, আদিরসের তরঙ্গ তোফানে পড়িয়া পাঠককে হাবুডুবু খাইতে হয় না।

পরমুখাপেক্ষী কবি নারী গণের পতি নিন্দাটী কেবল যে শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য এবং বাহবা পাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যে স্থানে তিনি এই বিষয়টীর সমাবেশ করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থের এই অংশে আদৌ খাটে না। কবি যদি নিজ ইচ্ছায় গ্রন্থ মধ্যে এই বিষয়টীর সমাবেশ করিতেন তাহাহইলে ইহার বহু পুর্ব্বেও এমন স্থান ছিল যাহাতে অতি স্বাভাবিক কৌশলে এই রূপ রচনাটীর স্থান করিতে পারিতেন। কারণ বর্দ্ধমানের পতি নিন্দাকারিণীগণ সর্ব্ব প্রথমই এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই ইতঃপুর্ব্বেও অনেক বার দেখিয়াছে। এই অস্বাভাবিক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কবি বুধবারের নিশা পালায় অযথা বিড়ম্বিত হইয়াছেন। এই ঘটনায় কবি যে কেবল নিজে বিড়ম্বিত হইয়াছেন তাহা নহে পর কেও বিড়ম্বিত করিয়াছেন। সেই দিন রজনীতে একটা হাসির তরঙ্গ তুফান রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের উপর দিয়া এমন ভাবে বহিয়া গিয়াছিল যে তাহাতে সমস্ত রাজ্য খানি তোলপার করিয়া দিয়াছিল। আর রাজ্যের যত ভুড়িওয়ালা মিন্সেকে লইয়া দেশশুদ্ধ একটা হাসির হড়্‌হা পড়িয়া গিয়াছিল। এমনকি বেচারী ঘাড়িওয়ালার স্ত্রী হয়ত সাতদিন কলসী নিয়া জলের ঘাটে যাইতে পারে নাই। হয়ত রাণীর কোনও চটুলা সহচরী সেই ক্ষণে কবিকে কোন বহু মূল্য পারিতোষিক প্রদান জন্য রাণীকে অনুনয় করিয়াছিল। সেই রাত্রে ভাগ্য ক্রমে কবির জীবনে যে বাহবা ঘটিয়াছিল তাহা আর তদীয় জীবনে দ্বিতীয়বার ঘটে নাই, এই বুধবারের নিশা পালাতেই কবির অশ্লীলতা চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং কবিও তাহার স্বীয় জীবন ধন্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু কবিকঙ্কের উদ্দেশ্য এক। তাহার উদ্দেশ্য লোক-মনোরঞ্জন নহে। আদিরস মিশ্রিত অশ্লীল সঙ্গীত গাইয়া বাহবা পাইবার জন্যও নহে; তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য সত্যপীরের মহিমা প্রচার ও গুরুর আদেশ পালন।

সত্য বটে ভারতচন্দ্রের রচনা অদ্ভুত গ্রথিত কুন্দ কুসুমের হার কিন্তু সে হার যতই সুন্দর, যতই কোমল, যতই কেন সুরভিত হউক না, অসঙ্কোচে তাহা আমরা নিজ প্রিয়তম বনিতা কিম্বা দুহিতার গলে পড়াইয়া দিতে পারিনা। পিতা পুত্রে মায়ে ঝিয়ে একাসনে বসিয়া সেই গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিনা!

কিন্তু কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরে তেমন অস্বাভাবিক অশ্লীলতা কোথাও নাই। তবে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই স্বভাবত অশ্লীল ও অসামাজিক। সেই অশ্লীলতাও বর্ণন করিতে গিয়া স্থানে স্থানে কবি জিব কাটিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রোতাকে ইঙ্গিতে শুনাইয়া নায়ক নায়িকাকে সাবধান ও সমাজকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ, এই গ্রন্থ ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহার, ও দেবতার মহিমা প্রচার উদ্দেশ্যে লিখিত।

তবে শব্দ নৈপুণ্যে ভাষার মোহিণী ঝঙ্কারে প্রচলিত অপ্রচলিত সকল বিদ্যাসুন্দর হইতে যে ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অশ্লীল হউক কিন্তু এমন বিপুলানন্দ প্রদায়িনী কবি প্রতিভা বুঝি আর কোন কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কোন একটী শব্দ ভাবিয়া চিন্তিয়া বসাইতে হয় নাই, ফোয়ারার জলের মত যেন স্বভাবতই অবিশ্রান্ত ভাবে উঠিয়াছে। এ ক্ষেত্রে দেবতার বীণা হার মানিয়াছে, কিন্নরের কণ্ঠ পরাজিত হইয়াছে। অপ্সরার সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। যদিও কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা তথাপি বিহঙ্গম কাকলীর ন্যায় তটিনীর অস্ফুট কলধ্বনির ন্যায় শুনিয়াছি আর মোহিত হইয়াছি। ভারত চন্দ্রের বীণা শ্রীকৃষ্ণের

মোহন বেণুর ন্যায় যে শুনিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে—পাগল হইয়া গিয়াছে। ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় বিচারের শক্তি তাহাদের নাই। বেণুমুগ্ধ ব্রজাঙ্গনার ন্যায় তাহারা কুল মান ভুলিয়া গিয়াছে।

তবে এই হিসাবে ময়মনসিংহের এই অনাদৃত উপেক্ষিত কবি কোন আসন পাইবার যোগ্য, তাঁহার কৃত বিদ্যাসুন্দর বা সত্য পীরের পাঁচালীই বা বঙ্গ সাহিত্যের কোথায় স্থান পাইতে পারে তাহার বিচার বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন যে কবি তাঁহার জীবনের কোনও প্রকৃত ইতিহাস আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। একটী চির প্রচলিত প্রবাদ সঙ্গীতের উপর অবলম্বন করিয়াই তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছে মাত্র।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

---

# ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যত্।

মা বঙ্গভারতি!

"তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণহারা হই;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব
অভিনব শান্তি-রসে মগ্ন হ'য়ে রই।
যে ক'দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙ্গা চরণতলে॥"

—৺বিহারীলাল।

এস মা, একবার দশভুজার রূপে আসিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দিরে দাঁড়াও, ও আশার স্নিগ্ধ অঞ্জনে বাঙ্গালীর চক্ষু মাজিয়া দাও, তোমার বরাভয়দায়ী করস্পর্শে তাহাদের মোহ কাটিয়া যাক্, হৃদয়ে বল আসুক, অন্তরের অন্তস্তলে উৎসাহের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হোক্;—বাঙ্গালী দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া, আত্ম-পর ভুলিয়া, একপ্রাণে, একতানে সঙ্গীত ধরুক,—সে সঙ্গীতে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাক্, বাঙ্গালার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আসন অধিকার করুক।

একদিন,—সেই অতি প্রাচীনকালে,—যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও জগতে ফুটে নাই,—বিশ্ব যখন একপ্রকার প্রগাঢ় অন্ধতমসে আচ্ছন্ন, সেই আদিকালে,—ভারতের আর্য্যাবর্ত্তে যে বেদগান গীত হইয়াছিল, সেই গানে তখনকার ভারতের সর্ব্বত্র,—"পর্ব্বত পাথার, সমুদ্র কান্তার" সমস্ত ভরিয়া গিয়াছিল,—সেই এক সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণে, ভারতবর্ষ যেন এক-প্রাণ হইয়া গিয়াছিল,—শ্রৌতযুগের সেই সাহিত্যিক একতা, সেই সখ্য-বন্ধভাব, সেই চিরনবীন প্রেম, সেই বড় স্পৃহণীয় মিলন,—আর কি হইতে পারে না? সে বৈদিক যুগ নাই, সেই বিরাট্ বৈদিক সাহিত্য, আজ অলঙ্ঘ্য হিমাচলের ন্যায় ঐ পড়িয়া আছে,—ভারতে আবার সেই সাহিত্যিক একতা, মনীষার সম্মেলন—একপ্রকার অসম্ভব, একথা বলিলে চলিবে না। সেই হারাণো ধন আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, সেই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। কালের বশে চলিয়া আমাদিগকে কালজয়ী হইতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকগণকে উদাত্ত-কণ্ঠে গাহিতে হইবে—

"কে বলিল্ পুনঃ পাবে না তায়?
হারাণো মাণিক পাওয়া কি না যায়?
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রস্ত ছায়া ক'দিন রবে?
এ জগত মাঝে করো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয়;
দেখো না, দেখো না, দেখো না পাছে,
আগে দেখ, আর কতদুর আছে;
ঐ দেখ দূরে ভারতী মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,—"
করহ সাধনা,—"পাইবে ফিরে"॥

—হেমচন্দ্র।

একদিন যেমন, বৈদিক সাহিত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর আত্ম-সাহিত্য ছিল, আজ বঙ্গ-সাহিত্যকে সমগ্র ভারতের

সেইরূপ আত্ম-সাহিত্য করিতে হইবে। জানি বটে, একথায় হঠাৎ আস্থা স্থাপন করা বড়ই দুষ্কর;—স্বীকার করি যে, কথায় যাহা বলা যায়, কার্য্যে তাহা পরিণত করা সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে,—কিন্তু চেষ্টায় ত দোষ নাই। মানুষের সামর্থ্য যে কত, একদল মানুষ, অথবা একটা মানুষ যে কত কাজ করিতে পারে, তাহা যদি সে নিজে বুঝিতে পারিত, আত্মসত্তায় যদি সে বিশ্বাস করিতে জানিত, তবে নরজাতির অবস্থা হয়ত আরও বিস্ময়করী হইত, জগৎ মধুময় হইত।

আজ একবার ক্ষণকালের জন্য, আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া,—ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টি-সংযোগ করিতে হইবে। কলবাহিনী ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া একবার নর্ম্মদা-সিন্ধুকাবেরীর স্রোতে মানস-স্নান করিতে হইবে। শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বসিয়া শৌর্য্য-বীর্য্যের সমাধি-ক্ষেত্র রাজপুতনার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে হইবে। কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে,—আমার বঙ্গ-ভারতীকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজসজ্জায় মনের মত করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কি করিলে, আমার বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষাফলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব,—এই চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমি বাঙ্গালী যেমন মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞান-গরিমায় আমার মাকে সাজাইতে চাই, তেমনই আবার বাঙ্গালার মনীষা-সম্পদে তৎ তৎ প্রদেশ কি উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথাও আমাকে ভাবিতে হইবে। একাকী দীর্ঘপথ চলা বড় দায় ও বিরক্তিজনক, দশজনকে লইয়া, আমার দেশী বিদেশী—সকল ভাইকে লইয়া—যাহাতে সেই বিরাট্ সারস্বত-মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারি, সেই চেষ্টা আমাকে করিতে হইবে। ক্ষুদ্র আপনাকে ভুলিয়া বৃহৎকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অল্পে সুখ নাই, যাহা ভূমা,—বিরাট্,—তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। তবে ত মুক্তি। যত সঙ্কোচ, বন্ধন তত কঠোর, যত প্রসার, মুক্তি তত সম্মুখে। বাহু প্রসারণ করিয়া, সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন করিতে হইবে,—আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে,—বাঙ্গালার রাম-প্রসাদের "মিঠের লোভে তেতোমুখে সারাদিনটা গেল"—ক্রন্দনের করুণস্বরে নিদ্রিত গুর্জ্জরের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে, আবার রাজপুতনার ভট্টকবির উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীতের সঞ্জীবনমন্ত্রে বঙ্গ-সাহিত্যের কোমল প্রাণে নবীন আশার আলোক ফুটাইতে হইবে।

অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে, আমার যদি কিছু ভাল থাকে তাহা অন্যকে অঞ্জলি পুরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদানপ্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে,—যাহার আশ্রয়ে বঙ্গবিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, গুর্জ্জর, রাজপুতনা, গান্ধার, পাঞ্জাব—সব এক সূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাঙ্গালার শ্যামা দোয়েলের কূজনে রাজপুতনার ময়ূর কেকামৃত বর্ষণ করিবে, আবার গান্ধারের দ্রাক্ষারসে বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জ সরস হইবে। এককথায়, এমন একটি সুখকর যান আবিষ্কার করিতে হইবে, এমন এক-খানি মনোহর বজ্‌রা গড়িতে হইবে,—যাহার সাহায্যে, ভারতের যে প্রদেশে যাহা কিছু উত্তম, মনোজ্ঞ, তাহা অন্যপ্রদেশে অবাধে আমদানী করা যাইবে। যাহার যাহা ভাল, সকলেই তাহার আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইবে। এই-রূপ করিতে পারিলে,—কালে, অনন্ত কালের তুলনায় অতি অল্প কালের মধ্যে, ভারতবর্ষে এক অদ্বিতীয় ও অবিচ্ছিন্ন প্রকৃত "একাতপত্র" সাহিত্য-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন হইবে। সে যে কি সুখের সাম্রাজ্য, সে যে কি মোহের সাম্রাজ্য, তাহা ভাবিতেও কতই না আনন্দ! এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান, যাহাদের, এক দেবতা, এক মন্ত্র এক পূজা যাহাদের, এক গান, এক সুর, এক তান, যাহাদের, তাহাদের আবার অভাব কিসের? যদি এমনই সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারি, সমগ্রভারত যাহাকে তাহার নিজের বলিয়া বুকে তুলিয়া লইবে—যদি এমনই রত্ন উদ্ধার করিতে পারি, তবেইত মাঁ'র প্রকৃত পূজা করি-লাম, অন্যথা—মা'র অবমাননা মাত্র। এস সাহিত্যিক, এস বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, এস ভাই বাঙ্গালী,—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-

রাজ্যগুলি এক করিয়া এক বিরাট্ সাহিত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তুমি আমি চলিয়া যাইব, আরও কত আসিবে, কত যাইবে, কিন্তু যদি এই ভারতব্যাপী একচ্ছত্র-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারি,—অথবা ইহার বিন্দুমাত্র আনুকূল্যও করিয়া যাইতে পারি, আমাদের মুরজীবন সার্থক হইবে। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। আমি একা, আমি দুর্ব্বল, আমি অসহায়, এই সকল মনুষ্যত্ব-ঘাতী চিন্তা পরিহার করিয়া, সিংহবিক্রমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, সিদ্ধি নিশ্চিত। মনে রাখিও—যদি তোমার সঙ্কল্প-শুদ্ধি থাকে, তবে তোমার সঙ্কল্পের সিদ্ধিও নিশ্চিত। সুতরাং শুদ্ধ-সঙ্কল্পে হৃদয় সবল করিয়া সাহিত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হও। দেখিবে, আজ যাহা ভাবিতেছ স্বপ্ন, কাল তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। দেখা যাউক, বাঙ্গালী আমরা এই সাহিত্য-সাম্রাজ্য-স্থাপনে কতটুকু সাহায্য করিতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে, ভারতবর্ষে একটা জিনিস দেখিতে পাই যে, কি মান্দ্রাজ বোম্বাই, কি গুজরাট বাঙ্গালা,—সকল দেশের শিক্ষিত লোকেই ইংরাজীর প্রভাবে পরস্পর কথাবার্ত্তার কাজ বা ভাবের আদান প্রদান চালাইয়া থাকেন। বরোদার এক ব্যক্তি, যিনি বাঙ্গালার কিছুই জানেন না, তিনিও অবাধে, ত্রিপুরার এক ব্যক্তির সহিত সুন্দর আলাপ করিতেছেন, পরস্পরের দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা-নিবন্ধন, তাঁহাদের কাহারই কোন অসুবিধা হইতেছে না। বিদেশী ইংরাজী ভাষাই তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘটকতা করিতেছে। এক হিসাবে, ইংরাজী আমাদের বহুল উপকার করিতেছে। আজ যে ভারতে, জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইয়াছি—তাহা ইংরাজীর প্রসাদে। রাজভাষা ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে করিবেও। সত্য বটে, পাশ্চাত্য ভাবের অনেক স্তর এ দেশের মাটীর সহিত খাপ খায় না, কিন্তু এমন অনেক জিনিস পশ্চিম দেশের ভাষা আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছে, যাহাতে আমাদের পরম উপকার হইয়াছে। অদৃষ্টবাদী আমরা কর্ম্ম করিতে শিখিতেছি। পাশ্চাত্য ভাষায় আমরা কতদূর উপকৃত বা আমাদের দেশীয় ভাষা পাশ্চাত্য ভাষার সম্পর্কে কতটা সম্পন্ন, তাহা অদ্যকার বক্তব্য নহে, এবং বারান্তরে, আমি তাহা বলিয়াছি, সুতরাং আজ সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ ভাবের রাজ্য, প্রাণের রাজ্য। ভারতের কোন প্রদেশেই ভাবের অভাব নাই। মনস্বী মহাজনের অভাব নাই। উদ্ধব-সুরদাস, রামপ্রসাদ-চণ্ডীদাস, মীরা-তুলসীদাসের ভারতে অভাব নাই। কেহ লোকলোচনের সম্মুখে আসিয়াছেন, কেহ বা পল্লীকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় জীবন কাটাইয়াছেন, দেশান্তরের লোকে তাঁহাকে চিনিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে এবং তাহা অতি প্রাচীন। তৎ-তৎ-প্রদেশের অনেক অমর কবি, অনেক নিপুণ লেখক সেই সেই ভাষায় কত সুমধুর কাব্য, কত সুমধুর কথাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও লিখিতেছেন,—তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সেই দেশের অধিবাসীরা তৎ-তৎ মহাকবির কাব্যামৃতপানে কৃতার্থ হইয়াছে। ধরুন—যেমন কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাস,—মাইকেল মধুসূদন বা হেমচন্দ্র, বঙ্কিম বা দীনবন্ধু। কে এমন বাঙ্গালী আছেন,—যিনি ঐ সকল মহাকবির কাব্যপাঠ করিয়া,—নিজে ঐ ঐ কবির স্বজাতি বলিয়া শ্লাঘা অনুভব না করেন? বাঙ্গালার এমন কোন্ শিক্ষিত গৃহ আছে, যেখানে ঐ ঐ কবির কোন-না-কোন গ্রন্থ গৃহের শোভাবর্দ্ধন না করিতেছে? ঐ প্রকার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথাও ভাবুন। প্রত্যেক প্রদেশেই তাহার "নিজস্ব" বলিয়া কিছু-না-কিছু আছেই। ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে এখনও নূতন, এখনও ত্রিশকোটী ভারতবাসীর মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন মাত্র ইংরাজীভাষার অনুশীলন করেন। যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ, যাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট, সেই সাধারণ জনসমাজ এখনও ইংরাজীর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় নাই। আমার মনে হয়, তাহাদিগকে,—সেই বিপুলজনসঙ্ঘকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া যদি এক করিতে পারা যায়,—তবেই ভারতে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে। অন্যথা নহে। এখন এমন একটি সাধারণ সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যাহার উপর দিয়া ভারতের সকল দেশের অধি-

বাসীরা তাহাদের সর্ব্ববিধ বাধাবিপত্তি পার হইয়া, এক মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে। সকলে সাহিত্যের অঙ্গনে এক হইবে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকিবে না। অবশ্য কথা বড়ই কঠিন। দেখা যাক্, ইহার সমাধান হয় কি না?

ভারতবর্ষে এখন সাধারণতঃ শিক্ষার কেন্দ্র দেখিতে পাই, প্রকৃত পক্ষে একটি। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন যত কিছু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে, যাহা আছে, তাহাও যায় যায়। নবীনের সজ্বর্ষে সে প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে। আর তাহার পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনার আশা নাই। এখন আর সে তেঁতুলের পাতার ঝোলে চতুষ্পাঠীর ছাত্র নির্ভর করিতে চায় না বা অধ্যাপকও নির্ভর করাইতে পারেন না। সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সব ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। এখন শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ লোকে বোঝে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা,—উচ্চশিক্ষিত বলিতে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। অভিভাবক এখন স্ব স্ব বালকদিগকে স্কুলকলেজে পাঠাইতে পারিলেই—তাহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল,—মনে করিয়া থাকেন। দেশের সে চৌপাড়ি পাঠশালা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, গ্রামে গ্রামে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। শিক্ষাসমাপ্তির পর যে কি হইবে, কোন পথে যাইতে হইবে,—সে সব চিন্তা না করিয়া, ছেলেদিগকে স্কুলকলেজে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ, এই ভাবে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি চলিলে, কোথায় যাইয়া যে ইহার কি পরিণাম দাঁড়াইবে, তাহা গুরুতর চিন্তার কথা। সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণ শিক্ষার উপর নির্ভর করে, সেই শিক্ষা এই বর্ত্তমান প্রণালীতেই হওয়া উচিত, না অন্য কোন সমীচীন পথে শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হওয়া বিধেয়,—সে বিষয় অত্র আলোচ্য নহে। স্থানান্তরে সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা বলিতেছিলাম।—শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সবে ৭।৮টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে মাত্র। কিন্তু সে দিন আর দূরে নহে, মনে হয়, যখন ভারতের এক এক প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে পাইব। যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর অন্য কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই, বা থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, তখন, যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদলবদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যদিয়াই করিতে হইবে। অন্যথা, একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যবস্থা থাকিতে, এখন আবার নূতন করিয়া আর একটা পথ খুলিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। সুতরাং ভারতের সাহিত্যিক একত্বের সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা, যতদূর সম্ভব, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যেই করিতে হইবে। চাই আমরা কাজ,—যে ভাবে, যত সহজে সেই কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। সংজ্ঞা লইয়া বিতণ্ডা করিলে চলিবে না, সংজ্ঞিত পদার্থ প্রাপ্তির প্রতি সাবধান থাকিতে হইবে। নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। ভগবানের নাম করিয়া, দেশ মাতৃকার চরণ স্মরণ করিয়া, বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব,—মায়ের ছেলে আমরা—"মা মা" রবে অগ্রসর হইব, সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। সভ্য মহোদয়গণ, আজ আমরা সকলেই এক সম্বন্ধে, এক উদ্দেশ্যে এই পবিত্র সারস্বত-সম্মেলনে সমবেত হইয়াছি,—আজ গৈরিকস্রাবের ন্যায়, আমার হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ আপনাদের সম্মুখে ছুটিতে চাহিতেছে,—আত্মগোপন করিতে আমি জানি না, কোন দিন করিও নাই। বিশেষতঃ আজ,—এমন পবিত্র দিনে, মাহেন্দ্রক্ষণে মনের কবাট খুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছে, যে,—ঐ দেখুন, আমার হৃদয়ে আমি ভারতের কি উজ্জ্বল ভবিষ্যত্ দেখিতে পাইতেছি। এক-ভাব, এক ধ্যান, এক জ্ঞানে একতাবদ্ধ হইয়া, এক পরিবারের মত, ভারতবাসীরা, হিন্দুমুসলমান, পার্শি-খৃষ্টান,—সকলে সর্ব্ববিধ মনোমালিন্য ভুলিয়া, জাতিভেদ ভুলিয়া, বীণাপাণির মন্দিরে সমবেত হইয়া, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মায়ের পদে,

"সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ"

বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিতেছে। বাঙ্গালার

"হৃদিবৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী"

সঙ্গীত, আমি যেন শুনিতে পাইতেছি,—ঐ শুনুন,—ভারতের অপর প্রান্তে,—সুদূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—বাঙ্গালার শ্যামার ঔদাস্যপূর্ণ সঙ্গীত,—ঐ যেন রামেশ্বরের সিন্ধুতীরে মূর্চ্ছিত হইতেছে। আবার ঐ শুনুন,—মহারাষ্ট্রের মধুর গীতলহরী বাঙ্গালাভাষার মধ্যদিয়া আসিয়া, বঙ্গের প্রতিপল্লী মাতাইয়া তুলিতেছে। আমি যেন দেখিতে পাইতেছি,—ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে—স্বস্ব দেশের ভাষার যে ব্যবধান বা প্রাচীর ছিল, যাহার জন্য,—বাঙ্গালী—কৃষক—বা পল্লীবাসী, উৎকলের বা দ্রাবিড়ের পল্লী-সঙ্গীত বুঝিতে পারিত না, পরস্পরের ভাবের বিনিময়, সুতরাং প্রাণের বিনিময় করিতে পারিত না,—সেই ব্যবধান-প্রাচীর যেন ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন আর "পর পর" ভাব নাই, সব এক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর কণ্ঠে গুর্জ্জরের কণ্ঠ মিশিয়া, এক অভূতপূর্ব্ব স্বপ্নময় সঙ্গীতের প্রস্রবণ ছুটাইতেছে। আমি অনেক দূরে ভাসিয়া আসিয়াছি। এখন প্রস্তুতের অনুসরণ করি,—বলিতেছিলাম,—আমরা চেষ্টা করিব, ভারতে যে ক'টী বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে, তাহার সাহায্যে একটা ভাবগত একতা স্থাপন করিতে পারি কি না। আমি এবিষয়ে খুব আশ্বস্ত। ভারতবাসীর একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও আত্ম-সমর্পণের কথা যখন মনে করি, তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, যে, ভারতবাসীরা কোন কাজে অসমর্থ, তা' সে কাজ যতই দুষ্কর বা আয়াসসাধ্য হউক না কেন? পারাঞ্জপে-গোখ্‌লে-রাণাডে, রামমোহন-রবীন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র, প্রফুল্ল-জগদীশ-রাসবিহারী, বিবেকানন্দ-সুরেন্দ্রনাথ-সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতির দিকে যখন তাকাই, তখন আশায় আমি উৎফুল্ল হই। এপর্য্যন্ত এমন কোনও কাজ ত দেখিলাম না, যাহা কঠোর বা অসাধ্য বলিয়া ভারতবাসী ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। কাজ করিতে আসিয়াছি, করিয়া যাইব। সঙ্কল্পে যদি দোষ না থাকে, মনে যদি কলঙ্ক না থাকে, শত সহস্র মত্ত ঐরাবতেও আমাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না, মানুষ ত কোন্ ছার! এ সংসারে কেহ কাহাকেও কিছু করিয়া দেয় না, প্রকৃতপক্ষে দিতে পারে না। "Friends and patrons cannot do, what man himself should do"—কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—সত্য কথা। শুধু দৈহিক বল নহে, দৈহিক বলের সামর্থ্য অতি অল্প,—মানসিক বল চাই। মনের বলে বলীয়ান হও, দেখিবে, বিশ্ব তোমার সমক্ষে অবনত। একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াও, দেখবে জগৎ তোমার বশংবদ। কৈ—বনের পশু সিংহকে ত কেহ রাজপদে অভিষিক্ত করে না, সে কিন্তু নিজের মনের বিক্রমে সমগ্র পশুজাতির উপর রাজত্ব করিয়া থাকে।—

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।
বিক্রমৈর্জ্জিতসত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা॥
একোহহং অসহায়োহহং ক্ষীণোহহমপরিচ্ছদঃ।
স্বপ্নেহপ্যেবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে॥

সুতরাং—

"কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?"—

একবার ঐক্য-বদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও,—দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের ন্যায় এক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রতানুষ্ঠান কর,—সাফল্য নিশ্চিত। এই আশায় বিমুগ্ধ হইয়া,—যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত আমি কত-কি-না—ভাবিতেছি! আমি রাজনীতির কথা বলিতেছি না,—কেন না,—যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতীয় ভাবগত ঐক্য নাই,—যাহাদের চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত নহে, তাহাদের পক্ষে রাজনীতি-চর্চ্চা আপাততঃ উত্তেজিকা হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি,—শিক্ষার কথা, দীক্ষার কথা, ভাবগত একতার কথা। স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া, যাহার যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিয়া, কি করিয়া ভারতে—এক ভাব, এক চিন্তা, এক

সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কি করিয়া সমগ্র-ভারতে এক জাতীয়-সাহিত্যের নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, তাহাই আমার বক্তব্য। বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, নিস্পাপ, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া, ক্রমে, ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে, ইহাই আমার বক্তব্য। তাই বলিতেছিলাম—আমাদিগকে, নিপুণ-ভাবে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে এই ভাবগত, জাতীয় সাহিত্যগত একতার সমাধান করিতে পারি। যদি এই মহৎ কার্য্যের,—এই দুঃসাধ্য কার্য্যের সু-সম্পাদনের কোনো উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি,—যাহাতে, বিদ্যার্থীরা, প্রথমতঃ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কৃতিত্ব লাভের পর, ভারতীয় কতিপয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে, বাঙ্গালী,—বি, এ, এম, এ, উপাধিমণ্ডিত যুবক, দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া, বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে আরও দুই একটা ভারতীয় ভাষা, হিন্দি বা মারাঠি, উর্দ্দু বা তৈলঙ্গী ভাষা শিক্ষা করিবে, তাহা হইলে, ক্রমে, শিক্ষা-সমাপ্তির পর,— ঐ ঐ যুবক, পরকীয় ভাষায় অর্থাৎ ঐ হিন্দি বা মারাঠি ভাষায় সম্পদ্-সৌষ্ঠব ক্রমে বঙ্গভাষায় বিবর্ত্তিত ও বঙ্গভাষার সম্পদ্ বর্দ্ধিত করিতে পারিবে। যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় মহারাষ্ট্র উন্মত্ত, যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় হিন্দুস্থান আপনার ভাবে আজও আপনি নৃত্য করে, সেই উন্মাদনা বঙ্গভাষার শিরায় শিরায় বহাইতে পারিবে। বঙ্গের ধোয়ী, উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধন আর বাঙ্গালা ভাষাতেই "অন্তরীণ" থাকিবেন না, ভারতের বিভিন্ন দেশের ভাষাতেও তাঁহাদের মধুর বংশীরব শ্রুত হইবে। শুধু এক প্রদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রীতির প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না। ক্রমে ভারতের সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়েই এই ভাবে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোম্বাই-মান্দ্রাজ পাঞ্জাব-এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা, মাত্র বঙ্গে করিলে এই পারস্পরিক "রেসিপ্রোকাল" ফলের সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি এই ভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়,—তবে প্রতিবর্ষে, আমরা এমন ২।৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব, যাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া, ভারতের অপর ২।৪টী ভাষাতেও সুপণ্ডিত। এইরূপে কিছুকাল পরে, বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পরে, আজ যেমন ইংরাজীতে বি, এ, এম, এর অনেক লোক পাইতেছি, সেই প্রকার, স্বীয় মাতৃভাষা ত আছেই, তাহা ছাড়া, দেশীয় অপরাপর ভাষাতেও সুপণ্ডিত লোকের অভাব থাকিবে না। ফলে দাঁড়াইবে এই,—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, মতি-গতি, সমস্ত, ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। একদেশের যে সাহিত্য উত্তম, একদেশের যে কবিতা উত্তম একদেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য, তাহা অন্য দেশের ভাষায়, প্রবিষ্ট হইবে। সুগম সরল পথ প্রস্তুত করিতেই যত পরিশ্রম, একবার পথ প্রস্তুত হইলে, যদি সে পথে আপদ বিপদ না থাকে, তবে চলাচল করার লোকের অভাব কোন দিনই হয় না। এখন ভারতবর্ষে এই ভাবে জাতীয় শিক্ষার কোন বিশিষ্ট পথ নাই। যাহা আছে, তাহা সমস্তই লুপ লাইনের মত। এখন আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে কর্ড, ক্রমে গ্রাণ্ডকর্ড, ও পরে, গ্রেট্-গ্রাণ্ড-কর্ড নির্ম্মাণ করিতে হইবে। জানি, এ পথ তৈরি করিতে অনেক ডাইনামাইটের প্রয়োজন, অনেক উত্তুঙ্গ পাহাড় উড়াইয়া দিতে হইবে, অনেক টনেল নির্ম্মাণ করিতে হইবে, বড়ই আয়াস-সাধ্য। কিন্তু তা' বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তপস্যায় কি না হয়? অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ যে দেশের সাহিত্যের চিত্র, প্রহ্লাদের সমক্ষে, স্ফটিক স্তম্ভে নর-সিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব যে দেশের চিত্র, মৎস্যচক্র-ভেদ যে দেশের চিত্র, সে দেশে অসাধ্য কি? সে দেশে অবসাদ কিসের? প্রারম্ভের পূর্ব্বেই যত হিসাব-নিকাশ যত ইতস্ততঃ, একবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে, যদি মনের বল থাকে, তবে ষ্টিমরোলারের মত, সমস্ত উচ্চ-

নীচ সমান করিয়া চলিয়া যাওয়া বেশী কথা নহে। তোমার পিতৃপিতামহের নিত্য-জপের মন্ত্র একবার স্মরণ কর—

"একো বলবান্ শতং বিজ্ঞানবতামাকম্পয়তে,
বলেন বৈ পৃথিবী স্থিতা, বলং বাবতিষ্ঠস্ব।"

এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এতদিন পরে ভারতীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা এই এম, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ একটি মূলভাষা ও তাহার সহিত অন্ততঃ একটি ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। অর্থাৎ যিনি প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষা লইবেন, তাঁহাকে সেই সঙ্গে হিন্দি বা মারাঠি ও তেলগু বা গুজরাটি লইতে হইবে,—এইরূপ যিনি মারাঠি-ভাষা লইবেন, তাঁহাকে তৎ সংস্কৃত আর একটী ভাষা লইতে হইবে। —যদি যথার্থ অধ্যবসায়শীল উদ্যম-সম্পন্ন কর্ম্মঠ যুবক পাওয়া যায়, অন্ততঃ বৎসরে একটীও মিলে, তবে দশবছর পরে বাঙ্গালায় এমন দশজন শিক্ষিত ব্যক্তিও পাইব, যাঁহারা অবাধে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় যে সমস্ত অনর্ঘ গ্রন্থ আছে, তাহা আনিয়া, প্রতিভার সাহায্যে, বঙ্গভাষা খচিত করিতে পারিবেন। বাঙ্গালার সম্পদ অনেক বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে যদি ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও দেশীয় ভাষায় এম, এ, র ব্যবস্থা হয়, তবে বাঙ্গালার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা সেই সেই দেশের পক্ষেও খাটিবে। ফলে—সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাবগত একতার—সাড়া পড়িবে। পরস্পরের আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে। অদূর ভবিষ্যতে, ইংরাজী জানেনা, ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু দেশীয় ভাষা জানে,—তাহারাও ভিন্ন দেশের—মনোহর ভাব-সম্পদ উপভোগ করিতে পারিবে। জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্যবন্ধনের সূত্রপাত হইবে। তখন আর দ্রাবিড়বাসীকে, ইংরাজীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে না। নিজের নিজের মাতৃভাষায় অপর প্রদেশের কবিত্বসৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহারা কৃতার্থ হইবে।

বঙ্গের সুলেখক হারাণচন্দ্র বঙ্গ-ভাষায়, সংক্ষেপে মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যাবলীর কতকটা ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন,—ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া কি, উক্ত কবিবরের কাব্যসৌন্দর্য্যের কতকটা উপভোগ করেন নাই? নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথের নাটকাকারে অনুদিত গ্রন্থ পড়িয়া ও অভিনয় দেখিয়া কে না শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল? বিদেশীয় কবির বিদেশীয় ভাষায় লিখিত, বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ গ্রন্থের মাত্র অনুবাদ পাঠেই যদি এতটা তৃপ্তি হয়, তবে স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত, স্বদেশীয় কবির গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিজ মাতৃভাষায় পাঠ করিলে কতটা আনন্দ জন্মিতে পারে, তাহা সহৃদয়গণেরই বিবেচ্য। অবশ্য আমার এই মতই যে অবিসংবাদী, ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে এইরূপই একটা প্রণালীতে প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে। আমি জানি,—আমার এই প্রস্তাব—কর্কশ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারিবে না, আমি জানি, এই প্রস্তাবের উপর নানা প্রকার কল্পনাজল্পনা উঠিতে পারে,—আবার সেই সঙ্গে আমি ইহাও জানি, যে, কে কি বলিবে, ভাবিয়া কোন কাজ করিতে গেলে—আর কাজ করা হয় না।—

"সুদুর্লভাঃ সর্ব্ব-মনোরমা গিরঃ"

এই কবি বাক্য আমি বিস্মৃত হই নাই। আমার জীবনের চিরদিনের মটো—

"বিয়াত্মনস্তাবিদচারু নাচরম্
জনস্তু যদ্বেদ স তদ্বদিষ্যতি।"

আমাকে সর্ব্বদাই সবল করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। যদি কোন মনস্বী এই প্রস্তাবের উৎকর্ষবিধানের অনুকূল কোন প্রস্তাব করেন, সাদরে গ্রহণ করিব। নূতন পথে অনেক আবর্জ্জনা থাকিয়া যায়, অনেক কণ্টক—প্রথম প্রথম চোখ এড়াইয়া যায়, ক্রমে চলাচল করিতে করিতে তাহার উদ্ধার হয়। সুতরাং সাঁতার না শিখিয়া সাঁতরাইব না,—এই বুদ্ধি ভাল নহে। ওপারের ঐ সুন্দর নন্দন-বনে যাইতে হইলে, বাহুতে ভর করিয়া সাঁতার শিখিতে হইবে। দু'চারবার হয়ত, হাবুডুবু খাইবে, তাহাতে নিরাশ হইও না,—ভরসায় বুক বাঁধিয়া সাঁতরাইয়া যাও, পারে পৌঁছিতে

পারিবে, তখন তোমার সকল ক্লান্তি—সকল শ্রান্তি দূর হইবে। শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধ অঞ্চলে তুমি আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িবে।

এস্থলে একটা তর্কের মীমাংসা আবশ্যক মনে করিতেছি, তাহা এই :—এদেশে আজকাল ইংরাজীর ভূয়ঃ প্রচার হইয়াছে। জ্ঞানের জন্যই হউক, আর উদরের জন্যই হউক, অথবা আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই হউক,—সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। এরূপক্ষেত্রে, আবার নূতন করিয়া এই ভারতীয় ভাষার প্রচলনের প্রয়াস কেন? যে কার্য্যসাধনের জন্য এই প্রয়াস, সেই কার্য্য বা সেই উদ্দেশ্য ত অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইংরাজীতেই হইতে পারে, তবে এ শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শ কেন? ইহার উত্তরে, আমার মাত্র দুইটী কথা বলিবার আছে।

১ম টী—জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য-গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য। দশভুজার পাদপদ্মে রক্ত জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য। ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।

২য় কথা—ইংরাজী ভাষা আমাদের অর্থকরী হইলেও, ভারতের অধিকাংশ লোক,—ইতর-সাধারণ তাহা জানে না, বা এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না। সুতরাং ইংরাজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা। যদি তেলগু ভাষায় বা উৎকলীয় ভাষায় বাঙ্গালার রামপ্রসাদ-ভারত চন্দ্রের ভাব-সম্পদ্ ফুটাইতে পারা যায়, তবে তাহাতে, ইংরাজীতে যতটা ফললাভের আশা করা যায়, তদপেক্ষা লক্ষগুণ ফল যে অধিক হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুলসিদাসের রামায়ণ ইংরাজীতে তরজমা করিয়া আমরা কয় জনে পড়িয়া থাকি বা পড়িয়া প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারি? তাই আমার মনে হয়,—জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে, সকলকে এক-অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে, জাতীয়-সাহিত্যে একতা বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয়-সাহিত্যের মধ্যদিয়া করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্য্যন্ত এক ঊর্ণনাভের আনায়ে বেড়িয়া ফেলিতে হইবে। অন্যথা একীভাব অসম্ভব। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে, এখন যে খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্য আছে, তাহা এক বিরাট্ সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে। সমস্ত ভেদ মিটিয়া গিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখময় স্বপ্নময় সঙ্ঘের গঠন হইবে। তবে এই মহৎ কার্য্যে মহা ত্যাগ চাই। বড় জিনিষ পাইতে হইলে, খুব বড় রকমের ত্যাগ আবশ্যক। যদি আমাদের সেই ত্যাগের সময় আসিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, সেদিন আর দূরে নহে,—যখন ভারতের এক প্রান্তের একটি সঙ্গীতে অপর প্রান্তের প্রতিপল্লী সাড়া দিবে। আহা, সে অবস্থার কল্পনাতেও আমার কত না সুখ, কত না আনন্দ!

অবশ্য যে প্রণালীতে আমি ভারতীয় ভাষার আলোচনা করিতে বলিলাম, তাহাতে, ঠিক ভাষাগত একত্ব সাধিত হইবে না বটে, কিন্তু ভাবগত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্রভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে। যদি একবার সেই ভারত-প্লাবিনী বন্যার আবির্ভাব হয়, তবে তখন, সকল অবসাদ, সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদারের অভাব থাকিবে না। একের কান্নায় অপরে কাঁদিবে, একের অভ্যুদয়ে অপরে আনন্দিত হইবে। Unification of Language না হউক, unification of thought and culture নিশ্চয় জন্মিবে। সুতরাং সমগ্রভারতের সকল কেন্দ্রে, সকল পল্লীতে এক স্রোত প্রবাহিত হইবে। মরুভূমিও তখন সরস হইয়া উঠিবে! ইহা আমার স্বপ্ন নহে।

কেহ কেহ বলেন,—সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেননা—ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ অনিবার্য্য। তাই তাঁহাদের মতে অন্ততঃ হিন্দি ভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। যে কারণে, ইংরাজীভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সর্ব্বজনীন ভাষা

হইতে পারে না। ইংরাজীভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন,—প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া, অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে,—সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্রভারতের ভাষা করিতে গেলেও, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহার নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে। যে মধুরতার জন্য, যে প্রসাদগুণের জন্য, যে মনোহারিতার জন্য—বাঙ্গালাভাষা এক স্পর্দ্ধার বস্তু, তাহা ক্রমে সিকতারাশিতে বারিবিন্দুর ন্যায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে। অন্য প্রদেশের সম্বন্ধেও এই একই কথা। সুতরাং, আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক, —সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্দ্ধিত হউক,—শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোন বাধার প্রয়োজন নাই। কেননা, যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহারা বড়ই দুর্ভাগ্য, জগতে তাহাদের স্থান অতি অল্প, কালের অক্ষয়শিলাফলকে তাহাদের কথা খোদিত থাকে না, তাহারা প্রাতঃকুজ্ঝটিকার ন্যায়, অচিরকাল -মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া—অন্য প্রদেশবাসী-দিগকেও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হোক্। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রাহ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে,—ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া, ভারত একই লক্ষ্যের দিকে, সমবেত ভাবে অগ্রসর হইবে। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যের ধারা যাহাতে প্রতিহত হয়, দেশ-হিতৈষী কোন ব্যক্তিরই তাহা করা উচিত নহে।—আপনার ধর্ম্মে আপনিই যাহা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, তাহাকে ব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য বিরূপ করা কোনমতেই যুক্তি-সঙ্গত বা নীতি-সঙ্গত নহে। —আমার বক্তব্য ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে;—আমার মনে এত ভাব আসিতেছে, কল্পনা আমাকে এত দূর-দূরান্তরের মনোহর দৃশ্য দেখাইতেছে যে, আমি আত্ম-সংযম বা আত্ম-গোপন করিতে পারিতেছি না। আর আমি আত্মগোপন করিতে শিখিও নাই। তথাপি, অদ্যকার এই সাহিত্যের 'মহা-সম্মিলনে' আমি আর আপনাদিগকে বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করি না। আমি সাহিত্যসেবী নহি; বঙ্গসাহিত্যের সেবক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার আমি অধিকারীও নহি, তথাপি, ভালবাসিয়া আপনারা আমাকে যে অদ্যকার এই গৌরবের আসন প্রদান করিয়াছেন, সে জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

উপসংহারে বক্তব্য।—বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, দলাদলি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া, আপনারা এক মনে, এক প্রাণে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হউন্। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। এখনও মনে মন মিশাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, দুর্ব্বলকে কোলে তুলিয়া, সকলকে আপন করিয়া লইয়া এক পথে, এক যোগে যাত্রা করুন,—মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার সময়ে, মনে মালিন্য রাখিতে নাই। ব্রতানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সংযম করিতে হয়, ইহা আপনাদেরই শাস্ত্রের আদেশ। বহিঃসংযম অনাবশ্যক, হৃদয়ের সংযম করিয়া বাগ্‌দেবতার মন্দিরের সম্মুখীন হউন,—এই আমার প্রার্থনা। মন্দির-প্রবেশের পূর্ব্বে কেবল হস্ত পদাদি নহে, হৃদয়ও প্রক্ষালিত করুন,—এই আমার সবিনয় নিবেদন মনে রাখিবেন,—এই বিংশশতাব্দীতে জগতের গতি যে দিকে, আপনাদিগকেও সেই দিকে যাইতে হইবে। কেন না,—আপনারা জগৎ ছাড়া নন্। যাহা আজ স্বেচ্ছায় করিতে অনিচ্ছুক, কাল বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হইবে। ভগবানের

"কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্ মোহাত্ করিষ্যস্যবশোঽপি তত্"

বাক্য বিস্মৃত হইবেন না। আর সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিবেন,—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ, স জীবতি॥"

সভ্যগণ! ভারতবর্ষের, স্মরণাতীত কাল হইতে

জগতে যে প্রাধান্ত, বাহুবল তাহার কারণ নহে, জ্ঞানবল তাহার কারণ। দুঃখিনী ভারতভূমির সে শিক্ষা-দীক্ষা ক্রমে মন্দীভূত হইতেছে,—মার আমার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এখনও রোগের প্রতিকারের সময় আছে, বদ্ধপরিকর হইয়া আবার ভারতভূমিকে—সেই বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানগরিমায় বিভূষিত করুন। ত্রিশ কোটী কণ্ঠে একবার তারস্বরে "মা" বলিয়া ডাকুন,—মা'র আসন টলিবে। মা মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তখন আবার নবীন উষার স্বর্ণচ্ছটায় ভারত রঞ্জিত হইবে। অজ্ঞান-অবিদ্যার অবসাদ কাটিয়া যাইবে। হৃদয়ে বল করিয়া স্মরণ করুন—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

কিসের অবসাদ? কিসের সংশয়? কিসের সঙ্কোচ?—

"কবিরজভূমি এই না সে দেশ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে,—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয়?
যেখানে সরসী-কমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ-চাঁদের চাঁদিনী
গগন-ললাট ভাবায়ে বয়?
তবে মিছে ভয়, কেনরে সংশয়?
গাওরে আনন্দে পূরা'য়ে আশয়,—
যেরূপে মায়েরে কমল-আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দনবনে।"

—হেমচন্দ্র।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
ভবানীপুর, কলিকাতা।
৩ই বৈশাখ, ১৩২৬।

* হাওড়া সাহিত্যসম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

# যৌবনের সমাধি।*

প্যারী নগরের একটা ছোট বাড়ীতে জেকের সহিত ক্রেম্‌সাইনের প্রথম সাক্ষাৎ। তাহার দুইজনেই এক সময়ে সেখানে ঘর ভাড়া নিয়াছিল। একই বাড়ীতে থাকা সত্বেও প্রথম প্রথম তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দূরের কথা, একটা কথারও আদান প্রদান হয় নাই। কিন্তু দুইজনেই দুইজনের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল। ক্রেম্‌সাইন্ জানিত যে জেক একজন ভবঘুরে মা-তাড়ানো বাপ-খেদানো দরিদ্র যুবক—কিন্তু চিত্রকর। জেকও জানিত যে তাহার সুন্দরী প্রতিবেশিনীটি একজন সামান্ত পোষাক নির্ম্মাতা;—বিমাতার জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাকে দুইদিক বজায় রাখিবার জন্ত খুব হুশিয়ার হইয়া খরচ পত্র করিতে হইত। আমোদ প্রমোদ কি বস্তু সে তাহা জানিতনা; কাজেই আমোদ প্রমোদের দিকে তার কোন লিপ্সাই ছিলনা।

তাহারা একই দালানের দুইটী কোঠায় বাস করিত। —মাঝখানে একটা কাঠের দেয়াল থাকিয়া একটা ঘরকেই দুইটী ঘরে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু এমন একদিন আসিয়াছিল যেদিন দেয়ালের এই আক্রটাও তাহাদিগের নিকট খসিয়া গিয়াছিল।

সেদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া সন্ধ্যার সময় জেক্ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সারাদিন সে নিরাহারে কাটাইয়াছে—এক টুকরা রুটিও তাহার ভাগ্যে জুটে নাই। কি একটা অনিশ্চিত অহেতুকী বেদনার গভীর ছায়ায় পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। সে কেমন একটা অশান্তি বোধ করিতেছিল—ঘরের দেয়ালগুলি যেন তাহাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্ত এক পা' দুই পা' করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। জেক্ বাহিরের হাওয়া ঘরে ঢুকিবার জন্ত একটা জানালা খুলিয়া দিল।

সুন্দর সন্ধ্যা। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে অদূরে ছোট ছোট পাহাড় গুলি নীরব বেদনাক্লিষ্ট অথচ স্বপ্নের

*ফরাসী লেখক হেনরি মারগার হইতে।

মত মোহময় দেখাইতেছিল। জেক্ জানালার ধারে ভাবাক্রান্ত মনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই নিস্তব্ধ শান্ত সন্ধ্যায় পক্ষিগণের সুমিষ্ট কাকলি তাহার বেদনা পীড়িত হৃদয়কে যেন আরও বিষণ্ণ করিয়া তুলিল। সামনে একটা কাক উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাহার সেই পুরাকালের বাইবেলের কথা মনে পড়িল—বাইবেলের বায়সগণ নিঃসহায় এলিজাকে রুটি আনিয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইল, মানুষের মত আজ কালকার কাক গুলিরও তত দয়া দাক্ষিণ্য নাই!

জেক্ সশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ছিন্ন পর্দাটা টানিয়া দিল। লেম্পের তেল কিনিবার আন্দাজ পয়সা ছিলনা। সে একটা অল্প মূল্যের মোম জ্বালাইয়া অত্যন্ত বিষাদিত মনে তাহার পাইপটায় তামাক ভর্ত্তি করিল।

"সুখের বিষয় ধোঁয়ায় পিস্তলটা ঢাকিয়া ফেলিতে পারে এতটা তামাক এখনও আমার আছে।" এই বলিয়া জেক্ পাইপে মনঃসংযোগ করিল।

নিঃসম্বল চিত্রকরের পিস্তলটাই ছিল শেষ সম্বল। তামাকে দুই এক কোঁটা আফিমের আরক মিশাইয়া জেক্ ধূমপান করিত। যে পর্য্যন্ত না ধোঁয়ায় সেই ছোট ঘরটার সব জিনিষগুলি এবং দেয়ালে টাঙ্গান পিস্তলটা ঢাকিয়া না যাইত, সে পাইপ টানা বন্ধ করিত না। পিস্তলটা ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইলেই ধোঁয়া ও আফিমের কল্যাণে জেক্ ঘুমাইয়া পড়িত। তখন যেন সে এই দুঃখ পূর্ণ পৃথিবী ছাড়িয়া কোন একটা সুদূরে শান্তিময় স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

অন্ধকার সন্ধ্যায় কিন্তু পিস্তলটা অদৃশ্য হওয়া সত্বেও জেকের মানসিক নিস্তেজতা এবং বিষণ্ণতা দূর হইল না। অন্যান্য দিনের মত তাহার ঘুম আসিল না।

এদিকে ফ্রেন্সাইন্ খুব হর্ষচিত্তেই বাড়ী ফিরিল। অথচ এই দুই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার বিভিন্নতার কোনো সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান ছিল না। ফ্রেন্সাইনের হৃদয়ে একটু আনন্দ কণা যেন স্বর্গ হইতে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত নামিয়া আসিয়াছিল। সে একটা গান গাহিতে গাহিতে সিঁড়িয়া উপরে উঠিতেছিল। ঘরের দরজা খুলিতে না খুলিতেই একটা দমকা হাওয়ায় তাহার হস্তস্থিত আলোটা নিবিয়া গেল।

তরুণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"কি মুস্কিল! ফের্ নীচে যাও;—ফের্ অতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠ।"

সে জেকের দরজার ফাঁকে একটা আলোর রশ্মি দেখিতে পাইল। তখন কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া চিত্রকরের নিকট হইতে আলো চাহিয়া আনিতে ইতস্ততঃ করিল না। মনে মনে ভাবিল—"এরূপ অবস্থায় একে অন্যের সাহায্য করে'ই থাকে। তার ঘরে ঢুকতে আর দোষটা কি?"

ফ্রেন্সাইন্ দরজায় দুইটা টোকা দেয়া মাত্রই জেক্ দরজা খুলিয়া দিল। রাত্রিবেলায় নিভৃত ঘরে তরুণীকে দেখিয়া সে প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল।

ফ্রেন্সাইন্ ঘরের মধ্যে পা বাড়াইবা মাত্র জেকের পাইপ্ উদগীর্ণ ধূমে তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। তাহার একটা কথা বলিবারও ফুরসুৎ হইল না—সে ধুপ্ করিয়া একটা চেয়ারের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার হাতের মোমটা এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

তখন রাত অনেক। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। দশজনে ফ্রেন্সাইন্কে কি মনে করিবে এই ভাবিয়া জেক্ আর কাহাকেও ডাকিল না। ঘরে বাতাস খেলিবার জন্য জানালাটা খুলিয়া দিয়া জেক্ ফ্রেন্সাইনের মুখে চোখে জল ছিটাইয়া দিল। ক্রমে ফ্রেন্সাইনের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল;—সে চোখ মেলিয়া চাহিল। তরুণী তখন সলজ্জস্মিত হাস্যে জেকের নিকট তাহার আগমনের কারণ বুঝাইয়া দিল। এবং তাহাকে অযথা কষ্টদিয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিল।

ফ্রেন্সাইন্ কহিল—"আমি এখন ঘরে যাচ্ছি।" জেক্ দরজা খুলিয়া একপাশে দাঁড়াইল। তখন তরুণীর মনে হইল যে মোমটাও জ্বালান হয় নাই, চাবীটাও হাতে নাই!

সে কহিল—"কি বোকা আমি! আলোর জন্যেই আসা, আর আলো না নিয়েই চলে যাচ্ছি!"

ঠিক সেই সময়ে বাহিরের বাতাস খোলা দরজা ও জানালা দিয়া আসিয়া ঘরের আলোটাকে নিবাইয়া দিল।

দুইজন তখন অন্ধকারে।

ফ্রেন্‌সাইন্ কহিল—"এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয় যে আলোটা কেউ দুষ্টুমি করেই নিবিয়ে দিলে। আমি আপনাকে যথেষ্টই কষ্ট দিচ্ছি; মাপ করবেন, মহাশয়! অনুগ্রহ করে আলোটা জেলে দিন—দেখি চাবিটা কোথায় আছে।"

"এই যে দিচ্ছি।"—জেক্ দেশালাইয়ের জন্য পকেটে হাত ভরিয়া দিল। পকেটে দেশালাই ছিল, কিন্তু তাহার মাথায় কি একটা খেয়াল চাপিল। জেক্ কহিল—"ওঃ! কি বিপদেই না পড়া গেছে! দেশালাইয়ে যে একটা কাঠিও নেই!"

সে নিজের বুদ্ধিকে তারিফ্ করিয়া মনে মনে কহিল "এটা একটা চমৎকার চাল!" ফ্রেন্‌সাইন কহিল—"কি আশ্চর্য্য! অবশ্য আলো ছাড়া আমি সহজেই ঘরে যেতে পারি; ঘরটা ত আর অত বড় নয় যে রাস্তা হারিয়ে যাব! কিন্তু চাবিটে যে আমার চাইই। মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমার একটু সাহায্য করুন; চাবিটে নিশ্চয়ই এখানে কোথাও পড়ে আছে।"

জেক্ কহিল—"আসুন, তালাস করি।" তাহারা হারানো চাবিটার জন্য অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিল। ব্যাপারটা এই হইল যে, মিনিটে দশবার হাতে হাতে ঠুকাঠুকি হইতে লাগিল। কিন্তু চাবি পাওয়া গেল না।

জেক্ কহিল—"চাঁদের আলো আমার ঘরে আসে। একটু অপেক্ষা করুন; চাঁদ উঠ্‌লেই চাবিটে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।"

অগত্যা চাঁদ না উঠা পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিতে হইল। এবং সময় কাটাইবার জন্য গল্প জুড়িয়া দিল।

এরূপ গল্প—যুবক যুবতীর মধ্যে—অন্ধকারে—নিভৃত ছোট ঘরে—বসন্তের গভীর নিঝুম রাতে—চলিতে লাগিল। গল্প চলিল প্রথমে অতি সাধারণ বাজে কথায়। ক্রমে উভয়ের হৃদয়ের গোপন কক্ষও ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে লাগিল। এক একটি কথার পাছে এক একটি দীর্ঘ শ্বাস! ক্রমে ব্যাকুল হৃদয়ের জমাট ভাব উষ্ণ অথচ মৃদু করস্পর্শে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল।

ঘণ্টা খানেক পরে আকাশে চন্দ্র প্রকাশিত হইল—জোৎস্না ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ফ্রেন্‌সাইন্ চিন্তা স্রোতে বাধা পাইয়া চমকাইয়া উঠিল এবং ছোট একটী অব্যক্ত শব্দ তাহার ওষ্ঠ যুগল হইতে বাহির হইয়া গেল।

জেক্ এক হাতে তাহার ক্ষীণ কটি বেষ্টন করিয়া কহিল—"ফ্রেন্‌সাইন্, তোমার কি হয়েছে?"

ফ্রেন্‌সাইন্ আবেশ জড়িত কণ্ঠে কহিল—"কি-চু-না। আমার মনে হ'ল কে যেন দরজাটায় ঘা দিচ্ছিল।"

সে তখন চাঁদের আলোকে দেখিতে পাইল তাহার সাম্‌নেই চাবিটা ঝক্‌মক্ করিতেছে। ফ্রেন্‌সাইন্ তাড়াতাড়ি চাবিটা পায়ে ঠেলিয়া মেঝের একটা ফাটলে ঢুকাইয়া দিল। চাবিটার জন্য তখন আর তার তত ব্যগ্রতা ছিল না।

*　*　*　*　*

( ২ )

ফ্রেনসাইন পীড়িত, দুরন্ত ক্ষয় রোগে তাহার কমনীয় সুন্দর চেহারা একপক্ষ মধ্যেই শীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ফ্রেনসাইন বেশ জানিত এই রোগ চিকিৎসকের অসাধ্য—তাহার আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। জেক্ ফ্রেন্‌সাইনকে প্রতিদিন দেখিয়াও বুঝিতে পারে নাই যে প্রণয়িনীর সহিত তাহার সংসারের খুলা খেলা আরম্ভ না হইতেই এতশীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে! মোহান্ধ মানুষ জীবনের কঠোর বাস্তবতা হইতে ইচ্ছা করিয়াই চোখ ফিরাইয়া আনে;—কি জানি সুখ-স্বপ্নের মোহ যদি টুটিয়া যায়!

জেকের একজন ডাক্তার বন্ধু যখন তাহাকে কহিল—"বসন্তের সবুজ পাতা যখন ঝরে' যাবে পানীকে আর তখন ধরে রাখতে পারবেনা"—তখন চতুরা ফ্রেন্‌সাইন্ লক্ষ্য করিয়াছিল ডাক্তারের ইঙ্গিতটা তাহার বন্ধুর মুখে কতটা বেদনা এবং নিরাশার কালি ঢালিয়া দিল।

মধুর তরল হাসিতে তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্তখানি ভালবাসা আনিয়া জেক্‌কে ফ্রেন্‌সাইন কহিল—"শুক্‌নো পাতার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? ওসব বাজে চিন্তা তুমি করো না। আমরা যে এখনও বসন্তের শেষে।—

গাছের পাতা সব সবুজ;—পীতের লেশ মাত্রও নেই! এত কাঁদ্‌লির দরকার কেন? বর্ত্তমানে ভগবান আমাদের যা দিয়াছেন, এস, আমরা তাই নিয়ে সুখে থাকি। ওগো, আমার বাধার সময় হ'লে তুমি আমায় নিষেধ করো। তোমার কথা ঠেলে' আমি কি কোথাও যেতে পারি।"—এইভাবে ফ্রেনসাইন্ জেক্‌কে প্রতিদিন সান্ত্বনা দিত।

ডাক্তার বন্ধু জেক্‌কে একদিন কহিল—"ফ্রেন্‌সাইনের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। তার বিশেষ তত্ত্ব-তালাপি দরকার।"

তখন জেকের চৈতন্য হইল। সে সমস্ত প্যারী সহর হাটাহাটি করিয়া ডাক্তারের পরামর্শ মত ঔষধ সংগ্রহ করিল। ফ্রেন্‌সাইন কিন্তু বরাবরই বলিত তাহার কিছুই হয় নাই। সে জেকের আনা ঔষধের শিশি গুলি জানালা দিয়া নরদামায় ফেলিয়া দিত। রাত্রে যখন ফ্রেন্‌সাইন কাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন সে ঘর ছাড়িয়া নীচে সিঁড়ি কোঠায় নামিয়া যাইত;—পাছে জেক্ তাহার কাসির শব্দ শুনিতে পায়।

একদিন তাহারা সহরের বাহিরে বেড়াইতে গিয়া দেখিল যে একটা গাছের প্রায় সবগুলি পাতাই পীত হইয়া আসিয়াছে। জেক্ বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফেল্‌ফেল্ করিয়া তার প্রণয়িনীর দিকে চাহিয়া রহিল। ফ্রেন্‌সাইন ধীরে ধীরে চিন্তিত মনে হাটিতেছিল। জেক্ কেন হঠাৎ ম্রিয়মাণ হইয়া গেল তাহার বুঝিতে দেরী হইল না। সে তাহার শীতল ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া কহিল—"কি বোকা তাই, তুমি! আমরা যে এখনও জুলাই মাসে! পাতাঝরা অক্টোবরের যে এখনও ঢের দেরী। আমাদের গভীর ভালবাসা এই তিন মাসকেই যে ছ'মাসের সামিল ক'রে দেবে! তা ছাড়া পাতাগুলি পীত হয়ে ঝরে পড়লেই যদি আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, বা তোমার পাখী উড়ে যাবে বলে মনে ভয় হয়, তবে তার পূর্ব্বেই আমরা বরং একটা পাইন বনে গিয়ে বাস করবো। পাইনের পাতা সব সময়েই সবুজ থাকে। পীত হবার আশঙ্কা নেই।

* * * * *

(৩)

অক্টোবর মাসে ফ্রেন্‌সাইনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। সে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিত না। জেকের ডাক্তার বন্ধু তাহাকে দেখিতে আসিত।

তাহারা যে ঘরটায় থাকিত সেটা সমস্তের উপরের তালায় ছিল। সেই ঘরের জানালা দিয়া দেখা যাইত রাস্তার পাশে একটা গাছের পীত পাতা গুলি একটা একটা করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্যটা ফ্রেন্‌সাইনের দৃষ্টি বহির্ভূত করিবার জন্য জেক্ জানালার সামনে একটা পর্দা টানাইয়া দিল। ফ্রেন্‌সাইন তাহা দেখিয়া মিষ্টি হাসিয়া বলিত—"ওগো ঐ গাছে যতগুলি পাতা আছে তার শতগুণ বেশী চুমোয় আমি তোমাকে আচ্ছন্ন করে দেবো।" তারপর একটু থামিয়া কহিত—"আমিত এখন অনেকটা ভাল আছি। দেখো, দু'এক দিনের মধ্যেই ঠিক হেটে বেড়াতে পারবো। কিন্তু এত ঠাণ্ডায় ত আর বের্ হওয়া যাবেনা।—তুমি না বলেছিলে আমায় একখানা শাল এনে দেবে?"

সে সমস্ত সময়ই তাহার প্রিয়তমের প্রতিশ্রুত শালটার কথা ভাবিত। স্বপ্নেও দেখিত সেই শাল।

"অল্-সেইন্টস্-ডে" পর্ব্বের পূর্ব্বদিন জেক্‌কে অত্যন্ত ম্রিয়মান দেখিয়া ফ্রেন্‌সাইন তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় ডাক্তার আসিয়া রোগীণীকে সযত্নে শয্যায় শোয়াইয়া দিল।

ডাক্তার জেকের কানের কাছে মুখ নিয়া কহিল—"জেক, বুক বাধ। মনের বল হারিওনা। সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফ্রেন্‌সাইন—"

জেকের দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল ঝরিতে লাগিল।

ডাক্তার আবার কহিল—"ফ্রেন্‌সাইন যাহা চায় সময় থাক্‌তে এনে দাও।"

ফ্রেন্‌সাইন ভাবে ইঙ্গিতে বুঝিল, ডাক্তার জেক্‌কে কি বলিতেছে। জেকের প্রতি তাহার ক্ষীণ হাত দুটী প্রসারিত করিয়া কহিল—"জেক তুমি ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করোনা। সে মিথ্যা বলছে। আমরা আগামী কল্য একসাথে বেড়াতে যাব—অল্-সেইন্টস্‌ডে'! ভারী মজা হবে কিন্তু! ঠাণ্ডাটা হয়ত খুবই পড়্‌বে। যাও আমার জন্য শালখানা নিয়ে এস ত।"

জেক্ ডাক্তারের সহিত বাহিরে যাইতেছিল। ফ্রেনসাইন ডাক্তারকে বসিতে বলিল, তারপর জেকের দিকে উৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া হাসিতে মধু ঢালিয়া কহিল —"বুঝলে জেক্। সব চেয়ে ভাল শালখানা আমার চাই। অনেক দিন টেঁকা চাই কিন্তু! যাও যাও নিয়ে এস এক্ষুনি!" হায়, তার হাসিটার পিছনে অশ্রুর ঝরণা গোপনে ছিল।

তখন ফ্রেনসাইন ডাক্তারকে নিরিবিলি পাইয়া কহিল —"মহাশয়, আমি বেশ জানি আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। আমার একমাত্র অনুরোধ আর শুধু একটী দিনের জন্ত আমাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী করে দিন। আমার আর কিছুই কামনা নেই। ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হোক।"

ডাক্তার যখন তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতেছিল তখন পূর্ব্ব উত্তর কোণের একটা দমকা হাওয়া হুহু করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং সেই রাস্তার পাশের গাছটি হইতে একটী পীতবর্ণের পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া ফ্রেনসাইনের শয্যার উপর ফেলিয়া দিল। ফ্রেনসাইন জানালার পর্দ্দাটা সরাইয়া দেখিল, গাছটায় আর একটীও পাতা নাই—ডালাগুলি সব কঙ্কালের মত পত্রহীন হইয়া খা খা করিতেছে।

"শুধু এই পাতাটাই অবশিষ্ট ছিল।"—বলিয়া সে পাতাটাকে উপাধানের নীচে রাখিয়া দিল।

ডাক্তার কহিল—"তুমি আরো এক রাত্রি বেশী বাঁচ্‌বে।"

তরুণীর রোগ-ম্লান মুখ খানি ছাপিয়া একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—"আঃ বাঁচা গেল, মহাশয়! শীতের রাত যথেষ্ট লম্বা হবে, নয়?"

জেক্ শাল নিয়া ফিরিয়া আসিল।

ফ্রেন্‌সাইন কহিল—"বাঃ! চমৎকার হয়েছে? বাইরে যাবার সময় আমি এটা গায় দেবো। যে শীত!"

তারপর দিন 'অলসেইন্টস ডে'তে—যখন গির্জ্জার ঘড়িটা বাজিতেছিল—ফ্রেন্‌সাইন শেষ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িল। তার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কচি মুখ খানা বরফের মত শাদা হইয়া গেল। সে অস্পষ্ট স্বরে কহিল—"আমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শালটা দাও ত!" সে তার ফুলের মত নরম, অথচ ঝরা ফুলের মত পাণ্ডুর হাত দুটী শালের ভিতর ভরিয়া দিল।

ডাক্তার কহিল—"যন্ত্রণার লাঘব হয়েছে। ফ্রেন্‌সাইনকে চুম্বন কর, জেক্।"

মাতালের মত টলিতে টলিতে জেক্ তাহার তরুণী প্রণয়িনীর হিমের মত শীতল পাতলা ঠোঁট দুখানির উপর আপনার সঙ্কুচিত অধর স্থাপন করিয়া তাহার শেষ প্রণয়-নিদর্শন আঁকিয়া দিল।

* * * * *

( ৪ )

শেষ সময়ে তাহারা তাহার শাল খানাকে হস্তচ্যুত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ফ্রেন্‌সাইন শালটা জোর করিয়া মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া কহিল—"না, না, আমার কাছেই এটা থাক্। এই শীতকাল—যে ঠাণ্ডা!"

তারপর মৃণালের মত কোমল বাহুতে জেকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবেগ-ভরা কণ্ঠে কহিল—"হায়, জেক্, জেক্! ওগো, আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম জেক্ তোমাকে আমি কার কাছে রেখে যাচ্ছি? বিদায়, বিদায়, জন্মের মত বিদায়! হা ভগবান!" তাহার সাগর-নীল নয়নের কোণে রৌদ্রস্নাত শিশিরের মত দুই বিন্দু অশ্রুজল ঝল্‌মল্ করিতেছিল!

* * * * *

নীরব প্রার্থনার পরে প্রতিবেশীরা শবাধার কাঁধে বহিয়া সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া গেল। সকলে কবরের চারি ধারে অনাবৃত মস্তকে রহিল। জেক্ সমাধির ঠিক কিনারায় শুষ্ক মুখে উদাস নয়নে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার হাত ধরিয়া ডাক্তার বন্ধু পাশেই ছিল। ডাক্তার জেকের বুকভাঙ্গা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বলিতে শুনিয়াছিল— "এরা আমার যৌবনের সমাধি দিচ্ছে।"

* * * * *

শ্রীজগদীশ রঞ্জন ঘোষ।

## বাসন্তী।

( ১ )

নীল নীরদের ওড়্না গায়ে অই এলরে সুন্দরী!
নিশ্বাসে তার হাস্নুহানা ফুটছে দিবস শর্ব্বরী!
তার অলকের গন্ধ পেয়ে,
কুঞ্জে কোকিল উঠ্‌ছে গেয়ে,
ফুলের গালে মৌমাছিরা খাচ্ছে চুমা গুঞ্জরি'!
নীল নীরদের ওড়্না গায়ে অই এলরে সুন্দরী!

( ২ )

দখিণ হাওয়ায় পরশ পেলাম সুখ জেগেছে বুক-ভরা!
পাখীরা সেই সাক্ষী দিল—কেউ নহে আজ মন-মরা!
হৃদয়-মাঝে সারং বাজে,
সুখের সোয়াদ সকল কাজে,
ফুট্‌ছে আকুল আমের মুকুল, ফিরছে বনে অপ্সরা!
দখিণ হাওয়ায় পরশ পেলাম, সুখ জেগেছে বুক-ভরা!

( ৩ )

চন্দ্র-তারার রন্ধ্র দিয়ে আলোক দেখি লক্ষ রে!
আজ্‌কের মত কিরণ লেগে কাঁপ্‌লো কবে বক্ষরে!
ঘরে এল চাঁদের আলো,
ইচ্ছা করে বাসি ভালো,
জ্যোস্না যে তার দেহের বরণ, তাইতো বাঁচি সখ্যরে!
চন্দ্র তারার রন্ধ্র দিয়ে আলোক দেখি লক্ষ রে!

( ৪ )

তোমার সাথে মিলন যে গো প্রাণের গভীর অন্তরে!
নইলে কি আর রূপ-সাগরে হৃদয় সদা সন্তরে!
সবুজ গাছের কচি পাতায়,
তোমার আঁচল অই যে লুটায়,
তরুণ হিয়া স্বপন দেখে তোমার প্রেমের মন্তরে!
তোমার সাথে মিলন যে গো প্রাণের গভীর অন্তরে!

( ৫ )

হায় কুহকী করলে একি, আর তো আমি অন্ধ না!
মাটির 'পরে মাথা রেখে কর্‌বো তোমার বন্দনা!
কত করি তোমায় দেখে,
সব মিলন সকল রেখে,
হাত মুখে সইল সুখে সংসারে দুখ্-যন্ত্রণা!
হায় কুহকী করে একি, আরতো আমি অন্ধ না!

( ৬ )

মোহর মানিক তুচ্ছ মানে রূপের মধুমক্ষিকা!
হিয়ার মাঝে এলে যখন জ্বালাও প্রেমের বর্ত্তিকা!
লো রূপসি, লো ললিতা,
আকন্দ-পাতা হয়নি বৃথা,
ধন্য জীবন—ধন্য ভুবন—ধন্য দেশ মাতৃকা!
মোহর মানিক তুচ্ছ মানে রূপের মধুমক্ষিকা!

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

## প্রেমের তত্ত্ব।*

ঝরণা মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর সনে
সমীরের সাথে সমীর মিশিছে
প্রাণের আবেগে তারকা বনে।
এ নিখিলে কেহ নহিত একেলা
বিধির এমন বিধান ধ্রুব
সবাই মিলিছে তব সনে মম
কেন নাহি হবে মিলন শুভ?
হের ঐ গিরি চুমিছে গগন
কোলাকুলি করে লহরী গুলি
প্রকৃতি জননী করে নাক ক্ষমা
ফুলে ফুল যদি না পড়ে ঢুলি।
সিন্ধুরে চুমে ইন্দু জ্যোছনা
রবিকর চুমে শ্যামলা ভূমি
এত যে চুমায় কিবা আসে যায়
যদি নাহি চুম' আমারে তুমি?

শ্রীকালিদাস রায়।

* Shelly র Philosophy of Love হইতে।

Printed by Satish Chandra Rai, at the Jagat Art Press, Dacca
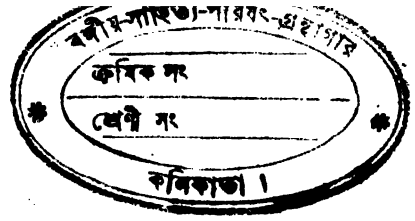
# সৌরভ

সপ্তম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। | অষ্টম সংখ্যা।

## অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

মনীষী মহর্ষিগণ নিখিল জীবের সুখ দুঃখাদি লাভের বিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার একের নাম অদৃষ্ট, অপরের নাম পুরুষকার।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মরাশির নাম অদৃষ্ট। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত শুভাশুভ কার্য্য করিয়াছি, ইহ জন্মে তদনুরূপ ফল উপভোগ করিতেছি।

আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই জন্মান্তরার্জ্জিত কর্ম্মের দোহাই দিয়া আসিতেছেন। কবি শ্রীশিহ্লন তাঁহার গ্রন্থারম্ভে অন্যকেহর নমস্কার না করিয়া এই কর্ম্মের নমস্কার করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—"নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি" আমি সেই কর্ম্মকে নমস্কার করি, ঈশ্বরের বিধানও যে কর্ম্মের অধীন, অর্থাৎ ঈশ্বরওযে কর্ম্মের প্রতিকূলে ফলদান করিতে পারেন না বা করেন না।

জগতে এক শ্রেণীর লোক এই কর্ম্মের এত পক্ষপাতী যে তাঁহারা একমাত্র অদৃষ্টকেই ফল লাভের মুখ্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জগতে ভালমন্দ যাহা কিছু দেখি, তাহার সমস্তেরই মূল একমাত্র অদৃষ্ট। বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মের নাম পুরুষকার, একমাত্র অদৃষ্টবাদীদিগের মতে এই পুরুষকারের কিছুই কার্য্যকারিতা শক্তি নাই। ইহারা বলেন, যখন চক্ষুর উপরে দেখিতেছি অদৃষ্টের স্রোতে পুরুষকার ভাসিয়া যাইতেছে, মানব শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় কার্য্যে ফল লাভ করিতে পারিতেছেন না। আবার অনেক সময় বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমে অভিপ্সিত ফললাভ করিয়া মানব সুখভোগ করিতেছে, তখন পুরুষকারের কার্য্যকারিতা স্বীকার করিব কিরূপে?

জীব মাত্রেরই ইচ্ছা, আমার সুখ হউক। সুখের জন্য জগৎ লালায়িত, সুখ ভিন্ন দুঃখ কেহ চায়না, তবু লোকের দুঃখ যায় না কেন? আবার যাহারা সুখের জন্য কোন চেষ্টাই করে না তাঁহারাই বা বিপুল সুখের অধিকারী হয় কেন? অতএব অদৃষ্টই সমস্তের মূল। অদৃষ্টের প্রতিকূলে দেহ মন বুদ্ধি খাটাইয়া ২৪ ঘণ্টা মাথার ঘাম পায় ফেলিলেও কোনও ফল হয় না, হওয়ার আশাও বৃথা। একঘেয়ে অদৃষ্টবাদীদিগের মত এইরূপ।

আবার যাহারা একমাত্র পুরুষকারবাদী তাঁহারা বলেন, অদৃষ্ট আবার কি? জন্মান্তরীয় কর্ম্মের নাম অদৃষ্ট জন্মান্তরের অস্তিত্বে প্রমান কোথায়? আমরা যে জন্মের পূর্ব্বেও দেহধারী ছিলাম, আবার মৃত্যুর পরেও নূতন দেহ ধারণ করিতে হইবে, ইহার কি কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে? কিছুই নাই, অনুমানও এবিষয়ে খাটে না।

যেহেতুক অনুমান প্রত্যক্ষমূলক, আমরা যাহার সহিত যাহার ঘনীষ্ঠ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং দেখিতে দেখিতে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, পরে তাহার একের দর্শনে অন্যের জ্ঞানের নাম অনুমান। এইরূপে কার্য্যের দ্বারা কারণের ও কারণের দ্বারা কার্য্যের অনুমান হয়।

যেমন আমরা চিরকাল যেখানে ধূম দেখিয়াছি, সেই খানেই তাহার মধ্যে বহ্নি দেখিয়াছি। দেখিতে দেখিতে সংস্কার জন্মিয়াছে যে বহ্নি ব্যতীত ধূম থাকে না। যেখানে ধূম থাকিবে সেখানে অবশ্যই তাহার মূলে বহ্নি

থাকিবে। সুতরাং এখন আমরা কেবল ধূম দেখিলেই তাহার মূলে বহ্নি আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি।

এইরূপে কুম্ভকারকে কুম্ভ প্রস্তুত করিতে দেখিয়া আমার সংস্কার জন্মিয়াছে যে কর্ত্তা না থাকিলে কুম্ভ প্রস্তুত হয় না সুতরাং এখন আমি কেবল কুম্ভ দেখিয়াই উপলব্ধি করিতে পারি যে এ কুম্ভেরও পূর্ব্বদৃষ্ট কুম্ভের ন্যায় একজন কর্ত্তা আছে। যিনি কোনও দিনও ধূম ও বহ্নির একত্র সমাবেশ দেখেন নাই এবং কুম্ভকারকে কুম্ভ প্রস্তুত করিতে দেখেন নাই, তাহার কখনও ধূম দর্শনে বহ্নির ও কুম্ভ দর্শনে কুম্ভকারের অনুমান হয় না। সুতরাং অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক।

অদৃষ্টের অনুমান প্রত্যক্ষ মূলকও নহে। সুতরাং অনুমানে অদৃষ্ট জ্ঞান হয় না। পক্ষান্তরে যদি জন্মান্তর থাকিত তবে পূর্ব্ব জন্মের কোনও একটা ঘটনা বা কার্য্য স্মরণশীলবুদ্ধিমানদিগের মধ্যে অবশ্যই ব্যক্তি বিশেষের স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল. তাহা যখন নাই, তখন জন্মান্তরই নাই বলিয়া অনুমিত।

চক্ষের উপর দেখিতেছি সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি, রোগ, স্বাস্থ্য সমস্তই ইহজন্মের চেষ্টা দ্বারা ঘটিতেছে।

যিনি লেখা পড়া শেখেন তাহার বিদ্যা জন্মে, যিনি না শিখেন তিনি মূর্খ থাকেন। যিনি স্বাস্থ্য রক্ষা করেন, তিনি নীরোগ, আর যিনি তাহা করেন না, তিনি রোগী।

যাহার যেরূপ বিদ্যা ও যিনি যেরূপ অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগী তাহার সেরূপ অর্থোপার্জ্জন ঘটিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে ঐহিক চেষ্টা দ্বারাই যখন অবস্থার তারতম্য দেখিতেছি, তখন অনমুভূত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কাপুরুষের কার্য্য।

যেখানে চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ হয় না, সেখানে চেষ্টাই উচিত রূপ হয় নাই বলিয়া মনে করিতে হইবে। অদৃষ্ট দোষে ফল হইল না বলিয়া কল্পনা করা অযৌক্তিক। তাই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

যত্ন করিলেও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে সেই যত্নেই কোনও দোষ আছে জানিবে।

পুরুষকার বাদীদিগের এই সকল কথা অদৃষ্টবাদীগণ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। তাহারা বলেন জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বলিয়া কি জন্মান্তর নাই? বলিব। এই জগতে প্রত্যক্ষ গোচর অতি অল্প, বহুল বস্তুই অপ্রত্যক্ষ, অথচ অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। যাহা প্রত্যক্ষে পাই না, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে বুদ্ধি বিভ্রাটের পরিচয় দিতে হয়। আমরা অতিদূরে কিছু দেখি না, অতি সূক্ষ্ম বস্তুও দেখি না, তাই বলিয়া উহা নাই বলিতে পারি না, না থাকিলে দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণেরসাহায্যে দেখি কি রূপে? দিবসে সূর্য্যালোকে নক্ষত্র মণ্ডল দেখি না, ভিত্তির অপর পৃষ্ঠের বস্তু দেখি না, দূরের শব্দ শুনি না, দূরস্থ বস্তুর ঘ্রাণ পাই না, তাই বলিয়া কি ঐ সকল বস্তু নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইব?

অনেকেই প্রপিতামহ বৃদ্ধ প্রপিতামহকে নিজের চক্ষে দেখেন না, তাই তাহারা আদতেই ছিলেন না বলিতে হইবে? যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া থাকি, সেই ইন্দ্রিয়গুলিও আমাদের অপ্রত্যক্ষ, ইহাতে কি আমাদের চক্ষুঃ কর্ণাদি নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? যেরূপ ইন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ হইলেও দর্শনাদি কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অনুমান হয়, সেইরূপ জন্মান্তর অপ্রত্যক্ষ হইলেও জগতের অবস্থা দর্শনে যুক্তি অনুমান প্রভৃতি দ্বারা জন্মান্তর ও অদৃষ্টের অনুভূতি হইয়া থাকে।

এই জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ অল্পায়ুঃ, কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য ইত্যাদিরূপে অবস্থার তারতম্য চিরদিন পরিলক্ষিত হইতেছে; এই বৈচিত্র্য ঈশ্বর ইচ্ছায় ঘটিয়াছে বলিলে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ আসে।

ঈশ্বর কিন্তু সর্ব্বভূতে সমদর্শী; ইচ্ছা করিয়া কাহাকে সুখী কাহাকে দুঃখী করেন নাই, জীব নিজ নিজ অদৃষ্টানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

যাহারা বলেন ইহ জন্মের চেষ্টা যত্নের তারতম্যেই অবস্থার তারতম্য ঘটিতেছে, তাহাদের বাক্য অতীব অকিঞ্চিৎকর। যেহেতু আমরা শত শত স্থানে দেখিতেছি, চেষ্টা যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটী নাই অথচ ফল তাহার ফলিতেছেনা। আবার বিনা চেষ্টায় অতুল, ঐশ্বর্য্য অতুল সুখ লাভ হইতেছে।

যদি পুরুষকারের বলেই সুখ সম্পদ ঘটিত, তবে পোষ্যপুত্রগণ বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয় কিরূপে।

অপিচ। আমরা দেখিতেছি, অনেক সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে রোগ নিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। যদি স্বাস্থ্য রক্ষাই আরোগ্যের কারণ হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তান ( যাহার কোন কর্তৃত্ব নাই ) সে কোন স্বাস্থ্য ভঙ্গের ফলে গর্ভ মধ্যে ও ভূমিষ্ঠ হইয়া রোগ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। যদি বল পিতা মাতার রোগ সন্তানে সংক্রামিত হয়, ইহাও যুক্তি সঙ্গত নহে। কারন পাপ ও নিয়ম ভঙ্গ করিল জনক জননী, আর তাহার ফল ভোগ করিল নিরপরাধ বালক, ঈশ্বরের বিচারে এইরূপ উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে পড়েনা।

অপিচ! দেখা যায় এক পিতা মাতার নানা প্রকৃতির সন্তান জন্মিয়া থাকে ; কেহ নির্ব্বোধ, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ গৌর, কেহ কৃষ্ণ, কেহ সত্বগুণ প্রবল, কেহ রাজসিক, কেহ তামসিক। অদৃষ্ট ভিন্ন এই প্রকৃতি ভেদের আর কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিথি নক্ষত্র লগ্নাদির তারতম্যে এবং সহবাস সময় দম্পতির মানসিক ভাবের তারতম্যে ও মাতার গর্ভাবস্থায় আহার বিহার ও মানসিক ভাবের তারতম্যে সন্তান দিগের প্রকৃতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে, এ কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, যমজ সন্তানের মধ্যেও দুইটীর প্রকৃতি ঠিক এক প্রকার নহে। ইহাদেরতো এক সময় জন্ম, একত্রে এক গর্ভে বাস সুতরাং সহবাস সময় দম্পতীর মানসিক ভাব ও গর্ভাবস্থায় মাতার ভাব যাহা ছিল তাহা উভয় সন্তানেই সমভাবে সংক্রামিত হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতি একরকম হয় নাই। এই প্রকৃতি ভেদের গুপ্ত কারণ একমাত্র অদৃষ্ট।

তৃতীয়তঃ যাহারা বলেন যে জন্মান্তর থাকিলে তাহার একটা কথাও কি স্মরণ থাকিত না। একথা অতি হাস্যাস্পদ। আমাদের ইহ জন্মেরই অতি বাল্যকালের কথা যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে স্মরণ হয় না ; এমন কি ২ দিন পূর্ব্বের কথাও অনেক সময় ভুলিয়া যাইতে দেখি ; এই অবস্থায় অপর একটা দেহের কথা স্মরণ থাকার দাবি দাওয়া রাখা যারপর নাই দুঃসাহসিকতা বটে।

বিস্মরণের কারণ রজোগুণ ও তমোগুণ, যাহার রজস্তমোগুণ যত অল্প সত্বগুণ যত প্রবল তাহার স্মরণশক্তি তত অধিক।

আমরা রজস্তমোগুণে অভিভূত সত্বগুণ আমাদের অতি অল্প এই জন্মে আমাদের আজকার কথাও কালস্মরণ থাকেনা, জন্মান্তরের কথা আর স্মরণ থাকিবে কিরূপে ?

যাহারা স্বভাবতঃ সত্বগুণ প্রবল অথবা যাহারা তপোবলে রজস্তমো গুণ জয় করিয়া পূর্ণ সত্বগুণ লাভ করিয়াছেন, তাহাদের জন্মান্তরের কথা ধারা বাহিক্রমে স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে। আমরা যেমন বাল্যের ঘটনা যৌবনে কি বৃদ্ধকালে একটু চিন্তা করিলে মানস পটে অঙ্কিত দেখিতে পাই, উহারাও সেইরূপ জন্মান্তরের ঘটনা মানস পটে স্তরে স্তরে চিত্রিত দেখিয়া থাকেন।

বামদেব প্রভৃতি যোগিগণ এই শ্রেণীর মানব ছিলেন। আজ কালও কদাচিৎ কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারেন, অনেকে ইহা খবরের কাগজে দেখিয়াছেন শাস্ত্রে ইহারা জাতিস্মর বলিয়া অভিহিত। সুতরাং জন্মান্তর আছে, অদৃষ্টও আছে, অদৃষ্টই সকলের মূল, পুরুষকার অদৃষ্টের অন্যথা করিতে পারেনা।

পুরুষকার বাদিগণ একথা মানেন না। তাহারা বলেন পুরুষকারে যদি কিছু না হয় তবে যাগ-যজ্ঞ-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-চিকিৎসা-চেষ্টা সমস্ত বৃথা যায়।

অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না।

নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।

মৃগগণ সুপ্ত সিংহের মুখে আপনা হইতে গিয়া প্রবেশ করে না, সিংহের পুরুষকার দেখাইতে হয়, চেষ্টা করিয়া মৃগ বধ করিতে হয়, নচেৎ আহারের যোগাড় হয় না।

সমান বয়স সমান প্রকৃতি দুইজনকে সমান পরিমাণে এক জাতীয় বিষ খাওয়াও, পরে একজনের চিকিৎসা কর আর একজনকে বিনা চিকিৎসায় রাখ, দেখিবে যাহার চিকিৎসা করিলে সে বাঁচিল, আর যাহাকে বিনা চিকিৎসায় রাখিলে তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইল।

প্রত্যক্ষ্যে দেখিলাম, একজন বিষ খাওয়া রূপ পুরুষ-

কারে মরিল আর একজন চিকিৎসা রূপ পুরুষকারে বাঁচিল। রোগের চিকিৎসায়ও আমরা সেইরূপ ফল দেখিতেছি।

সুতরাং জীবন মরণ সুখ দুঃখ সমস্তই পুরুষকারের অধীন। যাহারা পুরুষকার দেখাইতে অক্ষম, অলস অকর্ম্মণ্য ভীরু তাহারাই অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

অদৃষ্ট বাদী ও পুরুষকার বাদীদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে এইরূপে বাক্‌যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে।

উভয় বাদী আর একদল আজকালের নরম দলের ন্যায় উভয় মতেরই সামঞ্জস্য রাখিতে প্রস্তুত—

এই তৃতীয় শ্রেণীর মনীষীগণ বলেন অদৃষ্ট বাদী যাহা বলেন তাহা ঠিক, আর পুরুষকার বাদী যাহা বলেন তাহাও অতি উত্তম।

অর্থাৎ কেবল অদৃষ্টে কিছু হয় না, কেবল পুরুষকারেও কিছু হয় না—

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফল হেতবঃ।

এক এক কার্য্যের বহুকারণ থাকে। অদৃষ্ট, পুরুষকার ও ফলোপযোগী সময় এই তিনটী মিলিত হইলে ফল প্রকাশ পাইয়া থাকে। জল সেচন ও উপযুক্ত সময়রূপ সহকারী কারণ লাভ হইলে উপ্তবীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। সেইরূপ সময় ও পুরুষকার রূপ সহকারী কারণ লাভ করিয়া অদৃষ্ট রূপ বীজ কার্য্য ফল প্রসব করিয়া থাকে।

পুরুষকারে অদৃষ্টের বাধা জন্মাইতে পারে না—একথা অতি অযৌক্তিক। কারণ অদৃষ্ট আমার জন্মান্তরের কর্ম্ম, আর পুরুষকার, আমার বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম, উভয় কর্ম্মই আমার।

যেরূপ আমার বাল্য জীবনের অনিয়মে কোন রোগ জন্মিলে যৌবনে কঠোর নিয়ম প্রতিপালন ও সুচিকিৎসা অবলম্বন করিলে সেই রোগের নাশ করিতে পারি সেইরূপ আমার জন্মান্তরের দুষ্কার্য্যে দুরদৃষ্ট জন্মিলে ইহ-জন্মের প্রবল চেষ্টাও ভূরিসৎকার্য্য রূপ পুরুষকার দ্বারা সেই দুরদৃষ্টের নাশ হইয়া থাকে।

অদৃষ্টও পুরুষকারের বলাবল অনুসারে ফল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

নদীর স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করিতে গিয়া সন্তরণ কারীর বল যদি স্রোতের বল হইতে অধিক হয়, তবে সে স্রোতের প্রতিকূলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারিবে। আর যদি স্রোতের বল সন্তরণ কারীর বল অপেক্ষা অধিক হয়, তবে কিছুতেই সে অগ্রসর হইতে পারিবে না; সে শত চেষ্টা করিলেও স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আর যদি উভয়ের বল তুল্য হয়, তবে অগ্রসর হইতেও পারিবেনা, পশ্চাৎগামীও হইবেনা, যেখানে ছিল, সেইখানেই থাকিবে।

অদৃষ্ট ও পুরুষকারের বলও ঠিক সেইরূপ। যদি দুরদৃষ্ট প্রবল হয় তবে তদপেক্ষা প্রবল পুরুষকার দেখাইতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবেনা; সমস্ত পুরুষকার প্রবল দুরদৃষ্টের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রেই লোকে বলিয়া থাকে পুরুষকারে কিছু হয়না, অদৃষ্টই সকলের মূল। আর যদি দুরদৃষ্ট অপেক্ষায় পুরুষকার প্রবল হয়, তবে পুরুষকারের প্রাবল্যে দুরদৃষ্ট চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ স্থলেই লোকে পুরুষকারের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

---

# ইয়ুরোপের কথা-সাহিত্য।

## ইংরেজী উপন্যাস।

সাহিত্যের ধারা বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক। মানব জীবনের উৎস হইতেই সাহিত্যের বিকাশ; মানবাত্মার বিচিত্র লীলাই সাহিত্যের ভিত্তি। শিকড় দ্বারা মাটির রস গ্রহণ করিয়াই যেমন বৃক্ষ নানা আকারের ডালপালা বিস্তার পূর্ব্বক সজীব অবস্থায় থাকে, সাহিত্যও তেমনি মানবজীবনেররসে পুষ্ট হইয়া নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা প্রভৃতি নানারূপে আত্ম প্রকাশ করে।

উপন্যাস সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু উপন্যাসের ভিতর দিয়া সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নাটক ও কবিতার অনেক পরে। এই কথা সকল দেশের সাহিত্য সম্বন্ধেই খাটে। সংস্কৃতে গদ্য সাহিত্য লেখার

সূত্রপাত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তার কতশত বৎসর পূর্ব্বে যে বেদের জন্ম কে সঠিক বলিবে? গ্রীসে হোমারের আবির্ভাব খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮৫০ অব্দে; কিন্তু গদ্যে রোমান্সের জন্মদাতা Aristides তাহার Milesian Tales লেখেন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় অব্দে।

ফরাসী সাহিত্যের মত ইংরেজি সাহিত্যেও কাব্যের অনেক পরে উপন্যাসের বিকাশ। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে এই কথা বলিলে চলিবেনা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উপন্যাস রচনার উপযোগী ব্যাকরণ অনুশাসিত ভাল গদ্যের উৎপত্তি হয় নাই; অথবা লেখকগণ তখনও টের পান নাই যে উপন্যাসের প্রধান উপাদান মানব জীবন। অনেকেই হয়ত শুনিয়া থাকিবেন John Bunyan এই ধরণের একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন; তাহার নাম "The Life and Death of Mr. Badman" (1680). বিখ্যাত সমালোচক Edmund Gosse এই বহি খানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"It is absolutely original as an attempt at realistic fiction, and it leads through Defoe on to Fielding and the great school of English novels."

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নামকরা ইংরেজ-লেখকগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে পদ্যের ও গদ্যের জুড়ি-গাড়ী হাঁকাইয়া গিয়াছেন—ডানে বামে দৃকপাত করেন নাই। Shakspere নিজে সব্যসাচী ছিলেন। একদিকে যেমন Ben Jonson, Beaumont, Fletcher, Webster, Middleton, Ford, Massinger প্রমুখ বড় বড় কবি ও নাট্যকার ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি Lily, Sidney, Hooker, Bacon, Raleigh, Taylor প্রভৃতি বড় বড় গদ্য লেখকও ছিলেন। ইঁহাদের রচনায় অবশ্য ব্যাকরণ-উল্লঙ্ঘনের কোনো উল্লম্ফন দেখা যায় না; ইঁহারা ঠিক মডার্ণও নয়;—কিছু ল্যাটিন ঘেঁসা। ইহাদের মধ্যেও অনেকে গদ্যে গল্প লিখিয়াছেন;—Green লিখিয়াছেন 'Pandosto,' 'Menaphon' ইত্যাদি, Lodge লিখিয়াছেন 'Rosalind', Nash, 'The Unfortunate Traveller', Sidney, 'Arcadia' ইত্যাদি।

ইঁহাদের পরবর্ত্তী লেখকগণের রচনা এত বেশী মডার্ণ যে বিংশ শতাব্দীর গদ্যে আর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বৎসরের গদ্যে বড় বিশেষ পার্থক্য নাই। Cowley Dryden, Bunyan, Locke, Temple, Pepys প্রভৃতি লেখকেরা যে পদ্ধতিতে গদ্য লিখিয়াছেন, আজ দুইশত বৎসর যাবৎ সেই পদ্ধতিই বহাল রহিয়াছে। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভাল গদ্যের নমুনা ছিল না বলিয়া তখন উপন্যাস লেখা হয় নাই, একথা যদি কেহ বলেন, তবে তাহা নিঃসন্দেহ ভুল। মানব জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী যেমন বর্ত্তমান উপন্যাসের প্রধান খোরাক, তেমনি সপ্তদশ শতাব্দীর নাটকেরও। Hamlet এর উপদেশ "To hold the mirror up to Nature"—প্রকৃতির ফটো তোলা-উপন্যাস নাটক উভয়েরই পক্ষে বেদবাক্য। আর সাহিত্য-বেদে Shakspere প্রমুখ নাট্যকারগণ যে অসাধারণ বৃাৎপুন্ন ছিলেন, ইহাত ধরা কথা।

তা ছাড়া, Shakspere এর পূর্ব্বে এবং Shakspere এর যুগে উপন্যাস লিখিত না হইলেও Domestic Plays অনেক লেখা হইয়াছিল। Nicholas Udall's "Ralph Roister Doister" (1560), John Still's "Gammer Gurton's Needle" (1566), Green's "George-a-Green", অজ্ঞাত লেখকের "Arden of Feversham", "The Yorkshire Tragedy" প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। Green এর নাটক সম্বন্ধে সমালোচক Boas লিখিয়াছেনঃ—

"The prose scenes depicting the evils of usury and of jndicial extortion are written with graphic realism; the satire and the pathos both ring true, and the characterisation, so far as it goes, is vigorous and firm. * * * He found his truest inspiration in the joys and sorrows of the poor."

এমন কি Chaucer এর সমসাময়িক কবি Langland রাজত্যাচারিত এবং সমাজ-নিষ্পেষিত দীন দুঃখীর পক্ষ লইয়া "Piers the Plowman" লিখিয়া বিখ্যাত হন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু

পূর্ব্বের লেখকগণও বেশ জানিতেন যে মানবের অন্তর-বাহিরের সুখদুঃখময় জীবনকাহিনী অবলম্বনেই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। কিন্তু তথাপি খাঁটি উপন্যাসের আবির্ভাব এত বিলম্বে হইল কেন?

উত্তর এই—রাজা চার্লস যখন Cromwellএর হাতে বিড়ম্বিত হইয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন অনেক ক্ষুৎপীড়িত ও Cromwell তাড়িত লেখক রাজার অনুসরণ করিল। প্রায় দশ বৎসর পরে চার্লস যখন দেশে ফিরিয়া আবার গদিতে বসিলেন, তখন এই সমস্ত লেখক অনুচরগণ রাজ্ঞী এলিজাবেথের যুগে Marlowe্র প্রচারিত Romantic আইনের বদলে ফ্রান্স হইতে ধার করা Classical আইন প্রচার করিলেন;—নিজেদের ঘরের দুয়ারে হাতী বাঁধা থাকা সত্বেও ইহারা পরের দুয়ারে হাত পাতিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তখন Shakspereও তাঁহার পথাবলম্বী কবিবর অনাদরে অবহেলায় জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন; এমন কি কেহ কেহ Shakspereএর দুই একখানা নাটক নূতন করিয়া লিখিতেও পশ্চাদপদ হইলেন না!—ইহাদের অবিমৃষ্যকারিতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়!—কিন্তু আদর বাড়িয়া গেল—ফরাসী নাট্যকার Moliere এবং Racineর!

যে ব্যক্তি অন্যজনের অনুকরণ করিতে চেষ্টা পায়, তাহার উচিৎ গুণটুকু রাখিয়া দোষটুক ত্যাগ করা। এই সব ধুরন্ধর লেখকেরা কিন্তু ঠিক উল্টা বুঝিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, ইহাদের—Dryden, Wycherley. Congreve. Farquhar ইত্যাদির নাটকগুলি এতই কুৎসিত এবং পঙ্কিল হইয়া উঠিল যে কোনো ভদ্রসন্তান আর সেগুলি চোখের সম্মুখে ধরিতে পারিতেন না। তখন ( ১৬৯৮ খৃঃ ) Jeremy Collier তাঁহার "Short View of Immorality of Stage" পুস্তকে এই সব বাজে লেখক গুলিকে এরূপ তীব্র ভাবে আক্রমণ করিলেন যে বেচারারা একদম 'থ' খাইয়া গেল। দর্শক এবং পাঠকবৃন্দও এক যোগে ক্ষেপিয়া উঠিল! নাটকগুলি অগত্যা একে একে অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু থিয়েটার যাত্রীর উপায়? ইহারা এতদিন থিয়েটারে মস্‌গুল্ হইয়া আড্ডা দিয়াছে, স্ফূর্ত্তিতে সময় কাটাইয়াছে। এখন ইহাদের মন ও চক্ষুর খোরাক জোগায় কে? নাটকের অভিনয় না দেখিতে পারিয়া ইহাদের উদর ঢুপির মত ফুলিয়া উঠিতেছিল।

সেই সময় সাহিত্য স্কুলে বেত্রহস্তে আবির্ভূত হইলেন মাষ্টারত্রয়—Swift, Steele, Addison! ইঁহাদের সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য হইল—তখনকার পঙ্কিল কলুষিত সমাজটাকে উপরের দিকে টানিয়া তোলা—হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়া আত্মদোষ দেখাইয়া দেওয়া।

Addison, Sir Roger de Coverleyর জীবনী লিখিয়া ( ১৭১১খৃঃ ) বর্ত্তমান উপন্যাসের বীজ রোপণ করেন। ইহার অঙ্কুর উদ্গম হইল Defoeর "Robinson Crusoe"-তে ( 1719 ); আর পাতা গজাইল Richardson এর "Pamela"য় ( 1740 ).

তখন আর লণ্ডন বাসীদের আনন্দের সীমা রহিল না। নাটকের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস! উপবাস-ক্লিষ্টের এইত চমৎকার দানাপানি! ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাসের বাণ ডাকিল!—তখন 'যত আছে তত 'দাও' তরণী পরে'।

বর্ত্তমান উপন্যাসের এই হইতেছে জন্ম প্রকরণ। উপন্যাস ভাষার অথবা ভাবের অপেক্ষা রাখিতে ছিল না;—রাখিতেছিল, পাঠকের রুচির অপেক্ষা।

Richardson, Fielding, Smollette, Sterne, Goldsmith, অষ্টাদশ শতাব্দীর নামজাদা লেখক। কিন্তু Richordsonএর Calrissa Harlawe এবং Fieldingএর Tom Jones এই যুগের সর্ব্বোত্তম উপন্যাস। ফরাসী লেখক Dictionnaire Encyclopediqueএর সম্পাদক Diderot লিখিয়াছিলেন—"Take care not to open these enchanting books if you have any duties to fulfil." ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। কিন্তু এই সব উপন্যাসে তখনকার উচ্ছৃঙ্খল সমাজের বিচিত্র চিত্রটিই চমৎকার ফুটিয়াছে—কলা কুশলতা নহে;—এক একখানি উপন্যাস আকারে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত; আর নীতি বচনে

মনুসংহিতাকেও হার মানাইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে তৎকালীন নর-নারীর সজীব চেহারাগুলি যদি দেখা না যাইত, তবে ইহাদিগকে আজকাল কেহ জিজ্ঞাসাও করিত না।

ইঁহাদের পরে ১৭৬৬ খৃঃ Goldsmith 'Vicar of Wake field'এ সোজা সরলভাবে পল্লীজীবনের সুন্দর আলেখ্য রচনা করেন। Goethe ইহাকে Prose Idyll—গদ্যে গাঁথা—বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাকেও একটি উচ্চদরের উপন্যাস বলিতে পারি না। ধর্ম্মের জয় দেখাইতে গিয়া Goldsmithকে এত সব অঘটন ঘটাইতে হইয়াছে যে পাঠকের স্বতঃই মনে হয়—"এত ভারি আশ্চর্য্য!" তবুও বলিতে হইবে—দুঃখ কষ্টে, অভাব অভিযোগে, মান অপমানে Dr. Primroseএর ভগবানের প্রতি অটল নির্ভরতা সুন্দর ফুটিয়াছে। "Vicar of Wake field"এর পরে Miss Burneyর 'Evelina (1778) এবং Cecilia'র সামাজিক উপন্যাসের প্রথম নমুনা দেখিতে পাই, Miss Burney Dr. Johnsonএর প্রিয়-পাত্রী ছিলেন; এবং তাঁহার রচনা পদ্ধতির নকল করিতে ব্যগ্র ছিলেন।

Dr. Johnson ও "Rasselas" ( 1759 ) নামে একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। মাতার অন্তিম কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অর্থ-সংস্থানের জন্য তিনি এই পুস্তক খানি আট দিনে লিখিয়া ফেলেন। এইজন্য ইংরেজি সাহিত্য হইতে ইহার নামটা লুপ্ত হইয়া যায় নাই;—উপন্যাস হিসাবে ইহার অন্য কোনও গুণ নাই।

Miss Burneyর পরে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে উদ্বোধিত হইয়া Holcroft এবং Godwin রাজনৈতিক উপন্যাস সৃষ্টি করেন। Holcroftএর প্রধান উপন্যাস "Anna St. Ives" (1792). উপন্যাসখানি সাত খণ্ডে সমাপ্ত। তখনকার অন্যান্য উপন্যাসের মত ইহাও পত্রে লেখা। Richardson কিন্তু সর্ব্বপ্রথম এই প্রণালীর উদ্ভাবন করেন।

Godwinএর "Caleb Williams" ( 1794 ) আজ কালও পঠিত হইয়া থাকে। কারণ ইহাতে অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও প্লটটি জমিয়াছে ভাল; আর Calebএর চরিত্রটি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

Horace Walpole "The Castle of Otranto" নামক উপন্যাসে সর্ব্বপ্রথম 'Tales of Terror'—রোমাঞ্চ কর গল্প আমদানি করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের যথেষ্ট সৌষ্ঠব সম্পন্ন করা দূরের কথা যথেষ্ঠ অনিষ্টই করিয়াছেন, কারণ তাঁহার অনুকরণে যে সব অস্বাভাবিক ঘটনা পূর্ণ উপন্যাস রচিত হয় ( এক Backford এর "Vathek" এবং Mrs. Radcliffeএর "The Mysteries of Udolpho" ছাড়া সে গুলির মধ্যে উপন্যাসের উপাদান নাই বলিতে কিছুই নাই—না আছে চরিত্র অঙ্কনের চেষ্টা, না আছে স্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা! Prof. Saintsbury তাঁহার Nineteenth Century Literature" এ লিখিয়াছেন—"The actual literary value is on the whole low, though Mrs. Radcliffe is not without glimmerings.

উদার হৃদয় Scott বলিয়াছিলেন যে Miss. Edgeworthএর আইরিশ নভেলগুলিই তাঁহাকে স্কটিশ নভেল লিখিতে উদ্দীপিত করে। Scottএর এই উক্তি যথার্থ হইলেও ইহা সত্য যে Miss Edgeworthএর উপন্যাস মালায় গুটি কয়েক সজীব আইরিশ চরিত্র ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই। আর ইনি স্বাভাবিকতার ছায়া বড় একটা মাড়ান নাই! মোট কথা এই যে Mrs. Radcliffe, Walpole, Miss Edgeworth এক কুড়ি উপন্যাস না লিখিলেও ইংরেজি সাহিত্য দেওলিয়া হইয়া যাইত না।

Miss Edgeworth এর সমসাময়িক Miss Jane Austen; এরূপ সমালোচকের অভাব নাই যাহারা Miss Austenকে ইংরেজি সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা উপন্যাস লেখিকা বলিয়া প্রচার করিতে চান। Charlotte Bronte এবং George Eliot উভয়েই কিন্তু তাঁহাকে তত উচ্চস্থান দিতে নারাজ। ইংরেজি সাহিত্যে আজকালও এই বিষয় নিয়া আলোচনা হইয়া থাকে; এই আলোচনা যে কবে শেষ হইবে বলা যায় না। আমরা সোজা কথায়

এই বুঝি যে সামাজিক উপন্যাসে ইঁহার দক্ষতা অসাধারণ। "Pride and Prejudice" অথবা "Sense and Sensibility" উপন্যাসে তিনি যে সব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন—( Mr. Collins, Mr. Bennett, Jane, Lizzie, Wickham, Deshwood, Edward, Brandon, Elinor, Marianne ) সেগুলি সামান্য খুঁটিনাটি ঘটনার আবেষ্টনে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইঁহার একখানি উপন্যাস পড়িলেই অন্যান্য উপন্যাস পাঠের কাজ হইয়া যায়। কারণ, ইঁহার অঙ্কিত বিভিন্ন উপন্যাসের নামতঃ বিভিন্ন চরিত্রগুলি একই ছাঁচে ঢালা। আর ইহাও সত্য যে George Eliotএর Maggie অথবা George Meredithএর Dianaর মত চরিত্র Jane Austenএ আশা করা বৃথা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ক্ষেত্রে Walter Scott অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে ইতিহাসের সত্যতা কতটা রক্ষিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। ফরাসী সমালোচক Taine লিখিয়াছেন—"All these persons of a distant age are false. Costumes, scenery, externals alone are exact; actions, speech, sentiments, all the rest is... arranged in modern guise." ইহাও সত্য যে তাঁহার সব চেয়ে ভাল উপন্যাসগুলিতে ( Gey Mannering, Ivanhoe, Kenilworth, Anne of Gierstein, Quentin Durward, St. Roman Well ) ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ খুব কম। Scottএর চরিত্রগুলি রক্তমাংসে গড়া, তাজা, জীবন্ত। এই তাঁহার গৌরবের কথা। Shakspereএর অমানুষিক কবিপ্রতিভা, কলাকৌশল, গভীরভাব অথবা অপূর্ব্ব সর্জ্জনশক্তি তাঁহার মধ্যে নাই।

Scottএর পরে যে কয়েকখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে Thackeray's 'Esmond,' George Eliot's 'Romola', Kingsley's 'Westward Ho!' 'Hypatia' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান কালে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা পাইতে পারে এরূপ কোনো শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই—বাদে Maurice Hewlettএর "The Queen's Quair' (1904).

কেহ কেহ বলেন, গার্হস্থ্য উপন্যাসের প্রবর্ত্তক Dickens। যে উপন্যাসে একটি পরিবারের সুখদুঃখের কাহিনী সহজ সরল অথচ নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যে উপন্যাসে একটি মনোরম সকরুণ গৃহচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—তাহাকেই আমরা 'Domestic novel' বলি। এই ধরণের উপন্যাসের জন্মদাতা Dickens নহেন—Goldsmith. Goldsmithএর পরে Mrs. Opie, Mrs. Craik, Mrs. Gaskell, Mrs. Henry Wood গার্হস্থ্য উপন্যাসকে জীবিত রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে Charles Garviceএর নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহার উপন্যাসগুলিতে—চল্লিশ খানার কম হইবেনা—সস্তাদরের বাজে প্রেমের নাঁকি সুর ছাড়া অন্য কিছুই নাই। অথচ আশ্চর্য্য এই যে ইহার বইয়ের এমন কাটতি যে অন্য কোনো প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের সেরূপ কাটতি কিনা সন্দেহ!

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষ হইয়া বড় ঘরের বড় কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন—Thackeray। তাঁহার কোনো উপন্যাসেই চোর বদমাইস দীন দুঃখীর কীর্ত্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই ব্যাপারটা Dickens জমাইয়াছেন ভাল। থেকারের উপন্যাস পাঠে মনে হয়, ইনি ঘোর মানব-দ্বেষী ( Diogenes এর মত!) ছিলেন। মানুষের দোষগুলি সর্ব্ব সমক্ষে উলঙ্গ করিয়া দেখাইতে ইহার অপরিসীম আনন্দ ছিল! 'Vanity Fair' এ Becky Sharp কে তিনি এতটা কথায় কথায় জব্দ করিয়াছেন যে—এবং তাহাকে এরূপ ঘৃণিত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে Becky Sharpএর চেয়ে Thackerayর উপর আমরা চতুর্গুণ বিরক্ত হই! কিন্তু Prof. Saintsury লিখিয়াছেন—"Of all the innumerable cants that ever were canted, the cant about Thakeray 'cynicism' was the silliest and the most erroneous"। হয়ত Charlotte Bronteই Thackerayর দোষগুণ ঠিক মত মাপিয়াছেন—"What bitter satire, what

relentless dissection of diseased subject! * * * As usual, he is unjust to woman; quite unjust * * * * He likes to show us human nature at home, as he himself daily sees it * * *." সে যাহা হউক Thackerayর রচনা পদ্ধতিটি যে ইংরেজি সাহিত্যের গৌরব, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগে উপন্যাস ক্ষেত্রে Thackeray এবং Dickens জোড়ামাণিক ছিলেন। Browning এবং Tennyson এর মত ইঁহারাও একে অন্যকে তারিফ করিতেন; এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এরূপ শোনা যায় যে উপন্যাস লিখিবার পূর্ব্বে Thackeray নাকি চিত্রকর হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং Dickens এর উপন্যাস সচিত্র করিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। নবীন চিত্রকরের বিস্তার বহর দেখিয়া Dickens বিমুখ হইয়াছিলেন! অদৃষ্টের কি পরিহাস! আজ Dickens বড়, না Thackeray বড়—এই কথা নিয়া কত কথা কাটাকাটি হইতেছে!

Dickens এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "David Copperfield." এই উপন্যাসে তিনি নিজের জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইনি নাট্যকার Ben Jonson এর মত অতিরঞ্জিত অদ্ভুত চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। Dickens এর নাটকীয় প্রতিভা ছিল। নিজের উপন্যাসগুলি স্বদেশে এবং আমেরিকায় নাটকীয় ধরণে পড়িয়া ইনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন; তা ছাড়া পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থও ইহার কম ছিল না। যিনি বাল্যকালে রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করিয়া আহারের সংস্থান করিয়াছেন, 'মা ভারতী'র কৃপায় কালে তাঁহার অর্থের অপ্রতুল হইল না।

"হায় মা ভারতি চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদ যুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।"

হেমচন্দ্রের এই কথাগুলি উনবিংশ শতাব্দীর কোনো ইংরেজ লেখকের প্রতি খাটেনা।

Mary Ann Evans যখন আত্ম-গোপন করিয়া George Eliot নাম গ্রহণে "Scenes of Clerical Life" ছাপাইলেন, তখন অনেক পাঠকই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে নবীন লেখকটি লেখকই বটেন, লেখিকা নহেন। চতুর Dickens কিন্তু প্রথমেই উপন্যাস খানির ধরণ ধারণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নামে লেখক হইলেও আসলে ইনি লেখিকা! অনেকেই মনে করেন যে George Eliot এর গ্রন্থাদি দার্শনিকতায় ভরা; এই জন্য তিনি তত লোকপ্রিয় নহেন। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এই কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে সব উপন্যাস লিখিয়া George Eliot বিখ্যাত হইয়াছেন—সাধারণ এবং অসাধারণ উভয়েরই নিকট—('Scenes of Clerical Life, Silas Marner, Adam Bede, The Mill on the Floss,)—তাহাদের মধ্যে কি সূক্ষ্ম দার্শনিক ভাব আছে, আমরা জানিনা। তাঁহার শেষ বয়সে লেখা "Daniel Deronda" য় কিছু কিছু দার্শনিকতা আছে বটে; কিন্তু সে গুলি এমনই কি কঠিন ব্যাপার যে সাধারণের বোধগম্য হইবেনা?

George Eliot, George Meredith এবং Thomas Hardyর (জীবিত লেখক) উপন্যাস গুলিতে এমন অনেক ভাবিবার কথা আছে, যাহা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন উপন্যাসে নাই। Meredith এর "Diana of the Crossways," "The Egoist," "Harry Richmond." Hardyর "Tess of the D'urberville" "Jude the obscure," George Eliot এর "The Mill on the Floss," "Middlemerch", "Daniel Deronda' প্রভৃতি উপন্যাস শুধু মিছে কথার গাঁথা নহে; সত্যই যে সুন্দর, অন্তর্জগত এবং বহির্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতেই যে মানব আত্মার চরম বিকাশ, জীবনটা যে "শুধুই একটা কোলাহল" নয়, কিন্তু তার গভীর তাৎপর্য্য আছে, এই সব কথাই তাঁহাদের উপন্যাসে অপূর্ব্ব কলাকুশলতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অবশ্য রুশিয়ার ঔপন্যাসিক Maxim Gorki র ভয়াবহ ও বিসদৃশ চিত্র পাইবেন না। কারণ ইঁহাদের হোমিওপ্যাথিক ডোজ। কিন্তু সমজদার

পাঠকের মন আলোড়িত বিলোড়িত হইবেই। তবে যাহাদের ধাত হোমিওপ্যাথিক নয়, তাহারা Victoria Cross এর দুই একটা এলোপ্যাথিক ডোজ্ পরখ করিয়া দেখিতে পারেন।

সম্প্রতি ইংরেজী সাহিত্যে ঔপন্যাসিকের সংখ্যা অনেক এবং উপন্যাস লিখিত হইয়াছেও অসংখ্য। Arrold Bennett, H. G. Wells, Marie Corelli, E. F. Benson, Hall Bain, Walter Beosant প্রভৃতির নাম উল্লেক যোগ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাদের উপন্যাস ইংরেজি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারিবে কিনা ঘোর সন্দেহ আছে।

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ।

---

## স্বর্গীয় অমর চন্দ্র দত্ত।

বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, 'ভারত মিহির,' 'চারু-বার্ত্তা', 'চারু মিহির,' স্বদেশ সম্পদ, প্রভৃতি সংবাদ পত্রের পরিচালক, 'অরূপা', 'লহরী' 'হরিবল্লভের স্নেহ' প্রভৃতি উপন্যাস গ্রন্থের রচয়িতা, ময়মনসিংহের সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ও উৎসাহ দাতা, আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন গুরু ও উপদেষ্টা বাবু অমরচন্দ্র দত্ত আর ইহ জগতে নাই। গত ২৫ বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় তিনি সন্ন্যাস রোগে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। দীর্ঘ কাল রোগ যন্ত্রণায় ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি পরপারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু কিছু দিন যাবৎ হটাৎ নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ রশ্মির ন্যায় তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য আরোগ্যের উজ্জ্বল প্রভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি বেশ সুস্থ ও সবল দেহে দেড় মাইল দুই মাইল পথ হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন; পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এক খানা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া প্রেসে দিয়াছিলেন। এমন কি মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও তিনি তাঁহার সেই নূতন গ্রন্থের প্রুফ-সিট দেখিয়া রাখিয়াছিলেন। হায়, তখনও তিনি ভাবিতে পারেন নাই, পরের দিন এই সময়েই তাঁহাকে ভবের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।

তাঁহার জীবন কথা আলোচনার এখন সময় নহে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তাঁহার পূণ্য লোক যাত্রী আত্মার চির শান্তি বিধান করুন।

---

## মহা প্রস্থানে।

এই তো জীবন!
এইছিল এই নাই,
আর কি ফিরিয়া পাই,
হৃদি আলোড়ন!
ও সৌম্য মুরতি তার,
দেখিব না কভু আর,
সে যে ছিল ঋষির মতন!
হৃদয়ে অসীম আশা,
কি মমতা ভালবাসা,
মন খাঁটি, প্রাণ খাসা, মধুর আনন!
কর্ম্মবীর, ধর্ম্ম প্রাণ,
নাহি মান-অপমান,
চামেলী ফুলের মত হৃদয় শোভন!
সার্থক তাহার নাম,
পূর্ণ তার মনস্কাম,
জীবনে করিল শুধু সদনুসরণ!
হায়, হায়, তবু তারে
কেহ না রাখিতে পারে!
বৃথা চেষ্টা, বৃথা প্রাণ পণ!
যে যায় সে চলে যায়,
কে তারে ফিরিয়া পায়!
এই তো জীবন!

সার্থক করিলে তুমি জীবন-সংগ্রাম!
অদম্য উৎসাহ লয়ে,
নিশিদিন দাগা সয়ে,
অমর করিয়া গেছ "অমর" সে নাম!
সাহিত্য-সাধনা করি,
দারিদ্র্য লইলে বরি,
ঝরিয়াছে অশ্রু, কভু ফেলিয়াছ ঘাম!
কাহারো ধারনি ধার,
খাটিয়াছ অনিবার,
দেহের মনের কভু ছিল না বিরাম!

জ্ঞানের প্রচার তরে,
যুঝিয়াছ অকাতরে,
লভেছ কাজের মাঝে আত্মার আরাম!
শিশু সাহিত্যের রবি,
শ্রীমনোমোহন কবি,
তার তুমি ছিলে হিতকাম!
গোবিন্দ দাসেরো তুমি,
প্রতিভার পুণ্যভূমি,
দশের প্রণম্য, লহ কবির প্রণাম!

কি কঠোর অসাধ্য সাধন!
সত্যের রাখিতে মান,
কে বা সহে অপমান,
সারাটি জীবন!
সমাজের অত্যাচারে,
দারুণ দুঃখের ভারে,
সহাস্ত বদন!
গত জীবনের কথা,
প্রাণে আনে আকুলতা,
মনে হয় সেই যেন ভীষণ স্বপন!
কত বিদ্রূপের বাণ,
জর্জ্জর করেছে প্রাণ,
তথাপি করেছ তুমি সবারে আপন!
ধর্ম্ম-জীবনের সেই অসাধ্য সাধন!

তোমার জীবন্ত স্মৃতি অক্ষয় অমর!
হে অমর, মর, নাই,
ব্যেপে আছ সব ঠাঁই,
মরে যত পাপাত্মা পামর!
মরে 'বাবু', ঘুসখোর,
মরে সাধু-বেশী চোর,
মরে দেশী বিলাসী বাঁদর!
যে রহে মরার মত,
সে-ই মরে অবিরত,
মরিয়া আবার মরে মরণের পর!
হে জ্ঞানী, নিরভিমান,
দরিদ্র চরিত্রবান্‌,
চিরদিন পাবে শুধু জ্ঞানীর আদর!

সত্যভাষী, সত্যপ্রিয়,
তাই এত বরণীয়,
তোমার হৃদয় সে যে পুণ্যের আকর।
ধর্ম্মনীতি-সুসাহিত্য
সাধনা করেছ নিত্য,
"অরূপা" "লহরী" সাক্ষ্য দিবে নিরন্তর!
জ্ঞানের পাগল ছিলে,
জ্ঞান শুধু অন্বেষিলে,
প্রাণখোলা, উদাসীন, সরল অন্তর!
এহেন অমর প্রাণ,
সে যে বিধাতার দান,
তার স্মৃতি চির পূজ্য ধরার ভিতর!
কালের পাষাণ-বুকে,
সে নিজে মনের সুখে,
আঁকিল নিজের মূর্ত্তি অক্ষয় অমর!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

# অদৃষ্টের দৃষ্টি।

রাত্রি আটটা। বৃষ্টির বিরাম নাই। রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে, লোকের চলাচল বন্ধ! শুধু দুই এক খানা মোটর গাড়ীর হাসফাস শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। বৃষ্টিস্নাত লেম্পের মধ্যে গ্যাসের আলোগুলি নিদ্রালু চোখের মত নিষ্প্রভ এবং অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল।

ওয়াটার প্রুফে আবৃত দেহ একজন পাহাড়া ওয়ালা সন্তর্পণে ফুটপাথের উপর দিয়া যাইতেছিল। সে একটা দোকানের সম্মুখে আসিয়া একটা লেম্প পোষ্টে ঠেস দিয়া চুরুট ধরাইল এবং চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া পাহাড়া-ওয়ালার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

"কে—ও? এদিকে এ'সোত বাপু!"

একটা ক্ষীণকায় ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ ধীরে ধীরে অন্ধকার হইতে বাহির হইল। তাহার সাদা রক্তহীন মুখ অন্ধকারে আরও সাদা দেখাইতেছিল।

"কি নাম তোমার?"

"ফিন্‌——চার্লস ফিন্‌।"

"ওখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিলে, হে ?"

"কই, কিছুই না ত ! অমনি দাঁড়িয়েছিলাম, বাইরে বৃষ্টি কি না !"

"সন্ধ্যা থেকেই তুমি ওখানটায় লেগে আছ দেখতে পাচ্ছি ; কিছু বদ মতলব টতলব নেই ত ? নিজের রাস্তা দেখ বাপু।"

"কোথায় যাই ?" সমস্ত রাত্রিটা কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব ?"

"কি করে জানব বাপু, কোথায় তুমি যাবে, না যাবে ? আমার বিট্ ছেড়ে যেখানে খুসি সেখানে যাও।"

লোকটা মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল এবং অন্য একটা রাস্তার মাঝামাঝি আসিয়া একটা বন্ধকী দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। দোকানটা নানারংয়ের আলোক মালায় সুন্দর সাজান। কিন্তু রঙীন কাচের দরজা ও জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যস্থিত জিনিষ পত্র কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তখন আরও জোড়ে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল ; লোকটা একটু ইতস্ততঃ করিয়া দরজার হাতল ঠেলিয়া সেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রথমে তাহার ধারণা হইয়াছিল যে ঘরে কেহই নাই। দোকানের সো-কেইস কয়টা এবং লোহার সিন্দুক দুটা খোলা পড়িয়া আছে।

গ্যাসের আলোকে নানা প্রকারের অলঙ্কার পত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, গীতবাদ্যের যন্ত্রাদি স্পষ্ট দেখাইতেছিল।

"মহাশয়, আপনার কি চাই ?"

গলার শব্দে চমকিত হইয়া ফিন্—বামদিকে ফিরিয়া দেখিল, সো-কেইসের উপর একটী যুবকের মস্তক জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে ; তাহার শরীরের অন্য কোন অংশ দেখা যাইতেছিল না। দেহ-হীন মস্তকটী দেখিয়া সে প্রায় হাসিয়া ফেলিয়াছিল! ক্রমে মস্তকটী ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। তখন বোঝা গেল যে যুবকটী সো-কেইসের পিছনে বসিয়াছিল।

ফিন্ যুবকের দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া পকেট হইতে একটী পুরাতন রূপার ঘড়ি বাহির করিল। বেচারার ইহাই শেষ সম্বল। জেল্ হইতে বাহির হইবার সময় তাহার এই গচ্ছিত দ্রব্যটি সে ফিরাইয়া পাইয়াছিল। আর পাইয়াছিল একস্যুট্ পোষাক, লণ্ডনের একখানা টিকেট, আর কয়েকটী শিলিং ; নূতন করিয়া জীবন গঠন করিবার জন্য এই মাত্র কয়েকটি উপাদান। ছয় বৎসর যাবৎ ঘড়িটী কারাগারের সিন্দুকে বন্ধ থাকিয়া তাহা কয়েদীর মতই জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘড়িটা সে সাবধানতার সহিত একটা সো-কেইসের উপরে রাখিল।

দোকানের এসিষ্টাণ্ট ঘড়িটাকে ঘৃণার সহিত এক-দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"কোনো কাজেরই নয়। এই সব পঁচা মালে আমার এক বাক্স ভরা আছে।"

"মহাশয়, অনুগ্রহ করে এটার বদলে আমায় কিছু দিন। ঘড়িটার অন্ততঃ আধ ডলার দাম হবে। আমি সমস্ত দিন কিছুই খাইনি ; কোন মতে রাতটা কাটাতে চাই।"

এসিষ্টাণ্ট লোকটাকে আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সিন্দুকের কাছে গিয়া একটা দেরাজ খুলিয়া ফেলিল। দেরাজটা নোট এবং রৌপ্যমুদ্রায় ভরা। সে একটি হাফ ক্রাউন লোকটার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল—"একমিনিট অপেক্ষা কর ; ঘড়িটা ভাল হলে আমি তোমাকে আরও দেড় শিলিং দিব। তোমার যে পয়সার যথেষ্টই অভাব স্পষ্টই তাহা বুঝা যাচ্ছে।" সে ওয়াচমেকারের টেবিলের নিকটবর্ত্তী হইয়া চোখে একটা লেন্স লাগাইল এবং ঘড়ির পিছনের ঢাকনিটা ছুড়ি দিয়া খুলিয়া ফেলিল।

সিন্দুকের দেরাজটা তখনও খোলা। সাদা নোট-গুলি আলোকে ধব্‌ধব্ করিতেছিল। এসিষ্টাণ্ট পিছন ফিরিয়া মনোযোগের সহিত ঘড়িটা পরীক্ষা করিতেছিল। বুভুক্ষিতের পক্ষে এত বড় প্রলোভন সামলান দায়। ফিন্ একটু একটু করিয়া ডান হাতটা দেরাজের দিকে বাড়াইতেছিল, হঠাৎ সো-কেইসটার শব্দে দোকানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। ফিনের বাঁ হাতটা সো-কেইসের উপর ছিল।

এসিষ্টাণ্ট তৎক্ষণাৎ চোখ্ হইতে লেন্স নামাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। "বটে ? এই মতলবেই এখানে আসা, না ?"—সে একটা রিভলবার দেরাজ হইতে তুলিয়া লইল। লোকটা তাড়াতাড়ি হাতখানা সরাইয়া আনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। "এই তোমার ঘড়ি ; দোকান ছেড়ে শীগ্‌গীর বেরিয়ে যাও ! না, একটু দাঁড়াও

তোমাকে মজা না দেখিয়ে ছাড়ছি নে। তোমার মত বদমায়েসের আজকাল অভাব নেই।"

"মহাশয় আমায় মাপ করুন। আপনার কোন জিনিষই আমি ছুঁই নি।"

"ওসব হচ্ছে না। তুমি কিছু না কিছু পকেটে পূরতে যাচ্ছিলে। আর আমার মাথাটিও হয় ত আস্ত রাখতে না।" এই বলিয়া সে টেলিফোনের বাক্সটার কাছে গেল। ফিন্ ত্বরিতপদে তাহার সম্মুখীন্ হইয়া কহিল—

"মহাশয়, যোড় হাতে বলচি—।" "সরে দাঁড়াও তুমি!" বলিয়া এসিষ্টাণ্ট পিস্তলটা উঁচু করিয়া ধরিল।

লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইল এবং হাত নাড়িয়া আবেগের সহিত কহিল—"মহাশয় আমার কথা শুনুন! আমাকে ফের জেলে পাঠাবেন না। জালের অপরাধে এইমাত্র আমি ছ বছর খেটে আস্‌ছি, ছ বছর! ভেবে দেখুন। ছ'ছটা বছর লম্বা কত! এত শীগ্‌গীর যদি তাহারা আবার আমার নাগাল পায়, আমার আর উপায় নাই। আমাকে ছেড়ে দিন। দেখুন না, আপনার আমি কিছুই নেই নাই।"

এসিষ্টাণ্টের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল!—"ছ বছরেও যখন তোমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নি, তখন আরো কিছু দিন তোমার কারাগার বাসই শ্রেয়ঃ। তোমার কাছে পিস্তল আছে বোধ হয়?" সে লোকটার পকেট গুলি খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল।

ফিন্ ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও শরীরে বল ছিল। সে এসিষ্টাণ্টের হাত চাপিয়া ধরিল। তখন এই দুই ব্যক্তির মধ্যে, একটা ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল।

অকস্মাৎ একটা পিস্তলের শব্দ দোকানটাকে কাঁপাইয়া তুলিল;—কিন্তু পিস্তলের নাল উদ্‌গীর্ণ ধূমে কেহই কিছু দেখিতে পাইল না। ঘর হইতে ধূম সরিয়া গেলে ফিন্ দেখিতে পাইল—এসিষ্টাণ্ট তাহার পায়ের কাছে লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে, নিস্পন্দ প্রসারিত হস্ত, পলকহীন চক্ষু।

লোকটা দমিয়া গেল, ছেঁড়া কোটের ভিজা আস্তিনে সে তাহার স্বেদসিক্ত কপাল মুছিয়া ফেলিয়া খোলা সিন্দুকের দেরাজ হইতে নোট ইত্যাদি যত ছিল সব পকেটে ভরিল। তারপর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের সজল ঠাণ্ডা হাওয়া তাহার নিকট তখন বেশ আরামজনক বোধ হইতেছিল। এক নিমিষে দোকানে যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, ইহার জন্য সে নিজকে কোনো মতেই দায়ী করিতে পারিল না।

কয়েকটা রাস্তা পার হইয়া ফিন্ একটা ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। সেখানে বিনা বাক্যব্যয়ে যথারীতি মূল্য দিয়া খুব পেট ভরিয়া খাইল। আহার শেষ হইলে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। তাহার এখন প্রধান চিন্তার বিষয় হইল, মলিন শত ছিন্ন ভিজা পোষাকটা; হোটেলের আলোতে ইহার দৈন্যতা যেন আরও তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। দিনের বেলায় এই পোষাকটা পরিধান করিয়া রাস্তায় কি প্রকারে বাহির হওয়া যায়?

সে তৎক্ষণাৎ হোটেল ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং একটা পুরাতন জামা বিক্রেতার দোকান হইতে ভাল দেখিয়া একটা সুট্ কিনিল। আর একটা দোকানে গিয়া শার্ট, টাই, কলার ইত্যাদি কিনিল। এইরূপে সে তাহার দরকারী প্রায় সব জিনিষই সংগ্রহ করিয়া ফেলিল; এমন কি, তামাকের পাইপটি পর্য্যন্ত বাদ রহিল না। তারপর সে একটা সাধারণ স্নানাগারে গিয়া স্নান করিল এবং নূতন পোষাক পরিধান করিল। দাড়ী গোঁপ কামাইয়া যখন সে নাপিতের দোকান হইতে বাহির হইল তখন তাহাকে আর পূর্ব্বের লোক বলিয়া চিনিতেই পারা যাইতেছিল না!

রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। সে পুনরায় কিছু আহার করিয়া রাত্রের জন্য একটা হোটেলে আশ্রয় লইল। শয্যা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সে গণিয়া দেখিল, তাহার পকেটে তখনও মোট একশত একান্ন পাউণ্ড জমা আছে।

পরদিন প্রায় দ্বিপ্রহরে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। স্নানের কোঠায় গিয়া গরম জলে স্নান করিবার তার তত প্রয়োজন ছিল না বটে; কিন্তু এতদিন পরে এই

স্নানের আরামটুকু উপভোগ করিবার আনন্দ হইতে সে কোনো মতেই নিজকে বঞ্চিত করিতে পারিল না! স্নানের পর সে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বেশভূষা করিল; এবং বারবার আয়নায় মুখ দেখিয়া লইল।

ফিন্ ডাইনিংরুমে গিয়া দেখিল ঘরটা সাহেব মেমে প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। তখন গির্জ্জার ঘড়িতে দুইটা বাজিল। একজন ওয়েটার তাহাকে একটা টেবিলে বসিতে অনুরোধ করিল। সেখানে নানা বেশভূষায় সজ্জিত হরেক রকমের লোক দেখিয়া, তাহাদের হাস্য পরিহাস ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া, ভোজনের সময় বেণ্ডের বাদ্য শ্রবণ করিয়া তাহার বেশ্ শান্তি বোধ হইতে লাগিল।

আহার শেষ করিয়া একটা আরাম কেদারায় হাত পা ছড়াইয়া দিয়া ফিন্ অত্যন্ত পরিতৃপ্ত চিত্তে নিজের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। গতকল্য এবং অদ্যকার, এই দুইদিনের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যগুলি তাহার মনে এমন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল যে সে মনের আনন্দে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হোটেলের ওয়েটারকে সে এক ফ্লোরিণ্ বখশিস্ দিল; এই সময় তাহার মনে পড়িল—ঠিক আঠার ঘণ্টা পূর্ব্বে এসিষ্টাণ্টের কৃপা ভিক্ষা! মনের আনন্দে একটা বেশী দামের চুরুট লইয়া সে ধূমাগারে প্রবেশ করিল, এবং টেবিলের উপরিস্থিত খবরের কাগজটা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার চক্ষু পড়িল বড় বড় অক্ষরে লেখা একটা হেডিংএর উপর—"বন্ধকী দোকানে ডাকাতি।" তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। মনের মধ্যে যে আনন্দের বাণ ডাকিয়াছিল, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

এসিষ্টাণ্টের নাম জর্জ্জ হোলজ্। তাহার মৃত্যু হয় নাই। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে—বাঁচিবে কি না, তাহা বলা যায় না। তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করিতে না পারিলে, আসামী গ্রেপ্তারের কোনোই সম্ভাবনা নাই।

সংবাদটা পড়িয়াই তাহার মনে হইল "আর লণ্ডনে থাকা উচিত নয়, কিন্তু কোথায় যাইব? আর, এসিষ্টাণ্টের যদি মৃত্যু হয়, তবে ত আর কোনো কথাই নাই! তখন আর আমাকে ধরে কে?"

সূর্য্য পশ্চিম গগনে যতই হেলিয়া পড়িতে লাগিল ফিনের মনে ততই ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। বিকালের সংবাদপত্রগুলির জন্য সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল—নিশ্চিন্ত চিত্তে—স্বচ্ছন্দ চিত্তে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। রাস্তার হকারের নিকট হইতে একখানা কাগজ আনিয়া, কাগজের প্রথম লাইন হইতে শেষ লাইন পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া গেল—গত রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে সে কাগজে কোনো বিবরণ ছিল না। দুশ্চিন্তায় সেই রাত্রিতে তাহার ভাল ঘুম হইল না।

ফিন্ পরদিন প্রাতে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া ড্রয়িংরুমে গিয়া একটা খবরের কাগজে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। কিন্তু সে দিনও কোনো খবর পাওয়া গেল না।

অনিশ্চিত সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে ফিন্ অস্থির হইয়া পড়িল;—সে কোনো কাজেই মন বসাইতে পারিল না—সকল সময়ই তাহার মনে হইত, সেই রাত্রের ভয়ানক ঘটনা, আর ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম। সু-নিশ্চিত একটা কিছু জানিতে না পারিয়া তাহার পক্ষে দিন কাটান অসহ্য হইয়া উঠিল। এসিষ্টাণ্ট কি মরিয়াছে, না তাহাকে ফ্যাসাদে জড়াইয়াছে? এই দুই প্রশ্নের উত্তরের জন্য সারাটা দিন তাহার মন তোলপাড় করিতে লাগিল।

অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া ফিন্ একটা টেক্সি ভাড়া করিয়া হাসপাতালে উপস্থিত হইল। তারপর দালানের চারিদিকে সে দুই একবার ঘুরিয়া আসিল—কাহারও দেখা পাইল না।

অগত্যা, সিড়ি দিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল। ফিন্ যে স্থির মনে ভাল মন্দ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া হাসপাতালে গিয়াছে তাহা নহে। বাস্তবিক সেখানে গিয়া সে কি করিবে, না করিবে, কিছুই ঠিক করিয়া যায় নাই। উপস্থিত মত যাহা ভাল মনে হইবে তাহাই করা যাইবে, এই ছিল তাহার মনোগত ইচ্ছা।

একজন নার্সকে সে জিজ্ঞাসা করিল—"কাগজে দেখিলাম আমার বন্ধু জর্জ্জ হোলজ পিস্তলের গুলিতে আহত হইয়াছেন। তার কি বাঁচবার কোনোই আশা নেই?"

"ওঃ! আপনি সেই বন্ধকী দোকানের ডাকাতির কথা বলছেন? রোগী বাঁচবে কি না ঠিক বলা যায় না। এই যে ডাক্তার বাবু আসছেন? ইনিই রোগীকে দেখে থাকেন।"

ফিন্ ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া কহিল—"আমার না—ম গেনন। হোলজ্ আমার বন্ধু। তার এই বিপদে আমি যে কতটা মর্ম্মাহত হয়েছি, তা আর কি বল্‌বো, মহাশয়!"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিল—"তার জীবনের আশা খুবই কম। গুলিটা মস্তিষ্কের গোড়ায় বিঁধে আছে। অবস্থা শোচনীয়—পক্ষাঘাতে রোগী অবশ অচল। একটু নড়বার শক্তিও নেই। তবে, আমাদের আশা আছে, অন্ততঃ জবানবন্দীটা সে দিয়ে যেতে পারবে। আপনি কি তাকে দেখতে চান?"

ডাক্তারের এই প্রশ্নটার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে একটু চমকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল "হাঁ; যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।" পর মুহূর্ত্তেই সে নিজকে ধিকার দিল। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না বলিয়া সে ডাক্তারের অনুসরণ করিল।

রোগীর শয্যার কাছে গিয়াই লোকটা একলাফে হাত দুই পিছাইয়া আসিল—"এযে চেয়ে আছে!"—সে ডাক্তারের আস্তিন আঁকড়াইয়া ধরিল।

ডাক্তার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"এই অবস্থাতেই হাসপাতালে ইহাকে আনা হয়।"

"কিন্তু এ কি কখনও চোখ বোজে না?"

"না, সে অজ্ঞান।" তখন সে আরও কাছে সরিয়া আসিল। রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফিনের মন বিভিন্নভাবের ঘাত প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। নির্দ্দোষ এসিষ্টাণ্টের দুর্ভাগ্য দর্শনে তাহার হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইয়া গেলেও সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, রোগীর যেন আর সংজ্ঞা লাভ না হয়।

ফিন্ হোল্‌জের দৃষ্টিহীন বিস্তৃত চোখ দুইটীর প্রতি না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। এই স্থির পলকহীন চোখ দুটী যেন তাহাকে যাদু করিয়াছিল। কি যেন একটা অব্যক্ত ভাষা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিল। ফিনের মনে হইল, ডাক্তার কি করিয়া জানিতে পারিল যে হোলজ চোখে কিছুই দেখিতেছে না? হয়ত সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছে! দেহ অবশ হইলেই যে মস্তিষ্কের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে?

এই কথা মনে উদয় হওয়া মাত্রই ফিনের কপাল স্বেদসিক্ত হইয়া গেল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। সে ডাক্তারের পশ্চাতে সরিয়া আসিল। ডাক্তার তখন রোগীর বেণ্ডেজ বাঁধিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, ডাক্তার যখন অন্য রোগী দেখিতে গেল, সেও তাহার অনুসরণ করিল। হোলজের শয্যা পার্শ্বে একাকী থাকিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না।

সে রাত্রে তাহার মোটেই ঘুম হইল না। তন্দ্রার মধ্যেও সে স্বপ্নে দেখিতে লাগিল, সেই বিস্ফারিত বড় বড় চোখ দুটি তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে—যেন বলিতেছে, "এই আমার হত্যাকারী।" জাগ্রত অবস্থায়ও ফিন্ দেখিত—চোখ দুটী দেয়ালে, দরজায়, আলোকে, অন্ধকারে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি ভীষণ অবস্থা!

হোলজের জীবন মরণের উপর তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। এই কথাটাই ফিনের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ফিনের কাছে সমস্ত পৃথিবী লুপ্ত হইয়া শুধু এই একটি মাত্র কথাই প্রলয়ের আগুনের মত তাহার মনে অহোরাত্র জ্বলিতে লাগিল।

গতকল্য হাসপাতালে গিয়া তাহার মনে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি ব্যতীত কোনোই লাভ হয় নাই, তথাপি সে বারবার ঘড়ি দেখিতে লাগিল—কখন ১০টা বাজিবে,—হাসপাতালে যাওয়ার সময় হইবে। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল—চিরদিনের তরে হোলজের চোখ দুটী নিমিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত, জীবনে আর শান্তি নাই।

হাসপাতালে প্রবেশ করিতে তাহার কোনো বেগ পাইতে হইল না। সেই ডাক্তারটাই তাহাকে রোগীর পাশে লইয়া গেলেন।

ডাক্তার হোলজের নাড়ী টিপিয়া কহিলেন—"আপনি ঠিক সময় মত এসেছেন। ইহার জীবন-শক্তি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আর বেশী দেরী নাই।"

ফিন্ ভয়ে উৎকণ্ঠিত; অস্পষ্টস্বরে কহিল—"কিন্তু এর চোখ যে এখনও খোলা!"

হোলজের পাশেই, আর একটি ভিন্ন খাটিয়ায় একজন রোগী শুইয়াছিল। সে পূর্ব্বদিন ছিল না। তার চোখ মুদিত—যেন ঘুমে অচেতন। ফিনের কথা শুনিয়া এই রোগীটি বালিশের উপর দুই একবার মাথা এপাশ ওপাশ করিয়া কাৎ হইয়া হোলজের দিকে মুখ করিয়া শুইল।

ডাক্তার এসিষ্টাণ্টের হাতখানা ধীরে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া কহিল—"আহা, বেচারার জীবন প্রদীপ নিভে যাচ্ছে!" ডাক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিনের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু ফিনের কোনো উত্তর না পাইয়া ডাক্তার অতি সন্তর্পণে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার যে চলিয়া গিয়াছে, ফিন তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে রোগীর পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ দুটীর উপর কি মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে? সে রোগীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং ক্লান্তিহীন অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

পাশের খাটিয়াস্থিত রোগীটীও তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিজ কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ফিনের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ফিন্ রোগীর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডান হাতে রোগীর চোখের পাতা দুইটী নীচের দিকে টানিয়া দিল; কিন্তু হাত সরাইয়া আনা মাত্রই চোখের পাতা পুনরায় উপরে উঠিয়া গেল।

সে সভয়ে পিছনে হটিয়া গেল। সেই খাটিয়াস্থিত রোগীও তাড়াতাড়ি গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া একেবারে উঠিয়া শয্যার পাশে বসিয়া পড়িল। ফিন ভয়ে এতটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল যে আর একটা রোগী যে এরূপ করিয়াছে, তাহার খেয়ালই ছিল না। ফিন্ আবার এসিষ্টাণ্টের অসার দেহের উপর ঝুকিয়া পড়িল। এবার বুঝিতে পারিল, রোগীর শেষ সময় উপস্থিত। মুমূর্ষু হোল্জের অধর প্রান্তে যেন শেষ নিশ্বাসটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছে। বিস্ফারিত পলক হীন নয়ন হইতে জীবনের দীপ্তি যেন নিভিয়া গিয়াছে। ধীরে, অতি ধীরে, উপরের চোখের পাতা নিজের ভারেই যেন নীচের পাতার সহিত মিলিত হইয়া সেই অন্তস্থল ভেদী স্থির দৃষ্টিকে ঢাকিয়া ফেলিল!

* * * * *

ফিন্ তখন হোল্জের শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। এবং হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল—"রক্ষা পাওয়া গেল—ভগবানকে ধন্যবাদ!"

কাঁধের উপর হাতের স্পর্শে চমকিত হইয়া ফিন্ মুখ তুলিয়া দেখিল সেই খাটিয়াস্থিত রোগটী তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতেছিল। সব কথা তাহার বোধগম্য হইল না—সে কেবল শুনিল—লোকটা যেন বলিতেছে—"হোলজের হত্যাপরাধে আমি তোমাকেই গ্রেপ্তার কর্‌ছি।"

ফিন হতবুদ্ধির মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে ব্যক্তি পকেট হইতে একটা কি জিনিষ বাহির করিয়া ফিনের সম্মুখে ধরিল—"এটা কি তোমার নয়? বন্ধকি দোকানে এসিষ্টাণ্টের পাশেই এটা পড়েছিল।"

ফিন্ চাহিয়া দেখিল, জিনিষটি আর কিছুই নয়,—তাহার সেই জেলের, সঙ্গী মরুচে পড়া বহু পুরাতন রূপার ঘড়িটি! *

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ।

* ইংরেজী গল্পের অনুবাদ।

# ৺ অমরচন্দ্র দত্ত।

জন্ম—বঙ্গাব্দ ১২৬১, ৫ই আশ্বিন।

মৃত্যু—বঙ্গাব্দ ১৩২৬, ২৫শে বৈশাখ।

যমুনা লহরী ও 'ভারত সঙ্গীতের' কবি, জাতীয়তার প্রবীন পুরোহিত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সাংবৎসর শ্রাদ্ধ-বাসরে সম্মিলিত হইতে না হইতেই 'প্রেম ও ফুলের' প্রিয় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কমনীয় কণ্ঠ বঙ্গবাসীর নিকট চিরতরে নীরব হইয়াছে। কবিবর গোবিন্দ চন্দ্রের সদ্য শোক ভুলিবার অবসর ঘটিল না, ইতি মধ্যেই পূর্ব্ববাঙ্গালার অন্যতম প্রবীন সাহিত্যক অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু আমাদের হৃদয়কে শোক ভারাক্রান্ত করিল। ক্রমে ক্রমে কয়েকটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের তিরোধানে বঙ্গসাহিত্যাকাশের একাংশ ঘোর তমস চ্ছন্ন হইল। বঙ্গভাষা জননীর চিহ্নিত সন্তানগণ একে একে সকলেই বিদায় গ্রহণ করিয়া মায়ের স্নেহের বক্ষ শূন্য করিতেছেন। পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রচন্দ্র, প্রতিভাবান্ অজিতকুমারের অভাবও একই সময় আমাদিগকে অনুভব করিতে হইয়াছে।

বঙ্গাব্দ ১২৬১ সালে (১৮৫৪) ৫ই আশ্বিন ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ শ্রীবাড়ী গ্রামে, মাতুলালয়ে দত্ত মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন বানাইল গ্রামে; পিতার নাম ৺ ব্রজনাথ দত্ত।

অমর বাবু ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া কলিকাতা জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসনে এফ, এ পড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তাহার পাঠ শেষ হয়।

দত্ত মহাশয় বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যালোচনা করিতেন। মাইনর পরীক্ষার তাঁহার বাঙ্গালা রচনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হওয়ার পর হইতেই তাঁহার সাহিত্য সাধনা আরম্ভ হয়। ইহার পর হইতে তিনি আজীবন সাহিত্য সেবা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৭৭ অব্দে তিনি 'ভারত মিহির' সংবাদ পত্রের সহকরী সম্পাদকের কার্য্য করেন। অতঃপর কতিপয় বৎসরের জন্য ইহার সম্পাদকও ছিলেন।

অমর বাবু পূর্ব বাংলার সাহিত্যের গৌরবময় যুগের অন্যতম স্মৃতি স্বরূপ ছিলেন। তিনি যখন সাহিত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন পূর্ব্ববাংলায় সাহিত্যের গৌরবের যুগ চলিতেছিল। 'বান্ধব' তখন সাহিত্য আসরে নূতন ভাবের প্রবর্ত্তক—নিত্য নবভাবের অণুপ্রেরণায় সাহিত্যিক বৈঠককে মসগুল করিয়া রাখিয়াছে, ঠিক এমনি সময় অমর বাবু 'ভারত মিহিরের, মিহিরস্বরূপ বঙ্গ সাহিত্য গগনে দীপ্তি পাইতেছিলেন। সে একদিনের কথা—তখন বঙ্গ সাহিত্য গগনে 'বান্ধবকে' কেন্দ্র করিয়া কবিবর নবীনচন্দ্র, কবি দীনেশচরণ, কবি আনন্দচন্দ্র, ঐতিহাসিক রজনী কান্ত, কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়, কবিবর গোবিন্দচন্দ দাস, উজ্জল জ্যোতিষ্কের মত পরিশোভিত ছিলেন। যাহারা শ্রদ্ধার সহিত পুরাতন চিত্র অবলোকন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা দেখিতে পাইবেন, তখন দেশ কিরূপ নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। সাহিত্যে, ধর্ম্মে, সমাজে একটা নূতন জীবন স্পন্দিত হইতেছিল। ইতিহাসকে যাহারা সম্ভ্রমে মানিয়া চলেন, তাহারা একটী বার সেই যুগের সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া দেখুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক অনুরোধ।

ক্রমে অমর বাবু ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত সঞ্জীবনী পত্রিকার অন্যতর পরিচালক হন। এই সঞ্জীবনী বর্ত্তমান দেশ বিখ্যাত সঞ্জীবনী পত্রিকার পথ নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন—তাহা তাহার কর্ণধারগণ আজ অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? ১৮৭৮ অব্দ হইতে ১৯০৪ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি চারুবার্ত্তার সম্পাদক এবং অতঃপর বর্ত্তমান চারুমিহিরের সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদকের কার্য্য করেন। কেবল এই সংবাদ পত্রগুলির পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াই তিনি বঙ্গবাণীর সেবা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন নাই। 'লহরী' 'অরূপা' 'হরিবল্লভের স্নেহ' প্রভৃতি উপন্যাস মালা, 'নিরালা' নামক ক্ষুদ্র গল্পপুস্তক, 'হাজি মহম্মদ মহসীন' 'শরচ্চন্দ্র' প্রভৃতি জীবন-চরিত গ্রন্থ এবং 'আহার ইঙ্গিত' নামক প্রবন্ধ পুস্তক তিনি বঙ্গ সাহিত্য সরস্বতীকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার এই অভিনব উপহারে বঙ্গসাহিত্যের গৌরব কি প্রকার এবং কতখানি বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা তৌল

করিয়া দেখিবার সময় আজ নয়। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে. বঙ্গসাহিত্য হইতে তাঁহার নাম কখনও লুপ্ত হইবে না ; বরং উজ্জ্বলতর অক্ষরে তাহা অঙ্কিত থাকিবে।

অমর বাবুর আর একটী কীর্ত্তি—ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি। ১৮৭৭ অব্দে এই সহরে সারস্বত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার কল্পনাও কাহারও মনে আসে নাই, তখন অমর বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ময়মনসিংহে সারস্বত সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদের অনুষ্ঠেয় অনেক কার্য্য আরম্ভ করিয়া যথাযথ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সারস্বত সমিতি ময়মনসিংহের একটী গৌরবের জিনিষ ছিল। অমর বাবুই ইহার অন্যতম পরিচালক এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কিছুদিন ইহার সম্পাদকও ছিলেন। তাঁহার এই মানস সন্তান ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া যৌবনে যোগীর মত সমাধিস্থ হইয়াছে। কবি দীনেশচরণ, কবি আনন্দচন্দ্র, কবিবর গোবিন্দ চন্দ্র এই সারস্বতের পূজারী ছিলেন। তাঁহাদের কবিতা পাঠে লোকের চিত্ত মুগ্ধ হইত—অমর বাবুর অমর কণ্ঠ লোকের ভাব উন্মাদনা আনিয়া দিত। এই নগরে ১৮৮৪ অব্দে যে সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অমর বাবু ছিলেন তাহারও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক।

অমর বাবু কেবল সাহিত্যসেবীই ছিলেন না। তাঁহার শক্তির উৎস বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া জীবনের সার্থকতা ও শ্রী সম্পাদন করিয়াছিল। তিনি একাধারে সৎ বক্তা, সুলেখক, কর্ম্মী, আদর্শ-শিক্ষক, চরিত্রবান্, ভাবুক, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং জন সেবক ছিলেন। অমর বাবুকে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে পূর্ণরূপে আমরা দেখিয়াছি ; তাহাতে তাঁহার শক্তির সম্যক্ বিকাশেরও পরিচয় পাইয়াছি। তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার সময় আজ নয়।

অমরবাবুর নৈতিক চরিত্রের পরিচয় ময়মনসিংহ বাসী অনেকেই জানেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ময়মনসিংহের নৈতিক অবস্থা চিরদিন এমনতর ছিল না। এক সময় এই নগরে "সুরাধুনীর ধারা" খরতর ছিল। তাহার সাক্ষ্য অনেকেই দিবার জন্য বর্ত্তমান আছেন। অমরবাবু এবং তাঁহার সহকারী বন্ধুগণের সমবেত চেষ্টায় তাহার প্রবল স্রোত যে প্রশমিত হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য অনেকেই দিতে পারিবেন। সহরের এমন কোন সাধু অনুষ্ঠান ছিলনা, যাহার সহিত অমরবাবু কোন না কোনরূপ সংস্পৃষ্ট ছিলেন না। অমর বাবুকে আমরা অনন্যকর্ম্মারূপে দেখিয়াছি। ময়মনসিংহ আজ যে সকল বিষয়ে গৌরব করিতে পারে, সেই সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অমরবাবু কিরূপ দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা অনেকেরই জানা আছে। ময়মনসিংহ ইন্ষ্টিটিউসন বা সিটি কলেজিয়েট স্কুলের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা, সিটি কলেজ ( বর্ত্তমান আনন্দ মোহন কলেজ ) প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহাকে অগ্রগণ্য দেখা গিয়াছে।

তাঁহার মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি সাধারণের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানেন। কেন নীরব ছিলেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। দুরন্ত ব্যাধি তাঁহার জীবন প্রদীপকে ক্রমশঃ ক্ষীণতর করিতেছিল। অনেকদিন হইতেই তিনি 'পরপারে' পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে পারের তরীর অন্বেষণে ছিলেন। এ অবস্থায় যখন যিনি যে কোন সদুদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, শয্যাসায়ী থাকিয়াও তিনি সাধ্যানুসারে তাহাকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি 'সৌরভের' অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। সৌরভ সম্পাদক মন্ত্রশিষ্যের ন্যায় তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সৌরভের গৌরব রক্ষার জন্য তিনি কত কথাই না সম্পাদককে বলিয়াছিলেন।

অমরবাবু সাহিত্যকে যেমন জীবনের প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাহার সেবক মাত্রকেই প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ করিয়া অশেষ প্রীতি অনুভব করিতেন। এমনকি এইনবীন সাহিত্যসেবীর সহিত তিনি যেরূপ প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে ভালবাসিতেন, তাহা বাস্তবিকই এই আত্মম্ভরিতার যুগে অতি বিরল। অমরবাবুর 'হাতের

গড়া' অনেক নবীন লেখকের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জণ করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ বাক্যে প্রণোদিত হইয়া অনেককেই লেখনি সঞ্চালন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন সময়ে পরিচিত হইয়াও আমরা তাঁহার জলন্ত উপদেশ বাণী লাভে বঞ্চিত হই নাই। যিনি অমরবাবুর সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ব্যবহারে উদারতার সম্যক বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। আজ সত্যই আমরা একটী সাচ্চা, সরল, ধর্ম্মপ্রাণ, উৎসাহী লোক হারাইলাম।

যাঁহারা যথার্থ দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনকে সাধারণের কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্ষণ পর্য্যন্তও তাঁহার চিন্তাজাল হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে পারেন না। তাহারা সর্ব্বদাই আত্মচিন্তায় পরাঙ্মুখ থাকেন। তাহার ফলে তাঁহাদের অভাবের পর তাঁহাদের পরিজনের চিন্তা দেশবাসীকেই করিতে হয়। অমরবাবুর অবস্থা এখন দাঁড়াইয়াছে ঠিক তাহাই। দেশের ও দশের কল্যান কামনা করিতে করিতে স্বীয় পরিবারের ভাবনাও তেমন করিয়া তিনি ভাবিতে অবসর পান নাই। তাই তাঁহার দুস্থ পরিবার আজ যথার্থই বিপন্ন হইয়া দেশবাসীর কর্ত্তব্যের প্রতীক্ষা করিতেছে।

যে মহাত্মার মন্ত্রশিষ্য—যাঁহার আদর্শে তাঁহার জীবন গঠিত, সেই মহাত্মা আনন্দ মোহন বসুর জীবনী অনুধ্যান করিতে করিতেই অমরবাবু অমরধামের পথিক হইলেন। ভক্ত এমন করিয়াই তাঁহার গুরুর সহিত একপ্রাণ হইয়া যায়। এমন করিয়াই 'সব সমর্পিয়া' একমন না হইলে কি কখনও কাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? অমর বাবুর কথায়ই বলিতেছি—"যাহারা সংসারে সত্য এবং সরলতার আশ্রয়ে বাস করে, তাহারা মৃত্যুর অতীত।" আমরাও বলি—হে অমর, আজ তোমার নশ্বর দেহের মৃত্যু হইল সত্য, কিন্তু তোমার আত্মা অমর লোকবাসী হইলেন—তোমার উন্নত চরিত্র ও বিমল যশ বিভা অনেকদিন তোমায় ইহধামে অমর করিয়া রাখিবে—তুমি লোকের মনের মন্দিরে পূজা পাইবে।

শ্রীমাধবাচার্য্য চক্রবর্ত্তী।

---

# উল্কা।

প্রচুর উল্কাপাত যদিও কদাচিৎ হইয়া থাকে, তথাপি পরিষ্কার অন্ধকার রাত্রিতে কেহ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে অল্পাধিক উল্কাপাত দেখিতে পাইবেন। ইহারা অনেক সময়েই অর্দ্ধসেকেণ্ডের কম সময় স্থায়ী হইয়া থাকে। কিছু সময় পরে পরে কোন কোন রাত্রিতে নভোমণ্ডলে এক বিশেষ আতস বাজির খেলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৮৬৬ সনে নবেম্বর মাসে ১৩ই, ১৪ইর মধ্যে এইরূপ একটী আতস বাজি দেখিয়া সার রবার্ট বল (Sir Robert Ball) তাহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

তিনি বলিতেছেন, "মেঘ মুক্ত পরিষ্কার অন্ধকার রজনী। আমি সেই রাত্রির কথা কখনও ভুলিব না। আমি সে দিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় লর্ড রসের প্রবল দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা নীহারিকা পুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলাম। এমত সময়ে আমার একজন পার্শ্বচর আশ্চর্য্য বোধক শব্দ করাতে আমি দূরবীক্ষণ ছাড়িয়া নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দৃষ্টি করিবা মাত্রই একটী উজ্জ্বল উল্কা আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইল। ক্রমে ২টী ৪টী এরূপ অসংখ্য উল্কা দৃষ্ট হইতে লাগিল। যদিও সেই রাত্রিতে উল্কাপাত হইবে ইহা আমি পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলাম, কিন্তু তাহা যে এত সত্বর আরম্ভ হইবে তাহা আমি মনে ভাবি নাই। ইহার পরে ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এরূপ এক দৃশ্য দেখিলাম যে তাহা কখন জীবনে ভুলিব না। উত্তর উত্তর ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহারা পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া কোনটী দক্ষিণে কোনটী বামে এবং কোনটী আমাদের মস্তকের উপর দিয়া ছুটীতে লাগিল। নিশা শেষে যখন সিংহরাশির উদয় হইল তখন ক্রমেই উল্কাপাত সুন্দরতর হইতে লাগিল। এই উল্কা রাশি সিংহ রাশির দিক হইতে আসিতেছিল। কখন কখন কোন কোন উল্কা আমাদের দিকে আসিতে আসিতে হঠাৎ থামিয়া গেল এবং একটী নক্ষত্রের মত দৃষ্ট হইতে লাগিল। হঠাৎ উহা উজ্জ্বলতর হইয়া ক্রমে নিবিয়া গেল। আবার কোন কোনটি কতিপয় মিনিট স্থায়ী

একটী আলোক রেখা টানিয়া চলিয়া গেল। সে রাত্রিতে যে কত সহস্র উল্কাপাত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।"

বর্ত্তমান জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্কাপিণ্ড যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা আমরা অবগত আছি। যে উপাদানে উল্কারাশি গঠিত সেই উপাদান দ্বারাই আমাদের পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং শানগ্রহের বিশাল কায়ও এই উপাদানের সমষ্টি মাত্র. উল্কা একটী নিরেট শীতল লৌহ কিম্বা প্রস্তর খণ্ড বিশেষ। অনন্ত আকাশ হইতে আসিয়া ইহা আমাদের পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করে। তখন উহার গতি সেকেণ্ডে ২৬ মাইল থাকে। পৃথিবী ও প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮ মাইল বেগে চলিতেছে। যদি উল্কা পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে আসিতে থাকে তাহা হইলে উহার গতি সেকেণ্ডে ৪৪ মাইল দেখা যাইবে। যদি উল্কা পৃথিবীর গতির অনুগমন করে, তাহা হইলে উহাকে আমরা মাত্র সেকেণ্ডে ৮।১০ মাইল বেগে চলিতে দেখিব। আমাদের বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া প্রবল গতির দরুণ বায়ুর দ্বারা যে বাধা প্রাপ্তহয় সেই সংঘর্ষেই উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে উল্কা পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বন্দুকের গুলির ১০০ গুণ বেগে চলিয়া থাকে। কিন্তু বন্দুকের গুলি বায়ুর সংঘর্ষে ১০ ডি ফাঃ হিঃ উত্তপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু মণ্ডলে কোন বস্তু চলিতে থাকিলে উহা গতির বর্গফলের অনুপাতে উত্তপ্ত হইয়া থাকে, কাজেই উল্কা বন্দুকের গুলির ১০হাজার গুণ অধিক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রখর উত্তাপে উল্কা সহজেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া ক্রমে ধূলিরাশিতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ উল্কার পরিমাণ অর্দ্ধ রতির উর্দ্ধ হইবে না। নচেৎ উহা হইতে প্রচুর আলো প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কখন ২ ইহাদের পরিমাণ বৃহৎ থাকে; তখনই ইহারা আসিয়া আমাদের ভূমণ্ডলে পতিত হয়। ইহার কোন কোনটীর ওজন প্রায় ১ মণ হইয়া থাকে। এইরূপ বিশালকায় উল্কার সংখ্যা অত্যন্ত কম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে দৈনিক প্রায় ২ কোটী উল্কা পৃথিবীতে পতিত হয়। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই মেঘ ও চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হয় না। অত্যন্ত উজ্জল উল্কা পিণ্ড বায়ু মণ্ডলের প্রায় ১০০ মাইল উর্দ্ধেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ উল্কা আমরা ৭৫ মাইল উর্দ্ধে দেখিয়া থাকি, কোন কোন উল্কা ৫ হইতে ১০ মাইল উর্দ্ধে আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়, উল্কা প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রায় ৫০ হইতে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া থাকে।

কখন কখন অত্যোজ্জল উল্কা পিণ্ডকে তাহার প্রকৃত আয়তন অপেক্ষা অনেক বৃহৎ দেখা যায়। এমন কি কোন কোনটী আমাদের চন্দ্রমণ্ডলের সমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন আমরা অনুমান করিতে পারি যে উহাদের ব্যাস্ কয়েক শ ফিট হইবে। কিন্তু ইহা আমাদের দৃষ্টি ভ্রম মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে অতি বৃহৎ উল্কা ও আমাদের বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করিবার সময়ে ১০ ১২ মণের অধিক থাকে না। কাজেই উহাদের ব্যাস অত্যন্ত অধিক হইলেও ১০ ফিটের অধিক নহে। ১৮৬৬ সালে হাঙ্গেরী দেশে যে উল্কাটী পতিত হইয়াছিল, উহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। উহার ওজন প্রায় ৭ মণ। অনেক উজ্জল উল্কার পরিমাণ একটী বালু কণার মত। হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে বলিয়া এবং উহা হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহাও প্রজ্জ্বলিত হয় বলিয়া উহাদিগকে বৃহৎ দেখায়।

পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে আসে বলিয়া উল্কার উপাদান পদার্থ একটী দেখিবার জিনিষ। বিলাতে দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের ঐতিহাসিক যাদুঘরে ইহার বহু সংগ্রহ রহিয়াছে। ইহাদের উপরভাগে কাল পাতলা চকচকে একটী আবরণ দেখা যায়। হটাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া বায়ু মণ্ডলে চলার দরুণ এই আবরণটীর সৃষ্টি হইয়া থাকে। উপরের আবরণটী এক ইঞ্চির ১০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র পুরু। ইহার এত পাতলা হইবার কারণ এই, বায়ু মণ্ডলে চলিবার সময়ে প্রজ্জ্বলিত অংশের অধিকাংশই উড়িয়া যায়। এই আবরণটীর অধিকাংশ উপাদানই অক্‌স্যাইড অব আইরণ ( Oxide of iron ) এবং ইহা অত্যন্ত তড়িৎশক্তি সম্পন্ন।

কখন কখন উল্কা ভূপতিত হইবার সময়ে প্রবল বজ্রনাদের মত শব্দ হইয়া থাকে। অত্যন্ত দ্রুত পতিতে

চলিবার সময়ে সম্মুখের বায়ু উষ্ণ হইয়া থাকে এবং পশ্চাতে এক বায়ু-শূন্যস্থান উদ্ভূত হয়। এই শূন্য স্থানে সম্মুখের বায়ু প্রবল বেগে প্রবেশ করাতে বজ্রের মত শব্দ হইয়া থাকে। উল্কার পশ্চাতে কখন কখন একটী ধূম রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রেখা উল্কার ভস্মিভূত রেণু অত্যুষ্ণ বায়ুর সংসর্গে বাষ্পাকারে পরিণত হওয়ার দরুণ উদ্ভূত হয়।

১৮৮৫ সনে মেক্সিকোতে (Mexico) মেগাপিণ যে উল্কাটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত তাঁহার বর্ণনা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। "রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময়ে আমি যখন আমার বাগানে কতিপয় অশ্ব চড়াইতে গিয়াছিলাম তখন একটী উত্তপ্ত লৌহ হঠাৎ জলের ভিতর ডুবাইয়া দিলে যেরূপ ছেৎ করিয়া শব্দ হয় সেই রূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং সেই সঙ্গেই একটী গুরুভার জিনিষ মৃত্তিকায় পতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ হইল। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাগানটি উজ্জল আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে হাউই বাজির স্ফুলিঙ্গের মত উজ্জল ক্ষুদ্র ২ কণা সকল আমার নিকটস্থ বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল। আমি প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্ব্বেই ইহা মিলাইয়া গেল। তখন মাত্র একটী মেচ বাতির কাটি জ্বালিয়া দিলে যেরূপ আলো হয় সেইরূপ আলো রহিল। ইহাতে আমার অশ্ব কয়টী নিতান্তই বিচলিত হইয়াছিল এবং নিকটস্থ গৃহাদি হইতে লোকজন আসিয়া উহাদিগকে শান্ত করিল। আমরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম ব্যাপার কি? তখন পুড়িয়া যাইব ভয়ে বাগানের ভিতরে হাটিতে আমাদের ভয় হইতেছিল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিতে পাইলাম যে আলোটী ক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে।

তখন একটী আলো আনিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলাম একটী গর্ত্তের ভিতরে যেন একটী অগ্নি গোলক রহিয়াছে। ইহা ফাটিয়া আমাদের অনিষ্ট হইবে ভয়ে আমরা দূরে সরিয়া গেলাম। সে সময়ে আমরা আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখি যে তখনও উল্কাপাত হইতেছে কিন্তু তাহাতে কোনরূপ শব্দ নাই। তাহারা উর্দ্ধে অলস্ত অবস্থায় চলিতে চলিতে নিভিয়া যাইতেছে। তখন আমরা পুনরায় গর্ত্তের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, গর্ত্তের ভিতরে একটী লৌহ খণ্ড; কিন্তু তখনও উহা এত উষ্ণ যে উহাতে হাত দেওয়া যায় না। সে দিবস সারা রাত্রিই উল্কাপাত হইয়াছিল।"

বর্ণনাতে দেখা যায় মেগাপিনের উল্কাটী এক উল্কা বৃষ্টির সময়ে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ হয় না। খুব কম উল্কা বৃষ্টিতেই উল্কাপিণ্ড আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

থুইং (Thuing) সাহেব যে উল্কাটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এক মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে পতিত হইয়াছিল। প্রথমত এক প্রবল বিদারণ শব্দ তৎপরে শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া ভূমিতে এক গুরুভার জিনিষ পড়ার শব্দ শুনা গিয়াছিল। এই শব্দ অনেক দূর পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বহুলোক বাড়ী হইতে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল। এক কৃষক ইহা পড়িতে দেখিয়াছিল।

সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহার নিকটেই ইহা পতিত হয়। ইহা মৃত্তিকার ভিতর অনেক দূর প্রবেশ করিয়াছিল। এমন কি চক্‌ পাথরও কিছু দূর ভেদ করিয়াছিল। অধিকাংশ উল্কাই তির্য্যক ভাবে মৃত্তিকায় পতিত হইয়া থাকে। কদাচিৎ ২।১টী লম্ব ভাবে পতিত হয়।

১৪৯২ সনে সর্ব্বপ্রথমে এলসেসে (Alsace) একটী উল্কা পাওয়া যায়। উহাকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করিয়া এক পূজা ঘরে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহা ওজনে প্রায় ১½ মন। উহা পড়িবার সময় ৫ ফিট মৃত্তিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই উল্কা গুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক জাতীয় প্রস্তর প্রধান, আর এক জাতীয় লৌহ প্রধান. উল্কার লৌহ একরূপ যৌগিক পদার্থ, ইহাতে শতকরা ৮০ হইতে ৯৫ ভাগ লৌহ এবং ৬ হইতে ১০ ভাগ নিকেল থাকে। নিকেল থাকাতেই পিণ্ডটীকে শাদা শাদা দেখা যায় এবং ইহা সহজে মরিচা ধরে না। ইহাতে আরও ১০।১২টী ধাতব পদার্থ দেখা যায় যাহা

আমাদের পৃথিবীতে মিলে না। প্রস্তর জাতীয় উল্কার ভিতরে যে ধাতব পদার্থ দেখা যায় তাহা আমাদের পৃথিবীতে পাওয়া যায়।

সচরাচর অধিকাংশ উল্কাতেই নিম্নলিখিত পদার্থ বিদ্যমান দেখা যায়। লৌহ, নিকেল, মেগ্নেসিয়াম, কেলসিয়াম, এলুমিনিয়াম, কার্ব্বন, অক্সিজেন, সলফার, সিলিকন এবং ফস্ফরাস্। অল্প সংখ্যকের ভিতরে হাইড্রজেন, মেন্‌গেনিস্, কোবাল্ট, তাম্র, সীস্, সোডিয়াম, ক্রোমিয়াম, টিন, আরসেনিক, এন্টিমনি, ক্লোরিন্, নাইট্রোজেন, ভেনেডিয়াম এবং কখন কখন অল্প পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লেটিনাম, গেলিয়াম এবং আইরিডিন পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত লৌহ নিকেলের সহিত মিশ্রিতাবস্থাতে পাওয়া যায়।

এই সকল উল্কাপিণ্ডে কখন কোন প্রকার জান্তব পদার্থের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই! তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে উল্কা যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহাতে কোন প্রকার জীবের বসতি নাই।

কখন কখন প্রকাণ্ড উল্কা চলিবার সময় যে আলোক রেখা টানিয়া যায় তাহা প্রায় ৪৫ মিনিট স্থায়ী হইতে দেখা গিয়াছে।

ইহা প্রমাণিত হয় যে উল্কা সকল একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীতল জড়পিণ্ড—অনন্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। চলিতে চলিতে পৃথিবীর সান্নিধ্য হইয়াপৃথিবীর আকর্ষণে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মিভূত হইয়া যায় এবং কখন কখন দুই একটী আমাদের ভূতলে পতিত হয়। ইহা দ্বারা দেখা যায় যে আমাদের পৃথিবী ভিন্ন আরও নানাবিধ কঠিন পদার্থ অনন্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে।

যখন প্রচুর উল্কাপাত হইয়া থাকে তখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে উল্কা সকল কোন এক রাশির দিক হইতে আসিতেছে।

কোন্ রাশির দিক হইতে কখন উল্কাপাত হইয়া থাকে তাহা লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটী নিম্নে দেওয়া গেল। সিংহ রাশির দিক ( Leonids ) হইতে ১৩ই নবেম্বর, মীন ( Andiomedids ) হইতে ২৭শে নবেম্বর, মেষ ও বৃষ হইতে ( Perscids ) ১১ই জুলাই হইতে ২০শে আগষ্ট, তুলা ( Draconids ) হইতে ২রা জানুয়ারী, বৃশ্চিক ও ধনু ( Lysids ) হইতে ২০শে এপ্রিল, কুম্ভ ( Aquariids I & II ) হইতে ৬ই মে ও ২৮শে জুলাই, কাল পুরুষ বা বৃষ ( Orionids ) ১০ই হইতে ২৪শে অক্টোবর।

১৮৩৩ সনে যখন স্থিরকৃত হয় যে নিয়মিত সময় পরে পরে উল্কাবৃষ্টি হইয়া থাকে তখন ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে ঝাকে ঝাকে উল্কার দল সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে। যখন চলিতে চলিতে উহারা পৃথিবীর নিকটে আসিয়া পরে, তখন প্রবল পৃথিবীর আকর্ষণে উহারা কক্ষচ্যুত হইয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া উল্কাপাতের সৃষ্টি করে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

---

## গোবিন্দ প্রসঙ্গে।

প্রিয় কবির চির বিদায়ে তাঁহার ভক্তদিগের হৃদয়ে যে কি ভীষণ আঘাত লাগে তাহা সাহিত্যের আসরে অনেকবার পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। যে দিন বাঙ্গালী তাহার জাতীয় কবির বিয়োগে চোখের জল ফেলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে যে প্রকৃতই বাঙ্গালীর জীবনে এক নূতন অধ্যায় অভিনীত হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? শোকের উচ্ছ্বাসে প্রিয়জনের সম্বন্ধে অনেক প্রিয় ও অপ্রিয় কথা বলিয়া উহার প্রবণতার প্রশমন করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কাজেই আমরা অনেক সময় প্রিয়জনকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে অনেক সত্যের অপলাপ করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণও করিয়া থাকি। এই জন্য দায়ী যদি কাহাকেও করিতে হয়, তবে কবির ভক্তগণকে না করিয়া তাহাদের ভাব প্রবণতাকে করাই সঙ্গত। কবির প্রতি অত্যধিক ভক্তির প্রাধান্যই তাহাদের এই অত্যুক্তির কারণ। এই জন্য কবি গোবিন্দ দাসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্ত ও হিত-চিকীর্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অতিশয় উজ্জ্বল ও বিশেষ ভাবে ফুটাইবার জন্য অনেক অসার কথা বলিয়া-

ছেন। ইহা খাটি সত্য। কিন্তু এই জন্য দায়ী কাহাকে করিব? কবির অতুল প্রতিভা? না, ভক্তের বিমল ভক্তির আতিশয্য?

এ দেশের সম্পাদকগণ কবি গোবিন্দ দাসের উপর সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই—এইরূপ একটা কথা তাঁহার ভক্তদিগের মধ্যে উঠিয়াছে। এবং "নব্য ভারতের" প্রবীণ সম্পাদক অগ্রহায়ণের নব্যভারতে সেই কথার প্রতিবাদ করিয়া কবির উদ্দেশে বলিয়াছেন, "তিনি যদি তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট সে সকল কথা (অর্থাৎ নব্যভারত সম্পাদক কবির যে সকল উপকার করিয়াছেন) ব্যক্ত না করিয়া থাকেন, তবে ত্রিকালজ্ঞ দেবতার নিকট অপরাধী হইবেন।" সহৃদয় সম্পাদক মহাশয় কেবল যে তাহার নিজের ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া কবিকে ত্রিকালজ্ঞ দেবতার নিকট অপরাধী করিয়াছেন তাহা নহে। এইরূপ অবস্থায় কবিকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার অধিকার তাঁহার প্রত্যেক হিতকারী ব্যক্তির আছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বাস্তবিক কবি কি এইরূপ অপরাধে অপরাধী? কখনই নহে। ইহা সত্যের অপলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ সত্যের অপলাপ প্রকাশ পাইলে কবির প্রতি যে একটা অবিচার করা হইবে, তাহা ভক্তদিগের মধ্যে কেহ বুঝিতেছেন কি?

আমরা অনেক দিন মৃত কবির সাহচর্য্য লাভের সুযোগ পাইয়াছি এবং তাহার অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধুবর্গের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে কবি তথা কথিত অপরাধ হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত ছিলেন। অন্ততঃ নব্যভারতের সম্পাদকের নিকট যে তিনি কিরূপ কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহা তৎপ্রণীত "চন্দনের" উৎসর্গ পত্র পাঠ করিলেই প্রতীতি জন্মিবে। এইরূপ প্রাণ খোলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—অল্পই দেখা গিয়া থাকে। ইহা ছাড়া যখনই এইরূপ প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, তখনই দেবীবাবুর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে কবির শির নত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাঁহাকে নব্যভারতের কবি বলিয়া অভিনন্দন করিলে তিনি আনন্দের সহিত আমাদের কথায় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সংসার তাপদগ্ধ কবি যখন সংসারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন, তখন দেবী বাবুর 'আনন্দ-আশ্রমে' আসিয়া তিনি অনেকটা শান্তি বোধ করিতেন, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

একদিন ময়মনসিংহের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্তের ভবনে সাহিত্য সম্পর্কে বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল। কবি গোবিন্দচন্দ্র, সৌরভ সম্পাদক এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ময়মনসিংহের সারস্বত সমিতির কথা উঠিতেই তাঁহার রচিত কবিতার প্রশংসাধ্বনি উঠে। তখন কবি অম্লান বদনে বলিলেন—"অমরবাবু আমাকে ভাবের যোগান দিয়াছিলেন বলিয়াই কবিতাগুলি আপনাদের চক্ষে এমন লাগিতেছে।" এই কয়েকটী কথায় কবির কতখানি সারল্য ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সারস্বত সমাজে যখন কবি গোবিন্দ চন্দ্র "সারস্বত কবি" বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, তখন অমরবাবু ঐ সমিতির সম্পাদক। তিনি অবশ্যই বন্ধুভাবে কবিকে ঈদৃশ উপদেশ দিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে এতখানি সম্মান প্রদর্শন করা কত বড় হৃদয়ের পরিচায়ক তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কবির এইরূপ সত্য-প্রিয়তা ও সারল্যের চিত্র আমরা অনেক দিতে পারি।

ভারতমিহির, প্রতিভা, সৌরভ এবং নারায়ণ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকটও কবি ঋণী ছিলেন। কবির মৃত্যুর অব্যবহিত কালপূর্ব্বে যখন আমাদের সহিত তাঁহার শেষ দেখা হয়, তখন অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে নারায়ণ সম্পাদকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও যে তাঁহাকে যথা সময়ে কবিতা দিতে পারেন না, তাহার জন্য তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবং তাহার নিকট হইতে যে সাহায্য লাভ করিয়াছেন তাহাও তিনি অস্বীকার করেন নাই।

ইহা ছাড়া সাহিত্যিক বন্ধুদিগের নিকট তিনি কিরূপ আদর আপ্যায়ণ পাইয়াছেন তাহাও সময় সময় তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কিরূপ ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কবি অক্ষয় চন্দ্র বড়াল কবীন্দ্র রবীন্দ্র

নাথের সহিত পরিচিত করিয়া দিলে তিনি তাঁহাকে কিরূপ আদর করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে কবি কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ইহাতে তিনি নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া সম্ভ্রমে উৎফুল্ল হইতেন। এমন কি কবি গোবিন্দচন্দ্রের যখন কোন চাকুরী ছিল না, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাঁহার এষ্টেটে একটী কাজ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন তাহাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কথা প্রসঙ্গে আমরা তাঁহাকে বলিতাম—"পশ্চিম বঙ্গের লোক আপনার উপর অত্যন্ত অবিচার করিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের রামা শ্যামার কথা লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৰ্দ্ধিত করিতেছেন, অথচ আপনার নামটীর পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতেছেন না। আর পশ্চিম বঙ্গের যে সেই কবিতা লিখিয়া "বঙ্গের কবি" বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, কিন্তু আপনি পূর্ব্বাপর সেই "পূর্ব্ব বঙ্গের কবিই" রহিলেন! ইহা কি পক্ষপাতিত্ব নয়? ইহা শুনিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া আমাদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে তাহার হৃদয়ের মহত্ত্বই প্রকাশিত হইত। কথাটী অপ্রিয় হইলেও যে খাঁটী সত্য, তাহা কোন পক্ষপাতশূন্য পাঠক অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? ইহার বিস্তৃত আলোচনা দিলে অনেক সম্ভ্রান্ত সাহিত্য সেবীর পক্ষপাতিত্ব ও সঙ্কীর্ণতা ধরা পড়িয়া যাইবে। উহা চাপিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করি।

এই যুগে নাম কিনিতে হইলে যে যোগ্যতা না থাকিলেও কেবল দল গঠন করিতে পারিলেই কার্য্যসাধনের অনেকটা সহায়তা হয়, এই সত্য কবির জানা ছিল না। অথবা তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি কবিতা লিখিয়া বন্ধুবর্গকে যদি তাহার ঢক্কা নিনাদ করিতে নিয়োগ করিতেন, তবে কবির ভাগ্য দেবতা আজ কিরূপ পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিতেন তাহা কে জানে? কবি যে কাহারও মুখ চাহিয়া অথবা অন্যের প্ররোচনায় কিছু লিখিতেন না তাহা দেবীবাবুর প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে। কবির কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যিনি কবিকে দেখিতে অবসর পাইয়াছেন, তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে কবির চিত্ত সেই উপাদানে গঠিত নয়। তাঁহার চিত্তে স্বাতন্ত্র্য ও ভাবের সহজ গতি চিত্রপটের মত অবিকৃত রহিয়াছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার উৎস কোথা হইতে এবং উহা কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা যাহারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাহারা দেখিতে পাইবেন। দারিদ্র্যও জন্মভূমি-নির্ব্বাসন জনিত মর্ম্ম জ্বালা তাহার কবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে ভীষণ অগ্নিকণা ছড়াইয়াছিল।

প্রকৃত কবিত্ব যাহাদের আছে, তাহারা শুধু বাক্য ব্যয় করে না। বাক্যের অন্তরালে যে সম্মোহন সৌন্দর্য্য থাকে তাহা দ্বারাই লোকের মনোহরণ করিয়া লয়। এইজন্যই তাঁহার বিদ্বেষ বাক্যবাণের মধ্যেও এমন একটা কিছু আছে, যাহা সত্য এবং সুন্দর।

প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা বলিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিব। 'বান্ধব' সম্পাদক সাহিত্যাচার্য্য কালীপ্রসন্ন ও কবি গোবিন্দ দাসের মনোমালিন্যের কথা উত্থাপন করিয়া অনেক লেখক স্বীয় প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, তাঁহাদের উভয়ের ব্যক্তিগত বিবাদকে সাহিত্যের আসরে টানিয়া আনিয়া একটা কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য কি? প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে বিবাদ বিসংবাদ হওয়া অনিবার্য্য। তাহার সহিত স্থায়ী সাহিত্যের যে কি সম্পর্ক তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একদিন কথা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের সাহিত্য সাধনার কথা উঠিলে তিনি বাক্যে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা কালীপ্রসন্নের একজন ভক্ত ব্যক্তির মুখেও আশা করিতে পারি না। যাহারা গুণী তাহারা গুণের আদর করিবেই।

মৃত কবির পন্থানুসরণ করিয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন—'খোকার দপ্তর' প্রভৃতির লেখক মনোমোহন সেন, 'পল্লীকথা' রচয়িতা দুর্গামোহন কুশারী এবং কবি কুলচন্দ্র দে। ইঁহারা কবির দেহত্যাগের পূর্ব্বেই অকালে কালের কোলে ঝড়িয়া পড়িয়াছেন। নব্য কবিগণের লেখায় মৃত কবির প্রতিভার ছায়া পতিত হয় নাই এমন কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন কি? অবশ্যই তাহা স্বীকার করার মত সহৃদয় ব্যক্তির একান্ত অভাব হইবে। কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠকের নিকট তাহা লুক্কাইত রহিবে না।

কবি—তাহার কাব্য দ্বারাই জীবিত রহেন। কবি এখন সকলের তীব্র ও মধুর বাক্যাবলীর অন্তরালে অবস্থিত আছেন। ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের সঙ্গে পরিচিত হইতে তাঁহার কাব্য যেমন কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে তেমন আর কিছু হইবে কিনা সন্দেহ। তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে অসত্য কথা বা অত্যুক্তি যতটা প্রকাশিত না হয়, তাহা করাই প্রকৃত বন্ধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য। আমরা কবির হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের নিকট ইহাই আশা করি।

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী।

# ঋগ্বেদে চন্দ্রগ্রহণ।

ঋগ্বেদের একটী সূক্তে সূর্য্যগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে ; ঐ সূক্তের ঋক্‌গুলি এত স্পষ্ট যে বেদ ব্যাখ্যাকারগণ তাহাদের অপর অর্থ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু এই বেদে যেস্থলে চন্দ্রগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অর্থে তাঁহারা এরূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে উহার প্রকৃত অর্থের সন্ধান কেহ প্রাপ্ত হন নাই। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব, ৮ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে যজ্ঞার্থ রচিত হইয়াছিল। সায়ণাচার্য্য উহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে চন্দ্রগ্রহণ অর্থ হয় না। তিনি কতকগুলি শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া ভিন্নার্থ প্রয়োগ করায় ঋকের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদের ঋক্ সমূহের অর্থ সাধন করিতে সেকালে ঋষিগণ হৃদয়ে যে সকল বিশ্বাস পোষণ করিতেন আমাদিগকে সে সকলের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা এই প্রবন্ধে ঋষিদিগের কতকগুলি বিশ্বাস পাঠকদিগের নিকট প্রকাশ করিব। পরে উপর্য্যুক্ত সূক্তের অন্তর্গত কতকগুলি শব্দের অর্থ কি হওয়া উচিত, তাহা প্রদর্শন করিয়া ঋকের অর্থ করিতে চেষ্টা করিব। পাঠকগণ যাহাতে তুলনায় সমালোচনা করিতে পারেন সেই জন্য সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যাও উদ্ধার করিয়া দিব।

ঋষিগণ মনে করিতেন, যেমন পৃথিবীতে সপ্তসিন্ধু আছে, সেইরূপ দেবলোকেও সপ্তসিন্ধু আছে। (১) আকাশের ছায়াপথই সেই সপ্তসিন্ধু। তাঁহারা ইহাও মনে করিতেন, এই সপ্তসিন্ধু যমলোকের অন্তর্গত। (২) ত্রিদিবস্থ প্রধান প্রধান দেবগণ ও উষা সকল এই সিন্ধু পার হইয়া আসিলে মনুষ্যের দৃষ্টি পথবর্ত্তী হন।

সেকালে ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন, যজ্ঞ পুরুষের মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছেন। (৩) সেইজন্য চন্দ্রের এক নাম নৃমনা। (৪) চন্দ্র শব্দের অর্থ আহ্লাদকর। চন্দ্রকে দেখিলে সকলের মনে আহ্লাদ হয়, সেইজন্য উহার ঐ নামকরণ হইয়াছে। ঋষিগণ ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে সৃষ্টির অগ্রে 'একং' এর মনে কামরসের উদ্রেক হয় (৩) এই রসই চন্দ্রে সোমরসরূপে বর্ত্তমান। এই রস হইতে দেবগণ উৎপন্ন ও ইহাই তাঁহাদিগকে বল প্রদান করে।(৪) সেইজন্য চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি ক্রমাগত চলিতেছে। কারণ জগতের সৃষ্টিমূলে যজ্ঞ-পুরুষের কামনা বর্ত্তমান। সেই কামনা ইহতে চন্দ্রের বৃদ্ধি ; এবং সেই রস দেবগণ ভোগ করেন বলিয়া চন্দ্রের ক্ষয়। সোমকে অনেকস্থলে দ্রপ্‌স সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে।(১) ইহা দ্বারা সোমবিন্দু বুঝাইত। দ্রপ্‌স শব্দের আর এক অর্থ 'দ্রুত গমনকারী' চন্দ্র নক্ষত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত গমন করে বলিয়া ইহাকে দ্রপ্‌স বলা যাইতে পারে। একটী ঋকে "চন্দ্র দিব্যলোকের জল সকলের মধ্যে ধাবিত হইতেছে" বর্ণিত হইয়াছে। (২) চন্দ্রই সোম এবং সোমরসবিন্দু অর্থে দ্রপ্‌স সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে আর্য্যগণ উজ্জ্বল পদার্থদিগকে দেব সংজ্ঞা প্রদান করিতেন। দাস ও দস্যুগণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া তাহারা "অদেবীবিশ" অর্থাৎ কৃষ্ণ জাতি নামে অবিহিত হইত। সেকালে আর্য্য ও কৃষ্ণবর্ণ দাস দস্যুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইত। আর্য্যগণ মনে করিতেন যেমন পৃথিবীতে তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ দাস দস্যুর সহিত যুদ্ধ করেন সেইরূপ দিব্যলোকে দেবগণ কৃষ্ণবর্ণ অদেবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সেইজন্য চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের কারণ তাঁহারা মনে করিতেন, অদেবগণ ইহাদিগকে দেবতাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুনরায় উহাদিগকে উদ্ধার করেন। আর্য্যগণ গ্রহণের এইরূপ

(১) ঋগ্বেদ ১।৭২।৮ ; ৩।১।৪ ; ৬।৭।৬।

(২) ৯।১১২।৮।

(৩) ঋগ্বেদ—১০।৯০।১৩।

(৪) ঋগ্বেদ—১০।৪৫।১।

(৩) ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৪।

(৪) ঋগ্বেদ—৯।৯৬।৫ ; ১০।৮৫।৫ ; ১।৯১।৪১

(১) দ্রপ্‌সান্। ঈরয়ন্। বিদথেষু। ইন্দুঃ। ৯।৯৭।৫৬ ইন্দু দ্রপ্‌সদিগকে (অর্থাৎ সোমরস বিন্দুদিগকে) যজ্ঞে প্রেরণ করিয়া। (২) চন্দ্রমা। অপ্‌সু। অন্তঃ। আ। সুপর্ণঃ। ধাবতে। দিবি। ১।১০৫।১ দিব্যলোকে জল সকলের মধ্যে সুন্দর পক্ষযুক্ত চন্দ্রমা ধাবিত হইতেছেন।

অর্থ করিতেন বলিয়া গ্রহণকালে তাঁহাদের মনে অত্যন্ত ভীতি ও ভাবনার উদ্রেক হইত। প্রথমতঃ সূর্য্য কৃষ্ণবর্ণদিগের অধীন হইলে বা তাহাদের উদরে প্রবেশ করিলে সূর্য্যোদয়ের অভাবে আর্য্যদিগের যজ্ঞের কে সাক্ষী হইবে? যজ্ঞের সংবাদ স্বর্গরাজ বরুণের নিকট না গেলে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব। অতএব মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে চিরকাল অন্ধকারের মধ্যে বাস করিতে হইবে। তাঁহারা আলোকের ভক্ত ছিলেন। অন্ধকারের ভয় তাঁহাদিগের অন্তরে কিরূপ ভীতির সঞ্চার করিত তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

চন্দ্রগ্রহণকালে তাঁহারা আরো অধিক ভীত হইয়া পড়িতেন। কারণ সূর্য্য না থাকিলেও, অগ্নি উৎপাদন করিয়া যজ্ঞ করা যাইতে পারে। কিন্তু চন্দ্রই অমৃত। সেই অমৃত যদ্যপি অদেবগণ লাভ করে তবে তাহারাই অমর হইবে। যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করতঃ অমৃত পান আর্য্যের সম্ভব হইবে না। সেইজন্য চন্দ্রগ্রহণের সময় ভক্ত আর্য্যগণ কাঁদিয়া ফেলিতেন ও দেহের অলঙ্কার মোচন করিয়া শোকচিহ্ন ধারণ করিতেন। আমরা এক্ষণে মূল ঋক্‌গুলির অর্থ করিয়া দেখাইব ঋষি ৮।৮৫ সূক্তে চন্দ্রগ্রহণ বর্ণনা করিয়াছেন; পৃথিবীর উপর কোন যুদ্ধের বর্ণনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

প্রথম ঋকের অর্থ:—এই ইন্দ্রের ভয়ে, সুন্দর বাক্যযুক্ত উষা সকল গমনশীলা রাত্রিকে নদীসকলের দ্বারা পার হন। ইঁহার (ভয়ে) সুখে পারকারিণী ৭টী জলমাতা —সিন্ধুগণ নেতাদিগের পারের জন্য আছেন। (১)

এই ঋকে, উষাগণ ইন্দ্রের ভয়ে দেবলোক হইতে সপ্তসিন্ধু পার হইয়া মনুষ্যদিগকে দেখা দেন, বুঝাইতেছে। এই ৭ সিন্ধু যে দিব্যলোকের তাহাতে সন্দেহ থাকে না। অপরাপর দেবগণও এই সকল নদী পার হইয়া আকাশে আবির্ভূত হন ইহাও বুঝাইতেছে। ২য় ঋক্ হইতে ৭ম ঋক্ পর্য্যন্ত ইন্দ্রের স্তব। (১) ৮ম ও ৯ম ঋকে মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে অদেব অসুরদিগকে চক্র দ্বারা বধ করিবার প্রার্থনা রহিয়াছে। (২) এই সকল ঋক হইতে বেশ বুঝা

(১) অস্মৈ। উষসঃ। আ। অতিরন্ত। যামম্
ইন্দ্রায়। নক্তং। ঊর্ম্যাঃ। সুবাচঃ।
অস্মৈ। আপঃ। মাতরাঃ। সপ্ত। তস্থুঃ
নৃভ্যঃ। তরায়। সিন্ধবঃ। সুপারাঃ॥ ৮।৮৫।১

(১) (তুমি) পর্ব্বতদিগের একত্র অবস্থিত ২১টী শিখরদেশ একাকী বজ্র দ্বারা পাচার করিয়াছ; (সোম পানে) বলযুক্ত বৃষভ (ইন্দ্র) যে সকল করিয়াছেন, তাহা দেব বা মর্ত্ত্য কেহই পারে না। ২

ইন্দ্রের বজ্র অয়সনির্ম্মিত (ও তাঁহার) হস্তে স্থিত, ইন্দ্রে বাহুর শক্তি অসীম। ইন্দ্রের মস্তকে কর্ম্ম সকল আছে; (তাঁহার) নিকটে উৎকর্ণ হইয়া সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক (অবস্থান করে)।৩

তোমাকে যজ্ঞীয় (দেবতা) দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞার্হ মনে করি; অচ্যুতদিগেরও ক্ষয়কারক বলিয়া তোমাকে মনে করি। হে ইন্দ্র! তোমাকে সত্বদিগের পতাকা ও চর্ষণীদিগের বৃষভ মনে করি। ৪

হে ইন্দ্র! অহি হনন জন্য মদচ্যুত বজ্রকে বাহুতে যখন ধারণ কর, (তখন) ইন্দ্রের অভিমুখে স্তুতি ও হবি দ্বারা পর্ব্বত সকল, গো সকল ও ব্রাহ্মণগণ প্রকৃষ্টরূপে শব্দ করেন। ৫

তোমাকেই (আমরা) স্তব করিব, যিনি এই সকল জন্মাইয়াছেন; ইঁহা হইতে পরবর্ত্তীকালে সকল ভূতজাত (উৎপন্ন)। ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা ধারণ করিব; বৃষভের নিকট গীত সকলের সহিত ও নমস্কার সকলের সহিত গমন করিব।৬

তোমার সমীভূত বিশ্বদেবগণ বৃত্রের শ্বাসে ভীত হইয়া পলায়ন করতঃ তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিল; হে ইন্দ্র! মরুৎদিগের সহিত তোমার সখ্য হউক; অনন্তর এই সকল শত্রু সেনা জয় কর।৭

(২) গোযূথের মত যজ্ঞার্হ ৬৩ জন মরুৎ তোমাকে বর্দ্ধিত করেন। (এরূপ) তোমার নিকট (আমরা) আসিয়াছি; আমাদিগকে ভজনীয় ধনভাগী কর। এই হবি দ্বারা তোমার বল বিধান করিতেছি।৮

হে ইন্দ্র! তোমার তীক্ষ্ণ আয়ুধ, মরুৎ সেনা ও বজ্রকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে? অদেব অসুরগণ আয়ুধ হীন; হে ঋজীষী! তাহাদিগকে চক্র দ্বারা কর্ত্তন কর।৯

যাইতেছে যে ইন্দ্র ও মরুৎগণের সাহায্য প্রার্থনা করিবার মত কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ৯ম ঋকে অদেব অসুরদিগের উল্লেখ প্রথম দেখিতেছি; পরে আরো ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাইব।

১০ম ঋক্ হইতে ১২শ ঋক্ পর্য্যন্ত যজ্ঞকারীকে ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্রের স্তব করিতে বলিতেছেন; (১) স্তবে তুষ্ট হইলে ইন্দ্র আগমন করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। "হে জরিত! রোদন করিও না; অলঙ্কারে ভূষিত হও"? ঋত্বিকগণ যজ্ঞকারীকে এরূপ বলিবার কারণ কি? (২) ইহার কারণ আমরা ১৩শ ঋক্ হইতে ১৫শ ঋকে প্রাপ্ত হই। (৩) এই কয়টী ঋকের অর্থে আমরা চন্দ্রগ্রহণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ১৩শ ঋকে দ্রপ্‌স শব্দ বর্ত্তমান। সায়ন ইহার অর্থ উদককণোভিধীয়তে সুতসোম বলিয়াও ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। দ্রুতগামী অর্থ করিয়া কৃষ্ণাসুরকে বুঝাইয়াছেন। এই অর্থ করিয়া তিনি নানা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথম—আবৎ শব্দের অর্থ রক্ষা

(১) মহৎ, উগ্র, বলবান্, শিবতম, পশু দাতাকে সুন্দর স্তোত্র প্রেরণ কর। স্তোত্র বাহিত ইন্দ্রে বহু গীতি ধারণ কর। ইন্দ্র তনু নিমিত্ত শীঘ্র বহু শক্তি প্রাপ্ত হোন্।১০

যেমন নদীদিগের পার নৌকা দ্বারা (প্রাপ্ত হয়), সেইরূপ স্তোত্র বাহন বিভুর নিমিত্ত (অর্থাৎ তাঁহাকে স্বর্গদী দিগকে পার করিবার নিমিত্ত) স্তোত্র প্রেরণ কর। শ্রুত ও প্রীতি পূর্ণ (ইন্দ্রের) তনুতে ধীদ্বারা গমন কর; (ইন্দ্র) শীঘ্র বহু (শক্তি) প্রাপ্ত হোন্।১১

(২) তোমার তাহা (যজ্ঞস্থলে) সজ্জিত কর, যাহা ইন্দ্র সেবা করেন (অর্থাৎ যাহা পাইবার জন্য তিনি ইচ্ছুক) সুন্দর স্তোত্র স্তব কর; নমস্কার দ্বারা (তাঁহার) পরিচর্য্যা কর। হে জরিত! অলঙ্কারে ভূষিত হও, ক্রন্দন করিও না; (ইন্দ্রকে) বাক্য শ্রবণ করাও (অর্থাৎ রক্ষার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান কর)। (ইন্দ্র) শীঘ্র বহু (শক্তি) প্রাপ্ত হোন।১২

(৩) অব। দ্রপ্‌সঃ। অংশুমতীম্। অতিষ্ঠৎ
ইয়ানঃ। কৃষ্ণঃ। দশভিঃ। সহস্রৈঃ।
আবৎ। তম্। ইন্দ্রঃ। শচ্যা। ধমন্তম্
অপ। স্নেহিতীঃ। নৃমনাঃ। অধত্ত।১৩

কৃষ্ণ দশসহস্র সহিত আসিলে, দ্রপ্‌স (অর্থাৎ দ্রুতগমনকারী সোম) অংশুমতী (নদীতে) অবস্থান করিতেছিলেন; ইন্দ্র ধুকুচে তাঁহাকে (অর্থাৎ দ্রপ্‌সকে) বলদ্বারা রক্ষা করিলেন; নৃমনা (অর্থৎ সোম) রশ্মি দিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

[ সায়ন সম্মত অর্থ:— দশ সহস্রের সহিত দ্রুতগামী কৃষ্ণ আগমন করিয়া অংশুমতী নদী তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন; ইন্দ্র ধুকুচে তাহাকে (অর্থাৎ কৃষ্ণাসুরকে) কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হইলেন। নৃমনা (ইন্দ্র) হিংসক সেনা দিগকে (হনন করিয়া অসুরকে) বধ করিলেন।

স্নেহিতীঃ শব্দের অর্থ সায়ন "বধকর্মসুপঠিতঃ সর্ব্বস্য হিংসিত্রী স্তস্য সেনাঃ" করিয়াছেন। কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমে দেখিতে পাই স্নিহ ধাতু হইতে স্নেহ, স্নেহিত, স্নেহ প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন। স্নেহ অর্থে প্রেম, তৈলাদি রসভেদ। স্নেহিত অর্থে বন্ধু ও স্নেহযুক্ত। স্নেহু অর্থে চন্দ্র। চন্দ্রে সোম রস বর্ত্তমান, ইহাই ঋষি দিগের বিশ্বাস। অতএব স্নেহিতীঃ অর্থে চন্দ্রের অন্তর্গত সোম রস বুঝাইতেছে। সেই রসের অভিব্যক্তি তাহার রশ্মি। ]

দ্রপ্‌সম্। অপশ্যং। বিষুণে। চরন্তম্
উপহ্বরে। নদ্যঃ। অংশুমত্যাঃ।
নভঃ। ন। কৃষ্ণম্। অবতস্থিবাংসম্
ইষ্যামি। বঃ। বৃষণঃ। যুধ্যত। আজৌ॥ ১৪

অংশুমতী নদীর নিকট বিস্তৃত দেশে দ্রপ্‌সকে বিচরণ করিতে ও আকাশের মত আবৃত করিয়া অবস্থিত কৃষ্ণকে দেখিয়াছি। হে বৃষগণ! তোমাদিগকে যুদ্ধে ইহার সহিত যুঝিতে (আমি) ইচ্ছা করি।

[ সায়ন সম্মত অর্থ:—অংশুমতী নদীর বিস্তৃত প্রদেশে (বা অদৃশ্য গুহায়) সূর্য্যের মত দীপ্যমান, উদকমধ্যে অবস্থিত কৃষ্ণাসুরকে দেখিয়াছি। হে বৃষগণ (অর্থাৎ মরুৎগণ)! তোমাদিগকে আমি যুদ্ধার্থ ইচ্ছা করি।

নভঃ ন কৃষ্ণম্ অর্থ সায়ণ এইরূপ করিয়াছেন:—নভো ন নভসি যথাদিত্যো দীপ্যতে তদ্বৎ তত্র দীপ্যমানং অবতস্থিবাংসং উকস্যান্তর বস্থিতং কৃষ্ণং এতন্নামকং অসুরং অপশ্যং।]

না করিয়া প্রাপ্তি করিয়াছেন। ২য় স্নেহিতীঃ শব্দের সর্ব্ববাদী সম্মত অর্থ না লইয়া এক উদ্ভট অর্থের অবতারণা করিয়াছেন। ৩য় নৃমনাঃ শব্দে ইন্দ্রকে বুঝাইয়াছেন; কিন্তু চন্দ্রেই যে নেতার মন আছে, ঋষিদিগের এই বিশ্বাসের বিপরীত অর্থ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এক্ষণে আমরা ইহার পরবর্ত্তী ঋকের অর্থে সায়নের দ্বারা যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। ১ম, কৃষ্ণাসুরকে সূর্য্যের মত দীপ্যমান অর্থ করিয়াছেন। অথচ যাহার নাম কৃষ্ণ সে কিরূপে সূর্য্যের মত হইবে? পূর্ব্বে কৃষ্ণকে অদেব অসুর বলা হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণের বর্ণ যে কাল তাহা বুঝায়। এক্ষণে ১৫শ ঋক উদ্ধার করা যাইতেছে। (১) যদিও কৃষ্ণবর্ণ জাতির নায়কের নাম কৃষ্ণ, তথাপি সে দীপ্যমান তনু ধারণ করিল। ইহার মত অসংলগ্ন অর্থ হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের অর্থ গ্রহণ করিলে সকল দিক বজায় থাকে। স্বর্গীয় অমৃত চন্দ্রকে গ্রাস করিতে অদেবগণ কৃষ্ণাসুরের নেতৃত্বে আসিয়াছে। তখন চন্দ্র ছায়াপথের সমীপে অবস্থিত। চন্দ্রের অন্তর্গত সোমরস বা স্নেহসকল নষ্ট হইয়া গেল। সোমভক্ত আর্য্য ইহা দেখিয়া দেহের অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছেন ও উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঋত্বিকগণ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন যে এই বিপদকালে ইন্দ্রও মরুৎগণকে আহ্বান কর, ইন্দ্রের মত বীর দেব বা মর্ত্ত্য-দিগের মধ্যে কেহ নাই। তিনি আসিলে সোমকে উদ্ধার করিবেন। তাঁহাকে উচ্চৈস্বরে স্তব দ্বারা আহ্বান কর; কারণ স্তবই তাঁহার বাহন। স্তবই নৌকার মত তাঁহাকে স্বর্গীয়া নদী পার করিয়া আনয়ন করিবে। এই বলিতে বলিতে যখন চন্দ্রের মুক্তি আরম্ভ হইল, অমনি ঋত্বিকগণ বলিলেন আর ক্রন্দন করিও না; অলঙ্কার পরিধান কর; অগ্নিতে সোম আহুতি দান কর। তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ বল লাভ করিয়া অসুরদিগকে সংহার করিতে সক্ষম হইবেন। দেখিতে দেখিতে চন্দ্র যখন দীপ্যমান তনু ধারণ করিলেন, তখন ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তাঁহাদের মরুৎ ও অঙ্গিরা সেনাদিগের সাহায্যে অদেবী সেনা দিগকে ও কৃষ্ণকে সংহার করিতে যে সক্ষম হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। ইহাই ১৫শ ঋকে ব্যক্ত হইয়াছে।

চন্দ্রের মুক্তির পর ইন্দ্রের প্রশংসা সূচক স্তব হইতে লাগিল। ১৬শ হইতে ২১শ ঋক দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। ইহাদের মধ্যে একটী ঋক নিম্নে দেওয়া গেল।

> ত্বং। হ। ত্যৎ। সপ্তভ্যঃ। জায়মানঃ
> অশত্রুভ্যঃ। অভবঃ। শত্রুঃ। ইন্দ্র।
> গূঢ়ে। দ্যাবা পৃথিবী। অনু। অবিন্দঃ
> বিভুমৎভ্যঃ। ভুবনেভ্যঃ। রণং। ধাঃ॥ ১৬

হে ইন্দ্র! তুমিই শত্রুহীন সপ্তর্ষিদিগের হইতে উৎপন্ন হইয়া (কৃষ্ণবর্ণদিগের) শত্রু হইয়াছ। অন্ধকারে অবস্থিত দ্যাবা পৃথিবীকে লাভ করিয়াছ। মহত্ব যুক্ত ভুবন সকল হইতে (অর্থাৎ দিব্য লোক হইতে) রমণীয় (সোমকে) ধারণ করিয়াছ।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

---

[১] অধ। দ্রপ্সঃ। অংশুমত্যাঃ। উপস্থে
আধারয়ৎ। তন্বম্। তিত্বিষাণঃ।
বিশঃ। অদেবীঃ। অভি। আচরন্তীঃ
বৃহস্পতিনা। যুজা। ইন্দ্রঃ। সসহে॥ ১৫

অনন্তর অংশুমতির ক্রোড়ে দ্রপ্স [সোম] দীপ্যমান তনু ধারণ করিলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া বিচরণশীল অদেবী বিশকে (অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ জাতিকে সংহার করিলেন।

(সায়ন সম্মত অর্থ :— দ্রুতগামী (কৃষ্ণ) অংশুমতীর নিকট দীপ্যমান হইয়া তনু ধারণ করিলেন। তখন ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত কৃষ্ণবর্ণ অসুর সেনা বধ করিলেন।

অধ অথ দ্রপ্সো দ্রুতগামী কৃষ্ণঃ অংশুমত্যা নদ্যাঃ উপস্থে সমীপে তিত্বিষাণো দীপ্যমানঃ সন্ তন্বং আত্মীয়ং শরীরং অধারয়ৎ। অদেবীঃ অদ্যোতমানাঃ কৃষ্ণরূপা ইত্যর্থঃ আচরন্তী আগচ্ছন্তীর্বিশঃ অসুরসেনাঃ অভিসসহে জঘান। ]

# সংবাদপত্রে দৌত্য।

১৯০২ খৃঃ অব্দের এক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন প্রভাতে লণ্ডনের ফ্লীট ষ্ট্রীটের কোন সংবাদ পত্র আফিসে সম্পাদক কপোলে কর ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলে কতগুলি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি একে একে সেগুলি দেখিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার চিন্তাপূর্ণ বদনমণ্ডলে উৎসাহের সুস্পষ্ট রেখা প্রতিফলিত হইল। তিনি অবিচলিতকণ্ঠে ডাকিলেন "জো"।

অনুমান বিংশতিবর্ষীয় এক যুবক সসম্মানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিল।

সম্পাদক উৎসাহের সহিত বলিলেন, "দেখ জো, আমি তোমাকে ভাল ছেলে বলিয়া জানি। আজ তোমাকে একটা দুরূহ কার্য্যের ভার লইতে হইবে। প্রসিদ্ধ বুয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিলারে, বোথা এবং ডি-ওয়েট লণ্ডনে আগমন করিয়াছেন। সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের অনেকেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লণ্ডন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিমত অবগত হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। স্বেচ্ছায় বলিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সমগ্র লণ্ডনের লোক সাগ্রহে তাঁহাদিগের অভিমত প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আমরা যদি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের অভিমত সংগ্রহ করিতে ও প্রকাশ করিতে পারি, তবে আমাদিগের যে খুব অধিক পরিমাণে লাভের আশা আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

দেখ, এইমাত্র জানিলাম, সৈন্যাধ্যক্ষ ডি-ওয়েট আজ বৈকালে * * দোকানে তাঁহার পোষাকের জন্য অর্ডার দিতে গমন করিবেন। তুমি অবিলম্বে এই দর্জ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কার্য্যোদ্ধারের উপায় কর; স্থূলকথা এই যে, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে ডি-ওয়েটের নিজমুখ হইতে লণ্ডনের সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আনিয়া দিতে হইবে।"

জো গম্ভীরভাবে ধীর পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল যুবক অবিলম্বে দর্জ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। অল্পকাল মধ্যেই উভয়ের পরিচয় হইয়া গেল। জো দর্জ্জীর কাণে কাণে অনেক কথা বলিল, দর্জ্জী ব্যতীত আর কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

যুবক তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দরজীর কার্য্য আরম্ভ করিল। সে এখন সেই দর্জ্জীর দোকানে শিক্ষানবিশ।

দর্জ্জী সগর্ব্বে বলিলেন, "কেমন যুবক, পারিবেত? দরজীর কাজ বড় সহজ নয়। বিশেষতঃ আজকাল রাজা রাজড়া লইয়া ব্যবসায় করিতে হয়, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনের উপর আমাদিগের ব্যবসায় নির্ভর করে।" দোকানের সকলেই জানিল—আজ দরজী একজন নূতন শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিলেন।

অপরাহ্ণ চারিটায় একখানি বিরাটাকার জুড়ী দরজীর দোকানের সম্মুখভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজী বুয়ার সেনাধ্যক্ষের আগমনকাল জানিতেন, সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ডি-ওয়েট দোকানে পৌছিতেই দরজী তাঁহার নূতন সহযোগীকে লইয়া সেনাপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

পোষাকের মাপ লইবার সময় উপস্থিত হইলে দরজী বলিলেন, "জো, চল দেখি জেনারেল মহোদয়ের মাপটা লওয়া যাক। দেখ, আমি মাপ লইতেছি, তুমি লিখিয়া যাও। দেখি তোমার নোটবহি কোথায়?" যুবক সসম্ভ্রমে তাহার নোটবহি প্রদর্শন করিল।

দরজী বলিলেন, "ভাল, দেখ সাবধান, যেন কোনরূপ ভুলভ্রান্তি না হয়। তোমাকে ভাল ছেলে জেনে সঙ্গে রেখেছি। আমার নিজের ও দোকানের সুনাম যেন রক্ষা হয়।"

যুবক বিনীতভাবে মস্তক অবনত করিয়া রহিল, কোন প্রকার উত্তর করিল না।

দরজী ডি-ওয়েটের পদপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক আজানু মাপ লইলেন, তারপর যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লিখিয়া যাও, জানু ২৫"।

যুবক তাহার নোটবুকে অঙ্কপাত করিল। দরজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং বলিলেন "দেখ জো, কোন ভুল কর নাইত? দেখি তোমার নোটবুকখানা!"

যুবক যথাযোগ্য শিষ্টাচারের সহিত তাহার নোটবুক প্রদর্শন করিল। দর্জ্জী দেখিলেন, উল্লিখিত "২১" এর নিম্নে লিখিত আছে। "Ask him what he thinks of Mr. Chamberlain" অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বার্লেনের সম্বন্ধে সেনাপতি কিরূপ অভিমত পোষণ করেন, তাহাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুণ।

দর্জ্জী পুনরায় মাপ লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এবার আর সাদাসিদা দর্জ্জীর কাজের সহিত তাহাদিগের কথাবার্ত্তা নিবদ্ধ রহিল না। নানারূপ কথাবার্ত্তার ফলে উভয়ের মধ্যে সরলতা ও সৌহার্দ্দ্যের ভাব ক্রমেই সুস্পষ্ট হইতেছিল। প্রথমতঃ উঠিল, আবহাওয়ার কথা। "হা জেনারেল, আবহাওয়াটা বড় খারাপ দাঁড়াইয়াছে; কেমন নয় কি? বটে, বটে সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম, আপনি খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের আমল দেন নাই। বেশ করিয়াছেন। দেখুন,কাগজওয়ালারা বড় নচ্ছার; সহজেই হৈ, চৈ করিয়া উঠায়, এই চেম্বারলেনকে লইয়া কি আকাশ জোড়া আন্দোলনই-না চলিতেছে। আচ্ছা, চেম্বারলেন সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?"

জেনারেল অকপটে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিলেন। দর্জ্জী এই সময়ে কটিদিশের মাপ লইতেছিলেন, তিনি যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লিখিয়া যাও '৪০'।" নবীন সহযোগী দর্জ্জীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল। "৪০"।

"আচ্ছা, দেখি কি লিখিলে"? দর্জ্জী আগ্রহে নোটবুকেরদিকে লক্ষ্য করিলেন।

"জো" সৈন্যাধ্যক্ষের পশ্চাতে দর্জ্জীর সম্মুখে নোটবুকখানি ধরিল। তাহাতে "৪০" এর নিম্নে এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল, "Ask him what he thinks of London" "জেনারেল মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি এই লণ্ডন সহরটাকে কিরূপ মনে করেন।

তখন লণ্ডনের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। নবীন সহযোগী জেনারেলের অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক উভয়ের কথাবার্ত্তা সাঙ্কেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন।

দর্জ্জী পুনরায় হাঁকিলেন, "লিখিয়া যাও, আস্তিন ২৫"; 'ঠাঁ ঠাঁ ঠিক লিখিয়াছ ত, দেখি তোমার নোটবুকখানা?"

নোটবুকের নিম্নে লিখিত ছিল, "Ask him how it was—our soldiers could not catch him" "জিজ্ঞাসা করুন, আমাদিগের সৈন্যগণ কেন তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই।" জেনারেল আকুণ্ঠিত চিত্তে এই প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন। তখন প্রশ্নের উপর প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। দর্জ্জীর শিষ্টাচারপূর্ণ বিনীত ব্যবহারে জেনারেলের হৃদয় খুলিয়া গিয়াছিল; তিনি বোয়ার যুদ্ধের নানা কথা, ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনাপূর্ব্বক সন্ধ্যার অন্ধকারে জুড়ীতে আরোহণ করিলেন।

পর দিবস প্রভাতে এই একমাত্র সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে বুয়ার সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

লণ্ডনের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র যাহা পারে নাই, ফ্লীটষ্ট্রীটের এই সংবাদপত্র খানি তাহা সাধন করিয়া প্রভূত অর্থ ও সুনাম অর্জ্জন করিল।

সংবাদপত্রের জন্য সংবাদ সংগ্রহের সময় কিরূপ কৌশল ও তৎপরতা অবলম্বন করিতে হয়, উপরে তাহা একটীমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম। ইহা অনেক সময়ে বিপজ্জনকও বটে। যুদ্ধক্ষেত্রের অনলবর্ষী কামানরাজীর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সংবাদ সংগ্রহ যে সে কথা নহে। নিম্নে সংবাদ সংগ্রহ বিষয়ে আর একটী কৌতূহলপূর্ণ সংবাদ প্রদত্ত হইল।

আমেরিকার মণ্টপেলী নামক আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের কথা অনেকেই অবগত নহেন। এই অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ কাহিনী শ্রবণ করিলে হৃদয় আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেণ্টপিয়ার নামক একটী প্রসিদ্ধ জনপদের চল্লিশ সহস্র অধিবাসী উল্লিখিত অগ্নি উৎপাতের ফলে বিনষ্ট ও সমগ্র সহরটী ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। কিঞ্চিন্ন্যূন উনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে ইটালীর বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গমের ফলে বিসুবিয়সের পাদদেশে অবস্থিত হার্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নামক দুইটী সুদৃশ্য নগর সম্পূর্ণভাবে

ভস্মাচ্ছাদিত ও তরল ধাতু প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া যায়। অধুনা গবর্ণমেণ্টের সাধু প্রচেষ্টার ফলে এই দুইটী সহরের ভস্মরাশি অপসারিত হইতেছে। ফলে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সমগ্র জগতের অধিশ্বরী রোম নগরীর অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ও প্রাচীন রোমক সভ্যতার অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রাগুক্ত ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সেণ্টপিয়ার নগরের ধ্বংসবার্ত্তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে নিউইয়র্কের অধিবাসী মাত্রেই এই হৃদয় বিদারক কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। রোয়েমা নামক দ্রুতগামী একখানি জাহাজ এই সময়ে সেণ্টপিয়ারের অদূরবর্ত্তী বন্দর হইতে নিউইয়র্ক অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। "রোয়েমার আরোহিগণের চক্ষের সম্মুখে সেণ্টপিয়ার ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধ্বংশপ্রাপ্ত জনপদের হতাবশিষ্ট চারিজন অধিবাসী আহত অবস্থায় "রোয়েমায়" আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাদিগের মুখ হইতে অগ্নি উৎপাতের প্রকৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে—এই ভরসায় "রোয়েমা" নিউইয়র্ক বন্দরে পৌছিবার বহু পূর্ব্ব হইতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ জেঠিতে সমবেত হইয়াছিলেন।

রাত্রি সমাগত হইল, কিন্তু জাহাজ জেঠিতে আসিয়া পৌছিতে পারিল না। বন্দরে সমাগত প্রতিনিধিগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, এই সময়ে জাহাজ পৌছিতে না পারিলে প্রাতঃকালের "দৈনিকপত্র" সমূহে এই অগ্ন্যুৎপাতের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করা সম্ভবপর হইবে না। তখন সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের জন্য ছয়খানি কোষ নৌকা সজ্জিত হইল। বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিহিত সংবাদপত্রের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, স্ক্যাচ্ম্যান প্রভৃতিতে নৌকা কয়েকখানি পূর্ণ হইয়া গেল। সাগর তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে নৌকা কয়েকখানি জাহাজের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিদেশগত আরোহিগণের কোনওপ্রকার সংক্রামক, ব্যাধির প্রভাব যাহাতে বন্দরে পরিব্যাপ্ত হইতে না পারে, তজ্জন্য বন্দর মাত্রেরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। বন্দরের ডাক্তার তাঁহার নির্দ্দিষ্ট লঞ্চে আরোহণপূর্ব্বক জাহাজের আরোহিগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ করিবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তিরের নৌকাকে জাহাজের সমীপবর্ত্তী হইতে দেওয়া হয় না; এখানেও তাহাই হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত হইল, সরকারী ষ্টীম লঞ্চ "করোণা" প্রেসের প্রতিনিধিবর্গ ও বন্দরের বাবুকে লইয়া জাহাজে পৌছিবে, আর অন্যান্য নৌকাগুলি উহার অনুগমন করিবে।

কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হওয়ায় পর দিবস দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কেহই "করোণায়" সাহায্যে জাহাজে পৌছিতে পারিল না। তখন সংবাদপত্র সম্পাদকগণ সান্ধ্য সংস্করণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন, সকলেই আহত আরোহিগণের সাক্ষাৎকার লাভে যত্নপর হইয়াছেন। জাহাজের অধ্যক্ষের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারই অদূরে আহত আরোহী চতুষ্টয় দণ্ডায়মান ছিলেন।

তখন কথা উঠিল, কি করিয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ অল্প সময়ে তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবগত হইতে পারিবেন। "কুরিয়ার" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জনৈক উৎসাহ সম্পন্ন যুবক সেইস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন; তিনি বলিলেন, "আপনারা আমার কথা শুনুন; সন্ধ্যার বিলম্ব নাই; এসময়ে অনর্থক সময় নষ্ট করিলে, সন্ধ্যাকালীন সংবাদ পত্র সমূহে আমাদিগের বিবরণ প্রকাশিত হইতে পারিবেনা। রাত্রে জাহাজ তীরে ভিড়িলে অনেকেই এই লোমহর্ষক ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ পূর্ব্বাহ্নে অবগত হইতে পারিবেন। সুতরাং প্রাতঃকালীন সংস্করণে এই সংবাদ প্রকাশিত করা সম্পূর্ণ নিস্ফল হইবে। আপনারা আহত ব্যক্তি চতুষ্টয়কে সর্ব্বপ্রথমে "কুরিয়ারের" নৌকায় নামাইয়া দিউন, তারপর আমরা সকলে অনুগমন করি। সহরে পৌছিলে আহতদিগকে একস্থানে লইয়া গিয়া আমরা আমাদিগের প্রয়োজনীয় সংবাদ অবগত হইতে পারিব, এদিকে সংবাদ পত্রের "কম্পোজিটারগণ"ও সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া যাইতে পারিবে।

সকলেই বলিলেন, "বেশ কথা। উহাতে আমাদের অনেকটা সময় বাঁচিয়া যাইবে। তীরে পৌছিবার পূর্ব্বে আমরা, আমাদিগের প্রশ্ন গুলি ঠিক করিয়া লইতে পারিব"

দেখিতে দেখিতে "কুরিয়ারের নৌকার উপর জাহাজ হইতে সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল। আহত আরোহী চতুষ্টয় নৌকায় অবতরণ করিলেন। সংবাদ পত্র প্রতিনিধিগণের সকলেই তখন যুগপৎ নৌকায় অবতরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

সহসা "কুরিয়ারের" প্রতিনিধি অন্যান্য সকলের অগ্রগমণে বাধা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "আপনারা আর একটু বিলম্ব করুণ"। "কেন" সমবেত প্রতিনিধিগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বিলম্বের কোন হেতু হইয়াছে কি?" তখন যুবক স্বীয় অঙ্গাবরণ মুক্ত করিলেন। মুক্ত হইলে, যুক্তরাজ্যের রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীর নিদর্শন সূচক চিহ্ন সকলেরই নয়নগোচর হইল। যুবক সকলকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই নৌকাখানি গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব। এখানে আর কাহারও অবতরণের আদেশ নাই। এই দেখুন সরকারী আদেশ পত্র।"

যুবক লম্ফ প্রদানে নৌকায় অবতরণ করিলেন এবং সবেগে তীরের অভিমুখে নৌ সঞ্চালন করিতে বলিলেন। সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়! ইত্যবসরে নৌকাখানি আরোহী কয়জনকে লইয়া দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া গেল।

বিজয়দৃপ্ত "কুরিয়ার" পত্রের পক্ষ হইতে আহত ব্যক্তি চতুষ্টয়ের প্রত্যেককে তিনসহস্র টাকা প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করা হইল। পর দিবস একমাত্র কুরিয়ার সংবাদ পত্রে এই লোমহর্ষক ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল। সেদিন "কুরিয়ারের" যেরূপ কাটতি হইয়াছিল, তাহা অনেক দিন লোকের স্মৃতি পথে বিদ্যমান ছিল।

শ্রীকেশবলাল বসু।

---

# কবিকঙ্কের হেঁয়ালী।

"সৌরভে"র সুযোগ্য লেখক—সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দে মহাশয়; ক্রমশঃ কঙ্কেরজীবনী ও তৎকৃত 'লীলার বারমাসী' বিদ্যাসুন্দর, প্রভৃতি লিখিয়া "সৌরভে"র সৌন্দর্য্য সাধন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করিতেছেন, ইহা অতি আনন্দের কথা।

এতদঞ্চলে কঙ্কের রচিত কতকগুলি হেঁয়ালী শুনিতে পাওয়া যায়। বোধহয় চন্দ্র বাবুও তাহা অবগত আছেন। এই হেঁয়ালিগুলি সংগ্রহ করিয়া লিখিলে বন্দ্যোপাধ্যান আর অঙ্গহীন থাকে না।

সম্ভবতঃ বিদ্যাসুন্দর লেখা শেষ হইলে, সেগুলি চন্দ্র বাবুই লিখিবেন। তবে সম্প্রতি আমি তাঁহার ভাবী কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া দিলাম মাত্র।

হেঁয়ালিগুলি, রচনা পারিপাট্য বা তাৎপর্য্যে বিশেষ সুন্দর না হইলেও বালক কঙ্কের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

কঙ্ক, গোচারণ কালে রাজী নদী-তীরে বৃক্ষতলে বসিয়া বয়স্যদিগের সঙ্গে যে সকল স্ব রচিত হেঁয়ালি বলিয়া আমোদানন্দ উপভোগ করিতেন, নিম্নে তাহারই কয়েকটি লিখিত হইল।

১। তিন কোণা শরীর তার, সর্ব্ব অঙ্গে ছিদ্র।<br>
কান্ধে করে নিতে হয় এমনি সে ভদ্র॥<br>
পরের জন্যে মাছ ধরে খালে বিলে গিয়া।<br>
নিজের দেহ রক্ষা করে গাবের রস খাইয়া॥<br>
কয় কবি কঙ্ক, হিয়ালীর নাটি।<br>
এক ঠেঙ্ লাম্বা তার, এক ঠেঙ্ খাটি॥<br>
(উঃ—, মাছ ধরিবার জালী।)

২। বুকে খায়, পিঠে লেদায় (বাহ্যে করে)।<br>
তারে কোন জীব বলা যায়?<br>
কয় কবি কঙ্ক হিয়ালীর ছন্দ।<br>
মূর্খে ভাঙ্গাইব থাউক, পণ্ডিতের লাগে ধন্দ॥<br>
(উঃ—, ছুতারের রান্দা।)

৪। আইলাম কাজে, চাইনা লাজে,
বস্ত জন্মে পশুর মাঝে।
বামুন ভদ্র, বিধবায় খায়।
পুলা পুড়ীয়ে বেশী চায়।
কঙ্ক বলে সকাল কও।
ঠারে ঠোরে বুঝে লও॥ ( উঃ—দুগ্ধ )

৫। কৃষ্ণ বরণ, ছয় চরণ,।
পেট কাটিলে নাই মরণ॥
কঙ্ক কহে কহ ভাই।
জীবন্তটা কি শুনতে চাই॥
( উঃ—কালো রঙের বড় পীপড়া। )

৬। পিঠের দিকে অন্ধকার চকমকিয়া বুক।
বুকের মধ্যে আঁকা যত সংসারের মুখ॥
কঙ্ক বলে সত্য বল, সকাল শুন্তে চাই।
মিথ্যা যদি কহ তবে, ধর্ম্মের দোহাই॥
( উঃ—আয়না। )

৭। একত্র বসতি করে, ভগ্নী এক যোড়া।
জন্ম হইতে দুইও জনের, মুখ দুই খান পোড়া॥
দিবা নিশি ঢাকা থাকে, কাপড়ের তলে।
কে বলিবে পোড়া মুখে, কত মধুগলে॥
কয় কবি কঙ্ক, হিয়ালীর সার।
এমন অপূর্ব্ব বস্তু ভবে নাই আর।)
( উঃ—স্তন। )

৮। হস্ত নাই, পদ নাই, পেট ভরিয়া খায়।
চোক নাই, মুখ নাই, মড়ার সঙ্গেও যায়॥
কঙ্ক বলে সকাল বল, বস্তুটা কি ভাই।
পরের মুণ্ড লয়ে থাকে, নিজের মুণ্ড নাই॥
( উঃ—বালিশ। )

৯। কখন বাঁচে, কখন মরে, সর্ব্ব অঙ্গ গোল।
বুকের ভিতর বুড়ীর বাস, রূপেতে অতুল॥
কয় কবি কঙ্ক, হিয়ালীর লেখা।
দিনে থাকে লুকাইয়া, রাত্রিতে দেয় দেখা॥
( উঃ—চন্দ্র। )

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

---

# প্রাচীন মিশরে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান।

ইজিপ্টসিয়ান বা মিশরবাসিগণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে প্রাচীন কেলডিয়ানগণের প্রতিযোগী ছিলেন। কিন্তু তাহাদের কাগজ পত্রাদির বিশেষ কোন নিদর্শন নাই। তথাপি গ্রীকদিগের অতিরঞ্জিত ভাষায় তাহাদের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ও সভ্যতার জন্য ইহারা ইজিপ্টসিয়ানগণের নিকট ঋণী। গ্রীকেরা ইজিপ্টবাসিগণের বংশধর বলিয়াও আপনাদিগকে প্রচার করেন। সুতরাং অতিরঞ্জিত ভাষায় ইহারা নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ কীর্ত্তন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তবে ইউরোপবাসিগণ একথা স্বীকার করেন যে প্রাথমিক বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতা নীলনদের তীরবর্ত্তী কোন একটী জাতি কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে নীত হয়। আর প্রাচীনকালে গ্রীকগণ জ্যোতিষ শিক্ষা করিবার জন্য প্রায়ই মিশরদেশে গমন করিতেন। কিন্তু তাহাদের কি পরিমাণ জ্ঞান ছিল এবং তাহা হইতে কি পরিমাণ গ্রীকগণকে বিলাইবার শক্তি ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ডায়োজিনিস্ লেয়ার্টিসের মতে (Diogenes Laertius) ভালকান (Vulcan) হইতে আলেকজেণ্ডারের রাজত্বকাল ৪৮৮৫৩ বৎসরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সময় মধ্যে মিশরবাসী জ্যোতির্ব্বিদগণ ৩৭৩টী সূর্য্যগ্রহণ ও ৮৩২টী চন্দ্রগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত দীর্ঘকালে এত অল্প সংখ্যক গ্রহণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। বার তের শত বৎসরেই এই সংখ্যক গ্রহণ হইতে পারে তবে ডায়োজিনিসের উক্তির সমর্থন পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে মিশর দেশ হইতে যে যে গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহারই কথা হইতেছে। আর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আকাশ পরিষ্কার না থাকিলে, রাত্রিশেষে গ্রহণ হইলে, অথবা গ্রহণ অতি ছোট আকারে দেখা দিলে, কিম্বা বিরল-চ্ছায়া গ্রহণ হইলে অনেক সময় গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সংখ্যাটী যথা যথ রূপে লিখিত হইয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে যে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ১৭০০ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মিশরদেশে গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল। কেন না মহাবীর আলেক্জেণ্ডারের দিগ্বিজয় কাল পর্য্যন্ত ৪৮৮৫৩ বৎসর গণিত হইয়াছিল। সিরিয়াস নামক অতি উজ্জল নক্ষত্রকে মিশরবাসিগণ থেট্ (thaat) অর্থাৎ পাহারাদার (watchdog)

বলিতেন। কেন না প্রতি বৎসর বন্যার-জলে নীলনদের তীর প্লাবিত হওয়ার পূর্ব্বেই এই নক্ষত্রের উদয় হইত। অতি সাবধানতার সহিত এই নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মিশরবাসিগণ জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাহাদের বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫¼ দিন। ধর্ম্ম কার্য্যাদিতেই এই বৎসর ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাহাদের সাধারণ বৎসর ৩৬৫ দিনেই গণিত হইত। সৌর ও সাধারণ বৎসরের দৈর্ঘ্যের সামঞ্জস্য রাখিয়া মিশরবাসিগণ উভয় বৎসরের মিল করিতে প্রয়াস পান নাই। তাহাদের সংস্কার ছিল যে সকল ঋতুতেই আইসিস্ (Isis) দেবতার ভোজ ও উৎসব সম্পন্ন হইলে সকল ঋতুই সমান ভাবে সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। এই জন্যই মুসলমানগণের মহরমের ন্যায় আইসিস্ উৎসব মিশর দেশে সকল ঋতুতেই সম্পন্ন হইতে পারে। মিশর দেশের ১৪৬০ সৌর বৎসর ১৪৬১ সাধারণ বৎসরের সমান।

ডাইয়ন কেসিয়াস্ (Dion Cassius) বলিয়াছেন যে মিশর দেশেই গ্রহগণের নামানুসারে সপ্তাহের দিনগুলির নামাকরণ হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে অতি প্রাচীনকালেই এই নামাকরণের রীতি ভারতবর্ষে ও মিশর দেশে প্রচলিত ছিল এবং ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের ড্রুইডগণের ও ইহা জানা ছিল। ডায়ডোরাস্ সিকিউলাস্ (Diadorus Siculus) বলিয়াছেন যে প্রাচীন মিশরীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রহগণের নিশ্চলতা, শীঘ্রগতি ও বক্রগতির কারণ জানিতেন। অনেকে অনুমান করেন যে মিশরের চতুষ্কোণ পিরামিডসমূহ সম্ভুর কার্য্যের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর এগুলি এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে প্রধান প্রধান দিক সমূহের সঙ্গে ইহাদিগের দিক্ সমূহের সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে অন্ততঃ উত্তর দক্ষিণ রেখা পাত করিবার রীতি ইহাদের জানা ছিল। যাহা হউক ইহাদের পিরামিড সমূহের একটী দোষ ছিল। এগুলি এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে ইহাদের অগ্রভাগের ছায়া সুস্পষ্ট করিবার জন্য রোমানগণ ইহাদের শীর্ষদেশে এক একটী গোলক (Ball) স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে নলন্দা ও পঞ্জাবে যেমন দুইটী সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, নীলনদের তীরবর্ত্তী আলেকজেণ্ড্রিয়াতেও তেমন আর একটী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকও বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিত। এই বিদ্যালয়ে দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রাথমিক অবস্থায় যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইত। এই স্থানেই সর্ব্ব প্রথম সুশৃঙ্খলার সহিত গ্রহ নক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য আরম্ভ হয়।

মহাবীর আলেকজেণ্ডারের অকাল মৃত্যুর পরে তাহার সেনাপতিগণ তদীয় সুবিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লন। টলেমী সোটার (Ptolemy Soter) মিশর দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞান-প্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি গ্রীস দেশীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণকে স্বীয় রাজধানী আলেকজেণ্ড্রিয়াতে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে তথায় আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র টলেমী ফিলাডেলফাস্ ও (Ptolemy Philadelphus) পিতৃগুণে বিভূষিত—বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিদ্বজ্জনগণের ব্যবহার জন্য তিনি একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই অট্টালিকার নাম দিয়াছিলেন মিউজিয়াম (Museum)। এই অট্টালিকার সংলগ্ন একটী মান-মন্দিরও তাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর ডিমেট্রিয়াস্ ফেলারিয়াস্ (Demetrius Phalarius) বহু অর্থব্যয়ে, যত্নে ও পরিশ্রমে যে পুস্তকালয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ নরপতি উক্ত বিদ্বজ্জনগণের ব্যবহারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অহরহ পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকায় গমনাগমন করিতেন, তত্রস্থ পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ করিতেন এবং নানা উপায়ে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৯০০ বৎসর বর্ত্তমান ছিল। ইহা মানবজাতির যে কত কল্যাণসাধন করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। যতদিন পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সম্রাটের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

এরিষ্টিলাস্ ও টাইমোচেরিস্—(Aristillus and Timocharis) নামক দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ্ খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রথম টলেমির সময় জীবিত ছিলেন। ইঁহারাই আলেকজেণ্ড্রিয়ার সর্ব্বপ্রথম জ্যোতির্ব্বিদ্। প্রধান প্রধান নক্ষত্রসমূহের একটী মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং প্রাচীন গ্রীক ও পূর্ব্বদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণের ন্যায় নক্ষত্রগণের উদয়াস্ত নির্ণয় করাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে হিপারকাস্ অয়ন-চলন আবিষ্কার করেন। ইহাই পরে টলেমী সপ্রমাণ করেন।

আরিষ্টার্কাস্ (Aristarchus of Samos)—ইনি একজন যবন বা গ্রীক জ্যোতিষী ছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৮০ হইতে খৃঃ পূঃ ২৬৪ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। কপারনিকাসের পূর্ব্বে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সৌরকেন্দ্রিক মতের

সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইনি সেমোস্ নামক স্থানে বাস করিতেন। আরিষ্টার্কাস্ সূর্য্য ও চন্দ্রের দূরত্ব সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এবং ঐ দূরত্ব পরিমাপ করিবার সুন্দর একটী উপায়ও উদ্ভাবন করেন। যখন চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ মাত্র আলোকিত হয় (শুক্লা ও কৃষ্ণা অষ্টমীতে) তখন চন্দ্র হইতে যে আলোকরেখা মানুষের চক্ষুতে প্রবেশ করে, তাহা সূর্য্য ও চন্দ্রের সংযোজনী রেখার উপর লম্বভাবে পতিত হয়। এই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের কৌণিক দূরত্ব ৮৭ ডিগ্রী বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করেন। এই সমকোণী ত্রিভুজের সমাধান করিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্র যতদূরে অবস্থিত, সূর্য্য তাহা অপেক্ষায় (পৃথিবী হইতে) প্রায় ১৮½ গুণ দূরে অবস্থিত। এই প্রণালীতে কোন দোষ নাই। কিন্তু কখন চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই সম্বন্ধে এরিষ্টার্কাসের ভুল খুব বেশী দেখা যায়। তাহার অঙ্কের ফল ভুল হইলেও সৌরজগতের বিস্তৃতি ও সীমা সম্বন্ধে এই ফলে অনেকটা আভাস ছিল। সূর্য্যের ব্যাস নির্ণয় করিবার জন্যও তিনি অন্য একটী কঠিনতর উপায় উদ্ভাবন করেন। পাইথাগোরাসের মতই তিনি অনুসরণ করিতেন। সৌরজগতের বিস্তৃতি সম্বন্ধে অন্য কেহ তেমন ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই।

ইরেটোস্থেনিস্ (Eratosthenes)—খৃষ্টের জন্মের ২৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সায়রেণ (Cyrene) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। টলেমী এভারগেটস্ (Ptolemy Evergetes) কর্ত্তৃক তিনি আলেকজেন্দ্রিয়াতে আহূত হইয়া তত্রত্য রাজকীয় পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম অয়নান্ত বৃত্তদ্বয়ের অর্থাৎ কর্কট ও মকরক্রান্তির দূরত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন; তাহার মতে এই দূরত্বের পরিমাণ ৪৭° ৪২′ ৩৯″। সুতরাং রাশিচক্রের প্রবণতা তখন ২৩° ৫১′ ১৯″.৫ ছিল। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই গণনার মিল আছে।

ইনিই সর্ব্বপ্রথম শুদ্ধমতে পৃথিবীর আয়তন নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিন মিশর দেশের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তস্থিত সহর। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ সহর ও আলেকজেন্দ্রিয়া একই দেশান্তরে অবস্থিত। এই দুই স্থানস্থিত লম্বরেখাদ্বয় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যে কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ আকাশের গাত্রে যে বৃত্তখণ্ড ছেদন করে তাহা নির্ণয় করিয়া তিনি ৭° ১২′ পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ কোন এক কর্কট সংক্রান্তিতে আলেকজেন্দ্রিয়ার লম্বরেখা হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৭° ১২′ ছিল। আর সিন নগর ঠিক কর্কটক্রান্তিতে অবস্থিত ছিল। কর্কট সংক্রান্তিতে সূর্য্য থাকিলে এই নগরস্থিত একটী কূপের নিম্নদেশ আলোকিত হইত। এবং এই সময় এই নগরে শঙ্কুচ্ছায়া পতিত হইত না। মহারাজ আলেকজেণ্ডার ও টলেমীর আমিনগণ এই দুই স্থানের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিয়া ৫০০০ ষ্টেডিয়াম্ পাইয়াছিলেন। সুতরাং পৃথিবীর পরিধি

$$\frac{৫০০০ \times ৩৬০}{৭° ১২′} = ৫০০০ \times ৫০ = ২৫০০০০ \text{ ষ্টেডিয়া।}$$

* তিনি যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করিবার ইহা হইতে ভাল উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই।

হিপারকাস্—ইনি আদি জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া ইউরোপে পরিচিত। বিথিনিয়ার অন্তর্গত নাইসিয়া নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। খৃঃ পূঃ ১৬০ হইতে ১২৫ পর্য্যন্ত অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে ইনি রোডস্ দ্বীপে গবেষণা ও আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইনি অয়ন চলন আবিষ্কার করেন, সূর্য্যের বৈকেন্দ্রিক গতি বা কেন্দ্র-বিচ্যুতি উপলব্ধি করেন। সৌরবর্ষের মান নির্দ্দেশ এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের দূরত্ব নির্ণয় করিয়া ১০৮০টী নক্ষত্রের মানচিত্র প্রস্তুত করেন এবং পৃথিবীর উপরিস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অক্ষান্তর ও দেশান্তর নির্ণয় করেন। অনেকে মনে করিতেন যে ইনি আলেকজেন্দ্রিয়াতে গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় জানিতে পারা গিয়াছে যে তিনি কখনও আলেকজেন্দ্রিয়াতে থাকিয়া গবেষণা করেন নাই।

ইরেটোস্থেনিস্ যে রাশিচক্রের প্রবণতা নির্ণয় করিয়াছিলেন। হিপারকাস তাহা সপ্রমাণ করেন। তৎপর তিনি বৎসরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিতে মনস্থ করিলেন। ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে এরিষ্টার্কাস্ কর্কট সংক্রান্তির সময় একবার সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার মতে বৎসরের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৬৫¼ দিন। কিন্তু হিপার্কাস্ ঐ ফলের সঙ্গে নিজের পর্য্যবেক্ষণের ফল মিলাইয়া দেখিতে পাইলেন যে ৩৬৫¼ দিনে বৎসর ধরিলে ৭ মিনিট বেশী ধরা হইয়া থাকে। তাঁহার গণনা মতে বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট হয়। কিন্তু ইহাতেও ১২ মিনিট বেশী ধরা হইয়াছে। বিষুব সংক্রান্তি ও অয়নান্ত সংক্রান্তিতে বিশেষ সাবধানতায়

* ৬০৬¾ ইংরাজি ফুটে এক ষ্টিডিয়াম হয়।

সহিত সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে সূর্যের এই চারি স্থানে অবস্থান হেতু যে চারিটি বিন্দু পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা সম্বৎসর চারি সমান অংশে বিভক্ত নহে। বিষুবদ বৃত্ত হইতে মকরক্রান্তিতে উপস্থিত হইতে সূর্য্যের ৯৪½ দিন এবং মকরক্রান্তি হইতে পুনঃ বিষুবদ বৃত্তে উপস্থিত হইতে ৯২⅛ দিন লাগিয়া থাকে। সুতরাং সূর্য্য সমুদয়ে ১৮৭ দিন বিষুবদ বৃত্তের উত্তরে ও ১৭৮ দিন বিষুবদবৃত্তের দক্ষিণে অবস্থান করিয়া থাকে। তাহা হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সূর্য্য পৃথিবীর কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে। তৎপর তিনি সূর্য্যের বৈকেন্দ্রিক গতির একটা খণ্ডা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি আরও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই কারণেই বৎসরের সকল ঋতুর দিন গুলি সমান হইতেছে না।

তাঁহার দৃষ্টি তৎপর চন্দ্রের উপর পতিত হয়। কেলডিয়ানগণ যে গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি চন্দ্রের ও চন্দ্রপাতের সূর্য্য-প্রদক্ষিণের সময় অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রকারেও তিনি চন্দ্রের গতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের বহুল উন্নতি করিয়াছিলেন।

তৎপর তিনি প্রধান প্রধান নক্ষত্র সমুহের একটী তালিকা নির্ম্মান করিয়াছিলেন। এই কার্য্য করিতে যাইয়া তিনি অয়ন চলন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এরিষ্টিলাস ও টাইমোচেরিসের আমলে (১৫০ বৎসর পূর্ব্বে) মেষ রাশির আদি স্থানে ক্রান্তিপাত হইত কিন্তু তিনি দেখিলেন যে ইহা প্রায় দুই ডিগ্রী সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং বৎসরে ইহা ৪৮ সেকেণ্ড করিয়া সরিয়া গিয়াছিল। আধুনিক গবেষণায় অয়ন চলনের পরিমাণ প্রায় ৫০″,২। সুতরাং হিপার্কাসের ভুল খুব কম। তাহার তালিকাতে ১০৮০টী নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। তিনি রেখা গণিত ও বর্ত্তুলগণিতের সাহায্য ত্রিভুজের সমাধান করিতে পারিতেন। বিভিন্ন যন্ত্রাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেশান্তর ও অক্ষান্তর রেখার প্রয়োজন ও ব্যবহার জানিতেন এবং ইহাদের দ্বারা স্থান বিশেষের অবস্থান নির্ণয় করিতেন। তাহার পরিশ্রম ও বুদ্ধিশক্তির যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায়না। কিন্তু তাহার লেখা সমুদয়ই নষ্ট হইয়াছে। তবে টলেমী তাহার সিদ্ধান্ত ও পর্য্যবেক্ষণের কিছু কিছু রক্ষা করিয়াছিলেন।

হিপার্কাসের মৃত্যুর পর তিন শতাব্দীর মধ্যে অন্য কোন জ্যোতির্ব্বিদ তাহার স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এই তিনশত বৎসরের মধ্যেই জুলিয়াস্ সিজার রোমান পঞ্জিকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

টলেমী—ইনি একজন ভূগোল ও খগোল তত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন। খৃষ্টিয় ২য় শতাব্দীতে সম্ভবতঃ ১৩৯—১৬১ মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইনি প্রথম শতাব্দীর লোক। ১৬শ ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের ধারণায় ইনি একজন বড়লোক ছিলেন। কিন্তু ইনি পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাজ যত সংশোধন করিয়া গিয়াছেন নিজে ততদূর উদ্ভাবনা করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। জ্যোতিষে তিনি হিপার্কাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন ও নির্ভর করিতেন। খগোলক সম্বন্ধে ইহারা যে মত পরিপোষণ করিতেন তাহাই টলেমীর প্রণালী বলিয়া বোধ হয়। কেন না টলেমির গ্রন্থাবলিই এখন বর্ত্তমান আছে।

বাইজানটিন ও আরব দিগের নিকট হইতেই টলেমী তাহার সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত মতে পৃথিবী স্থির এবং জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত, গ্রহ নক্ষত্ররাজি এই কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। আকাশের বায়ুমণ্ডল ৮ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মণ্ডলে একটী করিয়া গ্রহ এবং শেষটীতে নক্ষত্র অবস্থান করিত। ইহাদের গতির দৃশ্যত অসামঞ্জস্য উপরন্ত সংক্রান্ত জটিল সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যা করা হইত। ভূগোলেও টলেমী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কাজ সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। তাহার ভূগোল ৮ ভাগে বিভক্ত। ইহাতে কেবল স্থানের তালিকাও ইহাদের অক্ষান্তর ও দেশান্তর বর্ত্তমান। টলেমী ২৬ খানি মানচিত্রও অঙ্কিত করিয়াছিলেন; ইহাতে পৃথিবীর মেপও ছিল।

টলেমীর রচিত পুস্তকের নাম ছিল Syntax খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ আরবগণ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবগণ এই গ্রন্থকে Almagest বলিতেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষা হইতে ইহা লেটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং ভেনিস নগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আদি গ্রীক গ্রন্থ হইতেও দ্বিতীয় বার এই গ্রন্থ লেটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ১৫৪১ ও ১৫৫১ খৃঃ ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রীক্ ভাষায় কিন্তু গ্রন্থ খানা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।

টলেমীর মৃত্যুর পর আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রীকগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের আর অধিক চর্চ্চা করেন নাই। যাহারা কিছু কিছু চর্চ্চা করিতেন, তাঁহারাও কেবল হিপার্কাস্ ও টলেমীর পুস্তকের নোট ও টীকা লিখিতেন। এইরূপ ভাবে আরও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত আলেকজেন্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব এবং তথায় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ইহার পর রোমানেরা দেশ অধিকার করিয়া লইলে তথায় বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের অবনতি ঘটে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন এক কথাতেই হয়; কিন্তু, উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে কি দেখিব বা দেখাইব, এই কথা ভাবিতে গেলেই আমি দুঃখে মরিয়া যাই—আমার অন্তরে বিষাদ-কালিমার ঘোর ছায়া রেখাপাত করিয়া দেয়। আমাদিগের দেখাইবার কিছুই নাই; সভ্যজগতের সুসম্পন্ন জাতি-সমূহের সঙ্গে স্থান পাইতে হইলে আমাদিগের যাহা যাহা থাকা উচিত, তাহার কিছুই নাই—এই ভাবিয়াই আমি অনেক সময় ম্রিয়মাণ হই।

যে ইয়ুরোপীয় মহাসমর সম্প্রতি স্থগিত হইয়াছে, সেই সমরানল প্রজ্জ্বলিত হওয়া অবধি নানা প্রকার দ্রব্য সম্ভারের অভাবে দেশময় যে কি ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে সমস্ত বস্তু এখন সভ্যজগতে সভ্যজাতির নিত্য-ব্যবহার্য্য হইয়াছে, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকলের অস্তিত্বই ছিলনা। ইয়ুরোপীয় ও অন্য দেশীয় বণিক-সম্প্রদায় সস্তায় সকল দেশে ঐ সকল পদার্থের আমদানি করিয়া ধনী নির্ধন সকলেরই সহজ-ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ইদানিং ভারতবর্ষের সুদূর পল্লীতে পল্লীতে পর্য্যন্ত ঐ সকল জিনিষের বহুলপ্রচার পরিদৃষ্ট হইতেছে। কাজেই এখন অনেক জিনিষের আমদানি রহিত হওয়ায় বা মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, সাধারণের ক্লেশের সীমা পরিসীমা নাই। আমরা পূর্ব্বে মাটীর দেড়কোয় [ পিলসুজ ] সল্‌তে ও প্রদীপে বেড়ীর তেল দিয়া পড়িতাম; ঘরে ঘরে ঐ প্রদীপই জ্বালা হইত। এখন নিতান্ত দূর পল্লী ভিন্ন উহার প্রচলন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। জাপানের আমদানী না থাকিলে বোধ হয় আজ ভারতময় সকল গৃহস্থেরই অন্ধকারে রজনী যাপন করিতে হইত। আপনারা দেখিতেছেন ত জাপানের চিমনী বার্ণর ও শিশি-বোতল এদেশের বাজারে কেমন শীঘ্র শীঘ্র স্থান পাইয়াছে। যদি জাপানের গ্লাস না আসিত, তবে 'বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসের' কাজ বন্ধ করিতে হইত। এই তো আমাদিগের অবস্থা। ভালই হউক আর মন্দই হউক আমাদিগের অবস্থা উত্তমরূপে বুঝা উচিত এবং অদ্য তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। রোগের নিদান নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানকালে আমাদিগের জীবন কেবলমাত্র দুঃখের কথায় পূর্ণ; এই দুঃখের ভিতর দিয়াই আমাদিগের দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া ভাবী কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিতে হইবে।

আজ এই সভাস্থলে অসংখ্য বঙ্গীয় যুবক ও বৃদ্ধমণ্ডলী উপস্থিত আছেন। সকলেই ভাবিয়া দেখুন যে এই সুদরিদ্র দেশের মধ্যবিত্ত লোকের প্রতি পরিবারের উপায়ক্ষম লোকের বার্ষিক আয় কত? ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন; তিনিও স্বীকার করিবেন ৩৫৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকার বেশী নহে। প্রতি পরিবারে ছেলে বুড়া সমেত যদি ৫ পাঁচ জন করিয়া লোক ধরিয়া লওয়া হয়, তবে তাহাদিগের পূর্ণাহার কি প্রকারে সম্ভবে? প্রতি দিনই তাহাদিগের উপবাস বলিতে হয়। সুতরাং তাহাদিগের শারীরিক পরিপুষ্টি কোথায়? ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেশ উৎসন্ন হইতে চলিয়াছে। জীবনী শক্তির হ্রাস হওয়ায় সহজেই আমরা ব্যাধির কবলে কবলিত হইতেছি। ক্ষয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগও এই সকল কারণেই বর্ত্তমান বঙ্গীয় যুবক-মণ্ডলীকে ক্ষীণায়ুঃ ও হীনবল করিতেছে। এই যে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেশের সর্ব্বত্র এত জোর করিয়াছে, ইহারও কারণ উহাই। আমাদিগের সহ্য করিবার শক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে; কাজেই যে কোনও রোগ একবার দেখা দেয়, সহজে তাহা যাইতে চাহেনা। অন্ন বস্ত্রের অভাবই জীবনী-শক্তি হ্রাসের একমাত্র কারণ। আমরা এখন এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, আমাদিগের আয় অতি মাত্র কম হইয়া আসিয়াছে, আর কম হইতে পারেনা। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদিগেরই বা কি অবস্থা? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকবৃন্দের বাজার দরও নাই বলিলেই হয়। যদিও বা কোথায় কিছু কাজ জুটে বেতন বি-এর পক্ষে ৩০।৪০ টাকা এম-এ-ওয়ালার বড় জোর ১০০৲ টাকা। কিন্তু এই যে সামান্য অর্থাগম, তাহাও আবার কয় জনের ভাগ্যে জুটে? সাধারণ গ্রাজুয়েটদের কোনও আশা ভরসাই নাই বলিলে হয়। তবে এখন কি করা উচিত? কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত? যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগেরও এই অবস্থা দেখিতে পাই, তথাপি কি ঐ সকল উপাধির জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়া আমরা সন্তান-সন্ততিগুলিকে ঐ পথের পথিক করিয়া দিব? বড়ই সমস্যার সময় আসিয়াছে; অতিমাত্র প্রণিধান সহকারে এই সময়ে কর্ত্তব্য স্থির করিলে, তবে ভাবী মঙ্গলের আশা আছে। নতুবা উত্তর কালের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবার আশঙ্কা।

লোকগণনার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্রে যেখানে যেখানে অর্থাগমের বিশেষ সচ্ছলতা আছে, সেখানে বঙ্গালী অর্দ্ধেকও নাই। বঙ্গালীর কলিকাতায় অর্থাগমের মধ্যে আছে কেবল স্কুলমাষ্টারী ও কেরাণী গিরি। ইহাতে বাঙ্গালীর এক প্রকার একচেটিয়া অধিকার বলিলেও হয়; কিন্তু এই দুই

ব্যবসায়ে প্রচুর উদরান্নের সংস্থানও হয় না, ইহা সকলেই জানেন। পূর্ব্বে পুর্ব্বে চৌসের মুৎসুদ্দী সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক ৫০০০৲ কি ৬০০০৲ হাজার টাকা উপায় করিতেন। এখন এই টাকার মূল্য চতুর্গুণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন বাঙ্গালী এই পদ হইতে একেবারে বিতাড়িত হইয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বঙ্গদেশে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন, তখন তাঁহাদিগের ব্যবসায়-সংক্রান্ত সম্পর্ক বাঙ্গালীদিগের সহিতই ছিল। কালক্রমে, এই ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যেই, বাঙ্গালীর ধনার্জ্জনের সকল পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমার একবার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর এই অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষায় কিছু শিক্ষা হয় বটে; কিন্তু অর্থাগমের সুযোগ ও সুবিধা না থাকায় উদরান্নের নিতান্ত অসদ্ভাব হইয়া পড়িতেছে। অথাপি বাঙ্গালী 'উচ্চ শিক্ষা' ২ করিয়া চেঁচাইতেছে। বিলাতে শতকরা ৯০ জন স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা ( Secondary Education ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শিক্ষার পরে শতকরা ১০।১২ জনের অধিক কলেজে পড়িতে যায় না; অবশিষ্ট ব্যবসায়-বিশেষে নিয়োজিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। আর আমাদের দেশে যদি কোনও ছেলে কলেজে পড়িতে না পায়, তবে অমনি বলিয়া উঠে—"মহাশয়, আমার জীবনের ভবিষ্যৎটা মাটী হইয়া গেল।" আমাকে এরূপ কথা প্রায়ই শুনিতে হয়। আমি শুনিয়া মনে মনে হাসি। ইহা খুবই সত্য যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনেও আমাদিগের দেশের কয়েকজন বড় লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব-শূন্য—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺মহেন্দ্রনাথ সরকার, ৺কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে "গীতাঞ্জলী" লোকলোচনের গোচরীভূত হইত কিনা সন্দেহ। এই শিক্ষা যে মৌলিকতার মহান্ অন্তরায়, তাহা বিশিষ্ট বিশিষ্ট মনীষিগণ স্বীকার করিয়াছেন; এমারসন স্পষ্ট বলিয়াছেন—"University makes a havoc of originality." বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে কেবল সুরকী-পেসা হয় মাত্র। বাঙ্গলার ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কশূন্য ব্যক্তিই জয়লাভ করিয়াছেন। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোনও ডিগ্রী নাই। তিনি B. E., হইলে বড় জোর এতদিনে একজন পাকা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া ৭।৮ শত কি হাজার টাকা মাসিক উপায় করিতেন। কন্ট্রাক্টর জে, সি, ব্যানার্জ্জি, ইঞ্জিনিয়ার জে, সি, বানার্জ্জি প্রভৃতিরাও বিনা সম্বলে বিনা মূলধনে নিজ নিজ ব্যবসায়ের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মূলে তাঁহাদিগের অদম্য উদ্যম। আর আমাদিগের কেনও কৃতবিদ্য যুবককে যদি মূলধন ১০,০০০৲ টাকা দিয়া কোনও কাজে বসাইয়া দেওয়া যায়, আমার বিশ্বাস, অচিরেই সে ঐ টাকাগুলি নষ্ট করিয়া বসিয়া থাকিবে। সুতরাং মূলধনের অছিলাতে যে কোনও ব্যবসায়-বাণিজ্য হয় না—তাহা আমি মানি না। সাধুসঙ্কল্প ও উদ্যমের কাছে কিছুই অনায়ত্ত থাকে না। আমাদিগের যুবকমণ্ডলী যে কিছুই করিতে পারেনা, এ কথা আমি বুঝিতে পারিনা। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'—এই উদ্দেশে উদ্দীপ্ত হইয়া যদি কর্ম্মে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে বৈফল্যের আশঙ্কা কোথায়? তবে আমাদিগের যুবকেরা এখনও পরিশ্রমের মর্য্যাদা বুঝিতে শিখে নাই। সেটা অনেক পরিমাণে দেশের জাতীয় ভাবের উপর নির্ভর করে। যাহাই হউক, সকলকেই শ্রমের আবশ্যকতা, মান ও মর্য্যাদা বুঝিতে হইবে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে; 'নাস্তি গতিরন্যথা'। নতুবা আর এখন সমাজে ও দেশে তিষ্ঠীবার উপায় নাই। যখন আমি "বেঙ্গল কেমিকেলে" ঔষধ প্রস্তুত করিতাম তখন ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় ( ইদানিং স্যর ) আমা ক বলিতেন,—'ঔষধ প্রস্তুত করুন, কিন্তু নিজে আর প্রকাশ্যে বিক্রয় করিবেন না।' আমি অগত্যা পরদার আড়াল হইতে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতাম। বলা বাহুল্য, এখন সেকাল গিয়াছে; ব্যবসায় বাণিজ্য নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিবে। ইহা কি আপনারা দুর্ভাগ্য বা পরিতাপের বিষয় মনে করেন না যে একজন জমিদার যখন ছেলেটী B.A., পড়িতেছে, তখন হইতেই তাহার nomination অর্থাৎ চাকুরীতে প্রবেশাধিকার লাভের মনোনয়নের জন্য তৈল-প্রদান ও পদলেহন আরম্ভ করিলেন। অথচ এদিকে জমীদারীতে উৎপন্ন যত পাটের দাদন অন্য লোক দিয়া গেল; জমিদার তদ্দ্বারা কিছুমাত্রই লাভবান্ হইলেন না। রালী ব্রাদার্স ও বার্কমায়ার কোম্পানী বৎসরের পর বৎসর সেই পাটের ব্যবসায়ে তাঁহারই মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া উদরপূর্ত্তি পূর্ব্বক পুষ্টাঙ্গ হইতে লাগিলেন, আর তিনি নমিনেশনের চেষ্টায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সপুত্র সিথিলাঙ্গ হইতে লাগিলেন। নিতান্তই কলঙ্কের কথা।

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের পাটের ব্যবসায়ের সংবাদ যাহারা রাখেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন,—সামান্য নিরক্ষর মুসলমান প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ৪।৫ মাস পাটের মরশুমের সময় কাজ করিয়া ১০০০৲।১২০০৲ টাকা উপায় করে ও অবশিষ্ট কাল গৃহে সুখে যাপন করে। এই সকল শ্রেণীর লোক সকলেই লক্ষ্মীযুক্ত। তাহাদের তুলনায় আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবকদিগের অবস্থা ভাবিতেও লজ্জা বোধ হয়। তাহারা অঋণী অপ্রবাসী হইয়া শকান্নের পরিবর্ত্তে—উত্তম চর্ব্য চুষ্যাদি দ্বারা উদর পূরণ করে। আপনারা হয়ত অনেকে দেখিয়াছেন যে, তাহাদিগের জন্য

বাজারের ভাল মাছ তরকারী তথাকথিত ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত বা বড়লোকেরা কিনিতেই পারেন না। আর আমাদিগের ভদ্রশিক্ষিত বাঙ্গালীরা সকলেই ঋণী, প্রবাসী ও শাকাহারী হইয়াই চাকুরীর সেবায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আপনারা মাড়োয়ারীগণের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, তাহাদিগের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইবার কিছুই নাই। তাহারা সেই সুদূর মাড়োয়ার প্রদেশের মরুভূমি হইতে সম্বলের মধ্যে একটি লোটা হাতে করিয়া এদেশে আসে, ছাতু খাইয়া দিন যাপন ক'রে; শেষে ক্রমে ক্রমে কেমন ধীর স্থির ভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। আমরা কি তাহা পারি না? ইচ্ছা করিলেই পারা যায়। চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধ; তাই দেখিতে পাইনা—বুঝিতে পারিনা। পূর্ব্বাবধি সেই চাকুরীর সেবাই চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ছিল ফারসীশিক্ষা—শিখিলেই নবাব সরকারে পুরুষানুক্রমে একটি চাকুরী জুটিয়া যাইত। ফারসীর পরে হইল—ইংরাজী। প্রথম প্রথম ইংরাজী শিখিলেই চাকুরী—হুড়্ হুড়্ করিয়া চাকুরী, বিশেষ পরিশ্রম নাই—সামান্য খাটুনি; আ'র প্রণালীবদ্ধ কাজও নাই। সেই পূর্ব্ব প্রথার অনুপাতে এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যে কলিকাতা বা বাঙ্গালার, ব্যবসায় বাণিজ্য কেন্দ্রে বা চৌসে শতকরা চারিজন ও বাঙ্গালী নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কলিকাতার ভাটিয়াদিগের এক সভায় আহূত হইয়াছিলাম। কলিকাতায় ১০০০ হাজার ভাটিয়া বাস করেন। সভাপতি যিনি ছিলেন, তিনি ক্রোড়পতি। যে কয়েকটী পরিবার কলিকাতায় আছে, সেই ভাটিয়া-দিগের মধ্যে নিতান্ত নিঃস্ব পরিবারেরও আয় মাসিক ১০০৲ টাকা। আমি তথ্যটী জানিয়াই অবাক। মাড়োয়ারীও একলক্ষ আছে। ইহা-দিগকে চাকুরীর কথা বলিলে ইহারা অপমানিত হয়। আমড়াতলাগলিতে যে সকল বড় বড় গোদাম ঘর আছে, সেই সকল গুলিই দিল্লীওয়ালা মুসলমানদিগের। রাস্তার সম্মুখে ছোট ছোট দোকান; ভিতরে বড় বড় ঘর, পাইকারী বিক্রয়ের মালে ঠাসা। ঔষধাদি নানা দেশীয় মালপত্রে এক এক জনের ২।৩টী বাড়ী বোঝাই। এই সকল বাড়ীর মাসিক ভাড়া ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার কম নহে।

এই সকল দেখিয়া আমাদিগের শিক্ষা হওয়া উচিত; মোহ কাটিয়া যাওয়া উচিত। সকল গ্রাজুয়েটকেই আইন শিক্ষার জন্য ল-কলেজে যাইতে হইবে, ইহা কি কম বিড়ম্বনার কথা! সেদিন আমি পাবনায় গিয়াছিলাম। ছোট জিলা, ছোট সহরটী। শুনিলাম, সেখানে উকিল আছেন—১০০টী। যশোহর বা আলীপুরেও ততোধিক। ল-কলেজে ২৫০০ আড়াই হাজার ছাত্র! স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমি সকল বিষয়েই একমত; কিন্তু কেবল ঐ ল-কলেজটি সম্বন্ধে নহি। কেহ যদি আমাকে ২৪ ঘণ্টার জন্যও সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দেয়, তবে আমি সর্ব্বপ্রথমেই ঐ ল-কলেজটীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া ১০ দশ বৎসরের জন্য উহা বন্ধ করিয়া দিই। কি দুঃখের কথা, দেশের যুবকগুলি কেবল B.L., M.L., M.A., M. Sc. পড়িবে আর যমের সদনে যাইবে।

কোন্ দিকের কি কথা বলিব? আমাদিগের সকল দিকই শূন্য—অন্ধকারময়। এই ঘোর দরিদ্রতার কাহিনী ফুরাইবার নহে। মফঃস্বলের কথা ছাড়িয়া দিই; কলিকাতার সহরও সহরতলিতে এখন বাসিন্দাদিগের জীবনী-শক্তি অতি নিস্তেজ,—ক্রমেই হীনতাপ্রাপ্ত হইতেছে। মৃত্যু-সংখ্যার কথা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ভূমিষ্ট হইবার এক বৎসরের মধ্যেই এক-তৃতীয় সংখ্যক শিশুর প্রাণ-বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। বাড়ী ভাড়ার হার অতি উচ্চ। সেই তাড়নাতেই মনুষ্যবাসের অযোগ্য বাসস্থান-গুলিতে বাস করিয়া লোকগুলি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আলো, রৌদ্র ও বাতাস এইগুলি ঈশ্বর স্বয়ংই সমভাবে ভোগ করিবার জন্য দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা-নগরী এইগুলির কিছুই দিতে রাজি নহে। যাহারা অভ্যন্তরস্থ অলিগলি দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কল্পনা করিতে পারিবেন—অবস্থা কি শোচনীয়। মেয়েদের অবস্থা আরও ভয়াবহ—আরও শোচনীয়। পুরুষদিগের অবস্থা তবুও বাহিরের যাতায়াতে কিছু মন্দের ভাল; আর মেয়েদের (মেয়েদেরই বা বলি কেন? মেয়ে-পুরুষ সকলেরই "যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সো হস্য বিশ্রামঃ।" এই সকল কারণেই প্রসূত সন্তান-সন্ততিগণের স্বাস্থ্য নিতান্ত খারাপ হইয়া আসিতেছে। মনে হয়, এদেশে স্পার্টাদেশের আইন প্রবর্ত্তিত করিলেই ভাল হয়। স্পার্টানেরা দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুগুলিকে উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিত; যেগুলি তাহাতেও বাঁচিত, সেইগুলি অবশ্য রাখিত। এদেশেও তাহা করা উচিত। বোধ করি তাহাতে পরিণামে ইষ্ট বৈ অনিষ্ট নাই। জীবন বীমার বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, এদেশীয় লোকের আয়ুর পরিমাণ গড়ে ২২ বৎসর, এবং বিলাতের ৪৬ বৎসর। প্রাগুক্ত প্রকারের অসুস্থ স্ত্রী পুরুষের সন্তান-সন্ততিগুলির যে এই অবস্থা হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

উল্লিখিত দুরবস্থা-সমূহের প্রতিরোধ করিতে না পারিলে সমাজের কোনক্রমেই মঙ্গল নাই। অনেকে আবার অচিরে ইহার অস্তিত্ব-হানিরও আশঙ্কা করেন। করিবার কথা বটে। নানাদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতিযোগিতা দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক অর্থাগমের পথ প্রশস্ত না করিলে, আমাদিগের আর সংসারে

তিষ্ঠিবার উপায় নাই। যাঁহারা আমাদিগের চক্ষের উপরেই এই সকল ক্ষেত্রে কৃতকর্ম্মা হইয়া অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগের প্রতি অযথা ঈর্ষা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে এখন কোনও ফলই হইবে না। তাঁহারা যাহা করিতেছেন, আমরাও তাহাই করিব; আমাদিগের প্রসার বা প্রতিপত্তির জন্য তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে হইবে,—এ কল্পনা নিতান্ত অলীক। "হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে ন তু" (হেতুতে করিবে ঈর্ষা। ফলে কভু নয়—দিনচর্য্যা) এই আয়ুর্ব্বেদোক্তি নিতান্তই সমীচীন। এই ব্যাপারে আমাদিগের হিন্দু ও মুসলমান ভাইগণ সকলেই সমানভাবে উদ্যোগী হইতে পারেন। উদ্যোগের অসাধ্য কি? অন্য কথা ছাড়িয়া দিই; বাঙ্গালাতেই কেবলমাত্র প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে। সুতরাং চটের কলের এইখানেই বিশেষ সুবিধা। ৭১টী চটের কল আছে। সকলই সাহেবদিগের। তাহার প্রত্যেকটীরই লাভ শতকরা ১২০৲ হইতে ২০০৲।২৫০৲ টাকা। যৌথকারবার করিতে গেলেই আমরা একটা-না-একটা বিবাদ জুটাইয়া সরিয়া পড়ি। কাজেই আর কি করিব? কিন্তু তাই বলিয়া কি শিখিব না? সাঁতার শিখিয়া কেহ জলে নামে না; জলে নামিয়াই সাঁতার শিখে। শিক্ষা করিলে আমরাও কৃতী হইতে পারিব। এই যে যুবকবৃন্দ এখানে আছেন, ইহাদিগকে আমি সরলভাবে অনুরোধ করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল হইলে যেন কেহ আত্মহত্যা করেন না— পরীক্ষার ফল সত্বরই বাহির হইবে; আর এইরূপ বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠানের কথা প্রায়ই শুনা যাইবে। অভিভাবক যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকেও বলি—তাঁহারাও যেন ছেলে ফেল হইলে দুঃখিত না হন। 'হা হতোঽস্মি' না করেন। তাঁহাদিগের জন্যও অনেক ছেলের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। আপনারা নিশ্চয়ই মনে রাখিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার বন্ধ হইলেও শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের দ্বার আমাদিগের রুদ্ধ হইতে পারে না। আমি সারাজীবন এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। শেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, প্রকৃত শিক্ষা বা মনুষ্যত্ব-লাভের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সংস্রব নাই। আর কেবল চাকুরীর জন্য শিক্ষালাভ করিলেও জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে মাত্র। আমেরিকা-দেশে তাহারা কি করে—প্রকৃত জ্ঞানলাভ দ্বারা শক্তি-সঞ্চয় করে। কেবল চাকুরীর জন্য লেখা-পড়া শিখে না, কেবল বিজ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা তাহারা জীবন-সমস্যার সার্থকতা সম্পাদন করে। এই যে ভীষণ যুদ্ধটা ইউরোপে হইয়া গেল, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই মহাসমর রাসায়নিকদিগের রসশালাতেই নির্ব্বাহ হইয়াছে। আর আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, তাহা কেবল মা সরস্বতীর সহিত ফাঁকি জুঁকি। তাহাতে কি কাহারও গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে?

... শিবাজী, রণজিৎসিংহ, হায়দারালী প্রভৃতি নিরক্ষর ছিলেন। রবার্ট ক্লাইভ কেম্ব্রিজের উপাধিধারী হইলে তাঁহার নামও কেহ জানিত কিনা, সন্দেহ। ওয়ারেণ হেষ্টিংস স্বয়ং স্বচেষ্টায় কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন। কার্ণেজী শেষ জীবনে ৯ কোটী টাকার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বাল্য কালে খবরের কাগজ ফেরী করিয়া বিক্রয় করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদক ৺প্রতাপচন্দ্র রায় কোনও বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখেন নাই। মহারথী রবার্টস সান্‌হার্ষ্ট হইতে ফিল্ড মার্শেল হইয়াছিলেন। এই যে প্রদেশে প্রদেশে চেম্বার অব কমার্স আছে, ইহার সভাপতিরা সকলেই নিজের চেষ্টায় শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন। ইহাদের সকলেরই পাঠাগার ও পুস্তকালয় আছে।

১০ দশটী বৎসর বাঙ্গালী আত্মনির্ভর-শীলতায় ভর করিয়া অগ্রসর হউন; দেখিবেন, তাঁহাদিগের পথ সুগম হইয়াছে। এই যে আমি আজ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, এই সকল প্রদর্শনীর আবশ্যকতা বুঝুন, ইহার অনুকূল চেষ্টাও শিক্ষা করুন। আর আমাদিগের যুবকবৃন্দ লেখা পড়া শিখে শিখুক, তাহাতে ক্ষতি কিছু নাই, অসুবিধা কিছু নাই—চাকুরী চাকুরী না করিয়া—বিজ্ঞান চর্চ্চা করুক—দেখিবে, শক্তি স্বয়ংই সঞ্চিত হইয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে। আমি দৈহিক বলের অভাব সত্ত্বেও গত তিন বৎসরে, এই ভারতবর্ষের মধ্যে ১৫০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছি। ইহা কেবল ইচ্ছা-শক্তির বলে। এই ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান হইলেই আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যুবকবৃন্দও নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। পরবশের দুঃখজ্বালা অতিক্রম করিয়া আত্মবশে সুখের মুখ দেখিতে পাইবে। আশা করি, আমার এই কথা বৃথা হইবে না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১৯৩ হইতে ২০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

# সৌরভ

| সপ্তম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩২৬। | দশম সংখ্যা। |
|---|---|---|

## দুইটি প্রাচীন মুদ্রা।

১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে মহারাজ দনুজমর্দ্দন ও মহারাজ মহেন্দ্র দেবের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি অবলম্বনে তাঁহাদের বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট দনুজমর্দ্দনের একটী মুদ্রা আছে, এই প্রবন্ধে তাহা উল্লিখিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধে তাহা ১১নং রূপে বর্ণিত। যথা সময়ে মুদ্রাটি হস্তগত না হওয়ায় তখন উহার বিশেষ বিবরণ দিতে পারি নাই। প্রবাসীতে প্রবন্ধ বাহির হইবার অব্যবহিত পরে কার্য্যবশতঃ আমার ময়মনসিংহ যাইতে হয়। তখন কেদার বাবু তাঁহার নিকটে দনুজমর্দ্দনের যে মুদ্রাছিল, তাহা আমাকে দেখান। কেদার বাবুর নিকট আর একটি প্রাচীন মুদ্রাও ছিল। তাহাও এই সময় দেখিতে পাই। এই মুদ্রাটি কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজ বংশের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা নরনারায়ণের, মুদ্রা দুইটি দেখাইয়া কেদার বাবু উহাদের বিষয়ে সৌরভে একটি প্রবন্ধ দিতে অনুরোধ করেন। তাহারই ফলে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মুদ্রা দুইটির বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

১। দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা। রৌপ্য নির্ম্মিত, ওজন ১৮২'৫ গ্রেণ, পরিধি ৩$\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি। "শ্রী শ্রীদনুজমর্দ্দন" এর দ্বিতীয় শ্রীর দক্ষিণ কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রার প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি অগভীর পোদ্দারের পরখ চিহ্ন। "নদেব" এর নীচে মুদ্রার বেধের উপর পাশা পাশী দুইটি পরখ চিহ্ন, আঘাতে মুদ্রার বৃত্তাকার পরিধিতে টোব পড়িয়া গিয়াছে।

| ভাও পীঠ | উল্টাপীঠ |
|---|---|
| সরল কোণ সমূহে ঢেউখেলান রেখা দ্বারা যুক্ত বৃত্তদ্বয় অভ্যন্তরে | বৃত্তের মধ্যে চতুষ্কোণ, কোণগুলি বৃত্তস্পর্শ করে নাই। চতুষ্কোণের মধ্যে তিন ছত্রে |
| শ্রী শ্রী দ | শ্রীচণ্ডী |
| নুজ মর্দ্দ | চরণ প |
| ন দেবস্য | রায়ণ |
| "স্য" অক্ষরটির তৃতীয় ছত্রে ভাল জায়গা না হওয়াতে একটু উপরে বৃত্ত ঘেঁসিয়া কষ্টে লিখিত। দ্বিতীয় শ্রীর ঠিক উর্দ্ধে সরল কোণে ঢেউখেলান রেখার গতি নষ্ট করিয়া ক্ষুদ্র বৃত্তাংশ বর্ত্তমান। বিন্দুশূন্য চন্দ্রবিন্দুর মত। | চতুষ্কোণের উপরে "শকাব্দা দক্ষিণে '১৩৪০,' নিম্নে 'পাণ্ডু" বামে 'নগরাত্', অগভীর কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুষ্কোণের বাহু গুলির ঠিক কেন্দ্র বরাবর বৃত্তের মধ্য দিকে চন্দ্র বিন্দু অথবা ৺ চিহ্ন সকল বর্ত্তমান। নিম্নের দিকেরটি স্পষ্ট নহে। |

এই মুদ্রাটি আমার প্রবাসীর প্রবন্ধে বর্ণিত ১নং, ১০ নং এবং ১১ নং এর মত ঢাকা ময়মনসিংহ জেলার সীমানাস্থিত কোন গ্রামে প্রাপ্ত।

২নং। কোচবিহার রাজবংশের আদি রাজা নরনারায়ণের রৌপ্য মুদ্রা। ওজন ১৭০'৫ গ্রেণ। পরিধি ৩$\frac{৯}{১৬}$ ইঞ্চি। পোদ্দারের পরখ চিহ্ন নাই। উল্টাপীঠের বাম নিম্নাংশে মুদ্রার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি অগভীর রেখা বর্ত্তমান, বোধ হয় ছাচের দোষ। এই রেখার উপর প্রান্তের নিম্নাংশে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা সামান্য চাঁছিয়া লওয়া হইয়াছে।

ভাওপীঠ

বিন্দুমালা দ্বারা ব্যবহিত সমান্তরাল বৃত্ত দ্বয় অভ্যন্তরে—

শ্রী শ্রী
মল্লরণারা
য়ণস্য শাকে
১৪৭৭

বাহিরের বৃত্তের ঊর্দ্ধ দক্ষিণ অংশমাত্র সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, বাকী অংশের ক্ষীণ রেখা আছে, নিম্নে প্রায় নাই।

উল্টাপীঠ

বিন্দুমালা দ্বারা ব্যবহিত সমান্তরাল বৃত্তদ্বয় অভ্যন্তরে—

শ্রী শ্রী
শিব চরণ
কমলমধু
করস্য

বাহিরের বৃত্তের বামার্দ্ধ মাত্র বর্ত্তমান।

মহারাজ দনুজমর্দ্দনের সুবর্ণগ্রাম হইতে মুদ্রিত ১৩৩৮ ও ১৩৪০ শকাব্দার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; ১৩৩৯ শকাব্দে মুদ্রিত পাণ্ডু নগর ও চট্টগ্রামের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু কেদার বাবুর এই ১ নং মুদ্রাটির মত মুদ্রা আর একটিও পাওয়া যায় নাই। এই মুদ্রাটি পাণ্ডু নগরে ১৩৪০ শকাব্দে মুদ্রিত। পরবর্ত্তী রাজা এবং দনুজমর্দ্দনের উত্তরাধিকারী মহেন্দ্র দেবের যত মুদ্রা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সেই সমস্তগুলিই পাণ্ডুনগরে ১৩৪০ শকাব্দে মুদ্রিত। কাজেই কেদার বাবুর এই মুদ্রাটি এবং সুবর্ণ গ্রামে ১৩৪০ শকাব্দে মুদ্রিত পূর্ব্বপ্রাপ্ত একটি মুদ্রাদ্বারা সপ্রমাণ হয় যে—১৩৪০ শকাব্দের কয়েক মাস পর্য্যন্ত দনুজমর্দ্দনই বাঙ্গালা দেশের রাজা ছিলেন। পরে মহেন্দ্র দেব পাণ্ডুয়ায় অভিষিক্ত হন।

কেদার বাবুর নরনারায়ণের মুদ্রাটিও মূল্যবান * এই পর্য্যন্ত নরনারায়ণের নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের কার্য্য বিবরণীতে ৪৫৭ পৃষ্ঠায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক বর্ণিত। ইহার ভাও পীঠে "শ্রীশ্রীমল্লর নারায়নস্য" এর পরিবর্ত্তে "শ্রীশ্রীমল্লর নারায়ন ভূপালস্য" লিখিত আছে। ইহাকে নরনারায়ণের 'ক' শ্রেণীর মুদ্রা বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত নরনারায়ণের মুদ্রাটী 'খ' শ্রেণীর মুদ্রা। রাজা রাজেন্দ্রলাল কর্ত্তৃক বর্ণিত মুদ্রাটিও ১৪৭৭ শকাব্দের।

২। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৮৭৪ খৃঃ ৩০৬ পৃষ্ঠায় ব্লকম্যান সাহেব কর্ত্তৃক বর্ণিত। ইহা অবিকল আমাদের বর্ণিত মুদ্রার মত। কেবল ওজন ১৫৭.৫ গ্রেণ বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩—৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৯৫ খৃঃ এর বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ২৩৭—২৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত। এই দুইটি মুদ্রাই 'ক' শ্রেণীর মুদ্রা। মাপ ও ওজন দেওয়া হয় নাই।

৫। সদ্য প্রকাশিত শিলং মুদ্রা পেটিকার তালিকা-পরিশিষ্টে ( Supplement to catalogue of the provincial casinet of coins, Assam. by A. W. Botham C. I. E. and R. Friel C. S. 1919 ) বর্ণিত। ১নং, ৩৬৩ পৃষ্ঠা। ইহা নরনারায়নের 'ক' শ্রেণীর মুদ্রা। বর্ণনায় "শ্রীশ্রীমল্লর নারায়ন ভূপালস্য শাকে ১৪৭৭" এর পরিবর্ত্তে "শ্রীশ্রীমল্লব নারায়ন"-ইত্যাদি ভ্রম ক্রমে লিখিত হইয়াছে।

৬। উক্ত পুস্তকের উক্ত পৃষ্ঠায় ২নং রূপে বর্ণিত। এইটি 'খ' শ্রেণীর মুদ্রা। এখানেও ভ্রম ক্রমে নামটি 'শ্রীশ্রীমল্লবনারায়ণ' রূপে পঠিত হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীমল্লর নারায়ণ' হইবে।

এ অবস্থায় কেদার বাবুর মুদ্রাটিকে ৭নং মুদ্রা বলা যায়। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে নরনারায়ণের যত মুদ্রা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সমস্তগুলিই ১৪৭৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।

রাজা নরনারায়ণের সময়ে কোচবিহার বা কামতা রাজ্য গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। নরনারায়ণ ১৫৪০-১৫৮৪ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবের সহিত বনিবনাও না হওয়াতে তিনি রাজ্য দুইভাগ করিয়া দেন। সঙ্কোশ নদী উভয় রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান থাকে। পূর্ব্বাংশে রঘুদেব রাজত্ব করিতে থাকেন, পশ্চিমাংশ নরনারায়ণের রাজত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। নরনারায়ণ—হইতে বর্ত্তমান কোচবিহার রাজবংশের ধারা চলিয়া আসিতেছে। বিজনী—এবং বেলতলার জমীদারগণ রঘুদেবের বংশধর।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

* ধারীশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত চৌধুরী এই মুদ্রাটির মালিক। সৌঃ সঃ।

# রামায়ণী সমাজ।

## জাতি তত্ত্ব।

রামায়ণী যুগে আর্য্যভারতে চাতুর্ব্বর্ণ সম্মত সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, রামায়ণে ইহার আভাস পাওয়া যায়। এই সমাজে ব্রাহ্মণ্যত্বেজের উপর ক্ষত্র শক্তির প্রভাব—বিশ্বামিত্রের নূতন জগৎ সৃষ্টির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামায়ণের ক্ষত্রিয় রাজগণ যেমন একদিকে ব্রাহ্মণের করধৃত ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় অভিনয় করিতেছেন, অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্মণের নীতি অবহেলা করিয়া উচ্চ-নীচ ভেদ-জ্ঞান শূন্য ভাবে—আর্য্য অনার্য্য সকলকেই সমভাবে আলিঙ্গন করিতেছেন; পরশুরামের ব্রাহ্মণ্য দর্প চূর্ণ করিয়া সমাজের হীন স্তরের নিষাদ রাজ গুহকে বক্ষে স্থান দিতেছেন। এইরূপ বিপরীত ভাবের সমাবেস রামায়ণের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই যুগের সমাজ ও বর্ণ পার্থক্য আলোচনার পূর্ব্বে আর্য্য ভারতের প্রাচীনতম সমাজের বর্ণ বিভাগের ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন; আমরা রামায়ণীযুগের জাতিতত্ত্ব আলোচনার পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহাই করিব।

আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যবসতি কোন সময়ে স্থাপিত ও বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ঋক্‌বেদের কোন কোন ঋক্ হইতে অবগত হওয়া যায়। ঋক্‌বেদের ৪ মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ১৮ ঋক্ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ঐ ঋক্ মন্ত্রটী রচিত হইবার সময় আর্য্যগণ সরযূ নদীর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এই সরযূ তীরে অযোধ্যা নগরী অবস্থিত।

বেদের রচনা চলিত থাকা কালে অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত আর্য্য-বসতি বিস্তৃত হইলেও বাল্মীকির সমসাময়িকযুগে যে জাতি বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাব আর্য্য সমাজে লক্ষিত হয়, সে রূপ বর্ণ বিভাগ ব্যবস্থা তখনও আর্য্য ভারতে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

বেদ বিভাগের পূর্ব্বে বেদের সর্ব্বত্র দুইটী জাতির কথাই বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্য। বেদে অনার্য্যদিগকে 'দস্যু' বাচ্যে অভিহিত করা হইয়াছে। এই দস্যু বা অনার্য্য জাতিই বশ্যতা স্বীকার করিলে তাহাদিগকে আর্য্যেরা দাস রূপে সমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) আর্য্য ও দাস (দস্যু) জাতি ব্যতীত আর কোন তৃতীয় জাতির উল্লেখ কোন বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক কালে আর্য্য সমাজে প্রথম অবস্থায় সকলি সম ধর্ম্মী, সম কর্ম্মী ও সমান অবস্থা সম্পন্নছিলেন। সকলেরি বৈশ্য বৃত্তি ছিল। (২) ক্রমে ২ ব্যক্তিগত গুণ ও কর্ম্মপ্রভাবে আর্য্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক (স্তোত্রকার বা পুরোহিত) শ্রেণী, রাজপুরুষগণ ও সাধারণ শ্রমজীবী বা ব্যবসায়ী লোক—এই তিনটী সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আহার বিহার ও বিবাহাদিতে কোন ভেদজ্ঞান ছিল না। তখনও এই তিনটী সম্প্রদায় তিনটী পৃথক জাতিতে পরিণত হয় নাই। (৩)

---

(১) ঋক্ বেদ ৬।১৮।৩

(২) শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার প্রকাশক Weber ঋক বেদের সময় আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"There are no castes as yet; the people is still one united whole and bears but one name, that of *visas*." (ঋক্‌বেদ রমেশ দত্ত ১৮ পৃ) শুক্ল যজু সংহিতার ভাষ্যকার মহীধর আর্য্য শব্দের অর্থ (আর্য্যঃ স্বামী বৈশ্যয়োঃ) 'স্বামী ও বৈশ্য' করিয়াছেন।

(৩) ঋগ্বেদ সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত ১।৭।৪ টীকা দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে ভট্ট মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন—

"There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of castes, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmans, no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of the people from leaving together from eating and drinking together; no law to prohibit the marriage of people belonging to differant castes; no law to brand the offspring of such marriage with an indelible stigma. Castes as now understood are not a Vedic institution and in disregarding the rules of castes no commend of the real Veda is violated."

এই সময় এক পরিবারের তিন ব্যক্তি তিন কার্য্য করিত। স্তোত্রকারের পুত্র চিকিৎসক এবং কণ্যা যবভর্জ্জনকারিণী ছিল। ৯ অষ্টকের ১১২ সূক্তের ৩ ঋকটী এইরূপ—

প্রথমে আর্য্যদিগের কেবল অনার্য্য বা দস্যুরাই শত্রু ছিল। দস্যুরা বশ্যতা স্বীকার করিয়া দাসরূপে পরিণত হইলে পর তাঁহাদের আর কোন উপদ্রব ছিল না।

ক্রমে সমাজে অনাবিলতা প্রবেশ করিতে লাগিল। চৌর্য্য, নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ (১) সমাজে উৎকট ভাবে সংক্রামিত হইয়া উঠিতে লাগিলে সমাজ পতিগণ সমাজ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে আর্য্যসমাজে কর্ম্ম-বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। রামায়ণে এই কর্ম্ম বিভাগ সৃষ্টির ইতিহাস নাই—মহাভারতে আছে। আমরা "মহাভারত" হইতে নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

ভীষ্ম বলিতেছেন "সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছুদিন কাল যাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশতঃ ক্রমশ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভ পরতন্ত্র, পরধন গ্রহণ তৎপর, কাম পরায়ণ, বিষয় শক্ত ও কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যা গমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছু রহিল না। (২)

আর্য্য সমাজের শৃঙ্খলা এইরূপে ভঙ্গ হইলে সমাজ পতি মহাপুরুষগণ সমাজ রক্ষার বিধান প্রণয়ন করিলেন। এই বিধানই রামায়ণে "স্মৃতি" (১) শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বলিয়া আদিতে সকল মানবই ব্রাহ্মণ ছিলেন। এইবার সমাজ রক্ষার জন্য বর্ণ বিভাগ বা কর্ম্ম বিভাগের প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়ায় সমাজ পতিগণ বিরাট আর্য্য সমাজকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। এই বিধান অনুসারে চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্য নিরত, বেদধ্যায়ী, ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞিক (ব্রহ্ম) দিগকে "ব্রাহ্মণ", দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ক্ষমতা সম্পন্ন বলশালী ব্রাহ্মণ দিগকে 'ক্ষত্রিয়', কৃষি বাণিজ্য ও পশু পালনক্ষম শ্রম সহিষ্ণু ব্রাহ্মণদিগকে বৈশ্য এবং নিরীহ অথচ কর্ম্মতৎপর ব্রাহ্মণদিগকে শূদ্র আখ্যা

---

"দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন কামনাতে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।" (ঋগ্বেদ সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত)।

বেদের অনেক স্থানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ আছে। ঋক্‌বেদের এক স্থানে, যথা—"ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ" ৭।১০৩।৮ এখানে ব্রাহ্মণাসঃ শব্দে স্তোতাগণকে বুঝাইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে যাহারা দুরভিগম্য বেদের মন্ত্র ভাগের অর্থ গ্রহণ জন্য বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ পাঠ করিতেন ও তদ্দ্বারা ক্রিয়ান্বিত হইয়া যজ্ঞের ব্রাহ্মণ হইতেন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইত। বেদের গদ্য ব্যাখ্যা ভাগের নাম "ব্রাহ্মণ"।

এক স্থানে বিপ্র শব্দের উল্লেখ আছে। এক স্থানে আছে "বিপ্রং দেবং অগ্নিং" ৮।১১।৬ দেব অগ্নিকে বিপ্র বা মেধাবী বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বেদের মেধাবী পাঠকই (ভবেদ্ বিপ্রঃ) "বিপ্র" আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন।

বেদের কয়েকটী ঋকে দেবতাদিগকে "ক্ষত্রিয়া" বলা হইয়াছে। কোন কোন ঋকে 'সুক্ষত্র' আছে। এক স্থানে, যথা—"বৃণে সুক্ষত্র বৃণয়।" 'ক্ষত্রিয়' বলবান অর্থে এবং 'সুক্ষত্র' অতিশয় বলবান অর্থে গৃহীত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বলবান ব্যক্তিরাই ক্ষত্রিয় আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

ঋক্ বেদের পুরুষ সূক্তে বিরাট দেহের চারি ভাগের উল্লেখ আছে। এই ঋকগুলি বেদ বিভাগের পরে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বেদবিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। ইহার আলোচনা যথা স্থানে করা যাইবে।

(১) ঋক্‌বেদের নানা স্থানে এই সকল কদাচারের উল্লেখ আছে। ৭।২১।১; ২।১৩৪।৪, ১।১২৪।৭, ২।৪২।১, ২।১৬৬।৪ প্রভৃতি ঋক্‌মন্ত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

(২) মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব ৫৯ অধ্যায় (প্রতাপ রায়ের অনুবাদ)।

(১) মহাভারতে এই স্মৃতিশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রের নাম "দণ্ডনীতি" প্রদত্ত হইয়াছে। এই দণ্ডনীতি পরে শুক্রাচার্য্য (ভৃগু) কর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া মনুস্মৃতি বা মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। অতঃপর পুনরায় ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রই পাটলীপুত্র রাজ পুষ্যমিত্রের রাজত্ব কালে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান মনুসংহিতায় পরিণত হইয়াছে।

প্রদান করিয়া আর্য্য সমাজে গুণ কর্ম্মের বিভাগ অথবা বর্ণ বিভাগ সম্পাদন করা হয়। (২)

মহাভারতের নানা স্থানে জাতি বিভাগের উপর্যুক্ত তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই বিভাগ কোন্ সময়ে আর্য্য সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ মহাভারতে নাই। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণ প্রাচীন। রামায়ণে জাতি উৎপত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব আছে—আমরা তাহা যথা স্থানে আলোচনা করিব। রামায়ণেও গুণ-কর্ম্ম বিভাগের বা বর্ণ বিভাগের সময় নির্দ্দেশক বিশেষ কোন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ঋক্ বেদের শেষ মণ্ডলের (১০ম) ৯০ সুক্তটীকে পুরুষসূক্ত বলে। বেদবিদ্ প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে—এই সুক্তটী (১) বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদ বিভাগের বহুপরে রচিত হইয়া ঋক্ যজুঃ (২) ও অথর্ব্ববেদে (৩) স্থান লাভ করিয়াছে। ঋক্‌বেদীয় পুরুষসূক্তের ১১ ও ১২ ঋকে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণ বিভাগের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রশ্ন যথা—"মুখং কিমস্য? কৌ বাহূ? কৌ উরূ? কৌ পাদৌ উচ্যেতে?" ইহার (বিরাট পুরুষের) মুখ কি হইল, বাহুদ্বয় কি হইল, উরুদ্বয় কি হইল, পদদ্বয় কি হইল? ১১

উত্তর—ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য তবৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং (৪) শূদ্রো অজায়ত॥

ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য বা ক্ষত্রিয় হইল, উরুদ্বয় বৈশ্য হইল, পদ (হইতে) শূদ্র হইল।

বেদ বিভাগের সময়ই জাতি বিভাগও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—ইহাই প্রচলিত সাধারণ মত। * এই বর্ণ বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ বর্ণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বা বিরাট (সমাজ) দেহের মস্তক স্বরূপ ছিলেন।

ক্ষমতা পাইলে অনেকেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সমূহের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অবহেলা করিবার ইচ্ছা গর্ব্ব ও অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত হয়। গর্ব্ব ও অহঙ্কার প্রবল হইলে গুণের হ্রাস স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে। ক্রমে ব্রাহ্মণ বর্ণে ঐ দোষগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ ঋষিগণের আচরণে উত্যক্ত হইয়া

---

(২) মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ও আছে :—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রাহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাংগতম্॥১০
কাম ভোগ প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজা ক্ষত্রতাং গতা॥১১
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপ জীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥১২
হিংসাঽনৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥১৩
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মোযজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যঃ ন প্রতিষিধ্যতে॥১৪
(শান্তি পর্ব্ব—১৮৮ অধ্যায়।)

উপনিষদ গুলিতে এবং বায়ু পুরাণে এই মত গৃহীত হইয়াছে।

(১) এই সুক্তের ৯ ঋক্‌টীতে বেদ বিভাগের আভাস আছে লক্ষ্য করিয়া ৺ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই সূক্তটী (১০) কত আধুনিক তাহা এই ঋকের দ্বারা কতক প্রকাশ হইতেছে। ইহার রচনা কালে ঋক্, সাম ও যজুয়ের মন্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক করা হইয়াছে। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতি বিভাগ প্রথা ঋক্ বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্ত এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" ঋগ্বেদ সংহিতা।

(২) শুক্ল যজুঃ ৩১।১১

(৩) অথর্ব্ব বেদ ১৯।৬।৬

(৪) একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে—'শূদ্রের বেলায় পঞ্চমী বিভক্তি।' তাহা এই পুরুষ সুক্ত লইয়া। এখানে কেবল শূদ্রের বেলায় পঞ্চমী হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে বিষ্ণু পুরাণ মনুসংহিতা প্রভৃতিতে সকলেই পঞ্চমীর অধীন ব্যাখ্যাত হইয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—পুরুষ সূক্তের এই ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে।

* ত্রেতাযুগে চাতুর্ব্বর্ণপ্রতিষ্ঠা, বেদের মন্ত্র সকল পৃথক্-পৃথক সংহিতাকারে বিভাগ ও মন্ত্র সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।' ৬০।৫৭ বায়ু পুরাণ।

উঠিলেন। এবং একাগ্র মনে ক্ষত্র শক্তির সহিত পুনরায় জ্ঞান সম্পদ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (১)

তখনও জ্ঞান চর্চ্চার অধিকার সকলেরই—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের—সমান ছিল, সুতরাং জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণ এবং ক্ষত্রিয়ের অনুসরণে বৈশ্য শূদ্র এমন কি ঘৃণ্য জারজ সন্তানগণও সমাজে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ—এমন কি অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ—সম্মান লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে এই সময় ক্ষত্রিয়ের প্রভাব এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে বহু ব্রাহ্মণ জ্ঞান লাভের জন্য ক্ষত্রিয়ের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শতপথ ব্রাহ্মণের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, ছান্দগ্য উপনিষদের প্রবাহন-জাবালী ও গৌতম সংবাদ, কৈশিতকী ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় রাজ চিত্র-গাঙ্গায়নী ও গৌতম সংবাদ এবং গর্গ অজাতশত্রু সংবাদ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সময়ের ইতিহাসে উচ্চ বর্ণের পতনের এবং নিম্ন বর্ণের উত্থানেরও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ কর্ম্মদোষে অনার্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজ বেণের পুত্রগণ নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরদিকে দাসী পুত্র কভষ, জাবালীর জারজ পুত্র সত্যকাম, শূদ্রজাতীয় রৈকর, ক্ষত্রিয় রাজ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি গুণ ও কর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সমাজে বরণীয় হইয়াছিলেন।

এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তুলনায়—উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইতে লাগিল। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদের এইরূপ একটী ঘোষণা বাক্যে গুণ-কর্ম্ম বিভাগেরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিতেছেন :—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব।
তদেকং সৎন ব্যভবৎ"

অর্থাৎ পূর্ব্বে কেবল এক ব্রহ্ম ( ব্রাহ্মণ ) ছিলেন। তখন এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ( বর্ণ ) ছিল না।

"তচ্ছ্রেয়া রূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্
তস্মাৎ ব্রাহ্মণং ক্ষত্রাৎ পরোনাস্তি।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয় মধস্তাদুপাস্তে
রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদযশো দধাতি
সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যৎ ব্রহ্ম।"

সেই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণগণ হইতে কতক বাহুবল সম্পন্ন লোককে ক্ষত্রিয় করা হইল। ক্ষত্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইল। কেননা ব্রাহ্মণগণ তাহাদের অধীন থাকিয়া উপাসনা করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয় গণই যশোভাগী হইতেন। ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থান।

"সনৈব ব্যভবৎ স বিশম সৃজতে,
সনৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণম সৃজত।"

ঐ ব্রাহ্মণগণ হইতে কতক বিশ বা বৈশ্য হইল এবং সেই ব্রাহ্মণগণের কতক লইয়া শূদ্রবর্ণ সৃষ্ট হইল।

মহাভারতোক্ত বর্ণবিভাগের ঐতিহাসিক তত্ত্বের সহিত উপনিষদের বর্ণবিভাগের ভাব মনে রাখিয়া পাঠকগণ এইবার ঋক্‌বেদের পুরুষ সূক্তের বিরাট পুরুষের ( বা বিরাট মানব-সমাজ-দেহের ) বিভক্ত অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করুণ; বর্ণবিভাগের জটিল ইতিহাস সরল হইয়া আসিবে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণে বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্য, শূদ্র, এমন কি অনার্য্যজাতিসমূহকে সহায় করিয়া ক্ষত্রিয়ের দর্প চূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পুরাণ সমূহের স্থানে স্থানে এইরূপ বিরোধের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বেও এইরূপ অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

---

১। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিবাদকে ইহার একটী পোষক প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ক্ষত্রিয় রাজা নহুষ ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ গণের অত্যাচার স্মরণ করিয়া তাঁহার রথ অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারা টানাইয়াছিলেন।

পুরাণে এইরূপ বহু গল্প ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব প্রমাণ করিবার জন্য রহিয়াছে।

(১) এই বিরোধের ফলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্থান সমান বলিয়া নির্ণিত হয়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এই বিরোধ-সন্ধি-যুগে মহর্ষি বাল্মীকির আবির্ভাব। মহাকবি বাল্মীকির সম-সাময়িক যুগের দেশ-কাল ও পাত্রের অবস্থাই রামায়ণীযুগের অবস্থা। আমরা এইবার রামায়ণে উল্লেখিত তৎ সাময়িক সমাজের বর্ণবিভাগের অবস্থা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ বিদ্বেষজনিত নূতন জগৎ সৃষ্টির ইতিহাস ও ব্রাহ্মণকুল তিলক পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন স্পৃহা চরিতার্থ জন্য পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করিবার উল্লেখ রামায়ণ ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিরাট আর্য্য-সমাজ-দেহের এই মস্তক ও বাহুর দ্বন্দ্ব—জ্ঞান ও শক্তির দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব আর্য্য সমাজে—বৈদিকযুগের অবসানে ও রামায়ণীযুগের পূর্ব্বে—উপনিষদের যুগে উপস্থিত হইয়াছিল।

রামায়ণের যুগে আসিয়া এই দ্বন্দ্ব সম্যভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ব্রহ্মণ্য শক্তিকে বরণ করিয়া লইয়াছেন; প্রচণ্ড-শক্তি ব্রাহ্মণ পরশুরাম ও রামচন্দ্রের ক্ষত্র-শক্তির নিকট সম্যকরূপে পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্যই বোধ হয় রামায়ণে উক্ত (সপ্তাশীতিতম সর্গে) হইয়াছে :—

"ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং যৎ পূর্ব্বমবরঞ্চ যৎ।
যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীর্য্য সমন্বতম্॥" ১৩
(উত্তর—৮৭ সর্গ)

(এই ত্রেতা যুগে) ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই তপোবল এবং বাহুবল—এই উভয় বলে—সমান।

রামায়ণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সমাজের এই চারিবর্ণকে এক পিতামাতার সন্তান বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। আরণ্যকাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গে গৃধ্ররাজ জটায়ু রামের নিকট প্রাণী সৃষ্টির ইতিহাস বিবৃত করিতে যাইয়া বলিতেছেন :—

"মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ॥"২৯

অর্থাৎ কশ্যপ ঋষির ঔরসে তৎ পত্নী মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১)

এক গৃহস্থের চারি পুত্র গুণ ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে সমাজে যেরূপ গৃহীত হইয়া থাকে, রামায়ণী সমাজেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ঠিক সেইরূপভাবে গৃহীত হইতেন। রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—চারি বর্ণকে সমানভাবে সৎকার করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ॥ ২০
সমানয়স্ব সংকৃত্য সর্ব্ব দেশেষু মানবান।
(আদি—এয়োদশ সর্গ)।

উচ্চ শ্রেণীর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের সম্মান যথেষ্ট ছিল। তাঁহাদের জন্য পৃথক যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল। অযোধ্যার বরযাত্রী ব্রাহ্মণেরা রামের বিবাহে যোগ-

(১) মহাভারতে লিখিত হইয়াছে—"পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ভৃগুময় ব্রহ্ম দণ্ড উন্নত করিয়া বৈশ্য ও শূদ্র সমভিব্যাহারে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক দিকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় অপর দিকে এক মাত্র ক্ষত্রিয় জাতি ছিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বারংবার পরাজিত হইতে লাগিলেন।" উদ্যোগপর্ব্ব।

ইহার পর পরশুরামের আবির্ভাব। তিনি ক্ষত্রিয়রক্তে পৃথিবী ধৌত করিয়া পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ করেন। এইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ চলিয়া আসিয়া উভয়ের শক্তি ধ্বংসের পর তাহার মীমাংসা হয়। রামায়ণে এই মীমাংসার আভাস আছে।

(১) দক্ষ প্রজাপতির দিতি, অদিতি, মনু প্রভৃতি আট কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। দিতির গর্ভে দৈত্য, অদিতির গর্ভে আদিত্য, মনুর গর্ভে মানব জাতির উৎপত্তি হয়। (রামায়ণ ১৪ সর্গ) এই উক্তি বেদ সম্মত। ঋক্ বেদের ১।৪৫।১ ঋকে মনুমাতার উল্লেখ আছে। সামবেদেও মনুমাতার কথা আছে। সামবেদের গানটী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। যথা—"পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবি॥"

বেদ-উপনিষৎ যাহা বলিবে, পুরাণ তাহার বিপরীত কথা বলিবে। তাই পুরাণ সমূহে বৈবস্বত মনুরপুত্র "মানব" এই মত প্রচারিত হইয়াছে। বেদ পাঠে এখন (কলিতে) সকলের অধিকার নাই, যাহাদের আছে, তাহাদের নিকটও তাহা দুর্ব্বোধ; সুতরাং—এখন তাহার কথা উদ্ভট—অভিনব।

রামায়ণেও মনুমাতার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ উদ্ধৃত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকেই আছে। এই মত অবৈজ্ঞানিক। পরবর্ত্তী কালে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

রানের জন্য অশ্বে ও শিবিকায় গমন করিয়াছিলেন। (১) অযোধ্যায় রাজপুরোহিতদিগের জন্য বিশিষ্ট রথের ব্যবস্থা ছিল। 'পুরোহিত বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণের যোগ্য সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।'

"ব্রাহ্মরথবরং যুক্তমাস্থায় সুব্রত ব্রতঃ।" অযোধ্যা—৫

গুণগত ও ব্যক্তিগত সম্মানের এইরূপ তারতম্য থাকিলেও পান আহার ও বিবাহ বন্ধনে বর্ণ বা জাতির গণ্ডি নির্দিষ্ট ছিল না।

দশরথের যজ্ঞে মণিকুণ্ডলধারী ভৃত্যেরা রন্ধন ও ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিয়াছিল।

'স্বলঙ্কৃতাশ্চ পুরুষা (২) ব্রাহ্মণান্ পর্য্যবেশয়ন।
উপাসতেচ তানন্যে সুমৃষ্ট মণিকুণ্ডলাঃ॥ ১৮

( আদি—১৪ )

অন্যত্র অগস্ত্য ঋষি অনার্য্যজাতীয় ইল্বল ও বাতাপির রন্ধন করা অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সীতা ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত রাবণকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া প্রথমতঃ আসন ও পাদ্য প্রদান করিয়া অতিথি জনোচিত সৎকার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, পরে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার স্বহস্তে রন্ধন করা সুস্কিত অন্ন ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। (৩)

ব্রাহ্মণবর্ণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রও ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতেন। এইরূপ অনুলোম ও প্রতিলোমজ সন্তানগণ পিতৃবর্ণে পরিচিত হইতেন। ব্রাহ্মণকন্যা শকুন্তার গর্ভে ও ক্ষত্রিয়রাজ দুষ্মন্তের ঔরসে যে পুত্র হইয়াছিল সেই ক্ষত্রিয়রাজ ভরত হইতেই রামায়ণের সূর্য্যবংশ বিখ্যাত। ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর গর্ভে ক্ষত্রিয়রাজ যযাতির ঔরসে মহাভারতোক্ত যদুবংশের উদ্ভব। *

রামায়ণী যুগে গৃহস্থ মাত্রেরই বেদপাঠে অধিকার ছিল। এবং তাহা সকলেরই একটী নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। রাম যে দিন বনে গমন করিয়াছিলেন, সে দিনের বর্ণনায় মহর্ষি লিখিয়াছেন :—

স্বম্ব নিলয়মাগম্য পুত্রদারৈঃ সমাবৃতাঃ।
অশ্রুণি মুমুচুঃ সর্ব্বে বাষ্পেণ পিহিতাননাঃ॥ ৩
নচাহৃষ্যন্ন চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্।
ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাপঠন্ গৃহমেধিনঃ॥ ৪

অর্থাৎ—রাম বনবাসে চলিয়া গেলে পর সকলেই স্ব স্ব গৃহে আসিয়া পত্নী ও পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া অশ্রুমোচন করতঃ তদ্বারা বদনমণ্ডল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে কাহার চিত্তে হর্ষোদয় হইল না। এমনকি বাণিজ্য ব্যবসায়ীরাও স্ব স্ব পণ্য সকল সজ্জিত করিলেন না। গৃহস্থেরা সেদিন বেদপাঠ পরিত্যাগ করিলেন। ( বঙ্গবাসী সং )

তখন স্ত্রীলোকেরাও বেদমন্ত্র উচ্চারণ (১) করিতে এবং স্বামীর সহিত যজ্ঞাদি সম্পাদন করিতে অধিকারিণী ছিলেন। (২)

এই সময় ব্রাহ্মণ সমাজেও অধিকারী ভেদ ছিল। দ্বিজেরা আত্মজকে মন্ত্র প্রদান করিতে পারিতেন না। ( সুন্দরাকাণ্ড ২৮—৯ শ্লোক ) দ্বিজ বলিতে কোন কোন

---

(১) পরবর্ত্তী যুগে যান আরোহন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

(২) পাচক ও পরিবেশক পুরুষেরা ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। রামায়ণের যুগে ব্রাহ্মণকে বৈশ্য বৃত্তি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। শূদ্রবৃত্তি বা সূপকার বৃত্তি তখনও ব্রাহ্মণের নিকট বোধ হয় ঘৃণ্য ছিল।

(৩) আরণ্য ৭৬। ৩৫। ৩৬ শ্লোক।

* মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ধৃষ্টদ্যুম্ন যে কোন জাতির মধ্যে দ্রৌপদীকে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া—সকল জাতিকেই লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

(১) মহর্ষি, বালীর স্ত্রী তারার মুখদিয়াও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করাইয়াছেন। বালী যুদ্ধ যাত্রা করিলে জয় শ্রী লাভের জন্য তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। ( কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—১৬— ।১২ শ্লোক ) বেদের অনেকগুলি সূক্তের ঋষি স্ত্রীলোক। লোমশা ১।১২৬।৭, ঘোষা ১০।৪০, অপালা ৮।৯১, শশ্বতী ৮।১ বিশ্ববারা ৫।২৮ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ঋক্ মন্ত্রের ঋষি। ঋষি বিশ্ববারা শূদ্র কন্যা ছিলেন। শূদ্র কবষ ও কতকগুলি ঋক্মন্ত্রের ঋষি। ৭।৩০।

(২) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৩৪। ৩৮ শ্লোক। বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে মনুসংহিতায় স্ত্রী ও শূদ্রকে বেদে অনধিকারী করা হইয়াছে।

স্থলে সংস্কার সম্পন্ন গৃহস্থকে বুঝাইত। * কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণকেও বুঝাইত।

অর্থের সম্মান ও প্রভুত্ব সকল কালেই স্বীকৃত হইতেছে। রামায়ণের যুগেও ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের ইঙ্গিতে চলিতে দেখা যায়; এইরূপ ব্রাহ্মণ সাধারণের প্রণম্য নহেন। যাঁহারা নিস্পৃহ তেজস্বী ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের সম্মান যথেষ্ট ছিল; এইরূপ সিদ্ধ ব্রাহ্মণেরাই রাজার ও জনসাধারণের প্রণম্য ছিলেন। এই সময় কাহারা প্রণম্য ছিলেন, ভরতের নিকট রামের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নে তাহা অবগত হওয়া যায়। রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"গুরু, বয়োবৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে তুমি ত নমস্কার কর?"

(অযোধ্যা—১০০—৬১ শ্লোক)

এই সময় নিমন্ত্রণের উপর বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের জীবিকা নির্ভর করিত। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা লালসা পরায়ণ হইয়া অর্থ প্রত্যাশায় একে অন্যে বাদানুবাদে বিব্রত হইতেন।

—তদা বিপ্রাঃ হেতুবাদন্ বহূনপি।
প্রাহুঃ সুবাগ্মিনোধীরা পরস্পর জিগীষয়া॥ ১৯

(আদি—১৪ সর্গ।)

বহু ব্রাহ্মণের ভিক্ষাও উপজীবিকা ছিল। কেহ কেহ কৃষি কর্ম্ম বা বৈশ্য বৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছিলেন।

'তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নামবৈ দ্বিজঃ॥
ক্ষত বৃত্তির্বণে নিত্যং ফাল কুদ্দাল লাঙ্গলী। অযোধ্যা ৩২

এই যুগে ব্রাহ্মণ রক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। ব্রহ্মস্বহরণকারীর নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা রামায়ণে ব্যবস্থিত আছে। (অযো—৭২) এইরূপে ব্রাহ্মণ রক্ষার চেষ্টা থাকা স্বত্বেও এই সময় নৈতিক জীবন এবং ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সমাজে অল্পে অল্পে ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করিতেছিল। রামায়ণের স্থানে স্থানে "নাস্তিক ব্রাহ্মণ" ও "সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের" উল্লেখ আছে। দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন:—

"অনার্য্য ইতি মামার্য্যাঃ পুত্র বিক্রায়কং ধ্রুবম্।
বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা॥ ৭৮

(অযো—১২)

রামায়ণে ব্রাহ্মণের দাস্য বৃত্তির কোনও আভাস পাওয়া যায় না। মহাভারতের যুগে আসিয়া দ্রোণাচার্য্যের মুখে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে সমাজের অধঃপতন ক্রমে সূচিত হইয়াছিল।

বৈশ্য ও শূদ্র সম্বন্ধে রামায়ণে পৃথকভাবে বিশেষ কিছু আলোচিত হয় নাই। সাধারণ ভৃত্যের কথা রামায়ণে আছে; উহারাই বোধ হয় শূদ্র।

রামায়ণে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। বিবাহের যৌতুক সামগ্রীর তালিকাতেও দাস দাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কৈকেয়ীর ধাত্রী মন্থরা তাহার একটী। সীতার বিবাহেও যৌতুক স্বরূপ বহু দাস দাসী প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ শ্রেণীর লোক শূদ্র জাতীয়, কি অনার্য্য জাতীয়, তাহার উল্লেখ রামায়ণে নাই। রামায়ণী সমাজে শূদ্রবর্ণ খুব অবহেলিত নহে, এইজন্য যৌতুক-দত্ত-দাস দাসীগুলিকে অনেকে শূদ্র বলিয়া অনুমান করেন না।

কঞ্চুকী (ক্লিব) ভৃত্যও বিভিন্ন জাতি এবং বর্ণ হইতে সংগৃহীত হইত বলিয়া মনে হয়।

দশরথের মন্ত্রীগণের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের লোক ছিল, রামায়ণে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। অযোধ্যার মন্ত্রণাসভায় ষোলজন মন্ত্রী ছিলেন; তাহার মধ্যে আটজন ব্রাহ্মণ ও আটজন ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মন্ত্রী ছিলেন।

সুমন্ত্র, ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল এই আট জন ব্রাহ্মণেতর মন্ত্রীর মধ্যে কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য এবং কে শূদ্র ছিলেন, অথবা শূদ্র কেহ ছিলেন কি না, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণে নাই। সে যুগে মন্ত্রী নির্ব্বাচনের সময় জাতি বা বর্ণ সম্বন্ধে কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে হইত কি না, তাহারও উল্লেখ রামায়ণে

---

* শূদ্রের সংস্কারে বা তপস্যায় অধিকার ছিলনা, দেখাইবার জন্য উত্তরকাণ্ডে শূদ্রক তপস্বীকে রামের হস্তে দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। উত্তর কাণ্ড লিখিত হইবার সময় সমাজের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। রামায়ণে অন্ধ মুনির তপস্যার বিবরণ আছে—এই তপস্বীর পুত্রকে দশরথ শরাহত করিয়াছিলেন। এই মুনি নিজ পরিচয় দিতে যাইয়া দশরথকে বলিতেছেন:—"শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ"। আমি শূদ্রা মাতার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। (অযোধ্যা ৬৩—৫১)।

নাই। পরবর্ত্তী যুগের মহাভারতে তাহার বিধান আছে। শান্তিপর্ব্বে ( ৮৫ অধ্যায়ে ) পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে মন্ত্রীসভা গঠন সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"একণে তুমি যাদৃশ লোকদিগকে অমাত্য পদবী প্রদান করিবে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। চারিজন সুপবিত্র বেদ বিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ, আট জন অস্ত্রধারী বল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন একবিংশতি বৈশ্য, বিনীত স্বভাব অতি পবিত্র তিনজন শূদ্র এবং একজন শুশ্রূষাদি অষ্টগুণ সম্পন্ন পুরাণবেত্তা সূতকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য।"

মহাভারতে বৈশ্য ও শূদ্রের মন্ত্রণা সভায় অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণের সময়ও বৈশ্য-শূদ্রের স্থান অযোধ্যার মন্ত্রী সভায় ছিল।

মহাভারতের মহাযুদ্ধে ক্ষত্র-শক্তি নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে পুনরায় ব্রহ্মণ্য প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সময় ধন গৌরবে বৈশ্যের স্থান সমাজের শীর্ষে স্থাপিত। শূদ্রের অবস্থা সারমেয় সদৃশ ঘৃণিত। এই সময় শূদ্রের আত্মদেহের উপর পর্য্যন্ত তাহার নিজের অধিকার ছিল না; সে যে ধন উপার্জ্জন করিত, তাহাতেও তাহার প্রভুর অধিকার ছিল!

অতঃপর বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাবে পুনরায় জাতিভেদের প্রাচীন শৃঙ্খল উন্মূলিত হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়—শূদ্র রাজা হইয়া ব্রাহ্মণের উপর আসন প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস এ প্রসঙ্গে আপততঃ অপ্রাসঙ্গিক।

রামায়ণে বর্ণ-শঙ্কর জাতির উল্লেখ নাই। আর্য্য সমাজে সূত, মাগধ, নিষাদ, কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল প্রভৃতি কতিপয় জাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির বিবরণ নাই।*

* বর্ণশঙ্কর বা মিশ্রবর্ণ বলিয়া ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ পরবর্ত্তীকালে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সূত | ক্ষত্রিয় | পিতার ঔরসে | ব্রাহ্মণ | কন্যার | গর্ভে | উৎপন্ন। |
| মাগধ | বৈশ্য | " " | ক্ষত্রিয় | " | " | " |
| মৎসজীবী (নিষাদ) | শূদ্র | " | ক্ষত্রিয় | " | " | " |
| ধীবর | নিষাদ | " " " | আয়োগবী | " | " | " |
| চণ্ডাল | শূদ্র | " " " | ব্রাহ্মণ | " | " | " |

( মানবতত্ত্ব—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। )

# জার্ম্মান পানা।

## Water Hyacinth. *

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের বিল এবং খাল গুলিতে জলীয় আগাছা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। এগুলি সাধারণতঃ দুই প্রকার :—

১। পানা গাছ। ইহাদের প্রাদুর্ভাব বাংলার সর্ব্বত্রই। কোন্ শতাব্দীতে যে ইহাদের জন্ম, বলিবার উপায় নাই।

২। জার্ম্মান পানা। এগুলিকে প্রথম কলিকাতার আশে পাশে দেখা যাইত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঘর, বাগান প্রভৃতি সাজাইবার জন্য মাত্র ৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহা কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ আনা হয়। য়ুরোপের যুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়াই হয় ত ইহাদের "জার্ম্মান" পানা নামকরণ হইয়াছে।

পানা গাছ এবং জার্ম্মান পানা দুইই জলের উপর ভাসিয়া থাকে। কিন্তু পানা গাছগুলি দেখিতে ছোট আর জলের উপরে যে অংশ ভাসিয়া থাকে, তাহা গোল এবং চেপ্টা। জার্ম্মান পানার আকার অন্যরূপ। পাতাগুলি বড়, জলের উপর ৬ ইঞ্চি হইতে ৩ফিট্ লম্বা হইতে দেখা যায়। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ যাইতে, রেললাইনের দুইধারে ইহাদের প্রাচুর্য্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মেঘনায় এবং পদ্মায় ও স্রোতের সহিত ইহা ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। জলের উপরে ভাসমান পাতাগুলিই পালের কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের দশ বারটি করিয়া ছোট ছোট ফুল ও হইয়া থাকে;—দেখিতে মন্দ নয়।

জার্ম্মান পানার আধিপত্য ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা অঞ্চলে ত আছেই। তা ছাড়া, রাজসাহী, রংপুর, গাইবান্ধা, নাটোর ইত্যাদি স্থানে ইহাদের বংশধরেরা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের কয়েকটা খালে জার্ম্মান পানার উপদ্রব এতটা বাড়িয়াছে যে তাহাতে নৌকার চলাচল একপ্রকার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে।

* পুষা এগ্রিকালচারেল্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট (Bulletin No, 71).

এরূপ ব্যাপার শুধু নারায়ণগঞ্জে নহে, ব্রহ্ম দেশে, ইন্দুচীনে, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং সুদূর ফ্লোরিডাতে ও ঘটিয়াছে। এই আগাছাগুলিকে কোনো আয়-কর ব্যবসা বাণিজ্যে খাটান যায় কিনা, এই নিয়া নানা স্থানে অনেক গবেষণা চলিতেছে। কাম্বোডিয়ার Prof Perrot এগুলি দ্বারা পাটের ছালা (Gunny bags) তৈরী করিতে চান। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ হইতে পাটের ছালার আমদানি বন্ধ করা। কিন্তু এপর্য্যন্ত জার্ম্মান পানাকে কেহ কোনো লাভজনক ব্যবসায়ের অঙ্গীভূত করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ কোনো কাজে হাত দেওয়া ও সম্ভবপর নয়। কাজেই এ দেশে এগুলিকে কৃষিকার্য্যে খাটান যায় কিনা এই নিয়া চেষ্টা হইতেছে। রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাজা জার্ম্মান পানায়—

| | | |
|---|---|---|
| জলের ভাগ শতকরা | | ৯৫.৫০ |
| নাইট্রোজেন | ,, | ০.০৪ |
| ছাই | ,, | ১.০০ |
| পটাশ | ,, | ০.২০ |
| ফস্ফোরিক এসিড্ | ,, | ০.০৬ আছে। |

শুষ্ক জার্ম্মান পানায় –

| | | |
|---|---|---|
| নাইট্রোজেন শতকরা | | ১.৫ |
| ছাই | ,, | ২৪.২ আছে। |

ছাই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—তাহাতে

| | | |
|---|---|---|
| পটাশ শতকরা | ,, | ২৮.৭ |
| সোডা | ,, | ১.৮ |
| চূণ | ,, | ১২.৮ |
| ক্লোরিন | ,, | ২১.০ |
| ফস্ফোরিক এসিড্ | ,, | ৭.০ আছে॥ |

পানাগাছ, জার্ম্মানপানা ও কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন সারে কিকি উপাদান আছে নিম্নে লিখিত হইলঃ—

| | | নাইট্রোজেন। | ফস্ফোরিক এসিড্। | পটাশ। |
|---|---|---|---|---|
| ১। | পানা গাছ—ছোট - | ০.৮৫ | ০.৩২ | ০.৯৬ |
| ২। | ,, -- বড়-- | ০.৬০ | ০.২০ | ২.১৭ |
| ৩। | জার্ম্মানপানা-মাঝারি- | ০.৪৫ | ০:৩২ | ২.৫২ |
| ৪। | ,, ,, বড়-- | ০.৬০ | ০.২৩ | ২.৬১ |
| ৫। | গোময় (Leather)- | ০.৬১ | ০.৬০ | —— |
| ৬। | ,, (Voelcker)- | ০.৫৬ | ০.২০ | ০.৫০ |
| ৭। | ,, ,, -- | ০.৪৫ | ০.২৩ | ০.২৫ |

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য সার অপেক্ষা পানা গাছ ও জার্ম্মান পানায় পটাশের অংশ অনেক বেশী। কোনো কোনো জার্ম্মান পানার ছাইয়ে শতকরা ৩৫ ভাগ পটাশ ও পাওয়া গিয়াছে। পঁচা জার্ম্মান পানায় অন্য সার অপেক্ষা ৫গুণ বেশী পটাশ আছে, সুতরাং কৃষিকার্য্যে জার্ম্মান পানার উপযোগীতা সহজেই উপলব্ধি হইবে। কারণ, পটাশের অতি উত্তম সার হয়। আর, নাইট্রোজেন এবং ফস্ফোরিক এসিডের ভাগ ও অন্য সারের তুলনায় কম নহে। ইহা ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৫০০ মণ তাজা জার্ম্মান পানা পঁচাইয়া যে পরিমাণ পটাশ পাওয়া গিয়াছে (৬.৬৫ পাউণ্ড) ৩৫৭ মণ জার্ম্মান পানা ছাই করিয়া তাহা হইতে ৫ গুণ বেশী পাওয়া গিয়াছে (৩০.৫ পাউণ্ড)।

পটাশের পাট উৎপন্ন করিবার শক্তি যথেষ্ট। যে জমিতে হাড় চূর্ণ, খৈল ইত্যাদি সার দিয়া ২৭ মণ (প্রতি একর এ) পাওয়া গিয়াছিল, সেই জমিতেই, এই সারের সহিত কার্ব্বনেট অব্ পটাশ মিশাইয়া প্রতি একর এ ৩৪ মণ পাট পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পটাশের গুণে ৭ মণ পাট বাড়তি হইয়াছে। কোনো পাটের ক্ষেতে পচা জার্ম্মান পানা অথবা জার্ম্মান পানার ছাই দিলে যদি বরাবরের চেয়ে বেশী পাট পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পানার পটাশই জমির উর্ব্বরতা শক্তি বাড়াইয়াছে। ইহা নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

জার্ম্মান পানার জন্য আলাদা ক্ষেত করিতে হয় না। ইহা খালে বিলে প্রচুর পরিমাণে হয়। কাজেই ইহার ব্যবসা করিতে নগদ টাকার দরকারে হয় না;—সুতরাং নির্ভাবনায় দুপয়সা পাওয়া যাইতে পারে।

যাহারা এই ব্যবসায়ে হাত দিতে চান, তাঁহারা কয়েকটি কথ মনে রাখিবেন ঃ—

১। কোনো দুরস্থানে তাজা পানা চালান দেওয়া যুক্তি যুক্ত নহে, কারণ এইরূপ পানায় শতকরা ৯৫

ভাগই জল থাকে। কাজেই ওজন অত্যাধিক বেশী হয় বলিয়া ষ্টীমার ও রেল কোম্পানিকে ভাড়া বেশী দিতে হয়।

২। পঁচা পানায় ৫০ হইতে ৬০ ভাগ জল থাকে, যেমন গোময়ে আছে। কিন্তু বেশকম এই যে, ইহাতে পটাশের ভাগ অনেক বেশী। কাজেই দূরে চালান না দিয়া নিজের ক্ষেতে ব্যবহার করাই উচিত।

৩। পঁচনের জন্য তাজা পানা উঠাইয়া তৎক্ষণাৎ গাদা করিয়া রাখিলে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কারণ পটাশ ইত্যাদি সারাংশ তরল অবস্থায় বাহির হইয়া যায়। এই জন্য পানাগুলি গাদা দিয়া রাখিবার পূর্ব্বে কয়েক দিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। অথবা শুষ্ক পানা তাজা পানার পরতে পরতে রাখিয়া দিতে হয়। মাটি অথবা গাছগাছড়া দিলেও কাজ চলে।

৪। শুষ্ক পানা ওজনে তাজা পানার ১/১০ ভাগ। সুতরাং শুষ্ক পানা, তাজা অথবা পঁচা পানা অপেক্ষা ব্যবসায়ের পক্ষে সুবিধাজনক, মালের ভাড়া বেশী পড়িবে না। ইহা পানার ছাই হইতে ওজনে ৫গুণ ভারী। এবং ইহাতে শতকরা ২০.২৫ ভাগ জল ও ৮ ভাগ পটাশ থাকে।

৫। ব্যবসার জন্য চালান দিতে হইলে পানা ছাই করিয়া দেওয়াই সব চেয়ে লাভ জনক। ইহা ওজনে তাজা পানার ১/৫০ ভাগ মাত্র। কিন্তু শুকনা পানা ৫গুণ ভারী।

৬। বর্ষাকালে জার্ম্মান পানার ছাই করিতে হয় না। অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত প্রশস্ত সময়।

৭। কলিকাতার Shaw Wallace Co. জার্ম্মান ছাই ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিলে প্রতি টন ( ২৮ মণ ) ছাইয়ের ৮৫৲— ১২০৲ দাম হয়।

শ্রীঅনুবাদক।

# ঔপন্যাসিকের প্রিয় উপন্যাস।

"আপনি কোন্ উপন্যাস-লেখকের ভক্তপাঠক, এবং কোন্ উপন্যাস আপনার মনের মত?"

কোনো ইংরেজি মাসিকের সম্পাদক কয়েকজন ঔপন্যাসিককে উক্ত প্রশ্ন সমাধানের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি যে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।

S. R, Crockett—( ১৮৬০—১৯১৪ )—ইনি জাতিতে স্কচ্ এবং "The Lilac Sunbonnet," The Standard Bearer," "Cinderella" প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া নাম করেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি Scott এর ভক্ত, আর "Guy Mannering" ( Scott লিখিত ) আমার প্রিয় উপন্যাস।"

Ian Mac Laren—ইনিও স্কচ্; "Beside the Bonnie Briar Bush" ইহার চমৎকার উপন্যাস—

"Thackeray এবং Scott দুইই আমার প্রিয়। 'Henry Esmond' ( Thackery's) ও "The Heart of Midlothian' ( Scott লিখিত ) এর মধ্যে কোন্ খানা আমার বেশী প্রিয়, ঠিক বলিতে পারি না। Scott এর চে'য় Thackeryর চিত্র বিস্তৃত, বিচিত্র এবং জমকালো। —লণ্ডনের রাজরাজড়ার কথায় পূর্ণ। Scott আঁকিয়াছেন ছোট সহর এডিনবার্গ—তাহার সরু গলি, অস্বাস্থ্যকর, অন্ধকারময় কারাগার, অদৃষ্টবাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিন মজুর! হয়ত এইখানেই Thackeryর চেয়ে Scott এর কলাকুশলতা বেশী ফুটিয়াছে। 'The Heart of Madlothian' এ Jeanie চরিত্রটি Scott এর অপূর্ব্ব সৃষ্টি।"

Justin Mc Carthy—( ১৮৩০—১৯১২ ) 'Fool of April,' 'Fair Irish Maid,' 'Calling the Time' প্রভৃতি-উপন্যাস রচয়িতা—

"আমি বলিতে বাধ্য যে Scottই আমার প্রিয়। কারণ, অন্যান্য লেখকের চেয়ে তাঁহার মধ্যেই কল্পনা এবং বাস্তবতা, চরিত্র-চিত্রন এবং বর্ণনা, ট্রেজিডি এবং কমেডির বিচিত্র সমাবেশ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাই।

কিন্তু এরূপ কথা আমি বলি না যে Fielding, Dickens, Jane Asten, Miss Bronte এবং Dumasকে ( ফরাসী ঔপন্যাসিক ) নীচে স্থান দিতেছি। আর কোন্ উপন্যাসখানা যে আমার সবচেয়ে প্রিয়, বলিতে পারি না। আমি অনেকগুলিই পড়িয়া থাকি।"

Gordon Stables—ইনি নৌবাহিনীর ডাক্তার ছিলেন, এবং প্রায় একশত খানা উপন্যাস লিখিয়াছেন; সবগুলিই প্রায় সমুদ্র, জাহাজ, নাবিক, ঝড়, গ্রেসিয়ার ইত্যাদি কথায় পূর্ণ—

"আমি নিজে একজন নাবিক; Clark Russell ও তাই। তাঁহার গল্পগুলিতে সাগরের ডাক, তরঙ্গের গর্জ্জন, পাখীর করুণ গীত, সবই প্রতিচ্ছত্রে বন্দী হইয়া আছে। তাঁহার উপন্যাস পাইলেই আমি সন্তুষ্ট। এই অসীম অকূল, ভীষণ সাগরের একজন মাত্র কবি আছেন। তিনিই Clark Russell।"

Jerome K. Jerome—ইনি 'Idler' এবং 'To-day'র সম্পাদক—নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও জার্নালিষ্ট। ইঁহার লিখিত 'Three men in a Boot' চমৎকার হাস্যরসাত্মক গল্প—

"আমি বিশ্বগ্রাসী! এক আধখানা উপন্যাসে আমার ক্ষুৎপিপাসা মিটে না, জীবিত লেখকগণের নাম করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে—রাম সুখী হইলে, শ্যাম বেজার হইবেন! আমার প্রিয় ঔপন্যাসিক Charlotte এবং Emily Bronte, Thackeray, Dickens, George Eliot. Scott, Dumas এবং Washingon Irving ( ইনি আমেরিকান )। কিন্তু ইহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা নহেন—আরও আছেন! আমার মানসিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, 'David Copperfield' (Dickens লিখিত) আমাকে সব সময়ই আনন্দ দেয়।

Guy Boothby—ইনি অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে—Dr. Nikola,' 'The Beautiful white Devil' 'My Indian Queen,' 'A Bid for Fortune ইত্যাদি সুপরিচিত—

"কাহার কথা ছাড়িয়া কাহার কথা বলিব? 'Vanity Fair,' 'The Newcomes'(Thakheray's)Adaam Bede'(George Eliot) 'Jane Eyre' (Miss Bronte,) 'Raven shoe', (Henry Kingsley) 'Westward Ho!' (Charles Kingsley), Ivanhoe," (Scott), 'Nicholas Nickleby' (Dickens)—আমার কাছে সবই সমান! তারপর Stevensonএর ভজন দুইগল্প, Kipling ত আছেই!

আবার Barrie, Hope, Weyman আর—কিন্তু লিষ্টি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে! কাজেই শুধু এইমাত্র বলা যায় যে কেবল একখানা উপন্যাসকে সর্ব্বোচ্চস্থান দেওয়া অসম্ভব!"

W. W. Jacobs:—হাস্য রসাত্মক গল্প লিখিতে ইনি চমৎকার ওস্তাদ। ইংরেজি মাসিকে প্রকাশিত ইঁহার গল্পগুলি অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন; বিশদ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন—

"Dickens আমার প্রিয়। আর তাঁহার সবগুলি উপন্যাসই আমি এত ভালবাসি যে কোন্‌খানা আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে, বলা দুরূহ!"

Silas K. Hocking—ইনি খুব লোকপ্রিয় ঔপন্যাসিক, এবং ইঁহার উপন্যাসের কাট্‌তি অসম্ভব রকম বেশী—

"আমি Thackerayর ভক্ত; এবং "The Newcomes" আমার প্রিয় উপন্যাস। ইহার কারণ হয় ত এই যে Barrie এবং Kiplingএর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই Thackeray আমার মন কাড়িয়া নিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এই কথা সত্য যে বর্ত্তমান সময়ের কোনও উপন্যাস লেখকেই Thackerayর মত আমাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। আজকাল কয়েকজন যুবক লেখক ভাল উপন্যাস লিখিতেছেন, আর আমার মনে হয় মোটের উপর লেখকের চেয়ে লেখিকারাই এই দিকে বেশী অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসের বিপুল এবং বিচিত্র ক্ষেত্রে Colonel Newcomes ( Thackerayর সৃষ্ট ) এর মত একটী সকরুণ চিত্র আর চোখে পড়ে না।"

Joseph Hocking :—'A Flame of Fire,' 'Great Love,' 'Esau' ইত্যাদি উপন্যাস প্রণেতা—

"মোটের উপর Dickens আমি পছন্দ করি বেশী। কোনও কোনও সময় অবশ্য Thackerayকেই অধিকতর ভাল লাগে; কারণ, ইঁহার কলা ও লিপি-কুশলতা যথেষ্ট। তবু Dickensকেই আমি ভালবাসি; কারণ, ইনি সর্ব্বদাই আনন্দ উৎফুল্ল এবং সুখবাদী। বাস্তবিক কোন্ উপন্যাসখানা আমার মনের মত বলা দুঃসাধ্য। —কখনও 'Lorna Doone' ( Blackmore's) কখনও 'Vanity Fair' (Thackeray's)। উপন্যাস পাঠ বিবাহ করার মত নহে। শুধু একজনকেই যে ভালবাসিতে হইবে, এরূপ কোনও কথা নাই।"

Max Pamberton :—Cassels' Magazineএর অন্যতম সম্পাদক. মাসিকে গল্প লিখিয়া থাকেন। 'The Iron Pirate.' 'The Gold Wolf' 'Beatrice of Venice' ইত্যাদি অনেক উপন্যাস ও গল্প লিখিয়াছেন—

"Victor Hugo ( ফরাসী লেখক ) আমার প্রিয়। Hugoর অভাবে Dickens। কিন্তু আমি ফরাসী উপন্যাসই বেশী পছন্দ করিয়া থাকি।"

Richard Whiteing :—ইঁহার লিখিত অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'No 5 John Street' একখানি ভাল উপন্যাস। ইনি 'Manchester Guardian' এর সম্পাদক এবং 'Daily News,' Morning Post,' প্রভৃতির সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়া থাকেন এবং Civil serviceএর পেন্সন ভোগী—

"আমার আদরের সামগ্রী ফরাসী উপন্যাস। আমার সব চেয়ে ভাল লাগে Balzac এবং Balzacএর 'Pere Goriot'!"

Israel Zangwill :—ইনি জাতিতে ইহুদি, নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক। সাহিত্য ক্ষেত্রে বেশ নাম করিয়াছেন। কতকদিনের জন্য 'Ariel' নামক সাপ্তাহিক বাহির করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'The children of the Ghetto', 'The Master', 'Ghetto Comedices.', 'The Dreamers of the Ghetto' প্রভৃতি অত্যন্ত আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ইঁহার প্রদত্ত উত্তরটী কিছু অনন্যসাধারণ—

"আমার কোনও প্রিয় ঔপন্যাসিকও নাই, কোনও প্রিয় উপন্যাসও নাই!"

আমেরিকার প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক Mark Twainএর উত্তরে হাস্যরস চমৎকার ফুটিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"প্রশ্ন—'আমার প্রিয় উপন্যাস'?"

"উত্তর - Hickleberry Finn!"

বলা বাহুল্য—Hickleberry Finn এর রচয়িতা Mark Twain স্বয়ং! ইঁহার যশ জগৎ জোড়া, এমন হাস্যরসিক সুলেখক বড় বেশী জন্মায় নাই। ইঁহার আসল নাম কিন্তু Samucl Clemens. 'A Tramp Abroad,' 'Tom Sawyer,' 'Pudd'nhead Welson' প্রভৃতি পুস্তক পড়িয়া কেহ হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। ইনি ১৯০৭ সালে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন এবং অক্সফোর্ড হইতে D. C. L. উপাধি লাভ করেন।

Sir Walter Besant—(১৮৩৬--১৯০১) ইনি প্রথম James Rice এর সহিত একত্রে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বহু উপন্যাসের মধ্যে 'All sorts and conditions of men,' 'Dorothy Foster' 'Armorelle of Lyonesse' সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—

"সর্ব্বসাধারণের প্রিয় অনেক উপন্যাস লেখককেই আমি ভালবাসি। আমার মনে হয় Fieldingএর 'Tom Jones' ইংরেজি উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ!"

Bret Harte—(১৮৩৯-১৯০২) আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক। ইনি কালিফর্ণিয়ার খনি সম্বন্ধে যে সব গল্প লিখিয়াছেন তাহা সকল দেশেই সমাদর লাভ করিয়াছে। Harte জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর ইংলণ্ডে কাটাইয়া ছিলেন—

"আমি অনেক উপন্যাস লেখককেই পছন্দ করিয়া থাকি। কিন্তু Dumasর 'Monte Cristo' আমার অতি আদরের জিনিষ। ইহা উপন্যাস সাহিত্যে অপূর্ব্ব!"

Anthony Hope—'The Prisoner of Zenda', 'The Dolly Dialogues,' 'Half a Hero', 'Phroso', 'Rupert of Heatzen' প্রভৃতি অনেক উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন—

"আমি অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে 'Tristram Shandy' (Lawrence Sterne, অষ্টাদশ শতাব্দী, Fielding এর সমসাময়িক) বেশী পড়িয়া থাকি।"

Robert Barr—'The Countless Tekla', 'The Palace of Logs,' 'The Mutable Many' প্রভৃতির লেখক—

"আমার প্রিয় উপন্যাস গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। যথা—Octave Feuillet এর (ফরাসী লেখক) 'The Romance of a Poor Young man', Maupassantর (ফরাসী) গল্প, Blackmore এর 'Lorna Doone', W. L. Alden, W. W. Jacobs, H. G. Wells, এবং Gilbert Parkerএর বাছা বাছা উপন্যাস; Scott এর 'Quentin Durward' এবং Henry Jamesএর (আমেরিকার লেখক) রোমান্স। আমার বিশ্বাস Boothe Tarkington এর 'A Gentleman from Indiana'র মত রাজনৈতিক উপন্যাস একখানাও লিখিত হয় নাই। Kiplingএর গল্পও আমি পছন্দ করি। কিন্তু শুধু একজনের লেখাই আমি পছন্দ করি না। তিনি রবার্ট বার্ নিজে!"

Helen Mathews—ইনি লেখিকা। 'Man of To-day,' 'Cherry Ripe', 'Gay Lawless' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া নাম করিয়াছেন—

"Jane Eyre' (Charlotte Bronte) আমার প্রিয় উপন্যাস। আর ঔপন্যাসিকের মধ্যে "Thomas Hardy."

Sarah Grand ইহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে—'Heavenly Twins' ও 'Babs the Impossible' ভাল উপন্যাস—

"বর্ত্তমান সময়ে আমার কোনো প্রিয় উপন্যাস অথবা ঔপন্যাসিক নাই। আমি সবচেয়ে ভালবাসি দুইজন লেখিকাকে—George Sand (ফরাসী লেখিকা) এবং George Eliot. George Sandএর 'Consuello' আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লাগে। ইহাদের উপন্যাসে অনেক ভাবিবার কথা আছে।"

Ellen Thorneycroft—'Fuel of Fire' 'A Double Thread', 'The Wisdom of Folly' প্রভৃতি অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন—

"আমি পছন্দ করি Jane Austen, Charlotte Bronte, Mrs. Gaskell আর Kingsley. আমার প্রিয় উপন্যাস—'Emma' 'Pride and Prejudice' (Jane Austen), 'Shirley' (Miss Bronte), 'Hereward' 'Hypatia' (Kingsley) আর 'Sylvia's Lovers' (Mrs. Gaskell)."

Marie Corelli—'The Sorrows of Satan' 'Thelma', 'God's Good Man' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময় ইহার উপন্যাসের কাটতি খুব বেশী—

"আমার পক্ষে কোনো একজন লেখককে অথবা একখানা মাত্র উপন্যাসকে প্রাধান্য দেওয়া অসম্ভব। কারণ আমি বহু উপন্যাসই পড়িয়া থাকি।"

Miss Beatrice Harraden——'Katherine Frensham' ইহার একখানা ভাল উপন্যাস—

"Thakeray এবং Scott আমার প্রিয়। আর তাঁহাদের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'Pendennis' (Thackeray) ও 'The Heart of Midlothian' (Scott) আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।"

আমাদের মন্তব্য :—

১। বর্ত্তমান কালের ঔপন্যাসিকগণের নিকট হইতে গুণানুসারে Scott, Thackeray এবং Dickens প্রত্যেকে ৪ চারি ভোট করিয়া পাইয়াছেন।

২। Jane Austen, Charlotte Bronte, George Eliot, Mrs. Gaskell প্রত্যেকে ২ ভোট পাইয়াছেন।

৩। 'David Copperfield' (Dickens) ৩ ভোট পাইয়া সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে। 'Vanity Fair' 'The Newcomes' (Thackeray) 'Jane Eyre' (Charlotte Bronte), 'The Heart of Midlothian' (Scott) 'Pride and Prejudice' (Jane Austen), Nicholas Nickleby (Dickens), 'Lorna Doone' (Blackmare)—প্রত্যেকে ২ ভোট পাইয়াছে।

৪। উত্তরদাতাগণ যে সকল প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখকের কোন নামোল্লেখই করেন নাই, তাঁহাদের নাম দেওয়া গেল—

ইংলণ্ড—Richardson, Smolette, Charles Reade, Anthony Troloppe, George Meredith, Lytton, Mrs. Oliphant.

আমেরিকা—Hawthorne.

ফ্রান্স—Stendhal, Flaubert, Daudet, Cherbuliez, Anatole France, Piere Loti, Zola.

জার্ম্মেনি—Paul Heyse, Spiehagen, Auerbach, Freytag, Marlitt.

ইটালি—Farina, Sienkiewicz, Manzoni, Bersezio.

হাঙ্গারি—Jokai.

স্পেইন—Caballero.

নরওয়ে—Bjornson,

হোলেণ্ড—Buskin Huet, Toussaint.

পোলেণ্ড—Krazewski.

সুইজারলেণ্ড—Keller.

রাশিয়া—Turgenieff, Tolstoy, Dostoivesky.

অষ্ট্রিয়া—Stifter.

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ।

---

## "আড়ং"।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ভাদ্রমাসের প্রথম দিন হইতে নানাস্থানে দৌড়ের নৌকা ও নানাপ্রকার আমোদপূর্ণ নৌকা একত্র হইয়া দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে "বাইচ" খেলা বলিয়া যে একটী জল-ক্রীড়া প্রচলিত আছে, আড়ংএ নৌকাদৌড় তাহারই একটী বিরাট সংস্করণ। "বাইচ" খেলায় সাধারণতঃ দুই চারি খানা নৌকায় একত্রে দৌড় হইয়া থাকে, কিন্তু নৌকাদৌড়ে শতাধিক দৌড়ের নৌকা যুগপৎ প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে পরাস্ত করিয়া জয়লাভ জন্ত তীরবেগে ধাবিত হয়।

শ্রাবণ মাসের মধ্য ভাগ হইতে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চলে কৃষিজীবীর ও মধ্যবিত্ত লোকের বৎসরের কার্য্য একরূপ শেষ হইয়া যায়। এই সময় তাহারা গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য কবি নারায়ণ দেবের সুললিত, মনোমোহন, করুণ রসাত্মক বেহুলার দুঃখের কাহিনী খোল করতাল যোগে গান করিয়া ও নৌকা দৌড়ের নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে।

দৌড়ের নৌকাগুলি সাধারণতঃ চল্লিশ হইতে ষাট হাত লম্বা, ও সোয়া দুই হইতে আড়াই হাত প্রস্থের হইয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে প্রত্যেক এক হাত অন্তরে সমান্তরাল ভাবে "গুড়া" নামে কাষ্ঠ দণ্ড বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক গুড়ায় দুইজন বাহক বসিতে পারে। নৌকার অগ্রভাগে একজন লোক দাঁড়াইয়া "সারি" গান করিতে পারে এরূপ একখণ্ড বিস্তৃত কাষ্ঠ খণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে। দৌড়ের নৌকাগুলিদ্বারা অন্য বিশেষ কোন কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। কেবল দৌড়াইবার জন্য এইগুলি ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অনন্ত বিস্তৃত হাওরগুলি বর্ষার সময় নব-সলিল-পূর্ণ হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় অনন্ত জলরাশি মৃদু বায়ু হিল্লোলে নৃত্য করিতে থাকে। এইরূপ সুবিস্তৃত হাওরের একপার্শ্বে দ্বিপ্রহর অতীতে শরতের রৌদ্র করোজ্জ্বল রজত ধারানিভ জলরাশির উপর দিয়া রক্ত, পীত, নীল, লোহিত বর্ণের পতাকা শোভিত নয়নানন্দ দায়ক মনোহর বর্ণে সুচিত্রিত, তানলয় বিশিষ্ট প্রাণোন্মাদকারী গ্রাম্য গীতি মুখরিত দৌড়ের নৌকাগুলি জল বিহগকুলের ন্যায় ক্রমে ক্রমে দিগন্তরালস্থিত গ্রাম সমূহ হইতে আসিয়া একত্র হয়। মনোহর পরিচ্ছদ ভূষিত বাহকগণ নূপুর মণ্ডিত সুরঞ্জিত বৈঠা দ্বারা সঙ্গীতের তালে তালে যুগপৎ জলে আঘাত করিয়া নৌকা পরিচালনা করে। দৌড়ের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার আমোদপূর্ণ নৌকা নানাদিক হইতে সমাগত হয়। আমোদপ্রিয় সৌখিন যুবকগণ চারুচন্দ্রাতপ সুশোভিত সুসজ্জিত নৌকায় বিবিধ রাগ রাগিনী আলাপ করিতে করিতে আড়ংএ সমাগত হয়। গ্রাম্য বিদূষক নানাপ্রকার হাস্যোদ্দীপক সং সাজিয়া দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিবার জন্য লালায়িত হয়। যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল নৌকা ও তদুপরি কৌতুহল পরায়ণ জনবৃন্দ।

দৌড়ের নৌকাগুলি আড়ংএ আসিয়া গ্রাম্য কবি বিরচিত "সারি" গান গাহিয়া চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিয়া কৌতুহলপরায়ণ দর্শক মণ্ডলীর চিত্ত বিনোদন করে। সমস্ত দৌড়ের নৌকা আড়ংএ সমবেত হইবার পর প্রতিযোগিতায় দৌড় হইয়া থাকে। প্রায় মাইল পরিমিত স্থান দৌড়ের সীমা নির্দ্ধারিত হয়। শত শত নৌকা সুরঞ্জিত ও সুসজ্জিত হইয়া একত্রে "কালী" "কালী" "আল্লা" "আল্লা" রবে দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তালে তালে সুচিত্রিত বৈঠাদ্বারা রজত প্রভ জলরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া বিজয় লাভের জন্য সদর্পে ধাবিত হয়। দৌড়ের শেষ সীমানায় যে নৌকা প্রথম উপস্থিত হয়, তাহার জয় সহস্র কণ্ঠে ঘোষিত হয়। এবং সেই নৌকা সর্ব্বজয়ী আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। দৌড় শেষ হইলে সমস্ত নৌকা ধীরে ধীরে আপন আপন গন্তব্য স্থানে গমন করে।

দৌড়ের নৌকায় যে সমস্ত গান গীত হয়, তাহার অধিকাংশই গ্রাম্য গীতি। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত গ্রাম্য কবিগণ গ্রাম্যভাবে প্রণোদিত হইয়া সরল সুললিত ভাষায় যে সমস্ত গ্রাম্য গীতি রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাললয় সংযোগে গীত হয়। গানগুলির অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এবং পূর্ব্বরাগ মিলন, বিরহ প্রভৃতি অবলম্বনে বিরচিত। নৌকার অগ্রভাগে "সারিওয়ালা" দণ্ডায়মান হইয়া সারিগানের আবৃত্তি করে এবং বাহকগণ একসঙ্গে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। সঙ্গীত বেশ মর্ম্মস্পর্শী ও বিমলানন্দদায়ক হইয়া থাকে। সময় সময় নৌকার অগ্রভাগে তালে তালে নৃত্য করিবার জন্য ও দর্শক বৃন্দের চিত্ত বিনোদনার্থ "ঘাটু" নামধেয় নৃত্যকারী বালক স্থাপিত হয়।

পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা দুই একটী গান উদ্ধৃত করিলাম। নৌকাস্বামীর ঘাট হইতে নৌকা যাত্রা করিবার কালে বাহকগণ তালে তালে বৈঠা ক্ষেপণের সঙ্গে ২ নিম্ন লিখিত গানটী গাহিয়া থাকে।

"যাত্রা করাইয়া দে মা কালীদয়ে যাই গো
চূড়া বান্ধিয়া দে।
চূড়া বান্ধিয়া দে, ধড়া পরাইয়া দে,
শিঙ্গা রবে বলাই দাদা বলিছে ডাকিয়া,
"সকাল কইরা আয় রে কানাই ক্ষীর ননী লইয়া।"

এবম্প্রকারে মধুরকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে নৌকা আড়ংএ উপস্থিত হইয়া সাধারণতঃ বিরহ গীতি গাহিয়া থাকে। কএকটী বিরহ গীতির অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"যা গো বৃন্দে মথুরাতে শ্যামকে আনিতে,
একবার আইনে দেখা দূতি আমার জীবন থাকিতে।
কাল আসবে বইলে বন্ধু আমার—ও গো গেল ঐ পথে
আমি পথ চাইয়া অন্ধ হইলাম সখি শ্যামের আশাতে।
* * * *
আমি কারে বা দেখাব দুঃখ হৃদয় চিড়িয়া,
আমার সোণার অঙ্গ মলিন হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া।
রাজার ঝিয়ারী আমি থাকি বিপিনে বসিয়া,
শশুরী ননদী ডাকে শ্যাম কলঙ্কী বলিয়া।
* * * *
সুবল বল বল বল ভাই
কেমন আছে কমলিনী রাই;
যার কারণে বৃন্দাবনে রে সুবল
কান্দিয়া সদা বেড়াই।
ডুবেছিলাম মান সায়রে
সাধিলাম রাইএর চরণ ধরে
নয়ন তুলে চাইল নাকো রাই,
আমার যত ময়লা
সব হল বিদূর রে সুবল—
আমি জন্মের মত বিদাই চাই।

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

শরতের নির্ম্মল গগনের অস্তগামী তপন, গলিত কাঞ্চন ধারায় এক সুবর্ণ সাগরের সৃষ্টিকরে। সেই দ্রব সুবর্ণের মধ্যে দৌড়ের নৌকা বিদায় গীতি গাহিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়। নৌকা স্বামী গৃহে গমন করিয়া নৌকাবাহক গণকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করেন।

কোন্ সময় হইতে যে এই নির্দ্দোষ আমোদপূর্ণ গ্রাম্য ক্রীড়ার প্রচলন হইয়াছে, এবং কে যে উহার প্রবর্ত্তক তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ নাই। মনসা পূজা উপলক্ষে এই উৎসব আরম্ভ হয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন—পদ্মাপুরাণের নায়ক চাঁদসদাগরের পুত্রগণ এই ক্রীড়ার প্রবর্ত্তক। সে যাহা হউক, স্মরণাতীত কাল হইতে এই গ্রাম্য ক্রীড়া এদেশে প্রচলিত আছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস ও ধারণা।

শ্রীযুধিষ্ঠির নাথ।

## অমর স্মৃতি

একটা শুভ্র কুন্দকোরক পড়ায় ভূমে বাতাসে,
একটা কোমল গন্ধ বুকের মিলায় সুনীল আকাশে,
মন্দ মধুর মলয়ানীল শীতল করা পরশে,
উটেছিল অন্তরেরই ছন্দ ছোঁয়া হরষে,
একটা বিপুল ঝড়ের রাতে রুদ্ধ হ'ল অকালে,
দিবা নিশি সন্ধ্যারাতে বইত নিতি সকালে,
অভাব একটা শিউড়ে উঠ্‌ছে ছন্দ ভাঙ্গা মরতে,
খুঁজ্‌ছে আকুল আশা নিয়া অন্তরেরই পরতে,
একটা আসন শূন্য হ'ল সাহিত্যের আঙ্গ মন্দিরে,
লহরী তার বাঁধন দড়ি জাগায় স্মৃতি সন্ধিরে,
ছন্দ সুরে তৈরী হৃদয় ভাবে ভাষার সমতা,
মৈমনসিংহ জুড়েছিল পুত প্রাণের মমতা,
মৃত্যুশিলায় হঠাৎ কাহার মৃত্যুতিথি ঝলসে,
কোমল কুসুম ঝর্‌ল আজি মরণ কাটার পরশে,
সন্ন্যাস তাঁর জন্মসূত্রে সত্যছিল জনমে,
সন্ন্যাসে তাঁর মৃত্যু হ'ল সত্যহ'ল মরণে,
সারস্বতের মঞ্চ আজি লুটায় ভূমে সরমে,
ব্যথায় ভরা বুকের কথা রুদ্ধরহে মরমে,
হাতের গড়া বুকচেড়াধন পাঠশালার ক্রন্দনে,
হৃদয় যেথায় ভিত্তিছিল ভাঙ্‌ল পাঁজর স্পন্দনে,
হে আচার্য্য ডুব্‌লে তুমি অশ্রুঝরার বাদলে,
গল্‌বে বিপুল বিশ্ব আঁখি অশ্রুধোয়া কাজলে।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

---

## অভিনেত্রী

"পিতৃধনে বঞ্চিত হ'য়ে তোমার বিবাহিত জীবনটা খুব সুখের হ'বে, মনে ভাব্‌ছ?"

"নিশ্চয়ই, একমাত্র পুত্রকে আপনি পথের ভিখারী করবেন না? মিস্ এমলি—"

"থিয়েটারের অভিনেত্রী মিস্ এমিলি!! আর্ল হাওয়ার্ড আরনল্ডের উপযুক্তা পুত্র বধূই বটে।"

পিতার ঘৃণামিশ্রিত হাসিতে পুত্র এড্‌বার্ড একটু অপ্রতিভ হইল, কিন্তু তাহার প্রণয়িনীর সপক্ষে ওকালতি করিতে পশ্চাৎপদ হইল না।

"আপনি অন্যায় কর্‌ছেন? কোনো পুরুষ কি রমণীকে বিবাহ করে শুধুই তার মায়ের খাতিরে?"

বৃদ্ধ আর্ল চীৎকার করিয়া কহিলেন—"হাজার হাজার লোক তাই করে থাকে। থাক্, আমার বক্তব্য আমি শেষ করেছি। মিস্ এমিলিকে যদি তুমি বিবাহ কর, আমার এক পয়সাও পাবে না। আমার এই সংকল্প থেকে কেউ আমাকে টলাতে পারবেনা— জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধন্না দিয়ে পড়ে থাকলেও না।"

এড্‌বার্ড রাগে ফুলিতেছিল। তথাপি যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা মেজাজে কহিল--"মিস্ এমিলি সুন্দরী, সুশীলা, ধনবতী। শুধু বড়ঘরে তার জন্ম হয়নি। ভেবে দেখুন, তাকে বিয়ে করলে আমাদের বেহাণী সম্পত্তিগুলো উদ্ধার করা সোজা হবে!"

"সম্পত্তি চুলোয় যাক্। আমাকে রাগিওনা, রাগিওনা! আমি যেন নিজকে ভুলে না যাই।"

"সম্প্রতি নিজকে ভুলে আমাকে যদি না ভুলতেন, বিশেষ ক্ষতি হ'ত না!" তাহার কণ্ঠস্বরে এবং বলিবার ভঙ্গিমায় একটা অবজ্ঞার ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই আর্ল মুষ্টিবদ্ধ হস্তে চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেও, এড্‌বার্ড বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না।

রাগকম্পিত চাপা গলায় আর্ল কহিলেন—"ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি যাও। আজ যদি বৎসরের প্রথম দিন না হ'ত,"বাড়ী ছেড়ে, বেরিয়ে যাও," বল্‌তেও কুণ্ঠিত হতেম না। তোমার এমিলিকে তুমি বিয়ে করগে,'—কিন্তু স্বপ্নেও ভেবো না সে, আমার বাড়ীতে ঢুক্‌তে পার্‌বে! যখন আমার মৃত্যু হবে—"

এই সময় দরজা ঠেলিয়া একটী সুন্দরী যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল; এবং আর্লকে অভিবাদন করিয়া কহিল— "সার, আর্‌নল্ড, মাপ কর্‌বেন! আমি জানতুম না যে কেহ এখানে আছে। বেহালাটা নিতে এসেছিলুম।"

'তারপর একটু থামিয়া কহিল—"তাইত! পিতা-পুত্রে ঝগড়া?"

আর্ল কহিলেন—"না. 'দিপেলেস্'-এ পিতাপুত্রে কখনও ঝগড়া হয় না।" "বটে? কিন্তু পিতাপুত্রে না হ'লেও পিতাপুত্রীতে যে হয়, কোনো সন্দেহ নেই। তা

না হলে, আপনার "দিপেলেসে" গ্রেরেইথের প্রেতাত্মার আবির্ভাব হ'ত না।"

আর্লের মুখমণ্ডল সাদা হইয়া গেল।

মলি উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল—"সার আরনল্ড্ আমাকে ক্ষমা করুণ। এরূপ বলা আমার পক্ষে হয়ত ঠিক হয়নি।"

আর্ল হাসিয়া কহিলেন—"আমাদের ঘরের লক্ষ্মী তুমি! তোমার সুন্দর সরল স্নিগ্ধ দৃষ্টির সামনে কোনো প্রেতাত্মা টিকে থাকতে পারে না। একথা যার চক্ষু আছে, সেই বল্‌তে পারে—যদি সে নিতান্তই গোবর গণেশ না হয়!"

আর্ল মলির কপালে চুম্বন করিয়া, পুত্রের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াগেলেন।

"এডি, আমার মনে হয় গ্রেরেইথের কথা শুনে, তোমার পিতা চিন্তাকুল হয়েছেন।"

"বাবা, গ্রেরেইথের নামও শুন্‌তে পারেন না। তুমি জান গ্রেরেইথ আমাদের বাড়ীতে একটা না একটা অমঙ্গল ডেকে আন্‌বেই! শুন্‌তে পাই, ঝগড়া ঝাটির সূত্রপাতেই নাকি এর আবির্ভাব হয়, এবং ঝগড়া না মেটা পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়ে না।"

"তাইত, আমার কথা শুনে আর্লের মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল! তোমরা নিশ্চয়ই ঝগড়া করছিলে না?

"মলি, বাবার ইচ্ছা আমি তোমাকে বিয়ে করি।"

"তুমি রাজী নও?"

মলির কথা শুনিয়া এডবার্ড চমকাইয়া গেল। মলি কি তাহাকে ভালবাসে? সে মলির কথার কি উত্তর দিবে ঠিক না করিতে পারিয়া ঘন ঘন দরজার দিকে চাহিতে লাগিল।

"তুমি ত ভারী ভীরু! উত্তর দাও না?"

"আমি জানি, আমি তোমার উপযুক্ত নই!"

"তুমি যে আর একজনকে অনেক ভালবাস, আমি বেশ জানি।"

"হায়, তুমি যদি তার সাথে পরিচিত হতে পার্‌তে—"

"না, আমি সে সব কিছুই কর্‌ছিনে। ভেবে দেখ, এডবার্ড আমাকে বিয়ে কর্‌লে তোমার পক্ষে কতটা লাভের কথা। আমার অর্থের অভাব নেই। তোমাদের রেহাণী সম্পত্তি—"

"আমি এত নীচ প্রকৃতির নই, মলি! ভালবাসার সাথে লাভ-লোকসানের কথা জড়ানো বর্ব্বরতা!"

"বটে? তাহলে, তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌তে রাজী নও? বেশ, গ্রেরেইথকে আসতে দাও!" বাস্তবিকই মলির অধর কাঁপিতেছিল!

"মলি, মলি, আমি ত জান্‌তুম তুমি—লর্ড টনী—"

মলি এডবার্ডের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাসিতে ঘরে একটা আনন্দের হাওয়া বহাইয়া দিল!

"দুষ্টু মেয়ে! তুমি আমার সাথে চালাকি কর্‌ছিলে!"

মলি এক দৌড়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এডবার্ড তাহার পশ্চদানুশরণ করিয়া বাগানে গিয়া তাহাকে ধরিল। এবং তাহার সঙ্গে আবার গল্প জমাইয়া তুলিল।

তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছিল, দেখিয়া আর্ল মনে মনে অত্যন্ত খুসি হইলেন!

লেডী আরনল্ড তাহাদিগকে দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে মলি এবং এডির মধ্যে বন্ধুত্ব আছে, ভালবাসা নাই!

লর্ড টনী তাহাদিগকে দেখিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আর—তাহার হাসির শব্দে মলির পিতা কর্ণেল ভার্ণি আরও জোরে হাসিতে লাগিলেন। কারণ তাহার মনে ছিল, মলি এবং লর্ড টনীর মধ্যে কোনরূপ প্রণয় ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই!

(২)

আর্ল আরনল্ড রাজা প্রথম চার্লসের পক্ষে ছিলেন, এবং নিজের ঘর বাড়ী জায়গা জমী বন্ধক দিয়া তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস্ এই রাজভক্ত আর্লের একমাত্র পুত্র এডবার্ডকে সেনাদলের কাপ্তান করিয়াই আপনার পিতৃঋণ শোধ করিয়াছেন।

উপায়হীন হইয়া আর্ল প্রতিবেশীদিগের সহিত সুরাপানে এবং তাস খেলায় সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। কিন্তু পাওনাদারের তাগাদা এবং বার্দ্ধক্য-জনিত বাতের উপদ্রবে শীঘ্রই তাঁহাকে অস্থির হইয়া পড়িতে হইল। সার ভার্ণির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মলিকে পুত্রবধূ করিতে পারিলে যে তাহার অবস্থা আবার স্বচ্ছল হইবে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও বিস্মৃত হইলেন না। সার ভার্ণিরও এ বিবাহে অমত ছিল না। কারণ লর্ড টনীর সহিত বিবাহিত হইয়া আদরের কন্যা মলি কোন দূরদেশে চলিয়া গেলে, বৃদ্ধের নিরানন্দ দিনগুলি কিরূপে কাটিবে? কিন্তু যত গোল বাঁধাইল মলি এবং এডবার্ড। যদিও ছোটবেলা হইতেই তাহারা এক সঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তবু তাহারা প্রেমিক প্রেমিকা নহে!

বড়দিন উপলক্ষে 'দি পেলেসে' অনেক অভ্যাগত ব্যক্তি সমাগত হইয়াছেন। মলি পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। এমন সময় ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করিয়া আর্লের কানে কানে কি বলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই একটী সুন্দরী যুবতীকে সমাদরে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

"মহাশয়া, আপনার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই!"

"সার আরনল্ড, আমার নাম মিসেস্ লেন্। গ্রিফেন্‌বেরীর বিসপের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলুম; কিন্তু রাস্তায় এত বরফ জমে গিয়েছিল যে ঘোড়া চারটে চার ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ছ' মাইলও যেতে পারেনি! এদিকে রাত্রিও হয়ে গেল। আপনার ঘরের আলোটা দেখে এদিকে আসতে পেরেছি। নইলে আমাদের জীবন্ত সমাধি হয়ে যেত!"

"মহাশয়া, ঠিক্ জানবেন, দশদিনের ভিতর আপনাকে আমরা ছাড়্‌চিনে! এই আমার ছেলে এডবার্ড!"

এড্‌বার্ড তাহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল—মিসেস্ লেন্, আমি আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করছি!"

"ধন্যবাদ, কাপ্তান এড্‌বার্ড! আপনাকে নিশ্চয়ই কোথাও দেখে থাকব?"

এড্‌বার্ড নিরুত্তর।

মলি কহিল—"আপনার ভুল হয়ে থাকবে হয় ত!"

মলির দিকে ফিরিয়া আগন্তুক কহিল—"সম্ভব নয়। বিসপ গ্রিফেন্‌বেরীর প্রাসাদে?—"

মলি কহিল—"আপনার নিকটাত্মীয়?"

"আমার নিকটাত্মীয়। কিন্তু এই ভদ্রলোকটী (লর্ড টনীকে দেখাইয়া) আপনার যতটা নিকটাত্মীয়; আমার অবশ্য ততটা নয়! তবু নিকট বই কি!"

মলির মুখ লাল হইয়া গেল। লর্ড টনী নখ খুঁটিতে লাগিলেন।

ডিনারের পর সুরাপানের সহিত বাজী রাখিয়া তাসখেলা আরম্ভ হইল। মিসেস্ লেন্ দেখিলেন, গ্লাসের পর গ্লাস সার আরনল্ডের কুক্ষিগত হইতেছে, এবং তিনি বাজীর পর বাজী হারিতেছেন! হঠাৎ আর্ল হাতের তাস টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন "সার কেপেল, আজ হার্ট কার্ম্মও আমার হস্তান্তরিত হ'ল! যাক, সুখের বিষয় ফার্মটা আপনার মত সৎ লোকের হাতেই পরেছে—"

আর বেশী বলিবার তার শক্তি ছিল না; বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে বোতলের অবশিষ্টাংশ এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন!

* * * *

এড্‌বার্ড মিসেস্ লেনের পার্শ্বে বসিয়া নীচু গলায় কহিল—"আমার বৃদ্ধ পিতা যদি জানতে পারতেন যে তিনি মিস্ এমিলিকে আদর অভ্যর্থনা করছেন, তাহলে তিনি হয়ত—তোমার এইরূপ ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিৎ।"

"হাঁ, আমি এই বলে লজ্জিত যে সার আরনল্ডের এমন কোন ছেলে নেই যে এই কপট বন্ধুর দলকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে! এবং একজন বৃদ্ধ আর্লকে সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।"

এড্‌বার্ড একটু গরম হইয়া কহিল—"মহাশয়া, 'দি পেলেসের' সার আরনল্ড, মিস্ এমিলির মত রমণীর উপদেশ ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে!"

মিস্ এমিলি কহিল—"তুমি মিথ্যা বলছ। আর আরনল্ডের দিকে চেয়ে দেখ, এই যে তিনি সার

কেপেলের কাছে হার্ট ফারম হারিয়েছেন বলে রুমালে চোখ মুচ্ছেন।"

"হার্ট ফারম! সত্যি হার্ট ফারম?"

"আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আর্লের কাছেই জিজ্ঞেস কর। কাপ্তান এডবার্ড—একদিন তুমি আমাকে গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করেছিলে। আজ তার কিছু প্রতিদান দিব।"

"কি করে তা সম্ভব? আমার বাবা কারও কথা শুনবেন না।"

"তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা রাখবেন। না শুনেই পারেন না। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি তোমাকে মিস্ এমিলির পাণিগ্রহণ কর্‌তে তিনি মত দিবেন। এখন একটা কাজ করত? ঐ তাস খেলার টেবিলটাকে লাথি মেরে ফেলে দাওগে, যাও!"

এডবার্ড ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—সেটা কি ঠিক হবে?—দূর হোকগে ছাই। আমি তাই করবো।"

সে মুহূর্ত্ত মধ্যে সার কেপেলের সম্মুখীন হইয়া কহিল—"আজকের মত তাস খেলাটা বন্ধ রাখ্‌লে হয় না? ছ'ঘণ্টার মধ্যে হার্টফারম্ পাওয়া কি কম লাভ বলে মনে হচ্ছে?"

সার, ভার্ণি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—"সার কেপেল, এডবার্ড ঠিক কথাই বলেছে। আজকের মত খেলা থাক। যথেষ্ট হয়েছে।

মিস্ এমিলি অগ্রসর হইয়া কহিল—"সার কেপেল, আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আপনাদের খেলা দেখছি। আপনাদের মত ভদ্রলোকের ভিতর অবশ্য বাজী রেখে খেলাটা কিছু নয়। বিশেষ, হার্ট ফারমের মালিক সুস্থমনে ছিলেন না—"

এডবার্ড গর্ব্বের সহিত কহিল—"মহাশয়া, সার আরনল্ড যদি সত্যই বাজী রেখে খেলে থাকেন, এবং হেরে থাকেন, সংসারে এমন কেউ নেই যে তার দেয় ঋণ পরিশোধ করতে বারণ করতে পারে।"

"এডবার্ড যথার্থ বলেছে। দেনা আমি পরিশোধ কর্‌বোই, হাজার হার্টফারমও যদি বিক্রি করতে হয়।" এই বলিয়া সার আরনল্ড জোরে টেবিলের উপর এক মুষ্টাঘাত করিলেন।

মিস্ এমিলি কহিল—"তবে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।" তারপর সে সার কেপেলের কানে কানে কহিল—"মহাশয় লোক নিন্দার ভয় যদি থাকে, তবে আপনি হার্টফারমের আশা ত্যাগ করুন।"

সার কেপেল কহিলেন—"মহাশয়া, আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?"

মিস্ এমিলি শুধু একটু হাসিল।

* * * *

পরদিন প্রাতে মিস্ এমিলি দেখিল—মলি বাহিরে যাইতেছে। দূর হইতেই সে মলিকে অভিবাদন করিল কিন্তু মলি প্রত্যাভিবাদন না করিয়া মিস্ এমিলির কাছে আসিয়া কহিল—"রমণি, কোন্ সাহসে তুমি এখানে এসেছ? আমি তোমাকে চিনি মিস্ এমিলি!"

"তুমি কি একথা সবার কাছেই বলতে চাও?"

"নিশ্চয়ই!"

মিস্ এমিলি স্থিরস্বরে কহিল—"বেশ; তাহলে তুমি যে লর্ড টনীকে গোপনে বিয়ে করেছ একথাও গোপন থাক্‌বে না!"

মলি চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখখানি অস্তগামী সূর্য্যের মত লাল হইয়া গেল। মিস্ এমিলি কহিল—"শোন আমি এখানে কেন এসেছি। রাজা চার্লস সার আরনল্ডকে আজ ব্যারনেট্ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সেই সনদ আমার কাছে।"

মলি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"তাই নাকি?" মিস্ এমিলি কহিল—"আমার আগমনের কারণ বুঝ্‌তে পারলে? সার আরনল্ডকে মদ এবং তাস ছাড়তে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করা, এবং মিস্ এমিলিকে বিয়ে করার জন্য কাপ্তান এডবার্ডকে সম্মতি দেওয়া।"

মলি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে পিকচার গেলারীতে লইয়া গেল।

মলি কহিল—"এই ছবিখানা গ্রেরেইথের। সে অপূর্ব্বসুন্দরী ছিল। কিন্তু বিয়ের পূর্ব্বদিন সে আত্মহত্যা করে। কারণ যাকে সে ভালবাস্‌তো তার সাথে বিয়ে না হয়ে অন্য একজনের সাথে বিয়ে হবার কথা ছিল।

লোকে বলে থাকে যে কোনো একটা বিপদ পাতের সম্ভাবনা হলেই তার প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। কাজেই সার আরনল্ড, গ্রেরেইথের কথা শুনেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।"

মিস্ এমিলি চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে কহিল—"এটা অবশ্যই ভাল কথা যে সার আরনল্ড একটা কিছু ভয় করে চলেন।"

(৩)

রাত্রি ভোজনের শেষে ড্রয়িংরুমের আলোগুলি নিবাইয়া দেওয়া হইল। বাড়ীর সকলেই শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু মিস্ এমিলি তাহার ঘরে একটী চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

সে তাহার পোষাকের উপর একটা ছাইরঙের চাদর জড়াইল এবং তাহার সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণ কেশ পৃষ্ঠদেশ ছড়াইয়া দিল এবং আস্তে আস্তে বারান্দা দিয়া আসিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল; কিন্তু দুই তিন ধাপ না নামিতেই নীচের হল ঘরে একটা অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইল।

সে সিঁড়ি ঘরে নামিয়া গেল এবং দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল, বৃদ্ধ আর্ল চেয়ারে বসিয়া তাঁহার কুকুরটার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং বলিতেছেন—"হায়, ওয়াল্টার তুমি এবং আমি এই পঁচিশ বছর এক সাথে আছি। ভগবান জানেন একমাত্র তুমিই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। এখন তোমাকেও আমার ত্যাগ করতে হবে। বন্ধু ওয়াল্টার, তোমার নির্ব্বোধ মনিবের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। কাল ভোরে যখন শুনতে পাবে যে আমি বরফে জমে শক্ত হয়ে গেছি, তখন নিশ্চয়ই তুমি বহুদিনের বন্ধুর জন্য দুফোটা অশ্রু-জল ফেলবে।"

বাহির হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল কুকুরটা গোঙা-ইতেছে, বৃদ্ধ আর্লও কাঁদিতেছেন। প্রভু ভৃত্যের এই সকরুণ দৃশ্য দেখিয়া মিস্ এমিলি চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। সে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেছে, এমন সময় বাহিরের বাতাসে দরজাটা খুলিয়া গেল;—এবং কুকুরটা মিস্ এমিলির সর্ব্বশরীর আবৃত প্রেতের মত চেহারা দেখিয়া ভয়ে লেজ গুটাইয়া জড়সড় হইয়া পড়িল।

সার আরনল্ড তখন পিছনের দিকে চাহিলেন এবং বাহিরের ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেখিতে পাইলেন যে একজন সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া আছে। আর্ল ভয় জড়িত স্বরে কহিলেন—"এ যে গ্রেরেইথ! "আমার সর্ব্বনাশের আর কি বাকী আছে যে—"

মিস এমিলি চাপাগলায় কহিল—"মি লর্ড," আপনি ঠিক বলেছেন, আপনার সর্ব্বনাশের দিন শেষ হয়ে গেছে।"

বৃদ্ধ আর্ল আশ্চর্য্য হইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল—"এ আমাকে "মি লর্ড" বলছে কেন ?"

"কারণ আপনি এখন লর্ড হয়েছেন। রাজা আপনাকে সনদ দিয়াছেন—পিকচার গ্যালরীতে আমার ছবির পিছনে সে সনদ দেখতে পাবেন।"

"তাহলে আমার ছেলে—আমার পুত্র এড্ডি—"

"এড্ডি আপনার উত্তরাধিকারী। আপনি তার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।"

"ঠিক—ঠিক! কিন্তু এখন আমি কৃত অন্যায়ের প্রতীকার করব। কারণ—"

"আপনি ইচ্ছা করলেই তা করতে পারেন। সে যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করতে অনুমতি দিন।"

"মলি—মলি ভার্ণি—"

"না, এড্ডির সামনেই মলি বলুক দেখি, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সে আর একজনকে বিয়ে করেছে কিনা।"

"কি আশ্চর্য্য! আমরা ত' কিছুই জানিনে?"

"আপনাকে প্রতিজ্ঞা কর্'তে হবে যে আপনি মিস্ এমিলিকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ কর্‌বেন।"

"আমার পুত্র সামান্য অভিনেত্রীকে বিয়ে করতে পারে না। সে হবে—দি পেলেসের লর্ড!"

"কখনো না; আমি শপথ করে বলছি, আমার কথা মত কাজ করতে আপনি যদি প্রতিজ্ঞা না করেন, রাজপ্রদত্ত সনন্দ আপনার হস্তগত হবে না। আপনি কি একমাত্র পুত্রকে পথে দাঁড় করাতে চান?"

"না, না; আমি তত নীচ নই। কিন্তু ওঃ! অভিনেত্রী পুত্র বধূ?"

"তাহলে যত শীগ্‌গির পারেন তাহাদের ভালবাসতে আপনার চেষ্টা করা উচিত। অন্ততঃ একজনকে।"

"এডি যদি তাকে ভালবাসে, আমিও ভালবাস্‌বো।"

"আমি আপনার কথা বিশ্বাস করলুম। আর এক কথা, আপনি বাজী রেখে তাস খেলতে পারবেন না।"

"স্বীকার আছি।"

"আর মদ! দিন এক বোতলের বেশী--"

"এক বোতল? এক ফোঁটাও স্পর্শ করব না।"

"না আমি অসম্ভবের প্রত্যাশা করিনে। এক বোতল আপনার দৈনিক বরাদ্দ! বেশীও নয়, কমও নয়। আমি জানি আপনাদের কথা নড়চড় হয় না। আমি বিয়ের দিন প্রিয়তমের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম নিজের জীবন দিয়ে তাহা রক্ষা করেছি। মি লর্ড, এভি তাহার প্রিয়তমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনার কি ইচ্ছা সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করুক! বিদায়, বিদায়!"

*　*　*　*　*

তার পরদিন মিস এমিলি নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল, সার আরনল্ড সনদ হস্তে টেবিলের অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া আছেন, আর সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাকে "মি লর্ড!" "মি লর্ড!" বলিয়া সম্মান প্রদর্শন ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

এভি এবং মলি ঘরে আসিবামাত্রই লর্ড আরনল্ড তাহাদিগকে লাইব্রেরী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেখান হইতে তাহারা অল্পক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিল—লর্ড—আরনল্ড এবং মলি সাশ্রুনেত্রে হাসিতেছিল। এভিও হাসিতেছিল, কিন্তু তাহার চখে জল ছিলনা।

সে মিস এমিলির নিকটবর্ত্তী হইয়া এবং নত হইয়া তাহার হস্ত চুম্বন করিল মলিও মিস এমিলিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

তখন অভিনেত্রী নিজেই অশ্রুর ভিতর দিয়া হাসিতে লাগিল। *

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ।

---

# ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত।

গরমের জন্য রাত্রে নয়নে নিদ্রা আসে না। হাতে পাখা হস্তে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নায় বসিয়া আছি—এমন সময় বহুদূরে বাউল সঙ্গীত হইতেছে, শুনিতে পাইলাম। দুপ্রহর রাত্রি, তাহার উপর আবার উদাস-করা বাউল সঙ্গীত—বড়ই মধুর লাগিল। পরের দিনই বাউল সঙ্গীত একতারা ও খঞ্জনী সহযোগে শ্রবণ করিবার জন্য আকুল হইলাম। কয়েকটি নিরক্ষর মুসলমান কৃষককে ডাকাইয়া আনিয়া গান শুনিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলাম এবং সেই সঙ্গে বোকাইনগর নিবাসী গৌরীপুরের সদর ডিহিম মহম্মদ খসিরুদ্দিন মৃধাকেও তাহার দলবল লইয়া হাজির হইতে বলিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে বহুরাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের 'বাউলা গান' শ্রবণ করিলাম। কতক গুলি মনোরম সঙ্গীত আমি খসিরুদ্দিন মৃধার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি—সাহিত্য-রসিক পাঠকদিগের নিকট সেইগুলি উপস্থিত করিলাম। নিরক্ষর পল্লী কৃষকদের এই সমস্ত সঙ্গীত আমার নিকট এক একটি কোহিনূর তুল্য মনে হইয়াছে। এই সমস্ত সঙ্গীত শ্রবণ করিলে বাস্তবিকই চোখের জল রাখা যায় না। আমাদের দেশের নিরক্ষর সাধারণ হিন্দু মুসলমান প্রকৃত পক্ষেই ধর্ম্মপ্রাণ, সেই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। আশা করি 'সৌরভের' পাঠকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চলের নিরক্ষর জনসাধারণের মিঠে ভাষার মিঠে সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিবেন। ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইহাতে জাতীয় সাহিত্য অবশ্যই পুষ্টিলাভ করিবে। জনসাধারণকে বাদ দিয়া, তাহাদের লাগ-সই ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া, বিরাট্ জাতীয় সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। যাহা হোক্, এখন এইস্থলে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাহি না। আবশ্যক বোধ হইলে পরে সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। যে কয়েকটি গান সংগ্রহ করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে এইবার মাত্র ছয়টি গান নিম্নে প্রদান করিলাম।

(১)

দিয়া মাটি পরিপাটি, আগুন জলে হাওয়ার ভরে
　　গাড়ী চল্‌ছে আজব কলে!

আবার, হাওয়ার কল বন্ধ হবে, ইঞ্জিন কল ছুইট্যা যাবে,
চড়নদার চল্যা যাবে সাধের গাড়ী ফেলে!

এই বাজারে কেউ যাইওনা বাউল চান্দে বলে।
চার জনারে কান্ধে লইয়া নিয়া যাবে গোরোস্থানে!
　　গাড়ী চল্‌ছে আজব কলে।

ইঞ্জিনের কলের ভিতর, চল্‌ছে কি আজব লহর,
তারেতে আনে খবর, কি চমৎকার মিলে।
ষোলো জনে দিছে পাহারা এই ঘরেতে মিলে!
মহারাণী কুণ্ডলিনী বিরাজ করে চতুর্দ্দলে!
　　গাড়ী চল্‌ছে আজব কলে!

শিয়াল ধরার ইষ্টিশনে, আছে কল মোহাব্বতের,
চালায় কল রাত্রি দিনে যেখানে মন চলে!
আট কড়োরা, ন দরোজা সদাই হাওয়া খেলে।
বারামখানায় জল্‌ছে বাত্তি, আলো হইল রঙমহলে!
　　গাড়ী চল্‌ছে আজব কলে।

---

* ইংরেজী হইতে অনুদিত।

( ২ )

অ মন পাগেলা রে! হর্দমে গুরুর নাম লইও!
হর্দমে গুরুরনাম মুস্সিদ্ বল্যা ডাক্য, মন পাগেলারে,
হর্দমে গুরুর নাম লইও!
আসমানে চাইয়া ডাক্‌রে, মন, আছে কয় তারা,
অকুল সায়রের মধ্যে বয় কত ধারা;
অ মন পাগেল রে! হর্দমে গুরুর নাম লইও!
আসমানে গাছের জড়োরে, জমনে তার ডাল;
এক ডালে বর্‌মা বিষ্ণু, আরেক ডালে কাল।
অ মন পাগেলারে! হর্দমে গুরুর নাম লইও!

( ৩ )

এ ভব সংসারের মধ্যে দয়াময় নাম কে ধরে!
দয়াময় নাম কে ধরে গো, দয়াময় নাম কে ধরে!
এ ভব সংসারের মধ্যে—
তুমি ডালও তুমি মূলও তুমি সকলে!
তোমার নামের গুণে গহিন বনে শুক্‌না গাছে ফল দবে!
দয়াময় নাম কে ধরে!
তুমি বর্‌মা তুমি বিষ্ণু তুমি সকলে!
তোমার রাঙ্গা চরণ অমূল্য ধন, সকলেই বাঞ্ছা করে!
দয়াময় নাম কে ধরে!

( ৪ )

সরলে গরল মিশেনা সরল ভাবে আছে যে জনা!
সর্পের মাথায় ব্যাঙ্গে নাচে, তবু সর্পে আহার করে না।
বুঝি সর্পের ওঝা আছে, তাই ডরে মাথাতুলেনা!
সরলে গরল মিশেনা সরল ভাবে আছে যে জনা!
পদ্ম পাতায় পানি পুড়ি টল-মল্, পদ্ম ভেজেনা!
তার সাক্ষী আছে দধির ভাণ্ড, উপরে ভাসে ননীছানা!
সরলে গরল মিশেনা সরলভাবে আছে যে জনা!

( ৫ )

ভবে কিধন পাইয়া ভুইলাছ রে মন!
গুরুর চরণ অমূল্য ধন, তাই কেনে করলেনা স্মরণ,
কি ধন পাইয়া ভুইলাছরে মন!
ধনী হবার ইচ্ছা কর, মনকে মহাজন কর,
প্রেমধন লইয়া ব্যাপার কর ঠিক্ রাখ্যা ওজন!
অন্য দিগে মন দিয়োনারে, তোমার হৃদে রাখ গুরুরচরণ!
কি ধন পাইয়া ভুইলাছরে মন!
ঢাকা গিয়া সন্দেশ খাইলে, বাবুগির নাম জানাইলে,
ঘিয়তের মধ্যে ছাই মাখাইলে, পান্তাভাতে মাখলে মাখন!
কিধন পাইয়া ভুইলাছরে মন!

( ৬ )

মনের দুক্কু মনে রৈল, মনে মনে ভাব্‌ছি তাই!
মনে মনে ভাব্‌ছি তাই গো, মনে মনে ভাব্‌ছি তাই!
মনের দুক্কু মনে রইল!
বন পোড়া যায় সবেই দ্যাখে আমার হৃদের আগুন
কেউনা দ্যাখে
জলে গেলে দ্বিগুন জলে—আমি কার ছায়াতে প্রাণ জুড়াই!
মনের দুক্কু মনে রইল, মনে মনে ভাব্‌ছি তাই!
যখন্ বাঁধ্‌বে যমদূতে তখন্ আমি কোথায় যাব!
বাঁধন নিব আপন হস্তে, তখন্ কার দোহাই দিব!
মনের দুক্কু মনে রইল, মনে মনে ভাব্‌ছি তাই!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

## গ্রন্থ-সমালোচনা।

**মায়ে পোয়ে**—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিব্যক্ত; মূল্য ছয় আনা।

ভক্ত প্রাণের ভিতর বিশ্বমাতাকে কিরূপে অনুভব করেন ও কিরূপে তন্ময়চিত্তে প্রাণের বেদনা তাঁহার চরণে ব্যক্ত করেন, তাহা ভাব উন্মাদনার আবেগে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশ করা হইয়াছে। মায়ের চরণ অনুসন্ধানে যাঁহারা নিয়ত ব্যগ্র, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যাহারা মায়ের চরণে নিবেদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, মাকে প্রাণের আবেগে মনের কথা উচ্চ কণ্ঠে শুনাইয়া যাঁহারা চিত্তে শান্তিলাভ করেন— তাঁহারা এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

**মানবতত্ত্ব—১ম খণ্ড—সৃষ্টিতত্ত্ব**—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত, কলিকাতা ৩২নং বকুল বাগান কাষ্ট লেন হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১॥০ টাকা ৩৬৮+৫৩ পৃষ্ঠা;

এই বৃহৎ গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই দ্বাদশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। ১ম অধ্যায়ে সৃষ্টী প্রকরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বৈবত প্রকরণ, তৃতীয় অধ্যায়ে ভৌম প্রকরণ, ৪র্থ অধ্যায়ে আর্য্য ইতিহাস, ৫ম অধ্যায়ে বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির ইতিহাস, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণ সকলের কর্ম্মবিভাগের কথা, ৭ম অধ্যায়ে শঙ্কর বা বিপ্রবর্ণের আলোচনা, ৮ম অধ্যায়ে বঙ্গের ভৌগলিক তত্ত্ব ও পুরাতন কাহিনী, নবম অধ্যায়ে বঙ্গের কায়স্থ রাজগণের ইতিহাস, দশম অধ্যায়ে কায়স্থের দ্বিজত্ব প্রমাণ, একাদশ অধ্যায়ে দেহতত্ত্ব এবং দ্বাদশ বা পরিশিষ্ট অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্য বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে হিন্দুশাস্ত্র গুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ তিনি গ্রন্থের প্রতি পত্রে বিস্তৃত করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থের শেষ দুইটী প্রস্তাব অতিশয় উপাদেয় হইয়াছে। বঙ্গীয় যুবকদিগকে আমরা তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, DACCA

সপ্তম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩২৬। একাদশ সংখ্যা।

## আয়ুর্ব্বেদের অবমাননা

পুরকালে এক সময় ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ-রবির প্রভায় সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছিল, ভারতবাসীগণ রোগ মুক্ত ও দীর্ঘজীবী হইয়া অতুলানন্দ লাভ করিয়াছিল। তখন শবচ্ছেদ প্রথা ছিল, বিবিধ রসায়ন গ্রন্থ ছিল এবং অস্ত্রচিকিৎসা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

কাল চক্রের পরিবর্ত্তনে বৌদ্ধ যুগের শেষ সময় হইতে শবচ্ছেদ ও অস্ত্রচিকিৎসা লোপ পাইয়া যায়। ক্রমে আয়ুর্ব্বেদের পঠন পাঠনের শিথিলতায় ও গ্রন্থ লোপ হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যার-পর নাই অবনতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। নবাগত পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রতি ক্রমশঃ লোকের শ্রদ্ধা ও রুচি প্রবল হইয়া উঠে, আবার ৫০।৬০ বৎসর হইতে ক্রমশঃ আয়ুর্ব্বেদের পঠন পাঠন ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বহুল প্রচার হওয়ায় চারিদিকে আয়ুর্ব্বেদের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া দেশের অনেকেই এখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী হইয়াছেন। বোম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, প্রভৃতি হিন্দুস্থানীয় সুপণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদের বহুল উন্নতি সাধন করিতেছেন। কলিকাতা নগরে কত বিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় দুরারোগ্য বহু রোগ আরাম করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন।

ক্ষণজন্মা যামিনী-ভূষণ কবিরাজ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ খুলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিতেছেন।

এখন সমস্ত লোকের মুখেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির কথা সমস্বরে শ্রুতি গোচর হইয়া থাকে।

কিন্তু এই উন্নতির ভিতরে যে অবনতির ছায়া প্রকাশ পাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদ কল্পতরুর মজ্জায় যে বড় বড় কীট প্রবেশ করিয়েছে, অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত সমাজ একটু চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা আজ এই আয়ুর্ব্বেদীয় কীটের বিষয়ই সংক্ষেপে ২।৪ কথা বলিব। এই কীট দুই প্রকার, এক-প্রকার কীট বহুদিন হইতেই আয়ুর্ব্বেদের বক্ষে দংশন করিয়া আসিতেছে, এই জাতীয় কীট সংখ্যায় বেশী কিন্তু ইহাদের ক্ষমতা অতি ক্ষুদ্র সুতরাং ইহাদের বহুদিনের দংশনেও আয়ুর্ব্বেদের তত অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কীট অপেক্ষাকৃত প্রবল ইহাদের দংশন মর্ম্মভেদী। আয়ুর্ব্বেদের প্রথম শ্রেণীর কীট মূর্খ কবিরাজ। চিরদিন হইতেই সমাজে হাতুড়ে কবিরাজের পসার চলিতেছে। কিন্তু আজকাল ইহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এত নিরেট মূর্খ এই দলে প্রবেশ করিয়াছে যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

বিচারে ভুল ভ্রম হইলে তাহার আপিল আছে, অন্যান্য কাজেও ভুল হইলে তাহার সংশোধন আছে, কিন্তু চিকিৎসা কার্য্যে ভুল হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ নিয়া টানাটানী, সংশোধনের পূর্ব্বেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়। এত

বড় একটা গুরুতর কাজ বর্ণজ্ঞান শূন্য মূর্খের হাতে থাকা যে সমাজের কতদূর অনিষ্টের কারণ, তাহা আর অধিক বুঝাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, ক্রমশঃ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য বস্তু দুর্মূল্য হওয়ায় ও অর্থাগমের পথ প্রশস্ত না থাকায় যাহার আর কোনও উপায় নাই, ক্ষমতা নাই, শক্তি নাই, দায় পড়িয়া সেই একজন আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজ কিম্বা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়া উঠিবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বেওয়ারিস মাল; ইহার পরীক্ষা নাই, বিচার নাই, বাধা দেওয়ার কেহর ক্ষমতা নাই, নিজে কবিকঙ্কন বা কবিভূষণ বলিলেই সমাজ তাহাকে অম্লান চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা জানি যিনি কোন দিনও আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা কি আলোচনা করেন নাই তিনিও একটা লম্বা চৌরা উপাধি ভূষণে বিভূষিত। চিরদিনই অসার পদার্থের আড়ম্বর কিছু অধিক; কাঁসার পাত্রে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয়, স্বর্ণ পাত্রে আঘাত করিলে সেরূপ শব্দ হয় না সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের বাগাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া সমাজ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ফল লাভে বঞ্চিত হইতেছে। চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে যেমন বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন সেইরূপ ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে অর্থ ব্যয়ের ও প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে যাহারা অন্য গতি নাই বলিয়া পেটের দায়ে কবিরাজ সাজিয়াছেন, যাহারা পরের বাড়ী বাস করিয়া থাকেন অথবা যাহাদের টাকা কড়ির অভাব, তাহারা সোণা, মুক্তা, কস্তুরী প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃত ঔষধ প্রস্তুত করিতে কতদূর সমর্থ, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে। অথচ ইহাদের নিকটও সমস্ত ঔষধই পাওয়া যায়, কেহরই বিমুখ হইয়া আসিতে হয় না; বরং সুশিক্ষিত ধনবান চিকিৎসক অপেক্ষায় ইহাদের ঔষধ সুলভ মূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে। দেশে যেরূপ অর্থাভাব তাহাতে আজ কাল সুলভ মূল্যের প্রলোভন পরিত্যাগ করা শিক্ষিত লোকের পক্ষে সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে সুতরাং এই সুলভের প্রলোভনে কৃত্রিম ঔষধ ক্রয় করিয়া সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। ফল না হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদেরও দুর্ণাম ঘটিতেছে।

আজকাল অধিকার, অনধিকারের বিচার নাই। স্বার্থের জন্য যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনিই অবাধে সেই ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে পারেন। সুতরাং অর্থাগমের জন্য অনেকেই অন্যান্য কারবারের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারবার খুলিয়া সুলভ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের উপকরণ গুলির দিনে দিন দ্বিগুণ ত্রিগুণ, কোথাও বা ৬।৭ গুণ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

| যুদ্ধের পূর্ব্বের মূল্য | | বর্ত্তমানের মূল্য। |
| --- | --- | --- |
| সোণা ১ভরি | ২৪৲ | ৩৪।৩৫৲ |
| পারদ /১ | ২॥• | ১৮৲ |
| হিঙ্গুল /১ | ২।• | ১৮৲ |
| রূপা ১ ভরি | ৷৵• | ১৶ |
| রাঙ /১ | ১৷৵• | ৪॥• |
| বংশলোচন /১ | ৫৲ | ১৪৲ |
| কর্পূর /১ | ২॥• | ১৩৲ |

স্বদেশ জাত দ্রব্যের ও এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন কি তিল তৈলের সের ।৶ আনা স্থলে ১॥• টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, কাষ্ঠাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, চাকরের বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে; এই অবস্থায় ঔষধের মূল্য কি রূপে সুলভ হইতে পারে, তাঁহা ভাবিবার বিষয় বটে। কেহ কেহ আবার নিজের সাধুতা প্রদর্শনের নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রত্যেক ঔষধের মূল্য ও পারিশ্রমিক ধরিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা খরচের উপর অল্পলাভ নিয়া সমাজের উপকার করিয়া থাকেন, আর যাহারা তদতিরিক্ত মূল্য নেন, তাহারা স্বার্থপর সুতরাং অসাধু। কিন্তু আমরা ঔষধ বিক্রেতাগণের ও সত্যবাদী সুবিজ্ঞ কবিরাজগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে ঐরূপ নিয়মে নাকি ঔষধের মূল্য নিরূপিত হইতে পারেনা। আয়ুর্ব্বেদীয় কোন্ ঔষধ কত মূল্যে বিক্রয় হয়, সমাজের সর্ব্ব সাধারণে তাহা জানে না, এরূপস্থলে একটা কিছু মূল্য ধরিয়া অনায়াসে নিজের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা যে মূল্য ধরেন, তাহা কেবল ঔষধের মূল্য ও পারিশ্রমিকের কিঞ্চিৎমাত্র মূল্য; ইহাভিন্ন

আরও ওষে নানাপ্রকারে কত ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা কি তাহারা সমাজের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন? কখনও নহে। ঔষধ রাখিবার বাড়ী ভাড়া, তৈল ঘৃতাদি আলদিতে তামার ডেক প্রভৃতির খরচ যাহারা নিজে চিকিৎসক নহেন তাহাদের চিকিৎসকের বেতন, বিজ্ঞাপনের খরচ, পুস্তক ও বিজ্ঞাপন বিতরণের খরচ, দেশে দেশে দূত পাঠাইয়া তাহাদের ঔষধের গুণ কীর্ত্তন করার জন্য দূতের বেতন, মানুষের বুকে পিঠে পার্শ্বে বিজ্ঞাপন লটকাইয়া মুখে মুখোশ দিয়া লোকারণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়ার খরচ। এই খরচ গুলিকি তাহারা মূল্য তালিকায় প্রদর্শন করিয়া থাকেন? না এই খরচ গুলি তাহারা কেবলই সমাজের উপকার ও পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য নিজ তহবিল হইতে করিয়া থাকেন? কখনই নহে। সুতরাং ঐরূপভাবে মূল্য দেখান, সমাজের চক্ষুতে ধূলা দেওয়া মাত্র।

যতই কেন বড় কারখানা হউক না, তাহাতেও চাউল দাইল গুড় চিনির ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণের নিকট ঔষধের কাট্‌তি হয় না, এই অবস্থায় সুলভ মূল্যে কখনও নিষ্কৃত্রিম ঔষধ বিক্রীত হইতে পারে না।

১০ | ১৫ | ২০টী জিনিসে এক একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার ভিতরে সোণা, রূপা, মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য ঔষধ আছে কিনা, তাহা কেহই দেখিয়া বুঝিবার শক্তি থাকেনা। ঔষধ খরিদ করিতে কেহ রসায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সঙ্গে নিয়াও যায় না যে, বস্তু বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবে। রঙ্‌ ও প্রমাণ ঠিক থাকিলেই ঔষধ চলিয়া যায়, এই অবস্থায় অনেকেরই সস্তাদরে কৃত্রিম ঔষধ বিক্রয়ের সুযোগ করিয়া লয়।

এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাহাদের নিকট সোণা মুক্তা কস্তুরী কোন দিনই খরিদ করিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের নিকট অথচ সোণা মুক্তা ঘটিত ঔষধ সর্ব্বদাই শিশি ভরা দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে পুরাতণ ঘৃত, পুরাতণ গুড় প্রয়োজনীয়; বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ইহার জোগাড় রাখিতে হয় এবং লৌহ প্রভৃতি জারিতে অন্ততঃ ২ | ৩ বৎসরের কমে হয় না।

যাহারা পুরুষানুক্রমে কবিরাজ নহেন পড়াশুনা করিয়া নূতন কবিরাজ হইয়াছেন তাঁহারা অন্ততঃ ২ বৎসর পরে ভিন্ন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারেন না, কারণ লৌহাদি প্রস্তুত করিতেই তাহাদের ঐ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে? আর যাহারা পুরুষানুক্রমে কবিরাজ, তাহাদেরও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারবার করিতে হইলে ২।৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই লৌহাদি প্রস্তুত করার দরকার। যিনি তাহা করেন না, তাহার ঔষধ ও নিষ্কৃত্রিম হয় না। কারণ ডাক্তারি ঔষধের ন্যায় অভ্র লৌহাদি প্রচুর পরিমাণে কোথাও খরিদ করিতে পাওয়া যায় না।

বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরে কথকগুলি লোক আছে, তাহারা কৃত্রিম স্বর্ণসিন্দুর ও কৃত্রিম লৌহাদি সস্তাদরে বিক্রয় করিয়া থাকে। চৌদ্দ আনি গেউর মাটীও দুই আনা কয়লারগুড়াতে তাহাদের লৌহ হয়, চা খড়ি দ্বারা তাহাদের বঙ্গ হয়, চুলার পোড়া মাটী দ্বারা তাহাদের অভ্র হয়। এই শ্রেণীর প্রবঞ্চকগণ বহুদিন হইতে কৃত্রিম ঔষধ বিক্রয় করিয়া সমাজকে প্রতারিত করিতেছে! ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে! যাহাদিগকে প্রয়োজনানুরূপ অভ্র-লৌহাদি প্রস্তুত করিতে দেখি না, তাহারা ঐ সকল অভ্র লৌহাদি দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। আর সস্তার প্রলোভনে সমাজ ঐ সকল মাটী খাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

তাই বলিতেছি যত দিনে বর্ণজ্ঞান শূন্য মূর্খ লোকের হাতে চিকিৎসার ভার থাকিবে এবং সস্তাদরের কৃত্রিম ঔষধ সমাজে প্রচলিত থাকিবে, ততদিনে আয়ুর্ব্বেদের অবমাননা ভিন্ন গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

মূর্খের চিকিৎসায় ও কৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুতে বাধা দিবার শক্তি আমাদের সমাজে কখনও কাহাও হইবে না। এই দুই কার্য্যে রাজ শক্তির প্রয়োজন। ভেজাল ঘৃত প্রভৃতি নিবারণের ন্যায় যদি ভেজাল ঔষধ নিবারণের উপায় থাকিত, তবেই সমাজ রক্ষা আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইত নচেৎ ক্রমেই আয়ুর্ব্বেদের গৌরব নষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অপেক্ষাকৃত সুলভে বিক্রয় করিতে হইলে এবং দেশের উপকার করিতে হইলে এভাবে

ব্যক্তি বিশেষের হাতে ঔষধের কারখানা না রাখিয়া দেশের রাজা মহারাজা এবং ধনী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাহায্যে সাধারণের সম্পত্তি স্বরূপ স্থানে স্থানে ২। ৩টী বৃহৎ আকারে ঔষধের কারখানা রাখা উচিত। ঐ সকল কারখানায় বহু যন্ত্রাদির সাহায্যে লৌহ প্রভৃতি জারিত দ্রব্য ও মকরধ্বজাদি এবং তৈল ঘৃতাদি বহুল পরিমাণে প্রস্তুত থাকিবে। ঔষধগুলি রাসায়নিক পরীক্ষক দ্বারা সময় সময় পরীক্ষিত হইলে ইহাতে কৃত্রিমতার লেশও থাকিতে পারিবে না। এই সকল ঔষধালয় হইতে কবিরাজগণ পাইকারী দরে ঔষধ খরিদ করিতে পারিবেন। যে সকল নিঃস্ব কবিরাজ অর্থাভাবে ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ঔষধ নিয়া ব্যবসায় করিতে পারিবেন। অর্থবান চিকিৎসকগণেরও অসুবিধা হইবে না।

শ্রীঃ—

---

# রামায়ণী সমাজ

## অনার্য্য সমাজের জাতিতত্ত্ব

রামায়ণী যুগে উত্তর ভারতের কতিপয় স্থান ব্যতীত প্রায় সমগ্র দেশ অনার্য্য বসতিতে পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদে যেমন অনার্য্যদিগকে আর্য্য ঋষিরা 'দস্যু', 'দাস', 'কৃষ্ণত্বচ', 'কৃষ্ণযোনী,' দাসী' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরিচিত করিয়াছেন, পুরাণ ও সংহিতাকারগণ যেমন শূদ্রকে 'ব্রহ্মারপদ-যাত', 'অস্পৃশ্য' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন, রামায়ণের কবিও কবি সুলভ রস প্রেরণায় তাঁহার সমসাময়িক অনার্য্যদিগকে—বানর, উলুক, ভল্লুক, মৃগ, পক্ষী, রাক্ষস ইত্যাদি নানা প্রকার বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছেন। এইরূপ উক্তি কবিদিগের লেখনীতে নানাকারণে প্রসূত হয়। এক—ঘৃণা প্রদর্শন, দ্বিতীয়—আমোদ উপভোগ, তৃতীয়—অজ্ঞতা, ইত্যাদি আমাদের জাতীয় কবির প্রদত্ত সংজ্ঞা মিলাইয়া যদি

"বানর ঔরষে জন্ম রাক্ষসী উদরে"

এমন কোন জাতির অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে সেরূপ জাতির অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অনুসন্ধান নিষ্ফল হইবে। কিন্তু এইরূপ রাক্ষস ও বানর জাতির শব্দর-আচার বা স্বভাব সম্পন্ন মানব জগতে বিরল নহে, সুতরাং সেরূপ জীবের অস্তিত্ব আমরা অর্থ বোধ দ্বারা উপলব্ধি করিয়া লইতে পারিন। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমরা কোন রামায়ণ ভক্ত-বিশ্বাসীর মনে আঘাত দিতে ইচ্ছা করি না।

এই পক্ষ এবং লাঙ্গুলধারী অনার্য্যদিগের মধ্যেও যে আর্য্য আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং ইহারাও যে তৎসাময়িক মানব সমাজের এক একটী অংশ ছিল তাহা মহাকবি বাল্মীকি তদীয় মহাকাব্য রামায়ণে নানাভাবে ও নানারূপ ইঙ্গিতে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; তাহার আভাস এই গ্রন্থের নানা বিষয়ের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। বক্ষমান জাতি তত্ত্ব অধ্যায়ে আমরা কেবল এই মাত্র বলিব যে হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতি লাঙ্গুলধারী বানর ও ভল্লুকগণ, জটায়ু, সম্পাতি প্রভৃতি পক্ষধারী গৃধ্রগণ এবং 'কিস্তুত কিমাকার' রাক্ষসগণ দক্ষিণ ভারতের অনার্য্য অধিবাসী ছিলেন। মহাকবির উদ্দেশ্য ঘৃণা প্রকাশ, আমোদ উপভোগ, না অজ্ঞতা, আমরা তৎ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিতেছি না, কেন না সে সম্বন্ধে আমরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ।*

---

* ইটালিয় ভাষায় রামায়ণের অনুবাদক গোরেসিও (Gorresio) সাহেব এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গ্রীফিথ সাহেবের রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত হইল—

"The army which Rama led on this expedition was, as appears from the poem, gathered in great part from the region of the Vindhya hills, but the races which he assembled are represented in the poem as monkeys, either out of contempt for their barbarism or because at that time they were little known to the Sanskrit-speaking Hindus. The people against whom Rama waged war are, as the poem indicates in many places different in origin in civilization, and in worship from the Sanskrit Indians; but

অনার্য্য লাঙ্গুলী-সমাজ বহুবর্ণে বিভক্ত ছিল। (১)

অনার্য্য রাক্ষস সমাজে 'ব্রহ্ম রাক্ষস' অনেক ছিলেন। সুন্দরকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ডের নানা স্থানে তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) সুতরাং এই সমাজেও যে গুণ কর্ম্মের বিভাগ ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। রাক্ষস সমাজে আচার ব্যবহারের যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন রাক্ষস সমাজে মৃতদেহ কবর দেওয়ার প্রথা ছিল, (৩) লঙ্কার রাক্ষস সমাজে মৃতদেহ দাহ করিবার রীতি ছিল। (৪) সুতরাং দাক্ষিণাত্যের রাক্ষসগণের সকলেই যে লঙ্কার রাক্ষসগণের এক জাতীয় ছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

বানরদিগকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বা নর ( বা+নর ) (wild man) বলিয়াই অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। মহাকবিও এই অর্থে বানরদিগকে পরিচিত করিয়াছিলেন কি না এবং কোন পরবর্ত্তী ভূত সেই বা নরের পশ্চাতে লাঙ্গুল ও তদোচিত কার্য্যাবলী যোজনা করিয়া মহাকাব্যের এই বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন কি না, এই বৈজ্ঞানিক যুগে সকলেই তাহার অনুমান ও বিচার করিতে পারিবেন। বিচারকালে এইটী মনে রাখিলেই চলিবে যে, এই আত্ম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দিনেও ভারতবর্ষের কোন কোন মানব সমাজ কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালী (৫) ও মহাবীর হনুমানের (৬) বংশধর বলিয়া সগর্ব্বে আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহাদের কাহারও রক্ত মাংসের লাঙ্গুল নাই বরং দুইএকজনের আছে—আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত শাব্দিক লাঙ্গুল!

---

the poet of the Ramayana, in this respect like Homer, who assigns to Troy customs creeds and worship similar to those of Greece, places in Ceylon the seat of this alien and hostile people, names, habits and worship similar to those of Sanskrit India. The poet calls the people whom Rama attacks—Rakshasas. Rakshasas, according to the popular Indian belief, are malignant beings, demons of many shapes, terrible & cruel, who disturb the secrifices and the religious rites of the Brahmans. It appears indubitable that the poet of the Ramayana applied the hated name of Rakshaas to an abhorred and hostile people, and that this denomination is here rather an expression of hatred and horror than a real historical name. —Ramayana Vol. VI. Preface.

রাক্ষস ও বানরদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই তাহাদিগকে দক্ষিণাপথের অনার্য্য অধিবাসী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। Monier Williams রামায়ণের আলোচনায় লিখিয়াছেন :—

"The story of the Ramayana, notwithstanding its wild Exaggerations, rests, in all probability, on a foundation of historical truth. It is certainly likely that at same remote period, probably not long after the settlement of the Aryan races in the plains of the Ganges, a body invaders headed by a bold leader and aided by the barbarous hill tribes may have attempted to force their way into the peninsula of India as far as Ceylon. The heroic Exploits of the chief would naturally become the theme of songs and ballads. The hero himself would be deified, the wild mountaineers and foresters of the Vindhya and neighbouring hills who assisted him would be converted into monkeys, and the powerful but savage aborigines of the south into many headed orgres and blood lapping demons called Rakshasas."

Indian Epic Poetry.

(১) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড—৩১শ সর্গ।

(২) রাবণের মৃত দেহ দাহ কালে ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণ স্তুতি পাঠ করিয়াছিলেন। (১১৩শ সর্গ—লঙ্কাকাণ্ড)

(৩) বিরাধের মৃত দেহ কবর দেওয়া হইয়াছিল—আরণ্য কাণ্ড ৪র্থ সর্গ।

(৪) রাবণের মৃত দেহ দাহ করা হইয়াছিল—লঙ্কাকাণ্ড ১১৩ সর্গ।

(৫) বাবু নবীনচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন—"Rai Sarat Chandra Das C. I. E. has published several Tibetan legends, according to which the ancient family of Tibet claimed its descent from **Honuman.**—"

A note on the Antiquity of the Ramayana.

(৬) "There are people in Orissa, who still trace their origin from Bali." Ibid—Page 6.

# বৌদি।

মা হারা হ'য়ে অবধি এ দুনিয়ায় বৌদি ছাড়া আর কাউকে জানতুম না। এই অসীম নীল আকাশের নীচে একমাত্র বৌদির সুধামাখান কোলটুকুই ছিল আমার সকল ব্যথা জুড়াবার স্থান। যেমন করে পাখী তার দুর্ব্বল পাখা দুখানীর আড়ালে রেখে আপনার শাবককে শত্রুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে, বৌদি ঠিক্ তেমনি যত্নে তাঁর প্রাণের সমস্তটুকু স্নেহ দিয়েই আমায় ঘিরে রাখ্‌তো। ঠিক করে পড়া বল্‌তে পারতুম না বলে দাদা যখন আমার কাণ টেনে ধরে পিঠে এক ঘা ব'সিয়ে দিতেন, আমি ক্রোধে ও অভিমানে দাদার হাত ছেড়ে পালিয়ে এসে একবারে বৌদির কোলে ঝাঁপিয়ে পরতুম। সেখান থেকে আমায় কেড়ে নিয়ে যাওয়া যে দাদার সাহসে কুলাবে না, সেটা আমার অবশ্যই জানা ছিল। তখন বৌদি আঁচল দিয়ে আমার অশ্রু সজল মুখখানি মুছিয়ে দিতেন, আর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে রূপকথার সোনার কাঠীর গল্প বলে আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তেন। দাদা সময় সময় বৌদিকে লক্ষ্য করে বলতেন "এটার সর্ব্বনাশ না করে তুমি ছাড়বেনা দেখ্‌ছি! এতটা প্রশ্রয় দেওয়া কি ঠিক্? এত বড় ছেলে, লেখা পড়ার নাম নেই, কেবল"—অমনি বৌদি বলে উঠতেন "হাঁ হাঁ আর আমায় বলতে হবে না, সবই আমি শুনি"—তখন দাদা চোখে ক্রোধ এবং মুখে অপরিসীম হাসি নিয়ে চ'লে যেতেন। এ দেখে আমি ও বৌদি কত হাসি তামাসা করতুম। এমনি করেই আমার শৈশবের দিনগুলো বেশ কেটে যেতে লাগল।

লেখাপড়া শেখা আমার হয়ে উঠেনি। চারদিকের লোকগুলো থেকে কেবল শুনতুম - আমার লেখা পড়া শেখবার মত নাকি মাথাই নাই। এও কি একটা যুক্তি? কই কারও ত আর একটা বই মাথা দেখি নি? তবে --বৌদি বলতেন "মাথার ভিতর নাকি একটা কি জিনিষ আছে, সেটা যার যত বেশী—" যাক্ ও সব কথা।

* *

সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর বিকালে আকাশটা বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে। সূর্য্যের স্নিগ্ধ মধুর কিরণ টুকু পৃথিবীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে, কি কোমল হাসিই না হাসছিল সে দিন! পবনদেব এক একবার তার শিক্তদেহখানি দিয়ে গাছ পালাগুলোকে চেপে ধরছিল; তারা যেন শীতে আরষ্ট হয়ে শিউরে উঠ্‌ছিল। আমি ও বৌদি বারান্দার রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে নব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছিলুম। এমন সময় পেছনে পদশব্দ শুনে চেয়ে দেখি—দাদা আরব্য উপন্যাসের বিরাট দৈত্যের মত অগ্নিমূর্ত্তী নিয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসছেন। মুখ তাঁর অস্বাভাবিক লাল, চোখদিয়ে যেন একটা অগ্নি গোলা ছুটে বেরুচ্ছে। দাদার এ অদ্ভুতপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে আমি দু'পা পিছিয়েই হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পরলুম। বৌদিও বিস্ময়ে অবাক্।

দাদা এক লাফে বাঘের মত আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়লেন এবং আমায় টান্‌তে টান্‌তে সিঁড়ির দিকে চললেন। টেনে নিতে নিতে দাদা চীৎকার করে বল্‌ছিলেন "হতভাগা! বের হ' বাড়ী থেকে—আমি আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না মরণ কি নেই? যে চারবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে না তাকে ভাই বলে পরিচয় দিতেও চাই না। হতভাগা! এবারও ফেল করেছিস্! কেবল অন্নধ্বংশ—আর ইয়ারকি—। এক্ষুণই বের হয়ে যা।" বল্‌তে বল্‌তে আমায় হুর্ হুর্ করে নীচে টেনে আন্‌লেন এবং এক ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিলেন। কপালের খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। আমি জ্ঞান হারালুম।

জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি আমি বিছানার উপর বৌদির কোলে শুয়ে আছি। চোখ্ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পর্‌ছিল? আমি হঠাৎ কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। ক্রমে সব কথাই মনে পড়ে গেল। লজ্জা এবং অভিমান চারদিক থেকে আমায় চেপে ধরল। আত্ম সংবরণ করা একরূপ অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। আমি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলুম। বৌদিও কাঁদতে লাগল। এই ক্রন্দনের ভিতরেই যে উভয়ের মধ্যে কতখানি

প্রাণের কথা বলা হয়ে গেল, তা কেবল আমরা দুজনেই বুঝলুম, আর বুঝলেন, আমাদের অন্তরের দেবতা।

অনেক চেষ্টার পর বৌদিকে বল্লুম "বৌদি! দাদা আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তবে তুমি কেন আবার আমায় তুলে আনলে। রাস্তার উপর পড়ে মরাই যে ছিল আমার পক্ষে ভাল। এ জীবনের আর মূল্য কি? একবার নয়, চার চার বার—"

বৌদি আমায় বাধা দিয়ে বল্লেন "ছি ভাই, বড় ভাইয়ের কথায় কি রাগ করতে আছে, না হয় তিনি"—

আমি বল্লুম "রাগ করিনি বৌদি! তিনি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। নিজের পায় দাঁড়াতে উত্তেজিত করেছেন। আমায় ক্ষমা কর বৌদি! কত অন্যায় তোমাদের কাছে করেছি, ছোট ভাই বলে সব ভুলে যেও। আর তোমাদের কষ্ট দেব না। আমি নিজেই নিজের পথ খোঁজে নেব। একটা কিছু আমার করতেই হবে।"

বৌদি চম্‌কে উঠে বল্লেন—"সে কিরে কোথায় যাবি তুই? তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাক্‌ব সেটা একবার ভেবে দেখেছিস্ কি? মা মরবার সময় আমার হাতেই যে তোকে সঁপে দিয়ে গেছেন। এই আঠার বৎসর না তুই আমারি বুকে মানুষ হয়েছিস্। আমার নিকট এ কথাটা বলতে তোর ঠোঁট একটুও কেঁপে উঠল না? তুই কি এতই নিষ্ঠুর যে একটা তুচ্ছ কারণে আমার মনে কষ্ট দিবি। কিছুতেই তোকে যেতে দেবো না। বাড়ী ছেড়ে কখনও যে তুই কোথাও যাস্‌নি। এখনও আমার হাতে না খেলে তোর পেট ভরে না। বিদেশে কে তোর অভাব বুঝবে, কে তোর দুঃখে সহানুভূতি দেখাবে, সেটা একবার চিন্তা করে দেখেছিস্ কি?—" বৌদির কথায় কতকটা শান্ত হলুম বটে কিন্তু সঙ্কল্প অটুট্ রয়ে গেল।

* *

এক বাদলার দুর্য্যোগে অলক্ষ্যে উল্কাপিণ্ডের মত গৃহত্যাগ করলুম। বৌদির কথা মনকে ভাবতেই দেই নি, হয় ত শেষে যাওয়া না ঘটে! রাস্তায় এসে দুছত্র লিখে পাঠালুম—আমায় যেন কেউ খোঁজ না করে, কারণ সেটা নেহাতই বৃথা হবে। মানুষ হয়ে যদি কখনও ফিরে আসি, তবেই আবার দেখা হতে পারে, নতুবা এই ত এই শেষ। আর লিখলুম—আমায় যেন তারা ভুলেই যেতে চেষ্টা করেন।

আমার এ বিদ্যা নিয়ে চাকরীর একটা জোগাড় করা যে বাতুলতা মাত্র, সেটা কেবল আমার মত যারা তাঁরাই জানেন। উপোস করে দিন যে আর চলে না? অগত্যা কিছুদিন দেখে বাঙ্গালী পল্টনে নাম লিখে দিলুম।

* *

পুষ্প মাল্যে শোভিত হয়ে যখন গাড়ীতে উঠে বস্‌লুম তখন পর্য্যন্ত মনটা আমার বশেই ছিল। ক্রমে যখন হাবড়া ষ্টেশন আমাদের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তখনই যেন কি একটা অভাব বোধ করতে লাগলুম। মনটাকে কল্পনার রাজ্যে টেনে নিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু হতভাগার কিছুতেই লক্ষ্য নাই। মন যেন আমায় ক্রমাগত বিপরীত দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। যে সংকল্প নিয়ে বাড়ী থেকে বেড়িয়েছি, সেটা বুঝিবা ফেঁসে যায়। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বল্লে এখনও সময় আছে চেষ্টা করে নাম কাটিয়ে নিতে পার। সমস্ত রাস্তাটাই মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটিয়ে দিলুম, ফিরে যাওয়া আর হয়ে উঠল না।

* *

করাচীর সমুদ্রের ধারে বসে সকলে যখন হাস্য কৌতুকে সমুদ্রতীর মুখরিত করত, আমি একধারে বসে এক দৃষ্টে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে থাক্‌তুম। থাক্‌তে থাক্‌তে ভুলে যেতুম আমার অস্তিত্ব, আমার বর্ত্তমান জীবন, করাচী বন্দর, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, পল্টন—সব ভুলে যেতুম। কেবল মনে পড়ত—সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের একটা ছায়া বহুল গ্রাম্যগৃহ—সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃসমা বৌদি—আর মনে পড়ত কত কি?—তাঁর স্নেহ, মিষ্ট ভর্ৎসনা—আর আমার নিষ্ঠুরতা! কল্পনার চক্ষে দেখতুম—বৌদির চক্ষে জল, ভাবতে ভাবতে যেন বৌদি শুকিয়ে

গেছে—রোগে শয্যাগত—আমার নাম ধরে কত ডাক্‌ছে—আর ভাবতেও যে কষ্ট হয়, এমন সব কথা।

আমি জাগ্রত অবস্থায়ই এ সব স্বপ্ন দেখতুম—কেবল বৌদি ময় জগৎ। ভাব্‌তে ভাব্‌তে পাগলের মত সমুদ্রের ধারে ছুটে বেড়াতুম। যখন দিনের আলো নিভে গিয়ে একটা বিরাট অন্ধকার এসে জগৎকে গ্রাস করে বস্‌ত, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আমাদের সৈন্যাবাসে ফিরে আসতুম।

* *

ছুটী সুদীর্ঘ বৎসর এমনিভাবেই কেটে গেল। ইতিমধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ আমার যোগ্যতা দেখে মেসপটমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাইরের চিন্তা থেকে দূরে থাকবার জন্য সর্ব্বদাই একটা না একটা কাজ নিয়ে থাকতুম। হাতের কাজ ফুরিয়ে গেলেই আবার চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়্‌তুম। দিনের বেলায় অসহ্য গ্রীষ্মে এবং রাত্রিকালের অসহ্য শীতে আমার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়্‌ল।

ভারতের কোন চিহ্নই সেখানেনেই কেবল ধূ ধূ বালুকা আর উত্তপ্ত বায়ু। চিন্তার মাত্রা ক্রমে এত বেড়ে গেল যে শেষে উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লুম—বুঝি এইবারই সকল চিন্তার অবসান হয়! অসুখ নিয়েই কাজ করতুম—কেবল মৃত্যুর দিনগুলোকে কাছে টেনে আনবার জন্য।

একদিন যন্ত্রণা এমন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল যে আমার ঊর্দ্ধতন—কর্ম্মচারীর নিকট গিয়ে কেঁদে ফেল্লুম। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন, তাঁরই অনুগ্রহে অল্পদিনের মধ্যেই সুবদার পদে আমার উন্নতি হয়েছিল। আমার মনের অবস্থা দেখে তিনি আমায় কয়েক মাসের ছুটী দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

* *

আজ কতদিন পরে বাড়ীতে যাচ্ছি। এতদিনের মধ্যে বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখেও জানাইনি—আমি কোথায় আছি। আমি জীবিত কি মৃত এ কথাও হয় ত তারা কেউ জানে না। বৌদি এবং দাদা আমায় দেখে না জানি কতই সুখী হবেন। আর আমার উন্নতিতে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। ভাবলুম না জানিয়ে হঠাৎ বাড়ী গিয়ে বৌদিকে চমকিয়ে তুলব।

* *

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় এসে বাড়ী পৌঁছলুম। স্পন্দিত বক্ষে রুদ্ধশ্বাসে, ক্ষীণ দেহ যষ্টিখানকে একপ্রকার জোড় করে বাড়ীর ভিতর টেনে আনলুম। তখন আমার প্রাণের ভিতরে কি বিরাট কাণ্ডই না চল্‌ছিল? নিঃশব্দে বৌদির দরজায় এসে দাঁড়ালুম।

ঐ বৌদি শুয়ে কি একটা পড়ছে—নয়? আমি "বৌদি" বলে ডেকে উঠ্‌লুম। যে শুয়েছিল—আমার ডাক্‌ শুনে হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে তাকিয়েই লজ্জায় জড়সড় হয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে ফেল্লে। আমিও "একি" বলে বিস্ময়ে দু'পা পেছিয়ে দাঁড়ালুম। ঠিক এমনি সময় আমাদের পুরাতন ঝি "কে ছোট বাবু এসেছো!" বলে চেঁচিয়ে উঠল। আমি তাকে দাদার কথা ও বৌদির কথা জিজ্ঞাসা করলুম। উত্তরে যা শুনলুম, তাতে মাথায় যেন আমার আকাশ ভেঙ্গে পড়ল; দাদা আপিসে গেছেন। আর আমার অন্ধের যষ্টী মাতৃস্থানীয়া বৌদি—ইহজগতে নাই। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে একদিন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ মারা গেছেন। দাদা ইতিমধ্যেই আবার বিয়ে করেছেন। এইমাত্র যাকে ঘরে দেখলুম, সেই নাকি নবৌ।

আমি ঝিয়ের গলা ধরে কেঁদে উঠলুম। যাকে দেখবার জন্য, যার মুখের একটা সুধা মাখা কথা শুনবার জন্য, সুদূর মেসপটমিয়া থেকে ছুটে এসেছি, সে আজ আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। তবে আর কার মুখ চেয়ে ঘরে থাকব? যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতার মধ্যেও যার মুখখানি সতত চোখে ভেসে উঠ্‌ত, যাকে দেখবার জন্য এখনও বেঁচে আছি। আমার সেই বৌদি নাই। তার মনে কত কষ্টই না দিয়েছি, কত কষ্টেই না জানি তাঁর শেষ নিশ্বাসটুকু বেড়িয়েছে। হায় দুরদৃষ্ট! একবার তার পা ধরে ক্ষমা চাইতেও দিলে না। তাকে একবার দেখবার আশাতেই যে এতদিন প্রাণ শেষ কর্ত্তে পারিনি;—আর ভয় নাই। জন্ম-

তুমি এই শেষ বিদায়! চন্নুম, আর হয় ত এ পাপী স্পর্শে তোমার দেহ কলঙ্কিত হবে না—"এই কথাগুলি বলে, চখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে যেই এক পা বাড়িয়েছি অমনি কে একজন ঘর থেকে ধাঁ করে বেড়িয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরল। এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ, অথচ যেন কত পরিচিতের মতই বল্লে "ছি ভাই! এই যে আমি তোমার বৌদি এখনও জীবিত। কোথা যাবে তুমি—ঘরে চল, আর কোথাও তোমায় যেতে দিব না। তোমার জন্য ভাবতে ভাবতে তোমার দাদার চেহারা যা হয়েছে, যদি একবার দেখতে! মুহূর্ত্তের জন্যও, তাঁর মনে সুখ নেই।" বলতে বলতে আদর করে আঁচল দিয়ে আমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি মুছিয়ে দিতে দিতে সেও কেঁদে ফেল্লে।

কৃতজ্ঞতায় ও ভক্তিতে ন বৌদির অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত চরণে আপনি শির নেমে এল! আমি অস্ফুটস্বরে বলিলাম—"বৌদি—"

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর সরকার।

---

# বড়াল কবির মৃত্যুতে।

(১)

কত শোক দুঃখ বহি', জীবন-যন্ত্রণা স'হি',
হে কবি, চলিয়া গেলে অমৃতের দেশে!
অদৃষ্টের উপহাস, সহিয়াছ বার মাস,
বিশ্বাস ছাড়নি তবু গেছ কেঁদে হেসে।
ক্রন্দনে কেঁদেছে বিশ্ব, কাঁদিয়াছে ধনী নিঃস্ব,
প্রকৃতি কেঁদেছে সাথে, সার্থক ক্রন্দন।
তোমার মধুর হাসি, ভালবাসি ভালবাসি,
ক্রন্দনের পাশাপাশি অপূর্ব্ব শোভন!

(২)

কি সুন্দর তোমার কবিতা!
শরতের মেঘে ঢাকা শশী ও সবিতা!
ফুটিয়াছে আলো-ছায়া, বাড়ায়েছে মোহ-মায়', 
সুন্দর করেছে ধরা শত সুষমায়!
পাখীরা পেয়েছে খালি, সকলে দিয়াছে তালি,
কত কবি নত শিরে প্রণমিল পায়!
পদে পদে কত যতি, সংযত বিনত অতি,
লালসার চিহ্ন নাহি, নাহি অট্ট হাসি!
ঠিক যেন হিন্দু বধূ, মৃদু কথা হৃদে মধু,
নাহি সে দেমাক্ তার উগ্র রূপরাশি!

(৩)

দরিদ্রের কোথায় আদর!
প্রতিভা থাক্ না তার, সে প্রতিভা উপেক্ষার,
বঙ্গের ভিতর!
এ জাতি জেনেছে—টাকা জীবন-গাড়ীর চাকা,
নহিলে সকলি ফাঁকা, নিত্য অপমান!
তাই এত দিনে রাতে, পা চাটিতে সবে মাতে,
উড়িতেছে ভণ্ডামির বিজয়-নিশান।
এদেশে গোবিন্দ দাস, তাই করি উপবাস,
অপমানে অনাহারে বরিল মরণ!
হে কবি, তুমিও তাই, সমাদর পাও নাই,
সহিয়াছ দুঃখ-কষ্ট, দুর্ব্বহ জীবন!

(৪)

নব্য বঙ্গ কবিদের হে গুরু মহান্!
তোমার প্রতিভা পূজি', একা একা যাব বুঝি',
স'হিয়া অসহ জ্বালা ঘোর অপমান।
তোমার কাব্যের মাঝে, তোমার ও মূর্ত্তি রাজে,
কালজয়ী, অচঞ্চল, অক্ষয়, অমর!
তথাপি তোমার তরে, নিয়ত নয়ন ঝরে,
বেদনায় বুক ভাঙে, কাতর অন্তর!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

---

# বৃহস্পতি।

সৌর জগতের গ্রহগণকে সাধারণত দুইভাগে বিভাগ করা যায়। বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী ও মঙ্গল (Mars) সূর্য্যের নিকটস্থ এই ৪টী গ্রহ ক্ষুদ্রগ্রহ, এবং ইহাদের বহির্দ্দেশে কতগুলি উপগ্রহের পরে বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), উরেনস্ (Uranus) ও নেপচুন (Naptune) এই ৪টি বৃহৎগ্রহ। সৌর জগতে আপাততঃ এই কয়টি গ্রহই বর্ত্তমান।

ইহাদের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিত হার্সেল একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি একটি সমতল ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে ২ ফিট ব্যাসের গোলাকার পিণ্ডকে সূর্য্য কল্পনা করিয়াছেন। এই সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ১৬৪ ফিট ব্যাসার্দ্ধে একটি সর্ষপবৎ বুধ ভ্রমণ করিতেছে; ২৮৪ ফিট ব্যাসার্দ্ধে একটি মটরবৎ শুক্র, ৪৩০ ফিট ব্যাসার্দ্ধে একটি মটরবৎ পৃথিবী, ৬৫৪ ফিট ব্যাসার্দ্ধে একটী বড় আলপিনের মাথার মত মঙ্গল, ১০০০ হইতে ২০০০ ফিট ব্যাসার্দ্ধে কতগুলি বালুকা কণাবৎ উপগ্রহ সমূহ, প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যাসে একটী মধ্যমাকৃতি কমলার মত বৃহস্পতি, ⅘ মাইল ব্যাসে একটী ক্ষুদ্রাকৃতি কমলার মত শনি, প্রায় ১½ মাইল ব্যাসে ক্ষুদ্রাকৃতি একটী বদরী ফলের মত উরেনস্ এবং ২½ মাইল ব্যাসে একটী বৃহৎ বদরীবৎ নেপচুন ঐ সূর্য্যের চারিধারে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে।

এই উপমা দ্বারা সূর্য্য মণ্ডলের গ্রহাদির আকার ও দূরত্ব সম্বন্ধে একটু ধারণা করা যায়। এই গ্রহাদির তুলনায় নক্ষত্রগণের দূরত্ব সম্বন্ধে একটু ধারণা করিবার জন্য হর্সেলের চিত্রের অনুপাতে অধ্যাপক ইয়ং (Professor Young) বলিয়াছেন যে পৃথিবী হইতে নিকটস্থ নক্ষত্রের দূরত্ব ৮ হাজার মাইল।

বৃহস্পতিকে গ্রহের রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ অপর সকল গ্রহ একত্র যোগেও ইহার সমান নহে। ইহার ব্যাস ৮৬৫০০ মাইল অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর প্রায় ১১ গুণ বড়। ইহা দ্বারাও ইহার আয়তন উপলব্ধি হয় কি না জানিনা। অপর কথায় বলিতে গেলে ইহার উপরিভাগের পরিমাণ ফল আমাদের পৃথিবীর ১১৯ গুণ। ইহার আয়তন পৃথিবীর ১৩০০ গুণ। অপর দিকে দেখিতে গেলে পৃথিবীর উপাদান বৃহস্পতির উপাদান হইতে ৪ গুণ ঘন সন্নিবিষ্ট, কাজেই বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মাত্র পৃথিবীর ২'৬৪গুণ অধিক। সুতরাং পৃথিবীতে যে বস্তুর ওজন মাত্র ১ সের, বৃহস্পতিতে তাহার ওজন প্রায় ২ সের ১০ ছটাক। ইহার ব্যাস সূর্য্যমণ্ডলের 1/10 ভাগ এবং পরিধি পৃথিবী হইতে চন্দ্র মণ্ডল যত দূরে তাহা হইতেও অধিক, কিন্তু ঘনত্ব প্রায় সূর্য্যমণ্ডলের মত। ইহার বিশাল আকার এবং অণুসকলের লঘু সন্নিবেশে (Low density) মনে হয়, ইহা এখন পৃথিবীর মত নিরেট না হইয়া সূর্য্যের মত লঘুই রহিয়াছে এবং ক্রমে পৃথিবীর আকার প্রাপ্ত হইতেছে। সে জন্যই পণ্ডিতগণ বৃহস্পতি, শনি, উরেনস ও নেপচুন এই ৪ টী বৃহৎ গ্রহকে সূর্য্যত্ব হইতে পৃথিবীত্ব প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে করেন।

বৃহস্পতি সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৮ মাইল বেগে ধাবিত হইয়া তাহার কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, এরূপ দ্রুতগতি সত্ত্বেও সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহার দ্বাদশ বৎসরের কিঞ্চিৎ কম সময়ের প্রয়োজন হয়।

পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করার সময়ে প্রতি ৩৯৯ দিন অন্তর একবার করিয়া বৃহস্পতির নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। পৃথিবী যখন বৃহস্পতির নিকটে আসে, তখন পৃথিবী ও বৃহস্পতির দূরত্ব ৩৬ কোটী ৯০ লক্ষ মাইল এবং যখন দূরে থাকে তখন ৫৭ কোটী ৬০ লক্ষ মাইল ব্যবধান হইয়া থাকে।

সূর্য্য হইতে বৃহস্পতির দূরত্বের গড় ৪৮ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল। বৃহস্পতির কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের উপরে ঈষৎ তির্য্যকভাবে অবস্থিত; কেবল মাত্র ১ ডিগ্রি ১৯ মিনিট বক্র।

প্রতি ১৩ মাস অন্তর পৃথিবী যখন তাহার কক্ষে চলিতে চলিতে বৃহস্পতির নিকটে আসে, তখন মনে হয় যেন কিছু সময়ের জন্য বৃহস্পতি স্থির থাকিয়া পশ্চাৎ দিকে গমন করিতেছে।

নিজ অক্ষ রেখার উপরে বৃহস্পতি অত্যন্ত প্রবলবেগে ঘুরিতেছে; কারণ এই বিশাল গ্রহটী একবার ঘুরিয়া আসিতে মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট সময় লাগে অর্থাৎ বৃহস্পতিতে কোন স্থানে সূর্য্য উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত মাত্র ৫ ঘণ্টা আন্দাজ সময় লাগে। বৃহস্পতির এই ঘূর্ণনে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা শক্ত পদার্থের মত সমভাবে ঘোরে না অর্থাৎ ইহার ঘূর্ণন অনেকটা সূর্য্যের মত। ইহার বিষুব রেখা একবার ঘুরিতে ৯ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট সময় লাগে কিন্তু ইহার মেরু প্রদেশের ঘুরিতে ৭ মিনিট

অধিক সময় লাগে। এক অক্ষ রেখার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও সমান বেগে ঘুরে না। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, বৃহস্পতি এখনও নিরেট অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

বৃহস্পতির অক্ষরেখা নিজ কক্ষের উপরে মাত্র ৩ ডিগ্রি বক্র হইয়া চলে, কাজেই ইহাতে কোনরূপ ঋতু পরিবর্ত্তন হয় না।

গ্রহরাজ বৃহস্পতি চন্দ্রের জন্য বিখ্যাত, এ যাবৎ বৃহস্পতির ৮টী চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের ৪টীর আবিষ্কার আধুনিক। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পরেই প্রথম বৃহৎ ৪টী চন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। ১৬১০ খৃঃ অঃ ৭ই জানুয়ারী গেলিলীও (Galilio) তাঁহার দূরবীক্ষণ বৃহস্পতির উপরে স্থাপন করিয়া ৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার মত পদার্থ ইহার ইতস্তত: চলিতে দেখেন এবং তিনি তাঁহার পৃষ্ঠ পোষক মেডিসির (Cosmode Medici) স্মৃতি রক্ষার্থ উহাদিগকে "মেডিসির নক্ষত্র" বলিয়া অভিহিত করেন।

১৮৯২ সন পর্য্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে গেলিলীওর আবিষ্কৃত কেবল মাত্র ৪টী চন্দ্রই বৃহস্পতির। ইহাদের নাম আইও (Io), ইয়োরোপা (Europa), গেনিমেডী (Ganymadi), কেলিষ্টো (Callisto)। নিকট হইতে দূরের দিকে পর্য্যায় ক্রমে ইহাদের নাম দেওয়া গেল।

বৃহস্পতির নিকটস্থ চন্দ্র আইও এবং ইয়োরোপা আকৃতিতে অনেকটা আমাদের চন্দ্রের মত। কিন্তু গেনেমেডি এবং কেলিষ্টোর ব্যাস প্রায় আমাদের চন্দ্রের দ্বিগুণ।

বৃহস্পতি হইতে ইহাদের দূরত্ব ক্রমান্বয়ে ২ লক্ষ ৬০ হাজার, ৪ লক্ষ ১৪ হাজার, ৬ লক্ষ ৬১ হাজার এবং ১১ লক্ষ ৬২ হাজার মাইল।

বৃহস্পতির দিনের হিসাবে প্রত্যেকের একবার বৃহস্পতিকে পরিবেষ্টন করিয়া আসিতে ৪½, ৮½ ১৭½ এবং ৪০½ দিনের প্রয়োজন।

যদিও বৃহস্পতির তুলনায় এই সকল চন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তথাপি ইহাদের গেনিমেডি চন্দ্র, বুধ গ্রহের দ্বিগুণ এবং প্রায় মঙ্গলের ⅓ অংশ বড় হইবে।

বৃহস্পতির চন্দ্র কয়টী প্রায় উহার বিষুব রেখার উপর দিয়াই ঘুরিয়া থাকে, কাজেই উহাদের গতি আমাদের পৃথিবীর কক্ষের সমসূত্রে। সুতরাং এই কয়টী চন্দ্রকে কখন বৃহস্পতির উপর দিয়া কখন বা তাহার পশ্চাতে চলিয়া যাইতে দেখা যায়।

পৃথিবী সূর্য্য হইতে যে আলো প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বৃহস্পতির চন্দ্র কয়টী তাহার ১/২৭ ভাগ মাত্র আলো পাইয়া থাকে। কাজেই ইহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল নহে। আবার ইহাদের মধ্যে কেলিষ্টোর বিশেষত্ব এই যে, সে অনেকটা অন্ধকার।

বৃহস্পতির এই চন্দ্র কয়টী সাধারণ ফিল্ডগ্লাস দ্বারাই দেখা যায়। ১৬১০ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত বৃহস্পতির এই ৪টী মাত্র চন্দ্রের কথাই লোকের জানা ছিল। ১৮৯২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে লিক্ মানমন্দির হইতে অধ্যাপক বার্ণার্ড (Professor Barnard) পঞ্চম চন্দ্র আবিষ্কার করেন। ইহা আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে ইহার ব্যাস মাত্র ১০০ মাইল। ইহা বৃহস্পতির অতি নিকটে আইয় চন্দ্রের অভ্যন্তর দিক দিয়া পরিভ্রমণ করে। বৃহস্পতিকে একবার বেষ্টনে ইহার মাত্র ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। উজ্জ্বল গ্রহের অতি নিকটে থাকাতে ইহাকে দেখা অত্যন্ত শক্ত।

১৯০৪ সনে লিক্ (Lick) মানমন্দির হইতেই অধ্যাপক পেরিনী (Professor Perrini) আলোক চিত্রের দ্বারা ইহার আর দুইটী ক্ষুদ্র চন্দ্র আবিষ্কার করেন। ইহারা অধ্যাপক গেলিলীওর আবিষ্কৃত প্রথম ৪টী চন্দ্রের বহির্দ্দেশ দিয়া পরিভ্রমণ করে। ১৯০৮ খৃঃ অঃ গ্রিনউইচ (Greenwich) মানমন্দির হইতে মিঃ মেলাটি (Mr. Melatte) ইহার অষ্টম চন্দ্র আবিষ্কার করেন। ইহাও আলোক চিত্র (Photography) দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। ইহা বৃহস্পতি হইতে অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। ইহার কক্ষ বৃহস্পতিকে ঠিক কেন্দ্রে না রাখিয়া, অর্থাৎ এক্‌ছেনট্রিক (Eccentric) ভাবে বর্ত্তমান। অপর কথায় বলিতে গেলে বৃহস্পতি ইহার কক্ষের কেন্দ্রে না থাকিয়া একপার্শ্বে স্থিত। ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা অপর চন্দ্রগণের বিপরীত দিকে চলিয়া থাকে।

ইহার পরেও বৃহস্পতির ২।১ টী চন্দ্র আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে।

ইহা উল্লেখ করিলে অশোভন হইবে না যে, সে সময়ে বৃহস্পতির চন্দ্র দ্বারাই আলোর গতি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। অতি প্রথমে বৃহস্পতির চন্দ্রের দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল চলিয়া থাকে।

১৬৭৫ সনে রয়েমার (Rœmer) নামক একজন ডেনমার্কবাসী জ্যোতির্ব্বিদ ইহার গ্রহণাদি সম্বন্ধে এক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেন। গেলিলীওর আবিষ্কৃত চন্দ্র চতুষ্টয়ের গতি ও কক্ষ জানা থাকাতে ইহাদের গ্রহণাদি সম্বন্ধে স্থির গণনা সম্ভব হইয়াছিল। পৃথিবী হইতে বৃহস্পতির দূরত্ব ও সান্নিধ্য হেতু উহার চন্দ্রগণের গ্রহণাদি, গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত সময়ের, অগ্র পশ্চাৎ হয়, অর্থাৎ পৃথিবী বৃহস্পতির নিকটে থাকা কালীন বৃহস্পতির চন্দ্রের গ্রহণাদি অনেকটা নিরূপিত সময়ে হয় এবং বৃহস্পতি দূরে অবস্থান কালীন গ্রহণাদি নিরূপিত সময় হইতে গৌণে হয়। পৃথিবী ও বৃহস্পতির দূরত্বের এতই বেশ কম হইয়া থাকে যে যখন উভয়ে নিকটে থাকে, তখন যে সময়ে গ্রহণ দেখা যায়, দূরে থাকা কালীন তাহা হইতে ১৬ মিনিট অধিক সময় লাগিয়া থাকে। আলোর গতি যদিও অত্যন্ত দ্রুত, তথাপি ইহার চলিতে যে সময়টুক লাগে, তাহাতেই পৃথিবী নিকটে ও দূরে থাকাতে যে ব্যবধান, সেটুক পর্য্যটন করিতে আলোর ১৬ মিনিট সময়ের প্রয়োজন। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯২ কোটী ৭ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল, কিন্তু এই সুদূর সূর্য্য মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে মাত্র ৮ মিনিট সময় লাগিয়া থাকে।

বৃহস্পতির চন্দ্রগণের বায়ুমণ্ডল থাকা অসম্ভব নহে। ফ্লেমেরিয়ন (Flammarion) এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে বৃহস্পতির চন্দ্রগণের বায়ুমণ্ডল বর্ত্তমান আছে। এবং তিনি ইহাও মনে করেন যে তথায় জীবের বসতি আছে।

অধ্যাপক বার্ণাড যে চন্দ্রটী আবিষ্কার করিয়াছেন যদি তথায় লোকের বসতি থাকে, তাহা হইলে তাহারা দেখিবে বিশাল বৃহস্পতি তাহাদের চক্রবাল হইতে ঊর্দ্ধে ৪৫০ ডিগ্রি স্থান পর্য্যন্ত জুড়িয়া রহিয়াছে।

বৃহস্পতির আলোক বিক্ষেপের ক্ষমতা (reflection) অত্যন্ত অধিক, সে জন্ত উহা সূর্য্য হইতে যে আলো প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার প্রায় ¾ অংশ ছড়াইয়া দেয়।

সূর্য্যের মত বৃহস্পতির পার্শ্বদেশ হইতে মধ্যপ্রদেশ অত্যন্ত অধিক উজ্জ্বল কিন্তু বুধ, শুক্র, এবং মঙ্গলের পার্শ্ব দেশ উজ্জ্বলতর বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক ইয়ং (Professor Young) অনুমান করেন যে বৃহস্পতির আবরণ অত্যন্ত স্বচ্ছ বিধায় এরূপ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির নিজের আলো অত্যন্ত প্রখর বলিয়া মনে হয় না, কারণ গ্রহণের সময়ে নিজের চন্দ্রগণকে আলোকিত করিতে ও সে অক্ষম।

প্রবল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা বৃহস্পতিকে অতি সুন্দর দেখায়। ইহাকে দেখিতে কোন নিরেট পদার্থ দেখিতেছি মনে হয় না; যেন বিবিধ রঙ্গের মেঘরাশি আবর্ত্তিত হইতেছে বোধ হয়। ঐ গ্রহের কোন বিশেষ চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাও এক স্থানে স্থায়ী দেখা যায় না। ইহাতে বিষুবরেখার সমান্তরাল কতকগুলি রেখা দৃষ্ট হয়। বিষুবরেখার দুই পার্শ্বে দুইটী প্রশস্ত স্থায়ী সমান্তরাল রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মেঘ পটল বারি সম্ভূত কিম্বা অপর কোন বস্তু দ্বারা উদ্ভূত তাহা স্থির বলা যায় না। ইহা ঠিক যে গ্রহের উত্তাপে কোন বস্তু গ্রহ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ক্রমে শীতল হইয়া নিম্নে পতিত হয়। দিবা কিংবা রাত্রিতে ইহাদের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাতেই মনে হয় যে এই মেঘ পটলের সঙ্গে সূর্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই। জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহার একটী চিহ্নকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, চক্রবালের সমান্তরালে বায়ব্য জহাজের মত একটী বিশাল চিহ্ন ১৮৭৮ সনে প্রথম পরিলক্ষিত হয়। তখন ইহার রং মৃদু গোলাপি এবং ইহা লম্বে ৩০ হাজার মাইল এবং প্রস্থে ৭ হাজার মাইল ছিল। এক বৎসরের মধ্যে ইহা গ্রহের প্রায় ⅙ অংশ স্থান জুড়িয়া ফেলে। ইহার রং ক্রমে সিন্দুর বর্ণ ধারণ করে, এবং ৪ বৎসরের মধ্যে ইহার বর্ণ ফেকাশে হইয়া যায়। বর্ত্তমানেও ইহার বর্ণ

পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সম্ভবত এই লোহিত বর্ণ চিহ্নটী আগ্নেয় গিরি জাতীয় কিছু হইবে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

——:-০-:——

# নেপালী দরবার।

## জঙ্গবাহাদুর।

নেপালী জঙ্গবাহাদুরের কথা লিখিব বলিয়া পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম। সুতরাং এবারে তাহাই লিখিতেছি। নেপাল স্বাধীন দেশ, তাই তাহার ইতিহাসটাও মারামারি রক্তারক্তির ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মহারাণী লক্ষ্মীদেবী নেপালের একজন ভীষণ প্রকৃতির রমণী ছিলেন; তাঁহার আমলে অকারণে বহু সর্দ্দার হত্যা ও প্রজাহত্যা হইয়াছিল। জঙ্গবাহাদুরের জীবনের সহিত লক্ষ্মীদেবীর জীবনের খুব নিকট সম্বন্ধ। জঙ্গবাহাদুর নেপাল রাজ্য সুশাসনে আনিয়াছিলেন, তাঁহার আমলে নেপালে খুনাখুনি কমিয়া গিয়াছিল। নেপালে শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি মহারাণী লক্ষ্মীদেবীকে কাশীতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

জঙ্গবাহাদুর অতি প্রতাপশালী লোক হইলেও তাঁহার সুশাসনে প্রজারা সুখে ছিল। তিনি প্রতাপশালী বলিয়া তাঁহার নামে এখনও লোকে স্বীয় দুর্দ্দান্ত পুত্রের নাম জঙ্গবাহাদুর রাখে। দুর্দ্দান্ত হাতী ঘোড়ার নামও জঙ্গবাহাদুর রাখিতে দেখা যায়। অসীম ক্ষমতা লইয়া জঙ্গবাহাদুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাবিপদেও বিচলিত হইতেন না।

চুণার দুর্গে লাহোরের রাণী চান্দাকুমারী বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তথা হইতে তিনি একজন চাকরাণীর সহিত ছদ্ম বেশে পলায়ন করেন। তিনি একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় পাটনায় আইসেন। এপর্য্যন্ত ইংরেজ পক্ষের লোক তাহা অবগত হইতে পারেন নাই। ইহার পর তিনি বৈরাগিনীর বেশে নানা উপায়ে নেপাল সীমা পর্য্যন্ত আইসেন। তাঁহার বৈরাগী নেপালে পীড়াগ্রস্ত হইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন, এই কথা বলিয়া তিনি নেপালের সীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে দুইজন পঞ্জাবী ভৃত্য মাত্র ছিল। নেপালে পঁহুছিয়া তিনি নির্ভয় হইয়াছেন, মনে করিয়া নেপাল দরবারে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লিখিয়া পাঠাইলেন। অতিথিকে বিপদগ্রস্ত করা নেপাল দরবার উচিত মনে করিলেন না। তজ্জন্য নেপাল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। জঙ্গবাহাদুর তাঁহার নিজের বাগানের একাংশে একটী বাটীতে রাণীর জন্য বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। চারিজন পঞ্জাবী ভৃত্য এবং দুইজন পঞ্জাবী চাকরাণী ও তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। দুইজন গুর্খা রমণী সর্ব্বদা রাণীর নিকট থাকিত। ইহারা দেখিত, রাণী যেন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোথাও চিঠি পত্র পরিচালন করিয়া বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া দিতে না পারেন। নেপাল দরবার মাসিক ৮০০৲ আট শত টাকা রাণীর খরচার বরাদ্দ করিয়া দিলেন। ইহা ছাড়া চাউল, দাউল প্রভৃতির সিধা নিত্য তাঁহার নিকট নেপাল দরবার হইতে যাইত।

১৮৫০ সালের ১৫ জানুয়ারী জেনারেল জঙ্গবাহাদুর কুমার রাণাজী কাটমুণ্ড হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা রাম বাহাদুর প্রতিনিধি-প্রধান-মন্ত্রী স্বরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে কর্ণেল জগত সমসের ও আর ৮ জন গুর্খা অফিসার, একজন জ্যোতিষি ও কবি, একজন চিকিৎসক, একজন চিত্র শিল্পী, একজন সুবাদার ও চারিজন সুপকার গিয়াছিলেন।

মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম যখন রাণীলক্ষ্মীদেবীর সহিত বেনারসে গিয়াছিলেন তখন রাজকোষের চার লক্ষ টাকা তাঁহারা লইয়া যান। মহারাজ নেপালে নজর বন্দী অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মীদেবী দল বাহাদুর নামক একজন নেপালী প্রবাসীর একান্ত বসবর্ত্তী হইয়া পড়েন এবং অনেক টাকা বৃথা নষ্ট করিয়া ফেলেন। সেই সময় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নগদ টাকাও অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া ৫৲ টাকা সুদে ৩ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দেন। জঙ্গবাহাদুর বিলাত হইতে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ টাকা রাণী ও দুই রাজকুমারের মধ্যে তিন ভাগ করিয়া দিয়া তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজকুমার দ্বয়কে নেপাল যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু আর গেলেন না। ৮৩বৎসর

বয়সে মহারাণী বেনারসের নিকটবর্ত্তী মাধুদনগরে মানব লীলা সংবরণ করেন। সেখনকার বাটীতে গগন সিংহ প্রভৃতি অনেক নেপালী সর্দারের তৈলচিত্র সুরক্ষিত রহিয়াছে। ১৮৫০ সালের ২৪শে মে তারিখে মহারাণীর জন্মদিন বলিয়া নেপাল দরবার ২১ তোপ আওয়াজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জঙ্গবাহাদুরের জীবিতকাল পর্য্যন্ত এইরূপ সম্মান প্রদর্শিত হইত। বিলাতে গেলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া জঙ্গবাহাদুরকে বিশেষ আদর যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃঃ নবেম্বর মাসে ডিউক অব ওয়েলিংটনের মৃত্যু সংবাদ নেপালে আসিয়া পঁহুছিলে নেপাল দরবার হইতে ৮৩ তোপধ্বনি দ্বারা শোক প্রকাশ করা হয়। তাহার সহিত ইংলণ্ডে জঙ্গবাহাদুরের বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ১৮৫০ সালের অক্টোবর মাসে নেপালের বড় মহারাণী সাহেবার মৃত্যু হয়।

১৮৫১ খৃঃ অঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জঙ্গবাহাদুর ইংলণ্ড হইতে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন, তৎপর কাঠমুণ্ড নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার পিতা ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বাঘমতী নদী তীরে জঙ্গবাহাদুরের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যান। জঙ্গবাহাদুর প্রকাশ্য দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পত্র মহারাজের হস্তে প্রদান করিলে দুর্গ হইতে ২১টী তোপ ধ্বনিত হয়।

১৮৫১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জঙ্গ-বাহাদুরকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যায়। তাঁহার ভ্রাতা বাম বাহাদুর রাত্রি দুইপ্রহর কালে জঙ্গ বাহাদুরের বাটীতে গিয়া সাশ্রু নয়নে কহিলেন "দাদা, কাল তুমি যখন রাস্তা দিয়া দরবারে যাইবে, তখন তোমাকে হত্যাকরা হইবে স্থির করা হইয়াছে।" ইহার পর তিনি ষড়যন্ত্রের সকল কথা তাঁহাকে বলিয়া দেন। এই ভাবী হত্যাকাণ্ডে মহারাজাধিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুহিলা সাহেব এবং জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেনারেল বদ্রি নরসিংহ কুমার রাণাজি এবং পিতৃব্য পুত্র জয় বাহাদুর সিংহ যোগ দিয়াছিলেন।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জঙ্গ বাহাদুর চক্রান্তকারীও ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য ১০০ জন সৈন্য পাঠাইয়া দেন। বিদ্রোহীদিগকে দুই ঘণ্টার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কোট রাজপ্রাসাদে আনিয়া উপস্থিত করা হয়। অপরাধিদিগের প্রথমে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, পরে সকলেরই চক্ষু উৎপাটন দণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

জঙ্গবাহাদুর বড় মাতৃ ভক্ত ছিলেন। মাতার আদেশে তিনি শেষে উঁহাদিগের নির্ব্বাসন দণ্ড ব্যবস্থা করিয়া উঁহাদিগকে এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে রাখিয়া দেন। ১৮৫১ সালের ২৪ জুন তারিখে ইহারা নেপাল হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। নেপালী দরবার উঁহাদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক ১৲ একটাকা খোরাকী বরাদ্দ করিয়াদিলেন। ঐ সময় তরাইর জঙ্গল জ্বরের প্রকোপে সংক্রামিত ছিল বলিয়া জঙ্গ বাহাদুর উঁহাদিগকে হাতীর ডাকে এক দিনেই ঐ পথ পার করিয়া দিয়াছিলেন। প্রধান অপরাধী ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ অপরাধীদিগের কাহাকে চামারের হস্তে লাঞ্ছিত করিয়া জিহ্বা কাটিয়া দেওয়া হয়। কাহাকেও অন্যান্য দণ্ড দেওয়া হয়।

জঙ্গ বাহাদুর ১৮৫৩ খৃঃ অঃ ৺কেদারনাথ ও বদ্রি নারায়ণ দর্শন করিতে যান। ফিরিবার সময় জিলৌখীর ১১ মাইল দক্ষিণে (কাঠমণ্ডু হইতে ১০৩ মাইল) এক বারও বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে আসিয়া পহুঁছিলেন। জয় বাহাদুরের এলাহাবাদ দুর্গে ওলাউঠায় সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যু হয়। জঙ্গবাহাদুরের মাতা তাঁহার বন্দী পুত্রের জন্য ভীতা হইলেন সুতরাং এই সময় মাতার অনুরোধে তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নেপালে আনয়ন করেন। অতঃপর তাহাদিগকে উঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখা হয়, পরে জঙ্গবাহাদুর বালক ভ্রাতষ্পুত্রকে তাহার পিতার অধীন করিয়া অন্যত্র পাঠাইয়া দেন। ঐ সময় যুহিলা সাহেবকেও ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৮৫৪খৃঃ অঃ মে মাসে জঙ্গ বাহাদুরের একটী মর্ম্মর প্রস্তর মূর্ত্তি কাওয়াজের ময়দানে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জঙ্গ বাহাদুরের ৮ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত মহারাজাধিরাজের প্রধানা মহিষীর ৬ বৎসর বয়স্কা প্রথমা কন্যার মহাসমারোহে বিবাহ হয়। নেপাল রাজ্যের

প্রথমা কন্যা বিবাহে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা যাথট জমা হইয়াছিল। ইহার কয়েক দিন পর জঙ্গবাহাদুর স্বয়ং ফতেজং চৌতুরিয়ার ২৩ বৎসর বয়স্কা ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ কোট হত্যাকাণ্ডে ফতেজঙ্গ হত হইয়াছিলেন এবং তদীয় পরিবার বর্গ বেত্তিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে মহারাজ পরিবারের সহিত জঙ্গবাহাদুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, ফতেজঙ্গের বংশীয় দিগের সহিতও বিবাদ মিটিয়া গেল, ফতেজঙ্গের ভ্রাতষ্পুত্রদিগকে বাজেয়াপ্তি জাগীর পুনঃ প্রত্যার্পণ করা হইল এবং তাহাদের একজনকে এইসময় কর্ণেল পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ফতেজঙ্গের পরিবার-বর্গ বেত্তিয়া হইতে নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

---

# কবি ভোলানাথ রায়।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মসুয়া নিবাসী ভোলানাথ রায় একজন স্বভাব কবি ও উপস্থিত কবি ছিলেন। ভোলানাথ রায়ের লিখিত কবিতা আমরা পাই নাই; লোক মুখে প্রবচনের মত তাঁহার বহু কবিতা কিন্তু প্রচারিত আছে।

সাধাসাধি নাই, স্বাধীন বন বিহঙ্গ যেমন যখন তখনই আপন মনে গান গাহিয়া উঠে, তেমনই ভোলানাথ রায়েরও সময় অসময় বিচার ছিল না; যখন খুসী—হাঁটিতে, বসিতে, শুইতে, খাইতে কবিতার নির্ঝর বহাইতেন। সেই সকল কবিতা বা ছড়া সরস, অনাবিল এবং হাস্যের ফোয়ারা।

ভোলানাথ রায় অতি সরল, উদার, রসিক ও দয়ালু লোক ছিলেন। আসে পাশের গরীব দুঃখীদিগের ভাল-মন্দর সংবাদ লওয়া ভোলানাথের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। কাহারও দুঃখ বা দুর্দ্দশা-অসুখ-বিসুখের সংবাদ পাইলেই মুখভরা হাসি লইয়া সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ভোলানাথ রায় সেখানে হাজির। তাঁহার শুশ্রূষার ও চিকিৎসার বন্দোবস্তে, এবং হাসিমাখা সরস কবিতাবলীতে রোগী সোয়াস্তি বোধ করিত। রোগীর পরিবারবর্গ বিপদে যেন একটা ভরসার আলো দেখিতে পাইত।

ভোলানাথ রায় প্রায় সকলের সঙ্গেই কবিতায় কথা বার্ত্তা কহিতেন। পাড়ার মেয়েছেলেরা, প্রজাগণ, তাহাদের ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত ভোলানাথ রায়ের কবিতা শুনিয়া হাসিয়া কুটিপাটি হইত। সকলেই তাঁহাকে নিজেদের পরিবারের লোকের চাইতেও বেশী ভালবাসিত দেখিতে আগ্রহ করিত।

আমরা ভোলানাথ রায়ের কয়েকটী কবিতা বা ছড়ার এখানে উল্লেখ করিলাম। পাঠক তাহা হইতেই তাঁহার দ্রুত রচনা শক্তি, রসিকতা এবং সরলতার পরিচয় পাইবেন।

১। তাঁহার বৌ'দি কৃষ্ণমণি রাঁধিতে গিয়াছেন; ধোঁয়া লাগিয়া তাঁহার চক্ষে জল পড়িতেছে। তাহা দেখিয়াই ভোলানাথ বলিলেন,—

গিত্তাইনের (১) নাম কৃষ্ণমণি, রান্তে পরে চোখের পানী,
পাক বসাইয়া ফোঁফানী।

২। বৌরা খাইতে বসিয়াছেন। ভোলানাথ বাহির হইতে তাহার আভাস পাইয়া বলিলেন,—

ঘর খাইন (২) বইরে খবর,
'চেপা' পোড়া পান্তা ভাত চপ্পর চপ্পর;
পানি ভাতে না গেল আই, (৫)
চলগে। দিদি শুঁড়া খাই।

৩। ভোলানাথের হাতে লেবু (জাম্বির) আর কলা; ভাগে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মামা! এসব নিয়ে কোথা যান?" ভোলানাথ উত্তর করিলেন—

"আইট্যাকলা জামিরে, পাগল করল তোমার মামীরে।"

ভাগিনেয়ের সঙ্গে কেমন সরল রসিকতা!

৪। আছমত সরকারের খুব তাড়াতাড়ি অবস্থার উন্নতি হইয়াছে; তাই সে অহঙ্কারে বাঁচে না। এর মধ্যে একদিন সে হঠাৎ ভোলানাথ রায়ের সম্মুখে পড়িয়া গেল। কবি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—

আগে ঘোড়ল ঘোড়ল, পাছে চৌকিদার,
ঘুম থেক্যা উঠ্যা দেখি আছমত সরকার।

---

(১) গিত্তাইন—গিন্নি। (৫) আই—আকাঙ্ক্ষা।

জিলার কন্ম পাক্কা কালি কাগজ যার চবস্তা
বান্দরের মত ভেট্‌কি মারুইন রায়ত যায় দরস্তা "

৫। উমেদ রায়ের পুত্র আশারাম রামপুর কাছারীর দেওয়ান বা নায়েব। ভোলানাথ স্বয়ং খাজনা আদায় করিতে গিয়াছেন। দেওয়ানজি ( বা নায়েব ) স্নান করিবেন—তৈল মাখিতেই ব্যস্ত,—কথাই কহেন না। তিনি ভোলানাথ রায়কে কখনও দেখেন নাই। নাম মাত্র জানেন, সুতরাং তিনি বড় আমলেই আনিলেন না।

ভোলানাথ বলিলেন—

আমি আইলাম খাজনা কর্ত্তাম, দেওয়ানজী লাগাইল তেল।
আশা উমেদ যত আছিল মার্গের তলে গেল ॥

দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে মহাশয়?'
"আমি ভোলানাথ রায়"।

৬। ভোলানাথ খুড়তাত ভাইর পুকুরে স্নান করিতে গিয়া আছাড় পড়িলেন। সুতরাং ভাই গঙ্গাধর রায়ের পুষ্করিণীর বর্ণনা আরম্ভ করিলেন—

গঙ্গাধর রায়ের পুষ্কুণী, বাড়ীতে থাইক্যা ডঙ্কা শুনি।
তিন আঙ্গুল্যা একখান ঘাট, উঠতে মার্গ কাটাকাট্।
সেওড়া পত্র বরণ জল, বেঙ্গে করে কল্ কল্।
মাছের কিবা কারখানা, যত সব কাণ পণা
পাথর ভাসিয়া যায় সোতে
জাতিয়া ডুবাইলে লোটা, জল না উঠে এক ফোটা,
দীঘি দিছে বিষ্ণুরাম রায়ের পুতে ॥

গঙ্গাধরের পুত্র পুকুরে পাকা ঘাটলা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য তখন ভোলানাথ তাহাতে পদার্পণ করিবার লোকে ছিলেন না। থাকিলে হয়ত 'যে দেশে পুকুরে জল থাকে না—সে দেশে সিঁড়ি ঘাট' লইয়া একটা ছড়া বাঁধিয়া রাখিতেন।

৭। কুবীর বা কুবের দাস নাপিত আসিয়াছিল। ভোলানাথ ক্ষৌর কর্ম্মের জন্ত তাহাকে ডাকিলেন। সে 'এই আসিতেছি' বলিয়া চলিয়া গেল। ভোলানাথ স্নান করিয়া গা মুছিতেছেন,—তখন নাপিত আসিয়া হাজির। বৃদ্ধ কুবীর কে লক্ষ্য করিয়া ভোলানাথ কহিলেন—

"কুবীর দাসের বাড়ীতে গেলে, বিস্ময়ে কুবীর বলে
যান্ মশয় আসি কিছু পরে।
জিলার লড়িতে দিয়া ভর—আসতে বেলা আড়াই প্রহর
যখন মানুষে স্নান খৌতি করে ॥"

৮। এক আমীন আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথার চোটে কেহ টিকিত না। ভোলানাথ দেখিলেন, আমিনের দুখানি জুতা দুই রকমের। অমনি সভার মধ্যেই বলিয়া উঠিলেন—

"আমিনের ভাই গেলাইন গরু রাখিবার,
পথের মধ্যে একখানজুতা পাইলাইন জানি কার।
আর একখান আছিল উগারতলের মাঝ।
তারে দিয়া হইয়া গেল আমিনের সাজ ॥

আমীন সেই দিন হইতেই চুপ।

৯। একজন লোক সহসা ধনী হইয়াছিল—আবার শেষ বয়সে তাহার পতন হয়। ভোলানাথ কহিলেন—

"আঙ্গুল ফুইল্যা কলাগাছ জলে ডব্ ডব্ করে।
কাইত্যান্যা বাতাসে গাছ গোষ্ঠী গোত্রে পড়ে ॥'

(ভোলানাথের বংশ পরিচয় দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ভোলানাথ রায় দক্ষিণ রাঢ়ি কায়স্থ, সিদ্ধ মৌলিকমৌদ্গল্য গোত্র ( ঊর্ব চ্যবণভার্গব আপ্নবৎ জামদগ্ন্যাপ্নুবৎ )। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষের নিবাস ছিল নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। চাকদহ হইতে ঈশাখাঁর শাসন কালে এই বংশের রামসুন্দর দেব ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অতঃপর সেরপুর হইতে আসিয়া তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন যশোদলে বাসস্থান গ্রহণ করেন। ইহাদের এক জন—রামনারায়ণদেব ঈশাখাঁ বংশের চাকরী গ্রহণ করিয়া এগারসিন্ধুর আইসেন এবং নিকটবর্ত্তী মসুয়া গ্রামে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। রামনারায়ণ হইতে ইহারা মসুয়ার রায় বংশ বলিয়া পরিচিত হন। ভোলানাথ রায়ের সুযোগ্য বংশধর অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় বংশেরনাম উজ্জল রাখিয়াছেন।)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# বৃটীশ পার্লামেণ্টের রীতি-পদ্ধতি।

বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভা পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। বর্ত্তমান সময় এই মহাসভার কার্য্য কলাপের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। পার্লামেণ্টে ভারত-কথা এখন প্রায় প্রতি অধিবেশনেই আলোচিত হইয়া থাকে; ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলি এখন প্রতি সংখ্যায় তাহার কার্য্যকলাপের বিস্তৃত সংবাদ প্রদান করে; শিক্ষিত ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা এখন পার্লামেণ্টের আলোচনা করিতে ব্যস্ত; ইংলণ্ডের প্রবাসী ভারতবাসীগণ আজকাল দর্শকরূপে পার্লামেণ্ট সভার প্রায় প্রতি বৈঠকে উপস্থিত হইয়া ভারত-কথা আলোচনায় যোগদান করিতেছেন। সে দিনও (গত ৫ই জুন) ভারত শাসন সংস্কার বিল দ্বিতীয় বার পঠিত হইবার সময় বিকানিরের মহারাজ, কোচ বিহারের মহারাজ, লিম্বরের ঠাকুর সাহেব, কাশ্মীরের রাজা হর সিং, স্যার কে, জি, গুপ্ত, স্যার বি, সি, মিত্র, মিঃ ব্যোমান জী, মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিঃ কুণ্ডুরু প্রভৃতি বাদানুবাদ শ্রবণ করিবার জন্য মহাসভায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী মৃণালিনী ৯ ঘণ্টা কাল একাসনে বসিয়া থাকিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-চিত্র দর্শন করিতে অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

ভারতের এহেন ভাগ্য-বিধাতা-মহাসভার রীতি পদ্ধতি অনেকেই অবগত নহেন। আমরা গৌরভের কৌতূহলী পাঠকদিগের জন্য ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় পার্লামেণ্টের সভ্য স্যার এডবার্ড পেরোটের লিখিত বিবরণ হইতে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম।

৩টা বাজিবার ২০ মিনিট বাকী থাকিতে দর্শক ও সভ্যগণ দৈনিক কার্য্যাবলীর তালিকা ভোট আফিস হইতে লইয়া সভা গৃহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। ঠিক পৌনে তিনটার সময় পুলিশ প্রহরী প্রবেশেচ্ছুকদিগকে দুই সারিতে বিভাগ করিয়া মধ্যে একটা পথ করিয়া দেয়। তখন সভাপতির শোভাযাত্রা আগমন করে; এ সময় সকলকেই টুপী নামাইতে হয়। কেহ টুপী না নামাইলে প্রহরী টুপী নামাইবার আদেশ প্রচার করে।

সর্ব্বাগ্রে সোণার তকমা ও সান্ধ্য পরিচ্ছদে শোভিত সংবাদবহের ( Messenger ) শোভাযাত্রা; তৎপরে দণ্ডস্কন্ধে দণ্ডবাহকের ( Sergent-at-arms ) আবির্ভাব; তৎপশ্চাতে সভাপতি ( Speaker ) পদোচিত পরিচ্ছদ ও পরচুলা পরিহিত হইয়া প্রবেশ করেন। তাঁহার পরিচ্ছদের পশ্চাতের দীর্ঘ পুচ্ছ ভাগ একজন অনুচর ধূলি সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য তুলিয়া ধরে এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। এই জমকালো শোভাযাত্রার সর্ব্বপশ্চাতে আসেন শ্বেত দস্তানা ও কাল রেশমের দীর্ঘ জামা পরিহিত এই মহাসভার যাজক।

মহাসভা গৃহের মেজেতে একটী সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট আছে। দণ্ডধর, সভাপতি ও যাজক ঐ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান। এই মহিমময় ত্রিমূর্ত্তি সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াই গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রণিপাত করেন। তারপর আর কয়েকপদ মাত্র অগ্রসর হইয়া আবার প্রণিপাত করেন। দণ্ডধর এইবার দণ্ডটী টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া প্রণত হইয়া পশ্চাৎ দিকে সরিতে থাকেন। সভাপতি এবং যাজক তৃতীয়বার মস্তক নত করিয়া টেবিলের দুইপ্রান্তে দুইজনে আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির গৌরব মণ্ডিত নির্দ্দিষ্ট আসন তখন খালি পড়িয়াই থাকে।

যাজক বাইবেলের নির্দ্দিষ্ট একটী স্তোত্র পাঠ করেন এবং একটী ছোটখাট প্রার্থনা করেন। অতঃপর সভাপতি কতিপয় সুনির্ব্বাচিত বাক্য উচ্চারণ করেন। ঈশ্বরের নিকট রাজা ও রাজ পরিবারের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা হয়। তৎপর পাঠ। এই পঠনীয় অংশ যে কাহার রচনা, কেহ বলিতে পারে না। কোন সময়ে এই পাঠ প্রথম প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যাহাতে প্রত্যেক সভ্য প্রতি আলোচনার সুভাবে চালিত হইয়া তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, খেয়াল ও স্বদেশ প্রীতি পরিহার পূর্ব্বক সভায় যোগদান করিতে পারেন, এই পাঠ বা প্রার্থনায় সেই কথাই বলা হয়। ইহার পরে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা। এই সুপ্রাচীন সমাতন নিয়মেই প্রতিদিন মহাসভার উদ্বোধন হইয়া থাকে।

উপস্থিত সভ্য সংখ্যার অল্পতা প্রথম প্রথম বড়ই

বিস্ময়জনক লাগিত। সম্মুখের দুইটী বেঞ্চ একেবারে খালিই পড়িয়া থাকে। যাঁহারা সাম্রাজ্যের অদৃষ্ট পরিচালক, জননেতা, তাঁহাদের প্রতি সম্ভ্রম বশতঃই ঐগুলি খালি রাখা হয়। জন নায়কদিগের অনুপস্থিতি চোখে বড়ই লাগে। আবার যাহারা উপস্থিত থাকেন, তাহাদের ব্যবহারও বড়ই বিসদৃশ বোধহয়। কর্তব্যে জাগ্রত থাকিবার জন্য যে প্রার্থনা করা হয়, সে প্রার্থনায় তাহাদের কোন প্রকার মনঃসংযোগই লক্ষিত হয় না।

সভাগৃহখানা সভ্য সংখ্যানুপাতে বড়ই ছোট। মহাসভার সভ্য সংখ্যা ছয়শত সত্তর জন, আসনের আয়োজন প্রায় তাহার অর্দ্ধেক। কাজেই বসিবার যায়গার জন্য একটু ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ি স্বাভাবিক; তাহা হয়। প্রাচীন অক্ষরে "প্রার্থনা" ( Prayer ) শব্দটী মুদ্রিত, এরূপ কার্ড সভাগৃহের টেবিলের উপর একটী বাক্সে রাখা হয়। প্রার্থনার পূর্ব্বে এরূপ একখানা কার্ডে নাম লিখিয়া যেখানে যিনি বসিতে চান, সে আসনে রাখিয়া আসেন এবং প্রার্থনায় যোগদান করেন। প্রার্থনার পর হইতে সভাভঙ্গ পর্য্যন্ত ঐ আসনে তাঁহার বসিবার অধিকার থাকে। আসনে বসিয়া ঐ কার্ডখানা আসনের পশ্চাতে একটী ছিদ্রে রাখিয়া দিতে হয়; যেন অবসর সময়ে উঠিয়া গেলেও পুনরায় আসিয়া আসন অধিকার করিতে অসুবিধা না হয়।

"তেজীয়সাং ন দোষায়"। বিশিষ্ট জননায়কদের প্রার্থনায় যোগদান করিতে হয় না। সম্ভ্রম বশতঃ তাঁহাদের স্থানও কেহ অধিকার করে না। যদি কেহ ঈর্ষা বশতঃ বা ভ্রমক্রমে তাঁহাদের আসনে উপবিষ্ট হয়, তবে তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকে না। নানা বিদ্রূপ-পীড়নে তাহাকে অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। মিঃ রেডমণ্ড, ডিলন, এডাম্সন্, লর্ড সিসিল, কার্সন, প্রভৃতির জন্য আসন এরূপ শূন্য থাকে। পূর্ব্বে টুপী রাখিয়া যায়গা অধিকার করিবার প্রথা ছিল। একবার একজনেই এইরূপে ১২খানা আসন পূর্ব্ব হইতে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা সভাপতির দৃষ্টিগোচরে আসায় এই প্রথা এখন রহিত হইয়াছে।

প্রার্থনার পরে সভাগৃহ ধীরে ধীরে ভরিতে আরম্ভ করে। প্রখ্যাতনামাগণ সভাপতির আসনের পশ্চাদ্দিক দিয়া প্রবেশ করেন। সভাগৃহে প্রবেশকালে এবং বিনির্গমনকালে সভাপতির আসনের প্রতি ( সভাপতির প্রতি নয়, তিনি তখনও অন্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন ) মস্তক নত করিয়া সম্মান দেখাইতে হয়। এই প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত।

পূর্ব্বে সভাগৃহের মেঝেতে একটী গণ্ডীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা সভ্য নন্ তাহাদের পক্ষে এই নিষিদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করা অপরাধজনক। সম্মুখের বেঞ্চে সাধারণতঃ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণই বসেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একদিন এই শ্রেণীর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির একটী ছোট ছেলেকে গ্যালারির নীচে একটু বসিবার জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। পিতা বক্তৃতা দিতে উঠিলে এবং বক্তৃতায় বহু সময় ক্ষেপণ করিলে, পুত্রটী বাল স্বভাববশতঃ চঞ্চল হইয়া উঠে এবং টুপীটা রেলিংএর অপরদিকে সীমারেখা অতিক্রম করিয়া নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া যায়। বালক তখন রেলিংএর নীচ দিয়া গলিয়া যাইয়া সেই গণ্ডীর ভিতর ঢুকে এবং চক্ষের পলকে টুপীটী লইয়া ফিরিয়া আসে। অনধিকারী বালক হইলেও তাহার এই নিঃস্বার্থ অবৈধ প্রবেশ দর্শনে চতুর্দ্দিকে অনেকের মুখ অজ্ঞাত বিভীষিকা ভয়ে পাংশু হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকজন সভ্য এ কাণ্ড দেখিয়া একেবারে হাসিয়া উঠিয়াছিলেন; হাসির শব্দে বক্তা হয় ত ভাবিয়াছিলেন, তিনি ঠিক সে সময়ে যে বিদ্রূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই উপচিত হাস্যরোল।

টুপীটা এই মহাসভার সভ্যজীবনের অনেক প্রয়োজনে আসে। ইহার সম্বন্ধে কতকগুলি রীতিনীতিও আছে। সভায় প্রবেশ সময়ে, অথবা বাহির হইবার সময়ে, এবং দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার সময়ে কেহ টুপী মাথায় দিবেন না। আবার কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, সভাপতির আহ্বানে সভ্যগণ টুপী উঠাইয়া নিজকে পরিজ্ঞাত করেন। এইরূপ তর্কে বাদানুবাদকালে টুপী মাথায় দিয়াই তর্ক করিতে হয়। একবার এরূপ বাদানুবাদ-

কালে গ্ল্যাডষ্টোন—ভুলে টুপী না আনায়,—পার্শ্বের একজন সভ্য হইতে তাহার টুপীটা চাহিয়া নেন। গ্ল্যাডষ্টোনের মাথাটী ছিল—বিশাল; টুপী তাঁহার সর্ব্বদাই ফরমায়েস দিয়া বানাইতে হইত। কাজেই এই টুপীটা তাহার মাথার পক্ষে বড়ই ছোট হইয়া পড়িল। বাদানুবাদকালে কোন প্রকারে তাহা তাহার মাথায় বসাইয়া রাখিতে তিনি যে সতর্ক যত্ন লইতে ছিলেন, সেই ব্যস্ততা দর্শনে সভার সকলে হাসিয়া কুটপাট হইতে লাগিল।

কোন সভ্য বক্তৃতা দিতে উঠিলে টুপীটা আসনের উপরেই রাখেন; কেন না টুপী রাখিবার অন্য স্থান নাই। অনেক সময় এরূপ হয় যে, বক্তৃতার উপসংহারের উন্মাদনায় বক্তা মহাশয় টুপীর কথা একেবারেই ভুলিয়া যান; এবং বক্তৃতা শেষে টুপীর উপরই বীরদর্পে বসিয়া পড়েন। তখন এই স্তুপিষ্ট শিরোভূষণ হাতে লইয়া তৎপ্রতি যে ক্ষুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহাতে যে হাসির তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহা অনেক ব্যঙ্গ-অভিনেতার লোভের সামগ্রী। এই মহাসভায় যত হাসির উচ্চরোল উত্থিত হয়, এত উচ্চ ও সভ্য হাসি বোধ হয় আর কোন সভা সমিতিতে পাওয়া যায় না। একবার এরূপ হাসির পরে একজন আইরিশ সভ্য বলিয়া উঠিলেন—"সভাপতি মহাশয়, মাননীয় সভ্য মহোদয় যে সময়ে তাহার টুপীর উপর বসিয়াছিলেন তখন তাহার মস্তকটী যে ইহার ভিতরে ছিল না, এজন্য তাহাকে আমার আন্তরিক সন্তোষ জ্ঞাপন করিবার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি।" হাসির রোল থামিলে সভাপতি মহাশয় বিদ্রূপটি সম্যক উপভোগ করিয়াও ইহা যে রীতি বিরুদ্ধ, তদ্বিষয়ে সভ্য মহোদয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে আইরিশ সভ্যগণই এইরূপ বিদ্রূপ করিতে বিশেষ পটু।

বাদানুবাদের উত্তর প্রত্যুত্তরের সময় আসিলে, সভাপতি, মহাশয় সভাপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া উপবিষ্ট হন। প্রত্যেক সভ্য—কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে, তাহার একখণ্ড মুদ্রিত কাগজ পান। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের টাইপ করা উত্তরের বস্তা নিয়া প্রশ্নের অপেক্ষায় ট্রেজারী বেঞ্চের (Treasury bench) নিকট অপেক্ষা করেন। প্রশ্নগুলি দুই একদিন পূর্ব্বেই কেরাণীখানায় দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে মুদ্রিত হইয়া আসে। এই অবসরে সরকার পক্ষ সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

সভাপতি ডাকিলেন—"মিঃ স্মিথ!" মিঃ স্মিথ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"প্রথমসংখ্যা, মহাশয়।" যে মন্ত্রীকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি ইহার উত্তর পড়িয়া যান।

বস্তুত প্রশ্ন রচনাও একটি চারু বিদ্যা। যাহার উত্তর না চলে, এরূপ দুরূহ ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিয়া প্রশ্নের ভাষার মোসাবিদ হয়। অনেক চতুর প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নের ভাষা ও ভঙ্গী স্থির করিতে যে সময় ব্যয় করেন, অনেক নভেলের আবিষ্ট-প্রণয়ীও হয় ত তাহার নায়িকার ধ্যানে অতটা সময় ক্ষেপণ করে না। যখন প্রশ্ন প্রস্তুত হয়, তখন প্রতি প্রশ্নে প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ করিয়া ষষ্ঠতঃ প্রভৃতির ঘটাতে কেবলই মনে হয়, যে এ সকলই উত্তরকারীকে জালে ফেলিবার সকল প্রকারের আট-ঘাট, অভিসন্ধি। প্রথমে মনে হয় ইহার উত্তর দেবার শক্তি বুঝি কাহারও হইবে না। প্রাচীন ও অভিজ্ঞ সরকার পক্ষীয়গণ কিন্তু অতি সহজেই এবং খুব সংক্ষেপে প্রশ্নগুলি উড়াইয়া দেন। এ তাসের খেলায় সব টেক্কাই মন্ত্রিদের হাতে। কাজেই তাঁহাদিগকে জব্দ করা কঠিন। যে প্রশ্নের কোন উত্তর দিবার থাকে না, দিতে গেলেই বিপদ, সেস্থলে তাঁহারা তাহাদের রক্ষা কবচ বাহির করিয়া বসেন। তাহারা বলেন যে "এ সকলের উত্তর সাধারণের হিতার্থে এখন দেওয়া চলে না।"

এই একটা প্রশ্নকে ভিত্ত করিয়া আরও অনেক আগন্তুক প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং কখনও কখনও বাদানুবাদ তুমুল হইয়া উঠে। তখন সভাপতি মহাশয় বাঁধা দিয়া পরবর্ত্তী প্রশ্নকর্ত্তাকে আহ্বান করেন। এ-ভাবে বাদানুবাদ স্থগিত না হইলেও মন্ত্রী মহাশয়গণ তাঁহাদের সুরক্ষিত দুর্গে অনায়াসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহারা তখন বলেন "এই প্রশ্নের বিষয়ে পূর্ব্বে তাঁহাকে জানান হয় নাই, কাজেই তিনি উত্তর দিতে সমর্থ নন্।

পার্লিয়ামেণ্টে দুই মতের দুই দল আছে। তাদের মত অনেক সময়েই বিরোধী হয়।

৩টা ৪৫ মিনিটের সময় প্রশ্নোত্তর কিছুকালের জন্য হঠাৎ স্থগিত হইল। যাহারা প্রশ্ন করিতেছেন তাদের পাল্টাদল হয় ত সভায় আরও গুরুতর বিষয়ের অবিলম্বে আলোচনার জন্য সভার কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করিলেন। যদি বিষয়ের গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হয়, তবে এই প্রার্থনার অনুমোদন-কারীদিগকে সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইতে অনুরোধ করেন। যদি চল্লিশ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভ্য ইহা অনুমোদন করেন তবে রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময়, এ বিষয় পুনরুত্থাপিত হইয়া বিবেচিত হয়।

প্রশ্নোত্তরের পালার পর আসে তর্কবিতর্কের পালা।

দৈনিক কার্য্যবিবরণী কেরাণী পাঠ করিলে সভার মূলকার্য্য আরম্ভ হয়। মনে করুন—একটা বিল পাশ করিতে হইবে। তার ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন বাক্য ও বাক্যাংশ কিরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক হইয়া তাহার সিদ্ধান্ত হয়। সভাপতি তখন আসন পরিত্যাগ করেন, দণ্ডনেতা টেবিল হইতে দণ্ডটি এক ধারে সরাইয়া রাখেন, এবং কোন কোন সভ্য কেরাণীর শূন্য আসনে যাইয়া উপবিষ্ট হন। এই পরিবর্ত্তনের সময় একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়; অনেক সভ্যই বাহির হইয়া যান। নামজাদা অল্প কয়েকজন মাত্র এই তর্ক সমিতিতে থাকেন, তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্য সভ্যগণ নিশ্চিন্তমনে কেহ বাহিরে, কেহ চা-পানে, কেহ লাইব্রেরীর কক্ষে, কেহ চিঠি পত্রের ফাইল পাঠে, কেহ বা সংবাদ পত্রাদির মধ্যে নিমগ্ন হন।

এই তর্ক-সমিতির কাজ অগ্রসর হওয়া না হওয়া বিষয়ে অনেকটা, যে মন্ত্রী সেই বিল উপস্থিত করেন, তাহার উপর নির্ভর করে। তিনি কৌশলী লোক হইলে বাদানুবাদ কম হয়। এইস্থলে একজন সভ্য আসন পরিত্যক্ত সভাপতির সহিত যতবার ইচ্ছা আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি সভাপতির আসনে উপবিষ্ট থাকেন, তখন কোন বিষয়ের অবতারণা করিতে হইলে কোন সভ্য একবারের বেশী কিছু বলিতে পারেন না। এই আলোচনার বক্তৃতার ধার কেহ বড় ধারেন না। অনেকটা কেনা বেঁচার আলাপের মত হট্টগোলের কাণ্ড।

যাহারা সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া যান, তাহাদের কেহ কেহ সম্মুখের নদীর দিকের খোলা ছাদে চা-পান করেন। এখানে চা খাওয়াটা খুব একটা উপভোগের জিনিষ বলিয়া সকলেই মনে করেন। বৈদেশিক দর্শকগণকে এইস্থানে পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। এই খোলা ছাদের পিছনের বারান্দায় বহু প্রখ্যাতনামা বৈদেশিকগণের—স্বর্গীয় স্যার বেঞ্জামিন ষ্টোন কৃত—চিত্র ঝুলান আছে। সভ্য ও দর্শকগণ আমোদে ও চা-পানে প্রমত্ত, হয় ত এমন সময় "Di vi-zhun" শব্দে সকলে চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি নিজ নিজ ত্রুটীর জন্য ক্ষমা চাহিয়া সভা-কক্ষের দিকে দৌড়িয়া ছুটিয়া যান। কেন না, দুই মিনিট পরেই সকল প্রবেশ দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে।

যখন সভাতে মদ্বৈধ হয়, তখন সবদিকেই একটা উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন সকলকে ভোট দিবার জন্য একে একে বাহির হইতে হয়। যে দ্বার দিয়া সকলে বাহির হয়, সেখানে একখানা টেবিলের পার্শ্বে কেরাণী থাকেন, ও দরজার দুই পার্শ্বে দুই জন ভোট সংগ্রাহক থাকেন। এক এক জন সভ্য বাহির হন আর কেরাণী সেই সভ্যের নাম উচ্চারণ করেন এবং ভোট-গ্রাহকগণ তাহার ভোট লিখিয়া লয়েন। যখন কক্ষ মধ্যে আর কেহ থাকে না, তখন ভোট গণনা হয় এবং ভোট গ্রাহকগণ সেই দণ্ডের নিকটবর্ত্তী হন। যে দল জয়ী হয়, সেই দল দণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে। এবং যিনি সর্ব্ব দক্ষিণভাগে থাকেন তিনি ভোট সংখ্যা পাঠ করিয়া সকলকে শুনান। তৎপরে বিজয়ী পক্ষ আনন্দ ধ্বনি করে। ইহার পরে আবার কমিটি বসে এবং সভা-গৃহ শূন্য হইয়া পড়ে।

সভ্য সংখ্যা ৪০ জনের কম উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য স্থগিত থাকে। কিন্তু এমনও দেখাযায় যে শুধু সভাপতি এবং আর একজন মাত্র সভ্য রহিয়াছেন অথচ সভার কার্য্য চলিয়াছে। * এমন সময় যদি কেহ ৪০ এর

* গত ৫ই জুনের পার্লামেণ্ট সভার বিবরণ সঞ্জীবনীতে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। "পার্লিয়েমেণ্টের অধিবেশনের প্রারম্ভে প্রায় ৪০০

নূন সংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করেন, অমনি ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সভ্য গণকে আহ্বান করা হয়। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া যাঁহাদের খুস তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হন। যদি এই ঘণ্টার পরেও সভ্যসংখ্যা ৪০ না হয়, তবে সেদিনের জন্য সভা ভঙ্গ হয়। একবার একজন বক্তা বক্তৃতা দিতে যাইয়া অধিক শ্রোতার আশায়, সভ্য সংখ্যার অল্পতার প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখনই ঘণ্টা বাজান হইল, কিন্তু তাহাতেও সভ্যসংখ্যা ৪০ জনের বেশী হইল না। কাজেই সেদিন সভার কার্য্য বন্ধ হইল। সেই সভ্যের বক্তৃতা দেওয়ার অবসর জীবনে আর হইল না।

রাত্র ৮টা ১৫মিনিটে সভার কার্য্য স্থগিত রাখার বিষয় বিবেচিত হওয়ার কথা; এজন্য সান্ধ্য ভোজন সকাল সকাল হওয়া চাই। এখানে তিনটা বৃহৎ ভোজন কক্ষ আছে।

দুইটাতে দর্শকগণ ভোজন করিয়া থাকেন। অপরটী সভ্যদিগের জন্য। এই সভ্যদিগের কক্ষের একটি টেবিল আবার মন্ত্রীদিগের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। নূতন সভ্য আসিলে তাহার গতি বিধি একটু হাসি কৌতুকের সঞ্চার করে। অনেক নূতন সভ্য কেন্দ্রস্থিত বড় টেবিলটা খালি দেখিয়া তাহার নিকটে যাইয়া হয়ত আসন গ্রহণ করেন। ভৃত্য আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করে "মহাশয় কি একজন মন্ত্রী"? তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া ঐ আসন ছাড়িয়া যাইতে হয়। ইহা দর্শনে প্রাচীন সভ্য মহলে একটা মুচ্‌কি হাসির লহরী খেলিয়া যায়। একবার একজন নূতন সভ্য এভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এখনও হইনি"। যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার এই গর্ব্বিত উত্তর কিছুদিন পরেই সার্থক হইয়াছিল।

সভাগৃহে বক্তৃতা কালেও এই ভোজনাদি ব্যাপার চলিতে থাকে। ভোজন কক্ষে অথবা যেখানে সভ্যদিগেরভিড় বেশী হয়, সেখানে গেলেই অনুমান করা যায়—কিরূপ ব্যক্তি বক্তৃতা করিতেছেন। সে সকল খবর প্রচার করিবার লোক নিযুক্ত আছে। যেমন একজন নূতন বক্তা সভাগৃহে বক্তৃতা দিতে উঠিলেন, অমনি সে আসিয়া তাহা এ সকল স্থানে প্রচার করে। মিঃ এস্কিথ, মিঃ ব্যালফুর, মিঃ সিসিল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তাদের নাম শুনিলে অবিলম্বে সকলে সভাগৃহ যাইয়া পূর্ণ করে। সভাগৃহে এইরূপ যাতায়াত সর্ব্বদাই হইতেছে। নূতন সভ্যের পক্ষে ইহা একটু বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়।

রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় সভাপতি আসনে উপবিষ্ট হইলে সভার কার্য্য স্থগিত রাখিবার বিষয় অবতারণা করা হয়। তখন পরামর্শ সভার আলাপ আর চলে না। রীতিমত বক্তৃতা করিতে হয়। এ সময়ে হয়ত কোন নূতন সভ্য কম্পিতবক্ষে, শঙ্কিত মনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দিতে অগ্রসর হন। দেশের সর্ব্বপ্রকার সুদক্ষ জন নেতাগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে তাঁহার যে একটু ভীতি-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ইহা বলাই বাহুল্য।

রাজনীতি ক্ষেত্রে বিজীগীষা প্রবল হইলেও এই পার্লেমেণ্ট মহাসভার উদারতায় মুগ্ধ হইতে হয়। সভাপতি তো বক্তাকে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ দিবেনই, অন্যান্য সভ্যেরাও, যে বক্তার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পান, তাঁহাদের মত এবং চিন্তা প্রণালীর বিবিধ বিভিন্নতা সত্ত্বেও, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইঁহাদের গূঢ়ভাব এই যে—এখানে তাঁহারা সকলেই দেশের সম্মান, শান্তি ও সুখ সংবর্দ্ধন চেষ্টাতেই সমবেত হইয়াছেন। এখানে সকলেরই উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন।*

প্রাচীন বাগ্মিতার ছন্দ আজকাল আর চলে না। গ্লাড্‌ষ্টোনের মত বড় বড় শব্দ প্রয়োগে এবং তরঙ্গিত দীর্ঘ ছন্দে আজকাল আর কেহ' বক্তৃতা করেন না।

প্রধান মন্ত্রীকে আজকাল খুব কম দেখা যায়। কদাচিৎ ঘোড়-সোয়ারের মত আসেন। তিনি বক্তৃতা না করিয়া লিখিত বিষয়ই পাঠ করিয়া চলিয়া যান। কারণ

---

সভ্য উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীদের অনেকে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু প্রশ্নোত্তরের পরই মিঃ মণ্টেগু ও শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ ফিসার ব্যতীত আর সকলেই চলিয়া গেলেন। ২০০ সভ্য জুতার খট্‌খট্‌ শব্দ করিতে করিতে সভা-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ভারত সচিব মণ্টেগু ভারত শাসন সংস্কার বিলের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আরও ১০০ সভ্য অন্তর্হিত হইলেন। ক্রমে সভ্য সংখ্যা ৬০ ও ৫০ হইল। অবশেষে দেখা গেল, শ্রোতা কেহই নাই, কেবল বক্তারাই উপস্থিত।"

আজকাল যে কথাই তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে, তাহার মূল্য খুব বেশী। জনসাধারণের ধারণার অনুবর্ত্তী করিয়া সকল রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে চিত্রিত করিতে, সুন্দর নূতন কথায় তাঁহার মত সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে, এমন আর কেহ পারে না। এজন্যই এত শীঘ্র তিনি সমগ্রদেশের সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড্ জর্জ, মিঃ এস্কুইথ, মিঃ ব্যালফুর, মিঃ বোনারল, লর্ড হিউজ সিসিল, মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেন, ইহারাই আজকাল জন সভার প্রখ্যাত বাগ্মী। প্রত্যেকেরই এমন বিশিষ্টতা আছে, যাহা অপর সকল হইতে বিভিন্ন।

পার্লিয়ামেণ্ট হইতে নীলকাগজে বাধান 'Hansard' নামক পুস্তিকায় গত দিবসের সভার সমুদয় কার্য্যবিবরণী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত থাকে। সম্মুখবেঞ্চস্থিত খ্যাতনামা গণের মধ্যে কে কোন সময়ে তাঁর পূর্ব্ব মত বা উক্তির ব্যতিক্রম করিলেন, তদ্বিষয় নিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার চেষ্টায় বেশ একটু কৌতুক চলে। বক্তৃতাগুলি দৈনিক রিপোর্টে মুদ্রিত হয়, এবং সংশোধন জন্য বক্তার নিকট দেওয়া হয়। সংশোধিত বক্তৃতা পুস্তকাকারে বাঁধান হয়।

সরকারী কাগজেঃ বক্তৃতাংশে সর্ব্বদাই অনেক ভুল থাকে। ভুল থাকাই স্বাভাবিক; কারণ অনেক বক্তার কথা হয়ত মোটেই স্পষ্ট হয়না, দূর হইতে তো শুনাইবার না, যাহারা শুনেন তাঁহারা হয়ত ভুল শুনিয়া থাকেন। একবার একজন স্কচ্ বক্তার ( Sir George Campbell ) বক্তৃতা কালে একজন আইরিসসভ্য ( O' Gorman ) উঠিয়া সভাপতির নিকট নিবেদন করিলেন যে রীতিবিরুদ্ধতার জন্য বক্তামহাশয়কে সাবধান করিয়া দেওয়া হউক, এবং তিনি জানিতে চান, এই মাননীয় সভ্য মহাশয়ের তাহার স্বদেশবাসী দিগকে "অভিশপ্ত আইরিশ" ( Blaster Irish ) বলিয়া গালিদিবার কি অধিকার আছে? সভাপতিমহাশয় বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা, যদি করিয়া থাকেন, তবে তাহা পার্লামেণ্টের নীতি বিরুদ্ধ হইয়াছে। উত্তরে বক্তামহাশয় বলিলেন্—তিনি অভিশপ্ত আইরিশ ( Blaster Irish ) বলেন নাই, ( Glasgow Irish ) গ্লাসগো নিবাসী আইরিশ বলিয়াছিলেন। তারপর একটা হাসির ধূম পড়িয়া গেল।

রাত্রি ১১টার সময় বাদানুবাদ শেষ হয়। অন্যান্য কাজে আরো আধঘণ্টা কাটে। বিশেষ কাজ বা বিবেচনার বিষয় না থাকিলে এ সময়ে সভাপতি আসন পরিত্যাগ করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ।

---

# আমি কেন মরি না শ্যাম? কেন বা মরিব?

কেন গো মরি না আমি——প্রবৃত্তির অনুগামী
ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে গাঁথি বাসনার হার
"আমি" ও "আমার" করি হৃদয়ে সে হার পরি
জন্মে জন্মে করিতেছি "আমিত্ব" বিস্তার।
কেন গো মরি না আমি ভাবি বার বার। ১

এই যে নশ্বর ভবে কিছু নাহি স্থির র'বে।
জড় দেহ, এও মম নহে আপনার।
তথাপি "আমিত্ব" মাখি যতনে সাজায়ে রাখি,
অনুরাগে সাদা দেখি যদিও অসার।
কেন গো মরি না আমি ভাবি বার বার? ২

জড় বস্তু ত্যজি যায় তথাপি তাহারি গায়
মনোময় তুলি দিয়া আসক্তি অপার
লেপিয়া রঞ্জিত করি। নাহি দেখি, নাহি স্মরি
রঙে ঢাকা 'রূপ মম——প্রকাশ তাহার,
এই ক্ষুদ্র "আমি" কেন মরে না আমার? ৩

বৃত্তির প্রবাহে ভাসি স্তরে স্তরে সদা আসি
বিষয়ের ছাপ আত্মা ঢাকিয়া আমার
তাহারাই আত্মা হয়——সে ত সব ছায়াময়,
তথাপি সে সবে ভাবি "আমি" ও "আমার"।
অসংখ্য "আমি"র মৃত্যু হবে না কি আর? ৪

মরিলে বাঁচিয়া যাই——আর কভু মৃত্যু নাই
জন্মে জন্মে হবে না এ "আমি" অভিনয় ;
বিভুচিদানন্দে তব অমৃত হইয়া র'ব ।
জড় বিশ্ব নাশে দুঃখ হবেনা আমার ।
কেন গো মরি না আমি ভাবি বার বার ? ৫

কোকিল-স্বভাব তুমি, না ছুঁইয়া নিয় তুমি
সাজিয়া কোকিলা, শ্যাম! কাকের বাসায়
ডিম করি দেখ রঙ্গ, কিরূপে কাকের সঙ্গ,
ফুটিয়া সাবক করে না ভাবিয়া তায়,
মায়া-কাক কত ভাবে তাহারে ভুলায় । ৬

উচ্ছিষ্ট, অমেধ্য মল, অপহৃত অন্ন ফল
চঞ্চুপুটে আনি সদা দেয় তার মুখে,
কে যে তার পিতামাতা, জানে না তাহার কথা,
চিনে না তাহারে, তাই, সেও খায় সুখে ।
অনন্ত অমৃত ভাণ্ড রাখিয়া সম্মুখে । ৭

কর্ম্ম-বেগ আছে তালে, তাই সদা ডালে ডালে
কাক-সঙ্গে বৃক্ষে বৃক্ষে করিছে ভ্রমণ ।
সেই দেহ-বৃক্ষ-শাখে যথা তা'রে রাখে কাকে
তার সঙ্গে থাকি রঙ্গ কর দরশন ।
এমন রসিক শ্যাম ! আছে কোন জন ? ৮

সে যে পাখী কাক নয়——কোকিল-আত্মজ হয়,
চিনিলে অমৃত পিতা পিক-নীলমণি,
বুঝি নিজ তব, ডাক ছাড়ি সেই মায়া কাক
উড়িয়া তোমার কাছে আসিবে তখনি ।
তাই বসি দেখ রঙ্গ শঠ চূড়ামণি ! ৯

এই যে বিশ্বের হাট——এত রঙ্গ এত ঠাট,
"আমি" না থাকিলে শ্যাম ! র'বে না তোমার—
ধুয়ে মুছে যাবে সব——নানা নৃত্য, নানা রব—
নট-নটী রঙ্গালয় এত যে অপার—
রসিকতা, লীলা-খেলা রহিবে কি আর ? ১০

অসংখ্য "আমি" র খেলা, নানা জাতি, নানা চেলা,
"তুমি" 'আমি" ভাবা বলা মিটিবে তোম —

নটরাজ ! চেলা-সঙ্গে নাচিবে না রসরঙ্গে
রাধাময়ী "আমি" শ্যাম ! মরিলে আমার
কোথা র'বে লুকোচুরি খেলার বাহার ? ১১

থাক পূর্ণ, তবু আধা না থাকিলে "আমি"—রাধা
অনন্ত বিভব হবে তোমাতে বিলয় ।
রাধা না রহিলে বামে "আমি" "তুমি" "তিনি" নামে
কে তোমায় জিজ্ঞাসিবে কহ রসময় ?
শুধু আত্মারাম তুমি, "আমি" হ'লে লয় । ১২

সদাই কেবল রও অথচ যুগল হও
বাঁশি রবে চলে সুখে যমুনা উজান,
পাষাণ গলিয়া যায় পদ চিহ্ন ধরে, গায়,
গো-রাখাল নাচে প্রেমে—জীব, অচেতন.
অবনত তরুপত্র লভিতে চরণ । ১৩

প্রেমোচ্ছ্বাসে রজোরাশি বৃন্দাবনে ঊর্দ্ধে ভাসি
আকাশে বাঁশীর গানে দেহ লয় করে ।
আনন্দে তন্ময় হয় গোপ গোপবধূচয়
হরি স্মৃতি দেহ সহ বক্ষে সবে ধরে ।
এ "আমি" ত "আমি" নয়, এ "আমি" কি মরে ? ১৪

মরিব না শ্যাম আমি, পিতা মাতা বন্ধু স্বামী—
আমার সর্ব্বস্ব তুমি, রহিলে প্রকাশ,
দেখিব তোমার রঙ্গ করিব তোমার সঙ্গ,
অনন্ত রসের হবে হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ।
কেন গো করিব আমি "আমিত্ব" বিনাশ । ১৫

কভু বিম্বাধরে বাঁশী, কভু করে ধর অসি,
কভু লও কমণ্ডলু, কভু ধনুর্ব্বাণ ৷
ভাঙ্গা-গড়া স্থিতি মাঝে তোমার স্বরূপ রাজে,
সর্ব্বত্র দেখিয়া তব সেই অধিষ্ঠান
আনন্দ সুধায় মগ্ন রহিবে পরাণ । ১৬

প্রতি পত্র ফুল ফলে আকাশ-অনল-জলে
আলোক আঁধারে হাসি তোমার আননে
হেরি যদি প্রাণভরি, তবে কেন "আমি" মরি ?
আত্ম নিবেদন করি তোমার চরণে
তোমায় "আমার" করি রাখিব যতনে । ১৭

ডাকিলে আসিবে ছুটি, প্রসারি এ বাঁহু দুটি,
জড়ায়ে ধরিব বঁধু! হৃদয়ে আমার।
শ্রী-কন্যা-তনয়-মুখে তোমার আনন, সুখে
দেখিব, রয়েছে ঢালা পূত নিরমল,
করিব হৃদয়ে ধরি জীবন সফল। ১৮

কাচে আঁকা বিশ্ব-ছবি —মরতের শশি রবি,
অঙ্কিত কালের ঢেউ—দিবা-বিভাবরী।
যাহাকে দিয়াছ আঁখি— জ্ঞানজ্যোতি প্রেমে মাখি
—অপার্থিব দৃষ্টি, মায়া-আবরণ হরি,
সে দেখে তোমায় তাঁতে দুনয়ন ভরি। ১৯

ভঙ্গুর কাচের মাঝে তোমার স্বরূপ রাজে—
প্রেমময় জ্ঞানরবি চিদাকাশে হাসে,
গলা প্রেম সোহাগাতে সে রবির রশ্মি সাথে
কতবর্ণ কলে সখা! তোমার বাতাসে।
তাই, ভাসে বিশ্ব-চিত্র অনন্ত আকাশে। ২০

ছিঁড় যদি বিশ্বচিত্র তথাপি তাহার নেত্র
তোমার শ্রীঅঙ্গে আঁকা দেখিবে সে ছবি।
( ভাঙ্গা-গড়া কিবা দুঃখ—কেবলি অনন্ত সুখ
ডোবে যদি তব প্রেমে এই কাব্য কবি। )
সে দেখে প্রেমের রশ্মি ক্রোড়ে নিল রবি। ২১

শুন শঠশিরোমণি! তোমার হ্লাদিনী ধনী
দয়া করি পদ যেন রাখেন মাথায়,
মিশি তাঁর পদতলে, ধরিব তোমার গলে,
পাদু ধরা! তাঁর, তাই, লভিব তোমায়,
বিষময় দুঃখ তাপ লইবে বিদায়। ২২

পাশকাটা পোষা করি, সদা কাছে রাখ, হরি!
কভু কোলে কভুগালে শিরে বা চরণে
উড়িয়া পড়িব তব, দেখি রঙ্গ নব নব
তব সঙ্গে দেহ-বৃক্ষে লভিব শ্রবণে
সুখ-শান্তি, যাহা হয় "আমি"র মরণে। ২৩

তোমার অধরসুধা চঞ্চুপুটে চুষি ক্ষুধা
নিবারি, তোমার সঙ্গে অনন্ত আকাশে
ভ্রমিব পরম সুখে, জাগ্রত তোমার বুকে
রহিব শুইয়া যবে অন্দর আকাশে
প্রবেশ হ্লাদিনি-ক্রোড়ে প্রেমামৃত আশে। ২৪

বহিবে বাঁশীর গান আনন্দে নাচিবে প্রাণ
বিশ্বপূর্ণ সখা মোর করি দরশন!
মায়ার খাচায় তব ভরিও না, হে মাধব!
দিওগো দেখিতে তব মুরতি মোহন—
"আমিত্ব" লইয়া দেও অতুল চরণ। ২৫

প্রাণ সখা শ্রীনিবাস! করো না ইন্দ্রিয়-দাস
এ কিঙ্করে, দয়াসিন্ধো! দেও এই দান।
কেন গো মরিব আমি যদি ক্রোড়ে রাখ স্বামী—
জীবন, "আমি"র মৃত্যু উভয়ই সমান।
এস সখা! লও আসি দেহ-মন-প্রাণ। ২৬

কেন বা মরিব শ্যাম! তব নিত্যানিত্য ধাম—
সবস্থানে আছ তুমি, থাকিব তথায়।
কে আর যতন করি হৃদয়ে ধরিবে হরি!
"আমি" না থাকিলে, নাথ! সব তব যায়।
নিত্যানিত্যে থাকি হ'ব লীলার সহায়। ২৭

বিভব, বিশ্বের ঠাট——যত নাট্যশালা, নাট,
"আমি" না থাকিলে এই "তুমি" ও "তোমার"—
আড়ম্বর, মিটে যায়, রে'খ নাথ! রাঙ্গা পায়
তোমার ইচ্ছায় ইচ্ছা বিসর্জ্জি আমার
নিষ্কাম করিয়া কর ভাবের আধার। ২৮

যেন মহাভাবে মজি তোমার চরণ ভজি,
মোরে হেরি মায়া যেন করে পলায়ন।
যে হাট ভাঙ্গিয়া যথা যাও, নাথ লও তথা,
আপনা হারায়ে নাথ! লভিব চরণ,
পীযুষ-সাগরে মগ্ন মীনের মতন। ২৯

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি এল,

# ভূতের কাণ্ড।

আমরা বাল্যকালে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন প্রাচীনাগণের মুখে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ভূতের গল্প শুনিয়াছি। তখন হাটে, ঘাটে, মাঠে, গাছের আগায়, জলে, স্থলে, গ্রামে গ্রামে, ভূতের অভাব ছিল না। কত লোক ভূত দেখিয়া মরিত, কত লোক অজ্ঞান হইয়া পড়িত, কত লোকের দেহে ভূত আবির্ভূত হইয়া কতপ্রকার অদ্ভূত খেলা খেলিত। ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রায় নৈসর্গিক ঘটনা মধ্যে পরিগণিত ছিল। ক্রমে ক্রমে ভারতে ভূতের উপদ্রব থামিয়াছে, এখন আর ভূতের সঙ্গে লোকের প্রায় দেখা সাক্ষাত ঘটে না। শিক্ষিত বাবুদের মতে ভূত কুসংস্কারের ফল, দেশে যতদিন শিক্ষার অভাব ছিল, ততদিন ভূতের ভয় ছিল, এখন শিক্ষার প্রাবল্যে ভূতের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। আমরা একথা সমীচীন বলিতে পারি না, যদি শিক্ষার অভাবে ভূতের প্রাদুর্ভাব, আর শিক্ষার প্রাবল্যে ভূতের অভাব সম্ভবপর হয়, তবে যে দেশের লোক পূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত, যে দেশে কুসংস্কার নাই বলিলেও চলে, সেদেশে এখন ভূতের অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে পাই কেন। ভূত যেন আমাদের স্কন্ধ ছাড়িয়া এখন ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তাই আমরা বিবিধ পুস্তকে, মাসিক পত্রিকায় ও খবরের কাগজে সময় সময় ইউরোপীয় ভূতের বিচিত্র উপাখ্যান অবলোকন করিয়া থাকি। এ দেশেও ভূতের একবারে অসদ্ভাব হয় নাই, অনেকেরই অনেক সময় ভূতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত ঘটিয়া থাকে। আমার সঙ্গে যে ২।৩টী ভূতের দেখা সাক্ষাত ঘটিয়াছে, তাহারই একটীর কথা আজ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

৪৮ বৎসর যাবত আমি চিকিৎসা কার্য্যোপলক্ষে এই ময়মনসিংহ সহরে আছি। ২৬ বর্ষ বয়সে আমি এখানে আসিয়াছি, বর্ত্তমানে আমার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছে। বহুদিন এখানে বাস করায় টাউনের এবং টাউনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের রাস্তা-ঘাট, বন-জঙ্গল কিছুই আমার অবিদিত নাই, নানাস্থানে গমন করিতে হয় বলিয়া এখানের পথ ঘাট, গ্রাম নগর, সমস্তই আমার সুপরিচিত। এ হেন আমি, বহুদিনের অধ্যুষিত সুপরিচিত টাউনে ভৌতিক ব্যাপারে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম, তাহাই অদ্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৩১৮সনের ২রা ভাদ্র জেলার নিকটবর্ত্তী সম্ভূগঞ্জ হইতে একটী রোগিণীর অভিভাবক আসিয়া বলিলেন, মহাশয়! অদ্য শেষ বেলায় গুদারা ঘাটে গাড়ী পাঠাইয়া দিব,আপনি ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া সেই গাড়ীতে একবার রোগিণীকে দেখিয়া আসিবেন। আমি স্বীকৃত হইয়া দিবা ৪ টার সময় গুদারা ঘাটে আসিলাম এবং পার হইয়া গাড়ীতে রোগিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম।

সেখানে কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি ৭॥ টা কি পোনে আটটার সময় ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া নদীর পারের রাস্তায় উঠিলাম। আমি যখন রাস্তায় উপস্থিত হইলাম তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিশেষতঃ সে দিন কৃষ্ণ পক্ষের দশমী তিথি ছিল। কিন্তু আমার বাসা ওখান হইতে অর্দ্ধপোয়া মাইলও হয় কিনা সন্দেহ; রাস্তায় পরিষ্কার আলো জ্বলিতেছে, সুতরাং বাসায় যাওয়া কিছুমাত্র কষ্টকর নহে।

আমি গমনোদ্যত হইয়াই দেখিলাম, আমার সম্মুখে ৭৮ হাত ব্যবধানে একটা বৃহদাকার কাল বর্ণের কুকুর দণ্ডায়মান। রাস্তায় কত সময় কত কুকুর থাকে, আমি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাসার দিকে হাটিতে আরম্ভ করিলাম, কুকুর আমার অগ্রে অগ্রে হাটিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ হাটিলাম কিন্তু বাসায় আর উপস্থিত হইতে পারিলাম না। কোথায় আসিয়াছি, তাহাও অনুভব করিতে পারিলাম না। দুই পার্শ্বে দোকান ও ভদ্রলোকদের বাসা দেখিতেছি, সর্ব্বত্র আলো জ্বলিতেছে, অথচ আমি যেন কোন নূতন রাজ্যে নূতন দেশে উপস্থিত হইয়াছি।

লোকে কত টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিয়া দেশান্তরে নূতন দৃশ্য দেখিতে যায়, আর আমার ভাগ্যে তাহা বিনা ব্যয়ে বিনা পরিশ্রমে ঘটিল, তাই মনে বড় আনন্দ বোধ হইল। ভাবিলাম এ সুযোগ

সহজে পরিত্যাগ করিব না, আরও কিছু দেখিয়া নেই, তারপর ৪০ বৎসরের পরিচিত রাস্তা আমার নিকট কতক্ষণ অপরিচিত থাকিতে পারিবে।

আমি যখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তাকরি কুকুরও তখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে। প্রথমতঃ কুকুরকে যতদূর ব্যবধানে দেখিয়া ছিলাম সে ঠিক ততটুক ব্যবধানেই আছে। আমি আবার হাটিতে আরম্ভ করিলাম, আমি গতির বেগ যখন যেরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করি কুকুরও সেইরূপ আমার অনুকরণে গমন করিতে থাকে। অনেক দূর হাটিয়া একটা চৌমাথার রাস্তায় একটু দাঁড়াইয়া কোনদিকে যাইব চিন্তা করিতে লাগিলাম, কুকুরও তখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইতঃপর আমি, ইচ্ছা করিয়া যখন যতটুক সময় দাঁড়াইয়া থাকিতাম দেখিতাম, কুকুরও ঠিক ততটুক সময় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কুকুর যেন আমাকে ছাড়িয়া একপদও অগ্রসর হইতে চায় না।

এইভাবে প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল অতীত হইয়া গেল, হাটিতে হাটিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, তখন ভাবিলাম আর না, ঢের হইয়াছে, এখন একজন ভদ্রলোকের বাসায় উঠিয়া বলি যে আমি কিছুতেই বাসায় যাইতে পারিলাম না; একজন লোক দিয়া আমাকে বাসায় পৌছাইয়া দেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একটা বাসার দিকে চলিলাম, কিন্তু লজ্জা আসিয়া তখনই বাধা প্রদান করিতে লাগিল। এখানে ৪০ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন বাস করিলাম, যৌবনের প্রারম্ভে আসিয়াছি, বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় প্রায় উপস্থিত হইলাম, এখন কোন্ মুখে বলিব যে বাসা চিনিয়া যাইতে পারিলাম না। লোকে মনে করিবে কি? না কেহকে কিছু বলিব না, না হয় সমস্ত রাত্রি এই ভাবে হাটিব, রাত্রি প্রভাতে কখনও এ ভ্রম থাকিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া আবার হাটিতে আরম্ভ করিলাম। বলা বাহুল্য যে আমি এতক্ষণ যত রাস্তা হাটিয়াছি তাহার কোথাও গাড়ীর আড্ডা দেখিতে পাই নাই, পাইলে অবশ্য গাড়ী করিয়াই বাসায় উপস্থিত হইতাম। হাটিতে হাটিতে এবার এক অন্ধকারময় স্থানে উপস্থিত হইলাম। সে রাস্তায় আলো নাই, দুই পার্শ্বে বাড়ী আছে, ঘন সন্নিবিষ্ট নহে, অনুমানে বুঝিলাম টাউন ছাড়িয়া আসিয়াছি।

ইহার পর আমি এক সঙ্কীর্ণ রাস্তায় প্রবেশ করিলাম। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন, রাস্তার উভয় পার্শ্বের বৃক্ষাবলীর ছায়ায় ক্ষীণ পথ ভীষণ সূচীবিদ্ধ অন্ধকারে সমাবৃত। এই অবস্থায় কুকুর আমার অগ্রে আছে কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে প্রথমতঃ তাহা বুঝিতে পারিলাম না, একটু পরেই বিদ্যুতালোকে দেখিলাম কুকুর সেইভাবেই আমার অগ্রে পথ প্রদর্শক রূপে চলিতেছে। ইহার একটু পরেই আমার শ্রীপাদপদ্ম পাদুকা সহ কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া গেল। তখন বুঝিতে পারিলাম, শ্রীপাদ পদ্মের অধোগতি হইয়াছে, আমারও অধোগতির বিলম্ব নাই, তখন মনে ভয় হইল, অনুতাপও হইল। ভয় হইল এই জন্য, এ কোথায় আসিলাম, ঘোর নিশায় ভীষণ জন শূন্য স্থানে মহা বিপদে পড়িলাম। অনুতাপ হইল এই জন্য যে পূর্ব্বে লজ্জায় কেহকে জিজ্ঞাসা করিলাম না, এখন জিজ্ঞাসা করিবারও লোক পাইতেছি না। ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া সজোড়ে কর্দ্দম হইতে পাও তুলিয়া লইলাম, এবং পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া জুতা হাতে নিয়া যেদিক হইতে আসিয়াছিলাম আস্তে আস্তে সেই দিকে হাটিতে আরম্ভ করিলাম। তখন নভোমণ্ডল আরও ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। আমি সেই বিদ্যুতালোকে দুই চারি পদ অগ্রসর হই, আবার দাঁড়াই। এই ভাবে আস্তে আস্তে রাস্তায় চলিতে লাগিলাম। কুকুর তখনও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভীষণ মুখভঙ্গী দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইতেছে, ইহাও সৌদামিনীর কৃপায় অবলোকন করিলাম।

গভীর নিশার নিস্তব্ধতায়, অন্ধকারের প্রাবল্যে ও কুকুরের বিকট মুখ ভঙ্গীতে বস্তুতঃই তখন আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কি করি উপায় নাই বলিয়া ভগবানের নামে ও সাহসে নির্ভর করিয়া ক্রতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে অপেক্ষাকৃত

প্রশস্ত রাস্তা পাইয়া বিশ্রামার্থ একটু দাঁড়াইয়াছি সৌভাগ্য ক্রমে তখনই উত্তর দিকে রেলগাড়ীর হুঁইসেল শুনিতে পাইলাম। তখন বুঝিতে পারিলাম, যে সহর ছাড়িয়া অনেক দক্ষিণে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, তখন শব্দানুসারে উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম। উদ্দেশ্য, কোন মতে ষ্টেশনে পৌছিতে পারিলেই বাসায় যাইতে পারিব। উত্তরে যাইতে একটী রাস্তাও সম্মুখে পাইলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি রাস্তাটি উত্তরে না গিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়াছে। সেই দিকেই চলিলাম, পদ নিঃক্ষেপে রাস্তাটী পাকা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, রাস্তায় লোক জন প্রায় চলে না। হঠাৎ এক-জন লোককে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম গিরিশ কবিরাজের বাসায় কোন রাস্তায় যাইব। পথিক উত্তর করিল যে রাস্তায় যাইতেছেন, সেই রাস্তা। তখনও আমি কোথায় যাইতেছি জানি না, কুকুরও আমার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। হঠাৎ দক্ষিণ দিকে রাস্তার পার্শে একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইলাম, মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। মনে করিলাম এই পুষ্করিণীর জলে জুতা ও পা ধুইয়া জুতা পায় দিয়া বাম দিকের বাসায় যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিব, তার পর ইহাদের একজন লোকের ও লণ্ঠনের সাহায্যে বাসায় উপস্থিত হইব।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পুষ্করিণীর নিকট যাইতেই আমার অগ্রগামী কুকুর পুষ্করিণীর জলে ঝাপ দিয়া পড়িল এবং মধ্যদিকে সাঁতরাইয়া যাইতে লাগিল। কিছু দূরে গিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কুকুর দুই তিন বার ডাকিল। সড়কের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম কুকুর জলের উপরে দুই পায় সোজা-ভাবে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে। কুকুরের এই ভাব দেখিয়া আমার চৈতন্যোদয় হইল। মনে করিলাম আমি এই কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত স্থানে অপরিচিতের ন্যায় প্রায় ৫ ঘণ্টা কাল ঘুরিয়াছি, কুকুর যে পথে গিয়াছে সেই পথেই মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় চলিয়াছি. এখন কুকুর জলে পড়িয়া আমাকেও যেন জলে নামিতে ইঙ্গিত করিতেছে, আর একটু অগ্রসর হইলেই আমার জলে পড়িতে ইচ্ছা হইবে, তারপর কুকুর আমাকে নিশ্চয়ই জলে ডুবাইয়া মারিবে। এই চিন্তামাত্রেই প্রাণের ভয়, ভয়ের পরেই পলায়ন। হস্তের পাদুকা হস্তেই রহিল, আমি একদৌড়ে সড়কে উঠিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাস্তায় পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলাম। কিছুকাল বিশ্রামান্তে—বুঝিতে পারিলাম আমি নূতন বাজারের পশ্চিম দিকের রাস্তায় উপবিষ্ট। উঠিয়া যেদিকে চাই, সেই দিকেই পরিচিত বাসা দেখিতে পাই, পথঘাট সকলই আমার পরিচিত। কুকুর আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমও আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

আমি যেন নূতন রাজ্য হইতে আবার পরিচিত নূতন বাজারে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে এই নূতন বাজার আমার তখনকার বাসা হইতে প্রায় ১মাইল দূরে অবস্থিত। কোন পথ দিয়া কোথায় কোথায় ঘুরিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহা তখনও অনুভব করিতে পারি নাই। এই অবস্থার পর নিঃশঙ্কচিত্তে একাকী বাসায় উপস্থিত হইলাম। তখন রাত্রি প্রায় ১টা, বাসার সকলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। শয়ন ঘরে কপাট ধরিয়া অনেক ধাকাধাকী ডাকাডাকী করায় গৃহিণী জাগিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

ঘর্ম্মাক্ত বস্ত্র, আজানু কর্দ্দম, আমার অদ্ভুত মূর্ত্তি পাদুকা হস্তে গৃহিণীর নিকট দাঁড়াইল। আমার মূর্ত্তি দেখিয়া গৃহিণী অবাক; কিছু কাল স্তম্ভিত থাকিয়া গৃহিণী ভয় বিহ্বল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন একি, এ অবস্থা কেন। আমি বলিলাম, অবস্থার কথা পরে বলিব, অগ্রে জল আন। জল আসিল, হাত পাও ধৌত করিয়া গা মুছিয়া কাপড় ছাড়িয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিলাম, পরে আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনা গৃহিণীর নিকট বলিলাম। আমি কোনও ভয় পাই নাই, এ কথাও বুঝাইয়া বলিলাম।

আজ এই একটি ঘটনার কথাই লিখিলাম।

ভূততত্ত্ব বিদ্‌গণ যদি এ ঘটনার কোন বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেন, তবে বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার এই ভূত গ্রস্ততার কারণ অবগত হইয়া যাইতে পারেন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

# উদ্ভিদ।

## দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

আমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে উদ্ভিদ কিরূপে আহার করে। এবিষয় আলোচনা করিতে আমরা আদি উদ্ভিদ যাহা ডিম্বকোষে নিবদ্ধ তাহার বিষয় ছাড়িয়া উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ যাহার ফল ফুল জন্মিয়া থাকে তাহাদের কথা উল্লেখ করিব। এক কথায় বলিতে গেলে বৃক্ষ তাহার পাতার দ্বারা আহার করিয়া থাকে বলা যাইতে পারে। পাতাই ইহাদের মুখ ও পাকস্থলী।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে পাতা কি? ইহা বৃক্ষের অঙ্গ বিশেষ। ইহার এক অংশ পাতলা চেপটা ও অপর অংশ পাতার বোটা। দূর্ব্বা প্রভৃতি কোন কোন উদ্ভিদের পাতার বোটা নাই। সাধারণতঃ এই পাতা হরিৎ রঙের ও চেপ্টা এবং ইহার উপরে যথা সম্ভব সূর্য্যের কিরণ পতিত হইতে পারে। ইহা বায়ু হইতে সূর্য্যের কিরণ সহযোগে যথাসম্ভব কার্ব্বনিক এসিড্ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থান ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত বৃক্ষের পত্রের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই পাতা কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস আহার করিয়া থাকে বায়ু মণ্ডলে যে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস বর্ত্তমান আছে, তাহা ভক্ষণ করিতে এই পত্রগণের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। লোকের ধারণা উদ্ভিদ মাটি হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে কিন্তু ইহা নিতান্ত ভুল। সমস্ত বৃক্ষের সহিত তুলনা করিলে উহা মৃত্তিকা হইতে যে পার্থিব পদার্থ গ্রহণ করে তাহা অতি সামান্য। ইহার অধিকাংশ পুষ্টি সাধনই ভূবায়ুর কার্ব্বন ও জলের হাইড্রোজান ও অকসিজান হইতে হইয়া থাকে। সহজেই আমরা ইহার পরীক্ষা করিতে পারি। একটা উদ্ভিদকে শুষ্ক করিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা হইতে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস ও জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া গিয়া অল্প মাত্র ছাই অবশিষ্ট থাকে। এই ছাই আমাদের পার্থিব পদার্থ। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কৃষক বৃক্ষরোপনকালে বায়ু সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া মৃত্তিকা সম্বন্ধে এত চিন্তা করে কেন? ইহার উত্তর আমরা পরে দিব।

কার্ব্বনিক এসিড্ যদিও একটী গ্যাস, তথাপি বৃক্ষের স্থূলদেহ নির্ম্মাণ করিতে ইহার প্রয়োজন। পাতা এই কার্ব্বন বায়ু হইতে গ্রহণ করে। উদ্ভিদের এই ক্রিয়াটী আমাদের শ্বাস ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ইহাই উদ্ভিদের প্রকৃত আহার।

একটী বৃক্ষপত্রের পাতলাঅংশ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব যে উহার উপরি ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ জলময় কোষ সকল বর্ত্তমান। উহারা ভূবায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্ সংগ্রহ করে। উহাদের নিম্নে হরিৎ বর্ণের কোষ সমূহ বিদ্যমান এবং জীবনী শক্তি সম্পন্ন হরিৎ পদার্থে (Chlorophyll) পরিপূর্ণ। উহারা জলময় কোষ হইতে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্রহণ করিয়া তাহাদ্বারা শর্করা শ্বেতসার এবং জীবদেহের অপরাপর জিনিষ তৈয়ার করে। হাইড্র কার্ব্বন (Hydro-corbons) এবং কার্ব্ব-হাইড্রেঠাস্ (Corbo Hydratas) ও এরূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পাতার নিম্নস্তরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ কোষ রহিয়াছে। ঐ রসের দ্বারাই সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৃক্ষের পত্ররূপী শত সহস্রমুখ রহিয়াছে, কিন্তু জীবগণের একটী মুখ দ্বারাই কার্য্য সমাধা হয়। ইহার কারণ বৃক্ষ একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়াই তাহার আহার সংগ্রহ করে এবং বায়ুতে অবস্থিত সামান্য কার্ব্বনিক এসিড্ সংগ্রহ করিয়াই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কাজেই ইহার বহুমুখে আহার না করিলে চলে না।

এখন আমরা দেখিতেছি, পত্রই উদ্ভিদের এবং পরক্ষ ভাবে প্রাণিগণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। উদ্ভিদের পত্রের আকার বহুবিধ। যে স্থলে উদ্ভিদ বিরল ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে সে স্থলে তাহাদের পত্র প্রশস্ত ও বিস্তারিত হইয়া থাকে ইহার উদাহরণ তামাক ও সূর্য্যমুখী ফুলের পাতা। কিন্তু ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদের পত্র ঘাসের পত্রের মত লম্বা ও সরু হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের পত্রকে প্রসারিত রাখিবার জন্য শিরের মত শক্ত একরূপ পঞ্জর উহাতে বিদ্যমান্ আছে। সে জন্য পত্রকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক

শ্রেণী হস্তাঙ্গুলির মত যথা—পেপের পাতা, কুমরিয়া লতা কিম্বা পিপুল লতার পাতা। ইহাদের শিরগুলা এক স্থান হইতে বাহির হইয়া ছড়াইয়া পরিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণী পাখীর পালকের মত অর্থাৎ মধ্যের শির হইতে ক্রমে দুই পার্শ্বে, দুইটী করিয়া শির বাহির হইয়া গিয়াছে, আম, কাঠাল ইত্যাদি বহুবিধ বৃক্ষপত্র ইহাদের উদাহরণ। আবার ইহাদের মধ্যেও বহুবিধ প্রকার-ভেদ আছে। পাঠক একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা দেখিতে পাইবেন।

জীবগণের আত্মরক্ষার্থে ভগবান যেমন নানারূপ উপায় করিয়া দিয়াছেন সেইরূপ উদ্ভিদ পত্রের আত্মরক্ষারও নানাবিধ পন্থা রহিয়াছে। কোন পত্রের অগ্রভাগে সূচালু কাহারও গাত্রে কণ্টক এবং কাহারও দুর্গন্ধে জীব নিকটে যাইতে চাহে না।

মরুভূমির উদ্ভিদের পত্র আমাদের দেশ জাত গুল্ম পত্রের মত কোমল হয় না কারণ তথাকার প্রখর উত্তাপে উহা অচিরে শুষ্ক হইয়া যায়। কাজেই মরুভূমির পত্র একটু শক্ত ও পুরু হয় যেন সূর্য্যের কিরণে উহা সহজে ধ্বংস হইয়া না যায়।

আদি উদ্ভিদাণু যাহা একটী কোষে আবদ্ধ তাহার সেই কোষই ( cell ) উক্ত বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, শাখা কিম্বা মূল সমস্তের কার্য্য করিয়া থাকে। উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তাহা দ্বারাই বৃক্ষের ভিন্ন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এ যাবৎ আমরা ইহা একরূপ প্রতিপন্ন করিলাম যে উদ্ভিদ সূর্য্য কিরণ সহযোগে বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্ আহার করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ মহাশক্তির আধার সূর্য্য হইতে শ্বেতসার ইত্যাদিরূপে শক্তি নিজ দেহে সঞ্চয় করিয়া রাখে। আদি উদ্ভিদাণু ( cell ) একাই বৃক্ষের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। উদ্ভিদ একটু উন্নত হইলে পত্রের দ্বারায় আহার সম্পন্ন করে এবং পত্রই উহার জীবন ধারণের প্রধান উপায়।

—

বৃক্ষের মূলদেশ সাধারণতঃ ৩টী কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। উহা বৃক্ষকে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রাখে। মূলদ্বারা বৃক্ষ পান করিয়া থাকে এবং মূল দ্বারাই বৃক্ষ জীবন ধারণের উপযোগী বহুবিধ জিনিষ গ্রহণ করিয়া থাকে।

উদ্ভিদের মূল এরূপ বিচক্ষণতার সহিত মৃত্তিকার ভিতরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে যে পণ্ডিত ডারউইন (Darwine) বৃক্ষের মূলকে জীবের মস্তিষ্কের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাদের পথে প্রস্তর, ইট প্রভৃতি থাকিলে সাবধানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহারা মৃত্তিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

এই মূলদ্বারা বৃক্ষ মৃত্তিকার হইতে জল গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহা রস রূপে বৃক্ষের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই জল ব্যতীত বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে আর একটী জিনিষ গ্রহণ করে, তাহাদ্বারা বৃক্ষের জীবনী শক্তি ক্লরফাইল ( chlorophyll ) অথবা জীবউদ্ভিদ দেহের উপাদান প্রটপ্লাজেম ( protoplasm ) নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং সেই উপাদানের নাম নাইট্রজেন ( Nitrogen )। ইহা ভিন্ন বৃক্ষ মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে নানাবিধ নাইট্রেটাস্, সালফেটাস ও ফসফেটাস্ গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে প্রটপ্লাজেম ( protoplasm ) এর কথা উল্লেখ করিলাম। এই অদ্ভুত জিনিস যাহা হইতে উদ্ভিদ ও জীবদেহ গঠিত হয় তাহা কি?

ইহা একরূপ স্বচ্ছ কোমল জেলীর মত পদার্থ। ইহা কার্ব্বন্, হাইড্রজেন, অকসজেন, নাইট্রজেন ও সালফার ঘটিত অতিক্ষুদ্র আণুবিক্ষণীক রেণুতে পূর্ণ। এই প্রটপ্লাজেম অতিশয় নমনীয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিতে ইহাদিগকে অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া মনে হয়, ইহারা সর্ব্বদাই যেন অন্য কিসের সন্ধানে ঘুরিতে থাকে।

জীব ও উদ্ভিদ দেহের জননকারী পদার্থ এই প্রটপ্লাজেমকে কেবল মাত্র উদ্ভিদই তৈয়ার করিতে পারে। উদ্ভিদের ক্লরফাইল (chlorophyll) পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া প্রটপ্লাজেমে ( protoplasm ) পরিণত হয়। ক্লরফাইল ভিন্ন শক্তির উপাদান কেহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, কেন কৃষক উদ্ভিদের বিশেষ উপাদান রৌদ্র ও বাতাসের দিকে

লক্ষ্য না করিয়া মৃত্তিকার দিকে এত মনোযোগী হয়। ইহার কারণ ভূমি কৃষককে অর্থদ্বারা খরিদ করিতে হয় অথচ রৌদ্র ও বাতাস অনায়াস লব্ধ। ভূমির উপাদান হইতে উদ্ভিদ নাইট্রেট্স্. সালফেট্স প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া ভূমিকে দরিদ্র কিম্বা নিঃস্ব করিয়া ফেলিলে এ ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য নূতন উপাদান অর্থাৎ সারের প্রয়োজন হয়। ইহাও ব্যয় ও পরিশ্রম সাধ্য।

একটী উদাহরণ দিলে ইহা ভাল বুঝা যাইবে। অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে কাষ্ঠ ও অক্‌সিজেনের প্রয়োজন হয়। কাষ্ঠ আমাদের অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে হয় কাজেই আমরা কাষ্ঠকে অগ্নির একমাত্র উপাদান বলিয়া জানি; অনায়াস লব্ধ অকসিজেনের কথা কখনও মনে করি না, অথচ উহা ভিন্ন অগ্নি কখনও সম্ভব নহে। যদি আমাদিগকে একটী ক্ষুদ্র কুঠরীর মধ্যে এরূপ ভাবে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখা যায় এবং সম্পূর্ণরূপে বায়ু চলাচল রহিত হয় তাহা হইলে কিছু সময় পরে আমরা অক্‌সিজেনের মূল্য বুঝিতে পারি। তখন যে কোন মূল্যে অক্‌সিজেন পা লেই জীবন রক্ষা হয়।

সেইরূপ কৃষক উদ্ভিদ জন্মাইতে ভূমি ক্রয় করে, উহাকে বীজ বপনের উপযোগী করিবার জন্য পরিশ্রম করে, কাজেই ভূমিকেই উদ্ভিদের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করে। যখন উদ্ভিদ নাইট্রেটস্, ফস্‌ফেট্, পটাসিয়াম প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া ভূমিকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে তখন সাররূপে ভূমিতে ঐ সকল বস্তু প্রদান না করিলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

ঐ সার আমরা গোময় অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি জান্তব পদার্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। কাজেই জীবগণ এক সময়ে—যাহা বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল এখন অন্যরূপে তাহাই বৃক্ষকে দান করিতেছে।

বন-ভূমিতে অনেক সময়ে উদ্ভিদ মরিয়া মাটিতে মিশিইয়া যায়। ইহার ফলে মৃত্তিকা তাহার পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থ পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সে বৃক্ষ ভূমি হইতে ঐ সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া ভূমিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে; সেস্থলে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল বৃক্ষের বীজ বাতাস কিম্বা পাখীর সাহায্যে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

জলাভূমিতে উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে পটাসিয়াম প্রভৃতি লবণ কমই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কাজেই তথাকার উদ্ভিদ কোন কোনটী আংশিক জীব ধর্ম্মাবলম্বী হয়।

ইংলণ্ডে সান ডিউ (Sun dew) নামে একরূপ উদ্ভিদ আছে। উহার পাতা অনেকটা বৃত্তাকার এবং গায়ে এক রকম লাল মুমের মত জিনিস বর্ত্তমান। ঐ মুমের মাথা একটু স্থূল। যখন কোন কীট পতঙ্গ উহার স্রাবের গন্ধে পাতার উপরে অবতরণ করে, তখন উহারা আঠাবৎ স্রাবে আবদ্ধ হইয়া যায়। সে সময়ে উহার লাল মুম হইতে একরূপ পাকরস নিসৃত হইয়া উহাকে হজম করিয়া ফেলে। এই প্রণালীতে ঐ উদ্ভিদ নাইট্রেটস, পটাস ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকায় ( Vemus's fly-pot ) নামে একরূপ উদ্ভিদ আছে। উহাদের পাতা দুই অংশে বিভক্ত, ঠিক যেন একটী কবজা বিশিষ্ট কৌটা। উহার এক অংশের উপরে কোন কীট পতঙ্গ উপবেশন করিলে দুই অংশ যুক্ত হইয়া উহাকে পত্র কোটোরায় আবদ্ধ করিয়া ফেলে। পতঙ্গ যত সময় জীবিত থাকিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে তত সময় পত্রপুটে আবদ্ধ থাকিবে। কীট মরিয়া শান্ত হইলে পত্র পল্লব আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইবে এবং নূতন কীট ধরিবার অপেক্ষায় থাকিবে।

যে সকল উদ্ভিদের মূল দেশ নাইট্রেটস্ প্রভৃতি গ্রহণের অনুপযুক্ত তাহাদের পত্রেরই পতঙ্গ ভোজনের দরকার হয়।

আমেরিকার জলা জায়গায় অনেকরূপ কীট ভোজী উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। তাহাদের সাধারণ নাম Pitcher plants. ইহাদের এক জাতীয় উদ্ভিদের ঘটের মত পত্র পুটে একরূপ স্রাব সঞ্চিত থাকে। উহা চিনির সরবতের মত মিষ্ট। ঐ পুটের পাত্রেও একরূপ মধু নিসৃত হয়। কীট পতঙ্গ তথায় মধু পান করিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটের ভিতরে প্রচুর মধু সঞ্চিত দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ঘটের প্রবেশ পথে একরূপ সূচের মত

লোমাবলী এরূপ ভাবে সজ্জিত যে তাহাতে কীট পতঙ্গ সহজেই প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু বাহির হইতে পারে না। কাজেই পতঙ্গ ক্রমে অগ্রসর হইয়া মধুর মধ্যে পড়িয়া মরিয়া যায়। সে সময়ে উদ্ভিদ উহাকে পরিপাক করিয়া দেহ হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। অষ্ট্রেলিয়াতে এইরূপ উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়।

মালয় দ্বীপে নেপেন্থিস্ Nepenthis নামে ঐ জাতীয় পতঙ্গ-ভুক একরূপ জলজ উদ্ভিদ আছে। উহাদের ঘটের মুখে একটী ঢাকনীর মত থাকে এবং পতঙ্গ প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না। লোভে পড়িয়া কোন কোন ক্ষুদ্র পাখী ঐ পুট গহ্বরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহির হইতে না পারিয়া মারা যায়।

আমরা দেখাইয়াছি যে উদ্ভিদ মূল দ্বারা পান করিয়া থাকে। উহারা যে কেবল জলই পান করে, তাহা নহে। প্রটপ্লাজেম (Protoplasm) ও ক্লরফাইলের (Chlorophyle) বিশেষ উপাদান নাইট্রজেন (Nitrogen) গ্রহণ করিয়া থাকে। যে স্থলে মূলদেশ যথেষ্ট নাইট্রজেন সংগ্রহ করিতে না পারে সে স্থলে উদ্ভিদ পত্র কিম্বা শাখা দ্বারা পোকা অথবা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কোন কোন বৃক্ষ শাখাদ্বারা আক্রমণ করিয়া জীব জন্তু পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ শীতের সময়ের জন্য মূল দেশে বহু সার সংগ্রহ করিয়া রাখে। কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড মরিয়া গেলেও মূল দেশে জীবনী শক্তি নিহিত থাকে। আলু কচুর মত যথা সময়ে তাহা হইতে উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

---

# কবি লোচন কর্ম্মকার।

লোচন কর্ম্মকারকে আমরা দেখি নাই। অনেক দিন হইল লোচন,—লোক-লোচনের অতীত কোন এক অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। লোচন চলিয়া গিয়াছেন বটে,—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহার যশ-সৌরভে পূর্ব্বময়মানসিংহের অনেকটা স্থান আমোদিত।

পল্লী কবি লোচনের কবিত্ব কৌমুদীর অপূর্ব্বচ্ছটায় পল্লীস্থ পদ্য সাহিত্যের পর্ণকুটীর বিলক্ষণ প্রদীপ্ত। লোচন কোন পুস্তকাদি রচনা করিয়া যান নাই। কেবল তাঁহার রচিত কতকগুলি ছড়া ও গীতি কবিতা প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

লোচনের বাড়ী ছিল নেত্রকোণার আমতলা গ্রামে। বর্ত্তমান কালে লোচনের বংশধর কেহ নাই,—কেবল তাঁহার গুণ গরিমার অতীত ইতিহাসই লোচনকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

কবি লোচন কর্ম্মকারের অতি সুন্দর একটী কবি-গানের দল ছিল। তিনি স্থানে স্থানে এই দল লইয়া, স্বরচিত মান, যোগী, সন্ন্যাস, গোষ্ঠ, সখিসংবাদ, প্রভাস মিলন, মাল্‌সী, বিজয়া ও কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি গান গাইয়া শ্রোতৃবর্গকে অতুলানন্দ দান করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন ঢোল কাঁশী সংযোগে কবিগান গীত হইয়া থাকে, লোচনের সময় এরূপ ছিল না। খোল করতাল ও বেহালা সংযোগে কবিগান করা হইত। আর এখন যেমন উপস্থিত বুলিতে ছড়া পাঁচালী, গানের জওয়াব ও টপ্পা বলিতে হয়, তখন ইহাও ছিল না। কাগজে কিম্বা কলারপাতে লিখিয়া অতি সংক্ষিপ্তরূপে ছড়া পাঁচালী এবং জওয়াব টপ্পা করিতে হইত।

আমাদের এই কর্ম্মকার কবির রচিত ছড়াগুলি, অতি সুন্দর হইত বলিয়া অনেকে তাহা লিখিয়া শিখিয়া লইত। এতদঞ্চলের অধিকাংশ ছড়াই "লোচনের ছড়া" বলিয়া প্রবাদিত।

কেহ কেহ আবার লোচন কর্ম্মকারের রচিত অতি সুন্দর ছড়াগুলিকে,—"চৈতন্য মঙ্গল, রচয়িতা লোচন দাসের বলিয়া অযথা কুতর্কের সৃষ্টি ও কলহ করিয়া থাকেন। এবং এই সকল উজ্জ্বল-মধুর রস সংপৃক্ত কবিতাগুলি পল্লী বাসীর, হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া কবি লোচন দাসের দপ্তরে গুঁজিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন।

আমি বহুদিন যাবত লোচন কর্ম্মকারের গীত ও ছড়া সংগ্রহে ব্রতী হইয়াও বিশেষরূপ সাফল্য লাভে সমর্থ হইতে পারি নাই। কারণ, অঙ্গহীনা বস্থায় ভিন্ন, এখন আর এক জনের মুখেও একটি ছড়া বা গান সম্পূর্ণরূপ শুনা যায় না।

ময়মনসিংহের দাশুরায়,—রামগতি শীল ও নিরক্ষর কবি রামু মালীর মুখে কবি লোচন কর্ম্মকার-কৃত ছড়া ও গান সময় সময় শুনিয়া সুখী হইতাম। সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু, তখন মনোযোগের সহিত সে গুলি সংগ্রহের চেষ্টা করি নাই। তবে যে দুই-চারিটি ছড়া কি গান খুব ভাল লাগিত, তাহাই লিখিয়া লইয়া মুখস্থ করিতাম। দীর্ঘকাল ধরিয়া সমালোচনার বাহিরে থাকাতে সেই মুখস্থ করা কবিতা গুলির ও অনেকগুলি, এবং অনেকগুলির অনেকাঙ্গ, বিস্মৃতি বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে,—তাহাই অদ্য "সৌরভে"র কৃপাময় পাঠক-পাঠিকা-গণের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া, কবি লোচন কর্ম্মকারের কবিত্ব শক্তির কিঞ্চিদাভাষ প্রদান করিতেছি।

১। লোচনের ডাক মাল্‌সী।

দুর্গা গো,-তুমি দুঃখ হরা,-পরাৎপরা পরম ঈশ্বরী।
তোমার রাঙ্গাচরণ পাবার লাগি,—শ্মশানবাসী ত্রিপুরারী॥
তুমি আদি তুমি অন্ত,—কে জানে তোমার তদন্ত, ভ্রান্ত মনে সর্ব্বদা ঘুরি,—
কেন্দে লোচন বলে, মরণ কালে, পাই যেন মা,- চরণ তরী॥

( অন্তরা )

মা, আমার ভাব্‌না কিগো, ভব্‌তরিতে,—
বাজাব দুর্গা নামের ডঙ্কা।
তোমার নামের বলে বল্ করেছি,—
শমনের আর নাই গো শঙ্কা॥
তোমার নামের যে মহিমা,—কে কর্ব্বে তাহার সীমা,
নামটী তোমার নিরুপমা,—ভবপারের তঙ্কা,—
( তোমার ) নামের বলে, অবহেলে, শ্রীরামে জিনেছে লঙ্কা॥

---

লোচনের লহর মাল্‌সী।

চিতান,—ভবানী ত্বং ভব রাণী,—
মহারাণী, ভবে কর পার।
পারাণ,—আমি আসিয়ে ভবের হাটে,—
পড়েছি ঘোর শঙ্কটে,
নাই পারের কড়ি,—না জানি সাঁতার॥
লহর,—তুমি দয়াময়ী নামটি ধর,—নিজগুণে দয়াকর,
আমি বড়, পড়েছি বিপদে, মজে মিছা মায়ামদে,
খেল্‌তে খেল্‌তে ভবের খেলা,—সাঙ্গ হয়ে গেছে বেলা,—
(এখন) তরি যদি সন্ধ্যাবেলা,—তুমি স্থান দিলে শ্রীপদে॥
মিল,---অপরাধ করেছি যত, সংখ্যা নাই মা তার,—
(লয়ে) পাপের বোঝা হইতে পার,—পাপের ঘাটে বসেছি।
মহড়া,—দুর্গা মা গো! তোমার চরণতরী পাব বলে,—
আশাতে রয়েছি॥
ধুয়া,—ভবনদীর যে তরঙ্গ, তাই দেখে হৈল আতঙ্ক,
অঙ্গে নাই আর বল,—মাগো!
দুর্ব্বলের বল আর কি আছে,—নিদানের সম্বল,—
বিনে তোমার চরণ তরী, ভবনদী—কিসে তরি,
( তোমার ) নামের বলে দিব পারি,—এই ভরসা করেছি।
খাদ,—শত অপরাধে পদে, অপরাধী—আছি।
লহর,—আমি জন্ম ভরা তোমায় ভুলে,—মজে মিছা মায়া ভুলে,
গোলেমালে, হারা হৈলাম সব, আর্ কি জানাব সে সব,
সকলি মা জানো তুমি, তুমি আকাশ পাতাল ভূমি
অজ্ঞান আমি কিবা জানি, তোমার বৈভব॥
মিল,—কু কাজে কু সঙ্গে আমার দিন হয়েছে গত,—
( বলে ) জানাব আর দুঃখ কত,—হত বুদ্ধি হয়েছি॥

( এই গীতটীর অন্তরা, পরচিতান ও পরের লহর, মিল পাওয়া গেল না। )

২। ( বাসক সজ্জা নায়িকার প্রতি সখির উক্তি। )

চিতান,—কালা আস্‌বে বৈলে, নিশা কালে,
রাই,—অতি মানের সাথে।
পারাণ,—কৈরে বাসর সজ্জা, সুখের সুখ শয্যা,—
ফুল শয্যা কল্লেন শ্রীরাধে॥
লহর,—তুইলে রাধাপদ্ম,-কৃষ্ণকেলী, মল্লিকা মালতী বেলী,
নবকলি, তুইলে নানা ফুল,--
ও যার সৌরভে হয় প্রাণাকুল,—
হায়! জানে না রাই এমন হবে, সাধের কালা ছেড়ে যাবে,
ফুলের শয্যা বাসি হবে, মজাবে দু'কুল॥
মিল,—যেয়ে সুচিত্রা চিত্রলেখা,—
ললিতা,—রাধার সাক্ষাতে গো,—
মলিন বদনে সবে কেন্দে বলে।

মহড়া,—কেন গাঁথ মালা,—ও রাই রাজ বালা,
কালা বায় মধু মণ্ডলে ॥
ধুয়া,—তুমি নির্জ্জনে বনে গিয়ে, বন ফুল তুইলে,—
মালা গেঁথেছ রাই,—
নিশিতে শ্যাম বন্ধুর গলে দিবে বৈনে,—
এইল না সাধের কালা,—গেল না মনের জ্বালা,—
এখন তোর্ ফুলের মালা দিবে কার গলে।
খাদ,—মালা গেঁথেছ রাই, চিকণ চিকণ ফুলে ॥
লহর,—তোমার মালা হৈল কালভুজঙ্গ,
দংশন কর্ব্বে কোমল অঙ্গ, শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
ব্রজে রবে না,—সাধ্‌লে কালা শুন্‌বে না,
হাঁয় রাধে,—বৃথা হৈল কুসুম তোলা,—
সাঙ্গ হৈল ব্রজ লীলা,—
আর তোমার বন্ ফুলের মালা গলে পর্‌বে না।
মিল,— * * * *
অন্তরা,—ফুল তোলা সার হৈল তোমার রাজ নন্দিনী।
গেঁথেছ বন্ ফুলের মালা,—
মন মত চিকণ গাঁথুনী ॥
কার লেগে গেঁথেছ মালা,—মালা হৈল জপ মালা,—
ব্রজে রবেনা রবেনা চিকণ কালা,—
তুমি চিন্তা কর যার, ঐ যমুনা পার,—
ঐ দেখ তোমার চিন্তা মণি ॥

এই গীতটি হর্ষ-বিষাদের একটি পরিস্ফুট চিত্র। সমালোচনায় নিরক্ষেপ ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, এই গীতের ভিতর কবির রচণা কৌশল ও ভাবরসের সমাবেশ-প্রাচুর্য্য অ ত স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। গীতের শেষাংশটি বোধ হয় ভাবী বিরহের করুণ কান্নায় আরো রসাল ছিল,—কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা আর পাওয়া গেল না।

৩। লোচনের আর একটি গীত।

চিতান,—আশাতে জাইগে নিশি প্রভাত কালে।
পারাণ,—বিনে প্রাণ বল্লভে, আশা নিরাশ ভেবে,—
প্যারী কেন্দে বলে ॥
লহর,—নিশি পোহাইল, কি হৈল, কালা এইল না,—
আর ত সহেনা সে যন্ত্রনা,—
বাসি হৈল শয্যার ফুল,
দুঃখেতে প্রাণ হৈল আকুল,—
যার জন্যে সই হাঁরাইলাম কুল, তাঁরে পাইলাম না ॥
মিল,—শুনে শ্রীমতীর দুঃখের কথা বিশাখা কয়,—
আইজ আর—আস্‌বেনা বনমালী, সময় গেল।
মহড়া,—থেইকে কাজ কি গো রাই গৃহে যাই চল ॥
ধুয়া,—আমার এ বাঞ্ছা ছিল মনে, আস্‌বেন হরি,
কর্ব্বো দু'জনার চরণ সেবা অতি যত্ন করি,—
এইল না সাধের কালা, গেল না মনের জ্বালা,—
বুঝি আইজ হৈতে প্রেমের খেলা ঘুচে গেল।
খাদ,—করে প্রেম কালার সনে একি জ্বালা হৈল।
লহর,—আমি জানি রাই, বিচার নাই, লম্পটের কাছে,—
সে যে শঠের ধর্ম্ম শিখেছে,—
মন রাখা তাঁর মুখে মুখে, যতক্ষণ সে রয় সম্মুখে,
অপর কি তার মনে থাকে,—কি বইলে গেছে ॥
মিল,— * * * *
অন্তরা,—আমি সাধে কি তোমারে কই গো।
যদি না বলি উচিৎ,—ঘটে বিপরীৎ,
পাছে অপদোষী হৈ গো ॥
নিশিযোগে এসে কুঞ্জে,—যেতে চাও যামিনীভুঞ্জে,
রাই—রাই গো,—যদি আসিতে—যাইতে,
কেউ দেখে রাজ পথে, তবে উপায় যে কিছু নাই গো ॥

এই গীতটিরও পরচিতান, ও পরের লহর পাওয়া গেল না। আমাদের কর্ম্মকার কবির এই প্রকার লীলা-রসাত্মক গীতি কবিতা অনেক আছে। প্রবন্ধের বাহুল্য ভয়ে আর লিখিতে ইচ্ছা করিলাম না। এখন কয়েকটি ছড়া মাত্র লিখিয়াই প্রবন্ধের উপসংহারে উপস্থিত হইব।

লোচনের ছড়া।

একদিন কোন এক সূত্রধর সরকার "কামার চামাড় তুল্য বলিয়া লোচনকে গালি দিয়াছিল। লোচন তদুত্তরে ছড়া কাটিলেন,—

বল্লে কিরে! বেল্লিক বেটা শুনে অঙ্গ জ্বলে।
তোর মত মানুষে কিরে! এমন কথা বলে? ॥
চামার তুলে গরুর চাম্‌ড়া, কামার পিঠে লোহা।

(তোর) সাত পুরুষের মধ্যে কিরে ! কেউ জান্‌ল না উহা ?
ছোট লোকের ছোট বুদ্ধি,-কেবল ছোট জ্ঞান।
কথাতেই তোর্ পরিচয়,—সুথারের সন্তান ॥
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র কর্ম্মার, ঘৃতাচীর গর্ভে।
বুক ঠুকিয়া বলতে পারি, সভাতে সগর্ব্বে ॥
কাঠ্‌কাটা কাঠুয়া বেটা জানিস্‌তোনা শাস্ত্র।
চিনিস্ কেবল, কাঠ্ কাটিবার হাতুড় বাটাল অস্ত্র ॥
কর্ম্মকারত সচল জাতি, তুই বেটা অচল।
লগ্‌গী কর্ত্তেও হাতে লয় না, কেউ সুথারের জল ॥
কামার করে লোহার কর্ম্ম, জাতে ভদ্র লোক।
তার সঙ্গে তুলনা তোর্ খাটেনা একটুক্ ॥
কামারকে তুই চামার বলিস্ দুঃখে অঙ্গ ছায়।
বুঝা যাবে যদি দৈবে বাটাল ভাঙ্গ্যা যায় ॥
শূদ্র ভদ্র সকলে খায়, কামার জাতের জল।
তা হইলে ত দেশ জুড়িয়া চামারের এক দল ॥

একদিন বিপক্ষের সরকার কবির ভাবে রাবণ হইয়া,-লোচনকে হনুমান করিয়া বলিয়াছিল,—"মুখ পোড়া বান্দর।,,

লোচন উত্তর করিলেন,—

আমার মুখত আমি পুড়লাম, লেজের আগুণ দিয়া।
তোর্ কি বিশেষ লাভ হইবে, এই কথাটা কইয়া ॥
জগত্ পতি শ্রীরামচন্দ্র, আমি তাঁহার দাস।
ব্রহ্মাণ্ড হইলেও ধ্বংস, আমার নাই বিনাশ ॥
নর বানরে রাক্ষস গোষ্ঠী, সব্ করিবে ক্ষয়।
দুই চাইর দিনের মধ্যে দেখ্‌বে তোর্ দশা কি হয় ॥
তুই আমারে গালিদিলে, "মুখ পোড়া বান্দর,,।
এই বান্দরে দখল কর্ব্বে, রাক্ষসের আন্দর ॥
আমার গেছে মুখ্‌টা পোড়া, তোরও ত মুখ পোড়া।
সূর্পণখার কাটা নাক, কেম্‌নে লাগ্‌বে জোড়া ॥
পর পুরুষে নাক্ কাটিল, তোর্ ভইনেরে ধরে।
মুখ পোড়ার তোর্ বাকি কিরে? দেখ্‌ত বিচার করে ॥
তোর্‌ভইনের নাই নাকের আগা,-দেখে হাসে লোক।
কেমন করে লোকের কাছে, দেখাস্ পোড়া মুখ? ॥
বোচা নাকে বেসর দিতে, পারে না তোর ভইনে।
লজ্জা পাবে বইলে তোরে বেশী কিছু কইনে ॥

লোচন বৃন্দাদূতীর ভাব লইয়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিতেছেন।—

রাধার দাসী বৃন্দা নাম,-শ্রীপদে করি প্রণাম,
গুণধাম,—চিন কি আমারে ?
বহুদিন পরে দেখা, সেই যে ব্রজে ছিল দেখা,—
প্রাণ সখা, মনে কি তা পড়ে ?
তোমার সাধের রাই কিশোরী, ধরাতলে আছে পড়ি,
হরি হরি কি দুর্দ্দশা তাঁর।
স্বর্ণ বর্ণ দেহ ছিল, বিবর্ণ হইয়া গেল,
চিকণ কালা,—রাখ সমাচার ?
কালো ভেবে হৈল কালী, কালী যেমন শ্মশান কালী,
বনমালী, বলি তোমার ঠাই।
তুমি বিনে শ্যাম রায়, নিকুঞ্জ শ্মশানের প্রায়,
তাহে হায়, পড়ে আছেন রাই ॥
ব্রজের দুঃখের কথা, কব কি তোমার হেথা,
আর কথা না সরে বদনে।
ধরি বন্ধু তব পায়, রাধার জীবন যায়,—
শ্যাম রায় চল বৃন্দাবনে ॥

কবি লোচন কর্ম্ম কারের সময়,—কবি গানের বিষয় ছাড়া—অন্য রকমের ছড়াও দুই একটি কবির আসরে বলা হইত। নিম্নে লোচন-কৃত সেই প্রকারের দুইটী ছড়া লিখিত হইল।

(১) ছড়া।

জল ভরিতে, যমুনাতে চল্‌ছে ব্রজ-নারী।
জটিলা কুটিলা পাছে,—আগে বুড়াই বুড়ী ॥
মাইঝ্ খানেতে চান্দের মালা, বৌ সারি সারি।
বাউটী হাতে, পিন্ধনেতে, নানা রঙ্গের শাড়ী ॥
মাথায় খোপা, ফুলের ঝোপা দেখ্‌তে পরি পাটি।
চাপার কলি আঙ্গুলেতে, হীরা মণির আংটী ॥
সর্ব্বঅঙ্গ ভরা কত, স্বর্ণ অলঙ্কার।
ঢল ঢল করে কিবা, যৌবনের বাহার ॥
লিলুয়া বাতাসে তুলে শাড়ীর মাঝে ঢেউ।
লোচন বলে, নয়ান তুলে, যদি দেখে কেউ ॥

(২) ছড়া।

সকাল বেলা, কদম্ তলা, নন্দের কালা চান।
বাঁশী হাতে দাঁড়ায়েছে, গাত্যা প্রেমের কান॥
সখি সঙ্গে মনোরঙ্গে, রাধিকা যায় জলে।
মেঘের বরণ মদন মোহন, দেখ্‌ল কদম্ তলে॥
মন ময়ুরী নাইচা উঠ্‌ল বুকের ভিতর তার।
কলসী কাখে দাঁড়াইল, চল্‌তে নারে আর॥
কুটিলার কটু বাক্যে, ধীরে ধীরে যায়।
আড় নয়ানে, ঘুম্‌টা টাইনে, কালার পানে চায়॥
তাই দেইখে কুটিলা কয়, থাক্‌লো মাগী থাক্।
দাদার কাছে কইয়া তোর কাটাইব নাক॥
গোপের কুলে কালী দিলে ছিনাল মাগী তুই।
সকল ঘরে, পানীপড়ে, উদাম্ থাক্‌লে টুই॥
ঘরের বাহির কর্ম্মোতরে, কৈলাম খাটি খাটি।
লোচন বলে,—কৃষ্ণে প্রেমত বড়ই লট্ খটী॥

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

---

# হিসাব নিকাশ।

"ঘরে চা'ল নাই, যাই কোন ঠাঁই," নিবেদিল প্রজা যবে,
"সকলিত আছি, কোন মতে বাঁচি," বাবু বলিলেন সবে।
কহে প্রজাসব,—"তোমার বৈভব আছেতো প্রচুর প্রভু,
খাবার জন্য, তোমার অন্ন, ভাবিতে হয়কি কভু?
দিন দুই ধরে, নাই কিছু ঘরে, মরিতেছি অনাহারে,
তাই আজ হেথা, জানাইতে ব্যথা, আসিয়াছি তব দ্বারে"।
বুঝি বুঝিলেন, বাবু কহিলেন,—"নহেত এসব ফাঁকি,
কিন্তু কি দেই, টাকা কড়ি নেই, খাজনা যে সব বাঁকী।
গেলত বর্ষা, একটী পয়সা আদায় না হ'লো কোথা,
দিব হে কেমনে, ভেবে দেখমনে, কি হ'বে জানালে ব্যথা?
আছেত খাবার, আমার আবার পাঁচটা খরচ ও আছে,
কতকিছু আর বলিব কি তার, এই পূজা আসিয়াছে;
ছেলে মেয়েদের, দশটা সাধের জিনিষ পূজার দিনে,
কেমনে না দেই, কিছুই কি নেই,? দিতেই হইবে কিনে;
পূজায় খাবার, কিছুত জোগাড় না করিলে কেন হবে?
বছর মধ্য বজিয়া বন্ধ সকল কে করে কবে?
শোন, মোরঠাঁই, কিছু হেথানাই, মিছে আশা মোরকর,
খোঁজ যার কাছে, টাকা কড়ি আছে, হাতে পায় তার ধর"।
কহে প্রজাগণ,—"কহকি রাজন্ একি কথা শুনি আজ!
দয়া মায়াহীন, এতই কঠিন, হইলে কি মহারাজ!
দুর্দ্দিন বলে, ঠেলে ফেলে দিলে, এই কি তোমার কর্ম্ম!
কর বারমাস, আমাদের আশ, নাই কি তোমার ধর্ম্ম?
তুমি প্রতি পলে, আমাদের বলে, বাঁচিয়া আছতো রাজা,
ভূতের বেগার, খাটি কেন আর, সহিতেছি এত সাজা?
পড়িয়া কষ্টে, দুরদৃষ্টে, হাত পাতি চাহি ভিক্ষা,
শিখায়েছ বেশ, নাহি কোন ক্লেশ, হ'য়েছে আজিকে শিক্ষা;
তব আদরের, ছেলেমেয়েদের, কষ্ট সহেনা জানি;
কাঙ্গালের ছেলে, ভাত, নাহি পেলে, ব্যথান কতখানি!
পূজাতে তোমার খাবার জোগাড় নাকরিলে কেন হ'বে?
মোদের শোণিতে এই অবনীতে কীর্ত্তি তোমার রবে!"
বাবু হাতগুটি, করিলেন মুঠি, ভাঙ্গিবেন বুঝি মাথা,
"তোদের কি তবে, দেখাইতে হ'বে, হিসাব নিকাশ খাতা?
এখনি পালাও, ভিটাছেড়ে দাও, চলে' যেতে হ'বে আজি,
পাজীদের আর ভিটাতে আমার স্থান দিতে নহি রাজি।"
করি অনুনয় কতই বিনয় বলে সব প্রজাগণ,
যত বেশী বলে, তাহারে সকলে, বাবু তত রাগ হ'ন;
"জমিদার তুমি, তুমি ভূস্বামী, বলিলেত—'ভিটাছাড়'
একটুকু ঠাঁই, কোথা মোরাপাই, দেখায়ে দিতে কি পারে?
আমরা তোমার, প্রজা আপনার, জানাতে এসেছি ব্যথা,
আমাদের কাছে, দিতে নাহি আছে, হিসাব নিকাশ খাতা,
আমাদের হেথা, নিকাশের খাতা, দেখাতে হবেনা কভু,
একজন আছে, ওগো যার কাছে, দেখাইতে হবে প্রভু।"

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

---

# পুনার পত্র।

( দোলযাত্রা )

এবার দোলযাত্রার দিনটা এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালী—আমরা কি ভাবে কাটাইয়া ছিলাম, তাহার একটু আভাস এখানে আজ দিতে প্রয়াস পাইব।

এবার দোলযাত্রার দিন ছিল রবিবার; তাই আমাদেরও সুবিধা হইল। পূর্ব্ব হইতেই দোলযাত্রা সম্পাদনের জন্ত প্রত্যেক আফিস্ হইতেই চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আমরা সবাই ॥০, ১৲ টাকা সাধ্যানুসারে দিলাম, মোটামাহিয়ানার হিসাব পরীক্ষক (Accountant) ডেপুটী এগ্‌জামিনার যাঁহারা আছেন, তাঁহারা ৫৲ ১০৲ ১৫৲ ২৫৲ টাকাও সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন শনিবার ৫ ঘটিকার সময় শতাধিক বালক, যুবক, বৃদ্ধ বাঙ্গালী— আমরা এক হরি-সংকীর্ত্তনের মিছিল—বাহির করিলাম। এস্থানেবলা আবশ্যক যে এই দোলযাত্রার উৎসব পুনা হরি-সভার পক্ষ হইতে সম্পন্ন করা হইয়াছিল। উক্ত হরি-সভা এখানে বাঙ্গালীদের একটী প্রতিষ্ঠান। প্রতি শনিবার সভা-মণ্ডপে ভাগবত পাঠ ও হরি-সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, কীর্ত্তনান্তে প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। কলিকাতা হইতে দুইটী মৃদঙ্গ ও দুই জোড়া করতাল আনাইয়া কীর্ত্তনের সুবিধা সম্পাদন করা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ পতাকা প্রস্তুত করাইয়া,পুষ্পমাল্য ক্রয় করিয়া এবং কয়েকটী গ্যাসের আলো ভাড়া করিয়া মিছিলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ক বাদ্য-যন্ত্রের ভিতরে ছিল ২টী মৃদঙ্গ দুই জোড়া করতাল, হারমোনিয়াম্ একটী, বেহালা দুইটী, বাঁশী (flute) একটী। তিন ঘণ্টাকাল নগর (city) ও সৈন্যাবাসের (cantonment) প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাস্তায়, বিশেষতঃ যে সমস্ত দিকে (quarter) বাঙ্গালী পরিবারের বাস, সে সব জায়গায় ঘুরিয়া হরি-সভায় ফিরিলাম। হরি-সংকীর্ত্তনের মত কীর্ত্তন এ দেশে নাই; ইহার প্রাণ-মাতান উন্মাদিনী শক্তি সেদিন বাঙ্গালীতর সবাইকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সকলেরই মতে মিছিল বেশ সুন্দর হইয়াছিল। সামরিক খর্চার বিভাগের ( Military Accountant Department ) অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী এগ্‌জামিনার, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনার ৬ষ্ঠ বিভাগে ( 6th Division, Poona ) অস্থায়িভাবে কাজ করিতেছেন। যুদ্ধোপলক্ষ্যে কার্য্য বাহুল্যবশতঃ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। পুণা হরি-সভা এবং এই দোলি উৎসব তাঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত ও সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি পরম বৈষ্ণব, বড়ই উদার। কীর্ত্তনের সময়, তিনি সন্ধ্যা আহ্নিকের পর আসিয়া আমাদের সঙ্গেই বসেন। নগর সংকীর্ত্তনের দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৈরিকবসন পরিধান করিয়া ও নামাবলী গায় দিয়া সংকীর্ত্তন দলের অগ্রগামী হইতে লাগিলেন ও হিন্দু যাহাকে পাইতে লাগিলেন, তাহাকেই প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দু তাঁহাকে পাদ-স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। আমরা সবাই খুব একটা আনন্দ লাভ করিলাম।

রাত্রিতে, পরদিন কাঙ্গালী ভোজনের জন্ত, যাবতীয় আয়োজন করিয়া রাখা হইল। ভোর বেলায় পাক আরম্ভ হইল। বেলা ৮টায় পূজা সমাপনান্তে পুনঃ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মাদ্রাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী অনেক ভদ্রলোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে প্রসাদ ও পান, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি দ্বারা সংবর্দ্ধনা করা হইল। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে কাঙ্গালী ভোজন আরম্ভ হইল; অন্যূন সহস্র কাঙ্গালীকে ডাল, ভাত, লাবড়া ও মোহনভোগ দ্বারা আহার করাইয়া পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। আমাদের দেশে 'কাঙ্গালী' অর্থে যেমন ভিখারী ভিখারিণীকেই বুঝায়, এখানে তাহা নহে। সেই কাঙ্গালীসঙ্ঘে ভিখারী ভিখারিণী বরং কমই দেখিলাম; অধিকাংশই গরীব মেয়েলোক, সঙ্গে সন্তান সন্ততি, যারা শরীর খাটাইয়া রোজের অন্ন সংস্থান রোজ করিয়া থাকে।

পুনা সিটিতে গরীব লোক অসংখ্য। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই চাকরি ( কুলি মুজরি ) করিয়া উদরান্নের সংস্থানে সহায়তা করে; কাঙ্গালী ভোজনের বেলায় ঐ সব পুরুষ লোক বড় একটা আসে না। মেয়েরা ছেলেপিলে নিয়া শাল পাতায় তো খাইয়া যায়ই, আবার বাসা হইতে থালা-বাটি যাহা লইয়া আসে, তাহাতে ডাল ভাত ভরিয়া লইয়া যায়। এখানকার—মাদ্রাজ এসোসিয়েশন প্রতিমাসে একদিন কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া থাকেন। আমরাও মাঝে মাঝে তাহাতে সাহায্য করিয়া থাকি। আমাদের

ঐ দিনকার কাঙ্গালী ভোজনে কয়েকটী মাদ্রাজী ভদ্রলোক কাজ কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

## কার্লা গুহা।

গত বছর বড়দিনের ছুটী পাইয়াছিলাম আমরা ২দিন। মেসের সবাই কোথাও বেড়াইতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল কার্লা গুহায়ই যাওয়া। প্রত্যূষে উঠিয়া মাথাটা ধুইয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইলাম। ট্রেন ছাড়িবে ৮টায়। আমরা বাঙ্গালী দু'জন, ও তন্মধ্যে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার মাতৃহীন একমাত্র সপ্তম বর্ষীয় পুত্র ও ভৃত্য শিবাজী। সারা দিনের খাবার কেক্, বিস্কুট, পাউরুটী চিনি ইত্যাদি ষ্টেশন হইতে কিনিয়া লইয়া ট্রেন চাপিয়া বসিলাম। অনতিবিলম্বে আমাদের সুদীর্ঘ ট্রেনখানি বাঁশী বাজাইয়া ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে ছুটিল, শীত-প্রভাতের মিঠা রোদ জানালার ফাঁক দিয়া আমাদেরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, আমরা প্রভাতিক পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে অতীতের কত সুখ স্মৃতি ডাকিয়া আনিলাম।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর পুনার ৩৫ মাইল পশ্চিমে মালাভ্লী নামক ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সেখান হইতে উত্তরের দিকে সরকারী রাস্তায় কার্লা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিলাম। কার্লা আমাদের সম্মুখে, মনে হইল যেন দূরত্ব অর্দ্ধ মাইল। পাহাড়ের দূরত্ব স্থির করা বড় মুস্কিল; আমাদিগকে বোকা বনিতে হইল। মনে হইল যেন পাহাড়টা পিছনে হটিয়া যাইতেছে। পর্ব্বতের পাদ দেশে যখন উপস্থিত হইলাম তখন বেলা ১২½ টা; বুঝিলাম দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল; তার পর উপরে উঠিলাম। অন্যূন অর্দ্ধ মাইল উপরে উঠিয়াই গুহায় পৌঁছিলাম।

কার্লা বৌদ্ধ গুহা, গবর্ণমেণ্ট উহা সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। উপরেই একটী তত্ত্বাবধায়ক ( Custodian ) আছেন, উনি প্রত্ন তত্ত্ব বিভাগের ( Archeological Department) লোক, বাড়ী যুক্ত প্রদেশে। উপরে একটী ধর্ম্মশালা আছে, ২।৩ ঘণ্টা কি সারাদিনের জন্য চাকরও পাওয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় আমাদেরে একটী চাকর দিলেন, সে আমাদের পানীয় জল আনিয়া দিয়া ও নানা কাজ কর্ম্ম করিয়া দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। বেলা তখন একটা। আমরা খুব ক্ষুধার্ত্ত, সঙ্গে যাহা আনিয়াছিলাম, সবাই ভাগাভাগি করিয়া তাহা খাইয়া শেষ করিলাম। তত্ত্বাবধায়কের কথা ছিল আমাদেরে সঙ্গে করিয়া নিয়া সব দেখাইবেন; তাহা আর হইল না। কয়েকটি ইউরোপীয় ভদ্রলোক গুহা দেখিতে আসায় উনি পোষাক পরিধান করিয়া তাড়াতড়ি তাঁদের সঙ্গ ধরিলেন। আমরা নিজেরাই গুহা দেখিতে চলিলাম।

গুহাটি ত্রিতল, সর্ব্ব নিম্ন তলায় দরজা ( গেট্ ) পার হইয়াই যে সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যায়, তাহা চমৎকার ও দেখিবার জিনিষ। গুহার প্রবেশ দ্বারে ত্রাকরা দেবীর মন্দির; উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এ দেবীর ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। দেবী রৌপ্যময়ী বলিয়া মনে হইল, এক মস্তক ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাইলাম না। উক্ত দেবীর মন্দিরের সম্মুখেই নহবত, পূজার সময় সেখানে ঢাক ও সানাই বাজনা হয়।

হলটির দৈর্ঘ ১৩০ফিট, প্রস্থ ৭ ফিট, উচ্চতা ৭৫ ফিট, জোড়া জোড়া করিয়া ৩৭টি থাম ( pillar ) ব্যতীত বারান্দায়ও কয়েকটি পিলার আছে। ৩৭টি থাম থাকার বিশেষত্ব এই বুঝা যায় যে '৩৭' এই অঙ্ক বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র। হলটীর তিন দিকে অল্প পরিসর বিশিষ্ট কয়েকটী প্রকোষ্ঠ আছে, তথায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পিলার। বারান্দার ও ভিতরকার পিলার গুলিকে হস্তীর সম্মুখের দুটী পা ও আপাদ বিস্তৃত শুণ্ড বিশিষ্ট মস্তকের আকারে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; হস্তীর কণ্ঠদেশে পুরুষ-রমণীর অথবা প্রেমিক প্রেমিকার যুগল মূর্ত্তি, কোনও কোনও স্থলে দুইটী পুরুষ মূর্ত্তি, একটী স্ত্রী মূর্ত্তি, আবার কোনও হস্তীর কণ্ঠদেশে দুইটী স্ত্রী মূর্ত্তি ও একটী পুরুষমূর্ত্তি রহিয়াছে। হলে প্রবেশ করিবার সময় দেওয়ালের নানা কারু কার্য্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ত্রিতল গুহাটাই পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, তার উপর আবার এইসব কারুকার্য্য, এই সব উঁচু পিলার—কাল কুচকুচে পাথর কাটা; একটু জোড়া তালি নাই, ইট সুর্কির নাম গন্ধ নাই।

হলটির ভিতরকার ছাদ কড়ার ভিতরকার আকারের মত (Concave); তাহাতে পুরু তক্তা ১৮' কি ২০ ইঞ্চি অন্তর অন্তর লাগান আছে; প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, ধনুকের জ্যার আকারে ঐ তক্তাগুলি এমনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছাদে স্থাপিত হইয়াছে যে—সেই জন্যই ঐ হলে শব্দ করিলে এমনকি গোলমাল করিলেও প্রতিধ্বনি হয় না। তাঁহারা গুহার নির্ম্মাণ কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০ দুই শত অব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত গুহার কোন সংস্কার সাধন হয় নাই, সংস্কারের আবশ্যকতাও হয় নাই। ছাদের ঐ কাষ্ঠ কি জাতীয় ও কোনও মসলা ব্যতীত কিরূপে তাহাতে লাগান হইল, আর এই দুই হাজার বছরের ভিতরে খসিয়া পড়িল না কেন, অথবা জীর্ণ হইল না কেন, তাহা এখনও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। হলের প্রায় মধ্যভাগে বৌদ্ধ স্তূপ। কথিত আছে এই স্তূপ সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া যাহা অভিলাষ করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয়। আমরাও প্রদক্ষিণ করিলাম এবং ভগবচ্চুদ্দেশে "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" এই প্রার্থনা করিলাম।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল উক্ত প্রসিদ্ধ হলের চেয়ে উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট, তথাপি বাতাস ও আলোক প্রবেশ করিবার বেশ ব্যবস্থা আছে; দুই তিন শত লোক বসিয়া ধর্ম্মালোচনা অথবা সভা সমিতি করিতে পারে, এমন বেশ জায়গাও আছে। বড় হল্ গুলির পাশেই ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ আছে, সে গুলি সাধারণ কুটীর সদৃশ। দেওয়ালের গায় নানা স্থানে ধ্যানস্তিমিলিত লোচনে, আসন বদ্ধ প্রস্ফুটিত সহস্র দল কমলাসনে উপবিষ্ট, বুদ্ধ প্রতি মূর্ত্তি ও তাহার সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ দুই তিনটি শিষ্য বসিয়া আছেন, দক্ষিণে এবং বামে দুইজন শিষ্য, একটির হাতে দণ্ডকমণ্ডলু ও কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, আর একটির হাতে ধনুর্ব্বাণ—এইরূপ খোদিত মূর্ত্তি আছে।

নিম্নতলে আর যে কয়টি কোঠা আছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। সে গুলির উচ্চতা আরও কম, একটী দেখিলাম একেবারে খালি। আর একটীতে দেখিলাম কয়েকটী গরু ও মহিষ, আর একটীতে একটী ইন্দারা। তাহার জল-পান করিলাম—যেন বরফ। দ্বিতল হইতে ত্রিতলে উঠিবার সময় রাস্তার পাশে দেখা যায় একটী অযত্ন রক্ষিত বৃহদাকার শিবলিঙ্গ; উহা বুদ্ধদেবের পরেই শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব ও প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে।

* * * *

সন্ধ্যার সময়ে ষ্টেশনে পৌছিয়া আবার এক পেয়ালা চা পান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। রাত্রি ১০ঘটিকায় আমরা পুনায় পৌছিলাম।

শ্রীকামিনীকিশোর ধর।

—:০:—

# স্যমন্তকমণি বা হোপ ডায়মণ্ড।

পুরাণে স্যমন্তক মণির বিবরণ এইরূপ বর্ণিত আছে।

চন্দ্র বংশীয় নরপতি অনমিত্রের পৌত্র, নিঘ্ন নরপতির কনিষ্ঠ পুত্র সত্রাজিত একদা সমুদ্রতীরে সূর্য্যকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করেন। জলন্ত অগ্নিস্তূপের ন্যায় উজ্জ্বল স্যমন্তকমণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া সূর্য্যদেব সত্রাজিতের সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি বর স্বরূপ ঐ উজ্জ্বল মণি প্রার্থনা করেন। সত্রাজিত সূর্য্যপ্রদত্ত মণিতে ভূষিত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে, এই অমূল্য মণি মহারাজ উগ্রসেনেরই কণ্ঠদেশে শোভা পাইলে ইহার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সত্রাজিত শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনকে মণিটী দান করিয়া ফেলেন।

মণিটীর একটি বিশেষ গুণ ছিল এই যে, পবিত্র ব্যক্তি উহা ধারণ করিলে সুখে সন্তোষে কাল যাপন করিতে পারিত, কিন্তু কোনও অশুচি ব্যক্তি ইহা ধারণ করিলে তাহার মরণ অনিবার্য্য। প্রসেন যেমন উক্ত মণি কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন, অমনি এক সিংহ আসিয়া বনমধ্যে তাহাকে বিনষ্ট করিল। এই খানেই মণির অশুভশক্তির প্রথম বিকাশ। তৎপর সিংহ ঐ মণি মুখে করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ভল্লুকাধিপতি জাম্ববান তাহাকে বিনষ্ট করেন, এবং মণি

লইয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রের খেলার নিমিত্ত ঐ মণি ধাত্রী হস্তে প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণও মনে মনে লোভ করিয়া কবে মণিটী হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনিও ইহার জ্বালা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিলেন না। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ রত্নের প্রতি লোভ করিয়াছিলেন, এখন তিনিই প্রসেনকে বধ করিয়া স্বয়ং রত্নটি হস্তগত করিয়াছেন। অগত্যা লোকাপবাদ দূর করিবার নিমিত্ত তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রসেনাবলম্বিত পথে গমন পূর্ব্বক প্রথমে প্রসেনকে তৎপর সিংহকে নিহত দর্শন করেন। তৎ পার্শ্বে ভল্লুক পদচিহ্ন দর্শন করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে করিতে জাম্ববানের গৃহে ধাত্রী-হস্তে স্থিত উজ্জ্বল মণি দর্শন করিলেন। অপরিচিত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণর সাগ্রহ দৃষ্টিতে ধাত্রী মনে ভয় পাইয়া উচ্চ চিৎকার করিয়া উঠিল। ঐ স্থানে মণির নিমিত্ত জাম্ববান এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হয়।

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের গুহাগৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে সৈনিক দিগকে দ্বারদেশে সন্নিবেশিত রাখিয়াছিলেন, তাহারা দ্বারকায় প্রতিনিবৃত্তি হইয়া তাঁহার মৃত্যু কথা অতি রঞ্জিত করিয়া প্রচার করিলে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ যথারীতি সম্পন্ন করিলেন। আন্তরিক ভক্তি সহকারে প্রদত্ত অন্নজলে শ্রীকৃষ্ণের বল বৃদ্ধি হইল; তিনি জাম্ববানকে পরাস্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে স্যমন্তকমণি আনয়নপূর্ব্বক সত্রাজিতকে প্রদান করিয়া চৌর্য্যাপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

তৎপর বহুদিন যাবৎ স্যমন্তক মণির কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। কতিপয় দিবস পূর্ব্বে মার্কিন যুক্ত রাজ্যে একজন সুবিখ্যাত ধনী মহাজনের বালক পুত্রের যে শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও এই মণি অথবা এই রূপ অপর একটি মণির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ বলিয়া অনুমান হয়। পুরাণ বর্ণিত স্যমন্তক এবং অধুনা উল্লিখিত মণির একত্ব সম্বন্ধে তথ্য নির্দ্ধারণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান সাপেক্ষ। ঘটনাটি এইরূপ।—

আমেরিকার সুবিখ্যাত ধনী এডওয়ার্ড ম্যাক্‌লিন্ ওয়াশিংটন পোষ্টের স্বত্বাধিকারী। গত জুন মাসে তিনি একদিন পুত্রকে উপযুক্ত অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, পত্নী সমভিব্যাহারে ক্রীড়া কৌতুক দর্শনার্থ কেন্টাকি নগরে গমন করেন। ছেলে-চোর বা অন্যবিধ বিপদ হইতে স্বীয় পুত্র ভিন্‌সন্‌কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ম্যাক্‌লিনপত্নী বালকের শৈশবেই একদল বলিষ্ঠ প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বালক ভিন্‌সন্ ওয়াশিংটন প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী স্বীয় সৌধের সমীপে রাস্তার উপরে খেলা করিতেছিল; দুর্ভাগ্যক্রমে একটি চলন্ত মটর গাড়ীর ধাক্কায় সে মাটিতে পড়িয়া গেল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বালকের মাতা পিতা স্পেশ্যাল ট্রেনে আরোহণ করিয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। আমেরিকার মত সুসভ্য দেশে অগাধ ধন সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারীর পক্ষে চিকিৎসাদি যে পরিমাণে হওয়া উচিত, বালকের তাহাতে কোন অংশেই ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু কোনও চেষ্টাই বালককে জীবন দান করিতে পারিলাম না; আঘাত প্রাপ্তির পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বালক প্রাণ ত্যাগ করিল।

আমেরিকার দুইটি বিখ্যাত সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী জন্ ম্যাক্‌লিন এবং কলোরেডো প্রদেশের বহু খনির মালিক টমাস্ ওয়াল্‌শ্ উভয়ই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন, বালক ভিন্‌সন্ এই উভয়ের সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং শৈশবেই ভবিষ্যদুন্নতির হেতু ভূত লক্ষণ সমূহে অলঙ্কৃত ছিল। জীবনের এই দশবৎসর কাল তাহাকে মাতা, পিতা, তত্ত্বাবধায়ক ও প্রহরিবর্গের সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেই বাস করিতে হইয়াছিল। অন্যের সহিত মিশিতে দিলে বালকের মন সাধারণের সমান হইয়া যাইবে এই মনে করিয়া ম্যাক্‌লিন পত্নী নির্দ্দিষ্ট কতিপয় বালককে তাহার সহচর রূপে স্থির করিয়া দেন, এবং যাহাতে বালকের মনে সাম্য ভাবের উদয় হয়, এই জন্য একটি নিগ্রো বালককেও তাহাদের সঙ্গীরূপে অবস্থান করিতে অনুমতি দেন।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বালক ভিন্‌সনের পাঁচটী বাড়ী ছিল এবং সেই সকল বাড়ীতে ইচ্ছানুসারে যাতায়াত করিবার জন্য তাহার পরিচারক বৃন্দ সর্ব্বদা তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত থাকিত। ১৯১০ সনের বড় দিন উপলক্ষে প্রায় ৪০ হাজার পাউণ্ড বা ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের উপঢৌকন বালকের হস্তগত হইয়াছিল। কলোরেডো সুবর্ণ খনির অংশীদার বেল্‌জিয়ম্ রাজ লিওপোল্ড্

সুগন্ধি গোলাপ কাষ্ঠ (Rose wood) এবং স্বর্ণে নির্ম্মিত একখানি দোলা এই বালককে উপহার দিয়াছিলেন।

. তিনি সনের মাতা দুর্লক্ষণ প্রসবক মণি ( Hope Diamond ) ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনেকেই ইহা ধারণ করিয়া ইহার অবশ্যম্ভাবি কুফল হইতে অব্যাহতি পান নাই। কোন্ কোন্ ব্যক্তির বিপদ ঘটাইয়া, কি প্রকারে ইহা ম্যাক্‌লিন্ পত্নীর হস্তগত হইয়াছিল, তাহা বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ফরাসী দেশীয় বিখ্যাত আবিষ্কারক ট্যাভার্ণিয়ার এই মণি ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে লইয়া যান। তিনি ইহা ফরাসী দেশীয় তদানীন্তন সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইর নিকট বিক্রয় করেন। তদীয় যশস্বী প্রিয়-মন্ত্রী সম্রাটের নিকট হইতে উক্ত মণি গ্রহণ করিয়া ধারণ করেন এবং শীঘ্রই পদচ্যুত হন। কিছুদিন পরে তত্রত্য অষ্টম সম্রাট্ ষোড়শ লুইর পত্নী মেরী এন্টোনিটী উহা গলদেশে ধারণ করিয়া স্বামী,পুত্র এবং সাম্রাজ্য হারাইয়া গিলোটিন্ নামক সংহার যন্ত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তদীয় সখী ল্যাম্বেলের রাজকুমারী কখনও কখনও উহা গ্রহণ ও ধারণ করিতেন, তাই তাঁহাকেও হত্যার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রী টমাস্ হোপ্ ১৮ হাজার পাউণ্ড বা দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন অবশ্য এই মণি তাঁহার কোনও অনিষ্ট সাধন করে নাই। তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নাম হোপ্ ডায়মণ্ড ( Hope Diamond ) বা হোপ্ মণি রাখা হয়। নিউ ক্যাসল জমিদারীর ভাবী উত্তরাধিকারী লর্ড ফ্রান্সিস্ হোপ্ এই মণি কিছুদিন পরে প্রাপ্ত হন। তিনি কুমারী মে ওহিকে বিবাহ করেন; ইনি সুন্দরী এবং কুম্ গীতি নামক এক প্রকার নিগ্রোগীততে অতিশয় নিপুনা ছিলেন; কিন্তু ঐ মণি ধারণের কিছুদিন পরেই ইঁহার স্বামী ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমতি মে ওহি যখন কার্য্যান্তর উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, এই দুর্লক্ষণ মণিই তাঁহার সকল দুর্ভাগ্যের কারণ; এবং ইহা ধারণ করিলে কেহই বিপদমুক্ত থাকিতে পারিবে না। তিনি স্বয়ং মণির প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি ভাব পোষণ করিতেন,কেবল উৎসবাদি উপলক্ষে দশজনের মধ্যে বাহির হইবার সময় তিনি ইহা ধারণ করিতেন।

লর্ড ফ্রান্সিস্ মহোদয়ের নিকট মণিটি যতদিন ছিল, ততদিন উহা আর কেহই ধারণ করে নাই। লণ্ডন নগরের বিখ্যাত জহুরী ওয়েল্ সাহেব্ এই মণি ক্রয় করিয়া লন; তিনি ইহাকে আমেরিকার নিউইয়র্ক্ নগরের একজন জহুরীর নিকট বিক্রয় করেন। কিন্তু এই শেষোক্ত জহুরী মণিটী লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। বহুমূল্য এই জন্যই হউক অথবা ইহার দুর্ভাগ্যের বিষয় জানিয়াই হউক, কেহই ইহা খরিদ করিতে আসিল না। এদিকে তাঁহার গৃহে নানা বিপদ উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি একেবারে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া পড়িলেন। অবশেষে জ্যাকোয়েস্ কলট্ নামক ফরাসী দেশীয় একজন দালাল বাট্‌হাজার পাউণ্ড বা নয় লক্ষ টাকা মূল্যে ইহা ক্রয় করেন।

তিনি কানিটভস্কী নামক রুশিয়ার এক রাজকুমারের নিকট ইহা বিক্রয় করিয়া আপাততঃ মণির চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং উন্মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা মুক্ত হন। রাজকুমার তাঁহার এক প্রিয়তমা রমণীকে ইহা দান করেন। রমণী অভিনয় কার্য্যে অতিশয় নিপুণা ছিলেন; ঐ মণি গলদেশে বিলম্বিত করিয়া তিনি যেমন রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিয়া অভিনয় করিতেছিলেন, অমনি রাজকুমার দর্শন স্থান হইতে গুলিকরিয়া প্রিয়তমাকে ভূমি শায়িত করেন; কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ও বিপ্লব বাদীদিগের হস্তে নিহত হন।

মিসন্ মন্থারিডিস্ নামক গ্রীস্ দেশীয় একজন শ্রেষ্ঠী ইহা ক্রয় করেন এবং দালানের ছাদের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গ্রীস্ হইতে আসিয়া মণি তুরস্ক সুলতান্ আবদুল্ হামিদের কণ্ঠদেশ শোভিত করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য সুলতান্ অনতি বিলম্বেই সিংহাসনচ্যুত হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তরুণ তুর্কদলের নিকট হইতে হাবিব্ এই মণি ক্রয় করিয়া লণ্ডনে লইয়া যান এবং এইবৎসরই নবেম্বর মাসে একখানি ফরাসী জাহাজের সহিত রিও প্রণালীর অতল সলিলে নিমজ্জিত হন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীমাসে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী এডোয়ার্ড ম্যাক্‌লিন্ ষাট্ হাজার পাউণ্ড মূল্যে এই মণি খরিদ করেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। আর ১৯১৯খৃষ্টাব্দের জুনমাসে তাঁহার পুত্রটি বহু যত্ন ওসতর্কতার সীমা অতিক্রম করিয়া অকালে কালকবলে পতিত হইল।

কোনও দ্রব্যের এমন শক্তি থাকিতে পারে না বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন,এবং এসকলকে কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা করেন এবং বিজ্ঞতার ভাণ বা সুসংস্কারের গর্ব্ব করিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের ও মনে ক্ষণ কালের নিমিত্ত এই দুর্লক্ষণ মণি একটি নবীন চিন্তার অবসর দিবে, বলিয়া বিশ্বাস করি।*

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

*ষ্টেটস্‌ম্যান্ হইতে গৃহীত।

Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, Dacca